KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৫০৮/১, বেহালা পার্ক, কল-৩৪
Collection : KLMLGK	Publisher : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
Title : বিভাব (BIVAV)	Size : 5.5" x 8.5"
Vol. & Number : 21/2 21/3 22/1 23/1	Year of Publication : Oct - Dec 1999 Jan - March 2000 July - Sep - 2000 Oct - 2001
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

৮৩

বিশেষ শরৎকালীন সংখ্যা/১৪০৮

বিভাব

সম্পাদক/সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

বিভাব

তোমারে ক'লকাতা সেলাম

সাহিত্য-কলা-কৃষ্টির ত্রিবেণীসঙ্গম

ক'লকাতা। যেখানে প্রাণের স্পন্দন শোনা যায় প্রতি মুহূর্তেই। শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, কলা - সব বিষয়েই ক'লকাতার ঐতিহ্য সেই অষ্টাদশ-উনবিংশ শতক থেকে শুরু করে আজ অবধি একই ধারায় প্রবহমান। অবনীন্দ্র থেকে অমর্ত্য, মাইকেল থেকে মাদার টেরিজা, রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্র থেকে সুভাষ, জগদীশচন্দ্র থেকে জীবনানন্দ, নরেন্দ্রনাথ থেকে নজরুল, সুকুমার থেকে সত্যজিৎ ক'লকাতা সদাই সচল।

ঐতিহ্য এক মহান সম্পদ - আর তা রক্ষণাবেক্ষণ করাও এক মহান কর্তব্য। ক'লকাতা পৌরসভা এই মহান কাজকে মাথায় তুলে নিয়েছে।

কলিকাতা পৌরসভা

আরো ভালোভাবে বাঁচবার এক প্রতিশ্রুতি

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

বিভাব

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বিশেষ কবিতা সংখ্যা

১৪০৮

সূচি

সম্পাদকীয়

স্মরণিকা : শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের চারটি আলোকচিত্র

অতিজীবিত শ্যামল ❑ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৭

তলানিশুদ্ধু জীবনরসের নেশাড়ু শ্যামল ❑ অশেষ চট্টোপাধ্যায় ১১

রইল বাকি দুই ❑ সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ২০

বন্ধু, প্রণাম ❑ কিন্নর রায় ২১

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের গ্রন্থ তালিকা ২৯

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনপঞ্জি ৩২

তরু'র শ্বশুরবাড়ি

জ্যোৎস্না দেবীর দু'টি আলোকচিত্র

তরু'র শ্বশুরবাড়ি : পূর্বকথন ❑ হিমানীশ গোস্বামী ৩৭

তরু'র শ্বশুরবাড়ি ❑ জ্যোৎস্না দেবী ৪৩

জ্যোৎস্না দেবীর সংসার ❑ হিমানীশ গোস্বামী ৫৭

ভাষণ

অগ্নিযুগের সূচনা ও স্বরূপ ❑ হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৬৫

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ও মেঘনাদ সাহা ❑ ভূমিকা : অমিতাভ চৌধুরি ৭৩

বিশেষ রচনা

গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ্ :
আপনাকে যে-চিঠি পাঠানো হয়নি ❑ অমিতাভ রায় ৭৯

Special Section on Gabriel García Márquez ১০৬

গল্প

ঘনিষ্ঠ উত্তাপ ❑ কার্তিক লাহিড়ী ১২৫
অল্প একটু দুঃখ ❑ বিজনকুমার ঘোষ ১৩১
মৃদুলার বুধবার ❑ মানব চক্রবর্তী ১৩৯
ব্যাঙ্গমির চোখ ❑ তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪৭
আরব্য রজনী ❑ কিন্নর রায় ১৫৯

আখ্যান

গিরিশ দর্শন ❑ সুব্রত মুখোপাধ্যায় ১৫৩

উপন্যাস

কোন বাড়ি কার দেশ (ত্রিপুরা পর্ব) ❑ কল্যাণ মজুমদার ১৬৯

ক্রোড়পত্র

উত্তরা
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ❑ বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

কবি গৌরাঙ্গ ভৌমিকের প্রয়াণে আমরা শোকস্তব্ধ।
তাঁর স্মৃতির প্রতি রইল আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা।

বিভাব

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক

RN 30017/76

Declaration U/S of the Press & Registration of Book Act.

১। প্রকাশের স্থান : ৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক। কলি-৬৮
২। প্রকাশের কালানুক্রম : ত্রৈমাসিক
৩। প্রধান সম্পাদকের নাম : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
সংযুক্ত সম্পাদকের নাম : রাহুল সেন
জাতীয়তা : ভারতীয়। ঠিকানা : ৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক। কলি-৬৮
৪। মুদ্রাকর ও প্রকাশকের নাম : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
জাতীয়তা : ভারতীয়। ঠিকানা : ৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক। কলি-৬৮
৫। একমাত্র স্বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা :
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত। ৫০৮/এ যোধপুর পার্ক। কলি-৬৮

আমি সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে প্রদত্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

(স্বা) সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সম্পাদকীয়

বর্তমানে আমরা এক অস্থির সময়ের মধ্য দিয়ে চলেছি। উগ্রপন্থী ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ, চরমপন্থী আক্রমণ, যুদ্ধের আস্ফালন, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের টানাপোড়েন, সব নিয়ে এক শ্বাসরুদ্ধ অবস্থা। শুরু হয়ে গেছে যুদ্ধ। এই যুদ্ধে উগ্রপন্থা নির্মূল করার লক্ষ্যে, কিছু সাম্প্রদায়িক চরমপন্থীদের সঙ্গে নিহত হবে সাধারণ হাজার হাজার মানুষ। ক্ষমতাপিপাসু 'বিশ্বশক্তি'-র আস্ফালনে যাবে বহু প্রাণ, রক্তাক্ত হবে মানবতা, প্রেম, স্নেহ নামের যাবতীয় সুকুমার বৃত্তি। এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে মনে হয়, এই হিংসা, প্রতিহিংসা কি একান্তই অনিবার্য ছিল? প্রাণের এই যথেচ্ছ বিনাশ হয়তো আমাদের পুজোর আনন্দটাকেই অনেক ম্লান করে দেবে।

প্রতিটি ধ্বংসের মধ্যে যেমন লুকিয়ে থাকে সৃষ্টির বীজ, এই অস্থির টালমাটাল সময়ের মধ্যে দাঁড়িয়েও আমরা পাঠকদের হাতে তুলে দিলাম বিভাবের বিশেষ শরৎকালীন সংখ্যা। একইসঙ্গে সূচনা হল এই প্রকাশনার ছাব্বিশতম বছরের। সময়ের এই দীর্ঘ পরিসরে আমরা নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি এবং তা উত্তীর্ণও হতে পেরেছি। পাঠকদের অকৃপণ বদান্যতা ও লেখকদের সদা-প্রস্তুত সহযোগিতা আমাদের উদ্যমকে অব্যাহত রেখেছে। বিজ্ঞাপনদাতাদের আর্থিক আনুকূল্য থেকেও আমরা বঞ্চিত হইনি। সর্বোপরি ছিল অসংখ্য শুভানুধ্যায়ীর আন্তরিক শুভেচ্ছা, যা আমাদের প্রাণিত করেছে।

বিগত কবিতাসংখ্যার অভূতপূর্ব সমাদর, পাঠকদের প্রশংসা, সমালোচকদের সাধুবাদ আমাদের অভিভূত করেছে। এই সংখ্যা যে প্রবল প্রশংসা পেয়েছে তা ভবিষ্যতেও আমাদের বিশেষ কবিতাসংখ্যা প্রকাশ করতে উৎসাহিত করবে।

এই সংখ্যায় আমাদের নিবেদন ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মানে ভূষিত বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের 'উত্তরা' চলচ্চিত্রটির সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য। রয়েছে প্রখ্যাত রসরচনাকার হিমানীশ গোস্বামীর ভূমিকা সংবলিত, তাঁর মা জ্যোৎস্নাদেবী রচিত একটি অসামান্য স্মৃতিকথা। এ ছাড়াও প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, চিঠিপত্রের একটি সুচয়িত সংকলন।

বিভাবের খুব কাছের মানুষ, সাহিত্যিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্য-জগতে এক অপরিসীম শূন্যতার সৃষ্টি হল। শেষ মুহূর্তে তাঁর সম্বন্ধে কয়েকটি রচনা আমরা এই সংখ্যায় সংযোজন করলাম। তাঁর পরিবারবর্গের জন্য রইল আমাদের আন্তরিক সমবেদনা। বিভাবের এই সংখ্যাটি তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত।

এই সংখ্যা থেকে বিশেষ পরামর্শদাতা হিসাবে বিভাব পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হলেন প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায়।

শেষে-বিভাবের পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা ও অসংখ্য শুভানুধ্যায়ীদের জানাই শরৎকালীন প্রীতি ও শুভেচ্ছা। শরতের নির্মল আকাশ আমাদের জীবনে ফিরিয়ে আনুক শান্তির বাতাবরণ।

নমস্কারান্তে

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সম্পাদকমণ্ডলী :
পবিত্র সরকার । প্রদীপ দাশগুপ্ত
শান্তিনিকেতন
অরুণ মুখোপাধ্যায় । অনাথনাথ দাশ । স্বপনকুমার ঘোষ

সম্পাদক
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সংযুক্ত সম্পাদক
রাহুল সেন

প্রধান যোগাযোগ কেন্দ্র ও লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সম্পাদকীয় দপ্তর
'বিভাব'
৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক (দ্বিতল) । কলকাতা - ৬৮ । দূরভাষ : ৪৭৩-৩৬০০

শান্তিনিকেতনে যোগাযোগ কেন্দ্র
অরুণ মুখোপাধ্যায়
এ্যানডুজপল্লী (পশ্চিম), পো: শান্তিনিকেতন । পিন: ৭৩১২৩৫

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : শঙ্কর ঘোষ

বাঁধাই : গৌরাঙ্গ বাইন্ডার্স, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০০৯

প্রাপ্তিস্থান : *পাতিরাম*
ইস্টার্ন বুক এজেন্সি
৮/সি, টেমার লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক ৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক, কলকাতা -৭০০ ০৬৮ থেকে প্রকাশিত।
বর্ণনা, ৬/৭ বিজয়গড়, কলকাতা - ৭০০ ০৩২ ফোন : ৪১২ ১১৩৩ হইতে অক্ষর বিন্যস্ত
এবং চিত্রিত ও আইডিয়াল গ্রাফিক্স, কলকাতা - ৭০০ ০১৯ হইতে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

'অনিশ্চিত আকাশের মতো মুখ'

চাম্পাহাটির বাড়িতে 'অলীকবাবু'

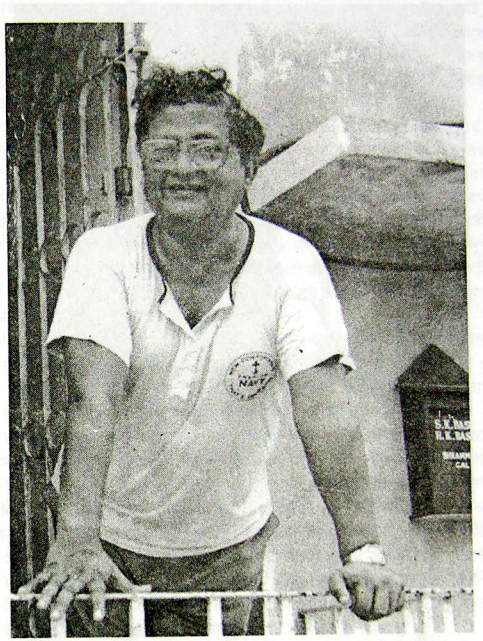

ব্রহ্মপুরের বাড়িতে এক উজ্জ্বল দুপুরে

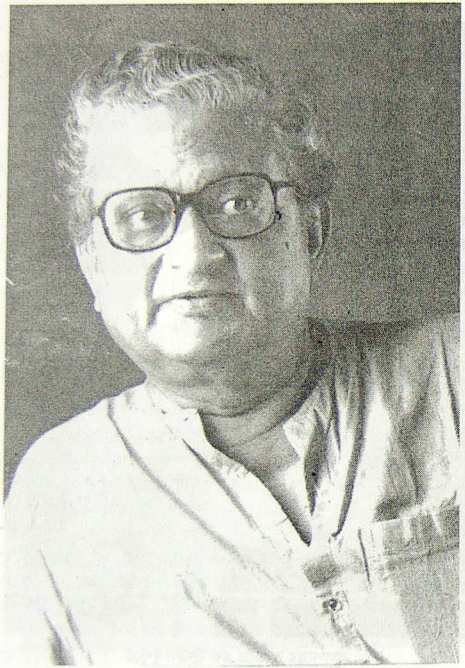

একান্ত নিজের কাছে

অতিজীবিত শ্যামল

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আজ মঙ্গলবার, আর দু'দিন পরে শ্যামলের শ্রাদ্ধ। যেখানে আমার যাবার ইচ্ছে নেই, তবু যেতে হবে হয়তো। লোকাচার। আমার সেখানে যাওয়া না যাওয়ায় শ্যামলের কিছু যাবে আসবে না, আমার মতন শ্যামলেরও পরলোক কিংবা আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস ছিল না। তবু তার দুই মেয়ে, স্ত্রী এবং অন্যান্য নিকটজনের সাময়িক সান্ত্বনার জন্য এরকম কিছু কিছু লোকাচার পালন করতেই হয়।

শ্যামল গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ার পর আমি তাকে একবারই মাত্র দেখতে গিয়েছিলাম। বেহালার কর্কট রোগ গবেষণা ও চিকিৎসালয়ে, তখনই মাঝে মাঝে তার কথাবার্তা অসংলগ্ন হয়ে পড়ছিল। তার পরের আট ন'মাসে আরও কি কয়েকবার যাওয়া উচিত ছিল না আমার? কিন্তু মনের মধ্যে প্রতিরোধ ছিল। স্বাভাবিকতা থেকে তার শরীর ও মনের কোনোরকম বিচ্যুতির সামনে দাঁড়াতে আমার ভয় করেছে। তার অন্তিম দিনটিতে কার্যকারণবশত আমি ছিলাম কলকাতার বাইরে। তার প্রাণহীন মুখ আমাকে দেখতে হয়নি। আমি শ্যামলের অসুখ কিংবা চূড়ান্ত প্রস্থানের বিষয়ে কিছু লিখব না, তার প্রাণবন্ত, কৌতুকময় অস্তিত্বের কথাই আমার বাকি জীবন মনে থেকে যাবে। আমার কাছে সে সব সময়েই অতিজীবিত শ্যামল, ইংরেজিতে যাকে বলে লারজার দ্যান লাইফ।

আমাদের কফি হাউস আমলে শ্যামল প্রায়ই মজা করে বলত, বাংলা সাহিত্যে সে আর আমি দুই ভাই, আমাদের বাবার নাম নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ঠাকুর্দা উপেন গঙ্গোপাধ্যায় ও বাবার ঠাকুর্দা তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। অনেক সভা-সমিতিতে গিয়ে শ্যামল নিজের নাম বলত সুনীল, আর আমাকে শ্যামল বলে পরিচয় করিয়ে দিয়ে ভ্রান্তিবিলাস ঘটাত।

নিছক পদবির মিল ছাড়াও শ্যামল আর আমি দুই ভাইয়ের মতনই ছিলাম একসময়ে বেশ কয়েকবছর। সমবয়েসী হলেও যমজ ভাই নয়, দু'জনের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিলই বেশি। বলা যেতে পারে, দুই মেরুরই অধিবাসী, তবে বিপরীত মেরুই পরস্পরকে টানে। প্রায় প্রতিদিনই দেখা না হলে ভেতরে ভেতরে একটা ছটফটানি হত, সেই একটা বয়েস যখন প্রেমিকার চেয়েও বন্ধুদের প্রতি টান ছিল দুর্নিবার, এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্ক শরীর ব্যতিরেকে সমকামীর মতন। শরীর ব্যতিরেকের কথা উল্লেখ করতে হল এই জন্য যে সেই কালে বন্ধুতে বন্ধুতে কাঁধে হাত দিয়ে পথ চলার রেওয়াজ ছিল, আমি তা মানতে পারিনি। কেউ কাঁধে হাত দিলেই আমার সেখানটা জ্বালা করত। আমি বন্ধুদের বলতাম, পুরুষদের স্পর্শ আমার একেবারেই সহ্য হয় না। এ কথাটা নিয়ে ঠাট্টা করত শ্যামল।

শ্যামল যখন বৃহন্নলা, অনিলের পুতুল লিখছে, তখন সে থাকে দক্ষিণ কলকাতায়, অতিশয় সুপুরুষ, সারল্যমাখা সপ্রতিভ এবং তুখোড় বাক্-বিভূতিতে যে কোনো আসরের মধ্যমণি। আমি প্রত্যন্ত উত্তরের বাসিন্দা, শুধু কবিতা লিখি, বাক্-পটুতা আমার কোনোকালেই নেই, তখন অনেকে আমাকে বলত লাজুক স্বভাবের। শ্যামল কৈশোর-যৌবনে কবিতা লেখেনি, অনেকসময় সে স্বীকারও করেছে যে কবিতা বিশেষ পড়েওনি, আমার কবিতাকে কোনোদিনই পাত্তা দেয়নি। তবু কী করে যে আমাদের বন্ধুত্ব হল? কেন যে সুদূর টালিগঞ্জ থেকে ট্রামে-বাসে

চেপে হঠাৎ হঠাৎ চলে আসত আমাদের শ্যামপুকুরের বাড়িতে? দুধ-রঙা গিলে করা পাঞ্জাবি ও ধুতি, আমরা তখন চুল ওলটাচ্ছি, শ্যামলের সিঁথি কাটা একপাশে পাট করা চুল, অচঞ্চলচোখ, যেন নিপাট ভালমানুষটি, কিন্তু মাথার মধ্যে সবসময় খেলা করছে একটা না একটা মজা করার ইচ্ছে। আফগানিস্তানের বেতারের পুস্তুভাষায় সংবাদ পাঠ কিংবা উর্দুতে লক্ষ্ণৌয়ের এক তয়ফাওয়ালির কিস্যা সে আমাদের এমনভাবে শোনাত, যাতে মনে হবে ওই সব ভাষা সে একবর্ণও না জেনে সে কত ভালো জানে।

আমি গদ্য লিখি না এবং আমার কবিতা সম্পর্কেও শ্যামলের কোনো আগ্রহ না থাকা সত্ত্বেও, শ্যামল যে আমাকে বন্ধু করতে চেয়েছিল, তার একটা কারণ শ্যামল জেনেছিল আমি তার একনিষ্ঠ পাঠক।

বন্ধুবান্ধবের মধ্যে আমারই যে পড়ার নেশা ছিল সবচেয়ে বেশি, তা আমি অসংকোচে বলতে পারি। আমি সেই সময়ে তো বটেই, তারপরেও বহুদিন পর্যন্ত শ্যামলের প্রতিটি লেখাই পড়েছি। এবং আমি তার প্রতিটি লেখারই মুগ্ধ পাঠক। কোনো কোনো লেখার বিষয়বস্তু হয়তো কমজোরি, আরম্ভের তুলনায় সমাপ্তি অসংলগ্ন, কিন্তু আমার ভালো লাগত তার প্রতিটি রচনার গদ্যভাষা। সন্দীপন যাকে দারুণ গদ্য বলে, আমি সে অর্থে দেখিনি। এ এক প্রসাধনহীন সাবলীল গদ্য, যার সঙ্গে মিশে থাকে উচ্চাঙ্গের হিউমার। এই হিউমারের কোনো বাংলা প্রতিশব্দ নেই, নিছক রসিকতা কিংবা কৌতুক নয়, সাহিত্যের একটা বিশেষ রস।

তখন দেশপ্রিয় পার্ক সন্নিহিত শংকর চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে রবিবাসরীয় সান্ধ্য আড্ডায় নিয়মিত গল্প-কবিতা পাঠ হত, শ্যামল সেখানে অনেকবার গল্প পড়েছে, তবু যে সে কোনো কোনো দুপুরে একা উত্তর কলকাতায় এসে শুধু আমাকেই আলাদা করে কোনো কোনো লেখা শোনাতে আসত, তার কারণটা সত্যিই অদ্ভুত কিংবা ব্যাখ্যার অতীত বলা যায়। ততদিনে শ্যামল আমাকে 'তুই' সম্বোধন করতে শুরু করেছে। শ্যামলের চেয়েও আমার আগেকার বন্ধু শক্তি, সন্দীপন বা শরৎকুমার কখনো আমাকে তুই বলেনি, আমারই কোনো আড়ষ্টতার কারণে, শ্যামল সে বাঁধা ভেঙে দিয়েছিল। নির্জন দুপুরে তার কোনো লেখা শোনার পর আমি উচ্ছ্বসিতভাবে তারিফ করতেই শ্যামল খুব ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞেস করত, আমার এই লেখাটা কৃত্তিবাসে ছাপাবি? ওর এই ব্যাকুলতার কি অর্থ হয়? কৃত্তিবাস শুধুই একটা কবিতার কাগজ, পাঁচ-সাতশো ছাপা হয়, শুধু তরুণ কবিদের মধ্যেই এ পত্রিকা সম্পর্কে যা কিছু আলোড়ন। শ্যামলের লেখা তখন কিছু কিছু বড়ো কাগজে ছাপা হচ্ছে, তা হলে কৃত্তিবাসের মতন একটা অকিঞ্চিৎকর কবিতা-পত্রিকায় তার গদ্য রচনা ছাপা হলে কী আর পরমার্থ হবে?

আমি সম্পাদক হিসেবে বেশ কঠোরই ছিলাম, প্রবন্ধ ছাড়া অন্য কোনো গদ্য কাহিনীর স্থান ছিল না। শ্যামলের কয়েকটি লেখা প্রত্যাখ্যান করার পরেও সে এমনই অভাবনীয় চমৎকার লেখা শোনাতে লাগল যে সমস্ত নিয়ম ভেঙে, কৃত্তিবাসের সহযোগী অন্য বন্ধুদের আপত্তি অগ্রাহ্য করেও প্রথমে শ্যামলের 'সুন্দর' নামে একটি রম্য রচনা আর 'বিদ্যুৎচন্দ্র পাল সম্পর্কে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়' নামে একটি নতুন আঙ্গিকের গল্প ছাপিয়ে ছিলাম।

শ্যামলের চম্পাহাটি পর্বের তো আমরা গোড়া থেকেই সাক্ষী।

আমাদের সকলের উপার্জন তখন সামান্য, শ্যামলও ব্যতিক্রম নয়, কিন্তু দুঃসাহসী শ্যামল সেই সময়েই ক্যানিং লাইনের চম্পাহাটিতে একটুকরো জমি কিনে, অসমাপ্ত বাড়ি তুলে বসবাস করতে শুরু করে। তার দু'টি মেয়েই ছোটো ছোটো, স্ত্রী ইতি সর্বংসহা। সেখানে শ্যামল চাষবাসে

মত্ত হয়ে বহু গ্রাম্য মানুষের সঙ্গে সহজভাবে মিশে যায়, তাদের সঙ্গে তাড়ি ও বিড়ি খেয়ে আড্ডা দেয়। তার ফলে শ্যামল এমন এক জীবনে প্রবেশ করল, যে অভিজ্ঞতা আমাদের কারুরই ছিল না। আমারও গ্রামে জন্ম, কিন্তু তা বাল্যস্মৃতি। যৌবন বয়েসে শ্যামল নতুন করে গ্রাম্য মানুষদের চিনল। 'কুবেরের বিষয় আশয়'-এর পর 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা'-র মতো উপন্যাস কিংবা 'সহোদর' ও 'পরী'-র মতন গল্প লিখে শ্যামল বাংলা সাহিত্যকে যে-ভাবে সমৃদ্ধ করতে লাগল, তা অনন্য, পূর্বসূরিদের সঙ্গে কোনো মিলই নেই। শ্যামল দ্বিতীয় বিভূতিভূষণ নয়, সে যথাযথ ভাবে আধুনিক, তার গ্রাম কিংবা আধা মফস্বল ভিত্তিক কাহিনীগুলির মধ্যে আছে সমসাময়িক তাৎপর্য এবং তির্যক দৃষ্টি, নিছক মুগ্ধতার চশমা পরে সে প্রকৃতিকেও দেখেনি।

অল্প বয়েসে ঝোঁক থাকে ভাঙার দিকে। অনেকেই ভাঙতে ভাঙতে যায়, অনেকেই থেমে যায় ভাঙনের মাঝপথে, দু'একজনই শুধু গড়ে নিতে পারে নিজস্ব পথ। পঞ্চাশের দশকে যারা ভাঙার খেলা শুরু করেছিল, তারা তো অনেকেই থমকে গেছে কিংবা ঘুরপাক খেয়েছে একই বৃত্তে, শ্যামল তৈরি করেছে নতুন নতুন পথ, তরুণতর লেখকদেরও সে সঙ্গে ডেকে নিয়েছে। আমি দশচক্রে পড়ে গদ্যের জগতে ঢুকে পড়লেও মনে হয়েছে, শ্যামলের মতন খাঁটি গদ্য লেখক হওয়া আমার পক্ষে কোনোদিনই সম্ভব নয়। সব সময়েই আমার মনে হয়েছে, এ যেন পরো ধর্ম ভয়াবহ।

শ্যামল একদিন বলেছিল, সুনীল, আমার মেয়েরা তোর বই এত মন দিয়ে পড়ে, তা দেখে আমার হিংসে হয়। আমি ওকে বলেছিলাম, পুপ্‌লু একটা ছোটদের পূজাবার্ষিকী পড়ে বলে উঠল, শ্যামলকাকুর লেখাটা সবচেয়ে ভালো লাগছে। তারপর, আমি কিছু জিজ্ঞেস না করতেই মতামত দিয়েছিল, বাবা, তোমার লেখাটা সাত নম্বর! এই বয়েসে ওরা তো কোনো মন-রাখা কথা বলতে শেখে না।

একথা শুনে শ্যামল হা-হা করে হেসে উঠেছিল।

আমাদের একসময়ের উদ্দামতা বা বাউণ্ডুলেপনার সঙ্গে শ্যামল কখনো যোগ দেয়নি। শক্তি, সন্দীপন ও আমি যখন চাইবাসা কিংবা হেসাডি কিংবা ধলভূমগড়ে চলে গেছি হঠাৎ হঠাৎ, শ্যামল যায়নি, ওকে ফেলে আমরা চলে গেছি হাওড়া স্টেশনে। শ্যামল পরে খেদ করেছে, তোরা কেন ডাকিসনি আমাকে? ডাকাডাকির তো কোনো ব্যাপারই ছিল না, যারা এসেছে তারা মিলিত হয়েছে কোনো অদৃশ্য চুম্বকের টানে। শ্যামল যখন বলত, তোদের চাইবাসা আর ধলভূমগড় আছে, আমার তো নেই, তার উত্তরে আমি বলতাম, তোর যে চম্পাহাটি আছে! হয়তো চাইবাসা-ধলভূমগড় থেকে আমরা যা পেয়েছি, শ্যামল তার চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছে চম্পাহাটি থেকে।

চম্পাহাটি নিয়ে শ্যামল অনেকখানি জড়িত হয়ে পড়েছিল বলেই শুধু নয়, গোষ্ঠীবদ্ধভাবে আড্ডা শ্যামলের তেমন পছন্দ ছিল না। দু'একজনের সঙ্গে নিবিড় হয়ে থাকতেই সে স্বচ্ছন্দ বোধ করত। যখন আমি জনসেবক নামে পত্রিকায় সান্ধ্য চাকরি করি, শ্যামল চলে আসত শেষের দিকে। দু'জনে বেরিয়ে, একটা রামের বোতল কিনে চলে আসতাম নাগেরবাজারে। সেখানে বারান্দায় বসে গল্প ও তর্কাতর্কি হত প্রায় সারারাত। কয়েকঘন্টা ঘুমের পর সে স্বাতীকে বলত এক্ষুনি তৈরি হয়ে নাও, আমরা চম্পাহাটি যাব। জোর করে সে রাজি করাত স্বাতীকে, সরাসরি চম্পাহাটি গিয়ে আবার ছেঁড়া আড্ডার সংযোজন।

এরকম হয়েছে অনেকবার, কিন্তু বহু বছর চলতে পারে না। মাঝখানে ছেলেমেয়েরা এসে পড়ে, দায়িত্ব চাপে কাঁধে, জীবিকার ক্ষেত্র বদলে যায়, সাহিত্য সম্পর্কে ধারনাও বিভিন্ন হতে বাধ্য। তৈরি হয়ে যায় দূরত্বও। বৃত্তও হয়ে যায় নানারকম।

শেষের দিকে বছর দশেক শ্যামলের সঙ্গে দেখা হয়েছে অনেক কম। কিন্তু শ্যামল টেলিফোন করত নিয়মিত, সপ্তাহে একবার তো বটেই। শ্যামলের অভিযোগ ছিল, সে-ই অগ্রণী হয়ে ফোন করে, আমি করি না। সত্যিই তাই, এই অভিযোগ আরও অনেকের কাছে শুনেছি, আমি টেলিফোনটাকে গ্রহণের যন্ত্র হিসেবে যত ব্যবহার করি, প্রেরণের কথা তেমন মনে থাকে না। শ্যামলের আরেকটা অভিযোগ, সে আমার বিভিন্ন লেখা পড়ে নানারকম মন্তব্য করে, কিন্তু আমি আর তার লেখা পড়ি না। এই দ্বিতীয় অভিযোগটা সত্যি নয়, এখনো পত্র-পত্রিকায় শ্যামলের লেখাটাই প্রথমে পড়ি। এমনকী 'আজকাল' সংবাদপত্রে তার বাজার সফরের রচনাগুলি পর্যন্ত। সব লেখাতেই তার একইরকম প্রসাদগুণ। কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সেই ভালো লাগার কথা জানানো হয়ে উঠত না!

আমি যখন 'দেশ' পত্রিকায় স্মৃতিকথা লিখতে শুরু করি , তখন সে পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক শ্যামলকে দিয়ে একটি ভূমিকা লিখিয়েছিলেন, তার নাম, 'তুই পারবি'। এই ভূমিকার ব্যাপারটাই আমার পছন্দ হয়নি। তখন আমি বিদেশে। ফিরে আসার পর শ্যামল জিজ্ঞেস করল, আমি তোর সম্পর্কে যা লিখেছি, তোর কেমন লেগেছে রে? সরাসরি উত্তর না দিয়ে আমি বলেছিলাম, দাঁড়া না, তুই যখন আত্মজীবনী শুরু করবি, তার একটা ভূমিকা আমি লিখব, তার নাম হবে, 'তুই কে রে'?

বাংলা সাহিত্যজগতে আমার সঙ্গে তুই-তোকারির সম্পর্ক আর একজনেরও রইল না! শ্যামলের আত্মজীবনী থেকেও বঞ্চিত হল বাংলা সাহিত্য।

তলানিশুদ্ধু জীবনরসের নেশাড়ু শ্যামল

অশেষ চট্টোপাধ্যায়

দেখলে মনে হয় সুকুমার রায়ের ল্যাগব্যাগার্নিস ভোল বদলে জ্যান্ত কাকতাড়ুয়া। ঢলঢলে হাফপ্যান্ট, গলা পর্যন্ত বোতাম-আঁটা ফুলশার্ট। দু হাঁটুর মালাইচাকিতে পুরোনো পাঁচড়ার কালো কালো ছোপ। এমনিতেই পাতলা চুল বয়সের কাঁচিতে আরো ছাঁটাই। যা আছে তাতেও নুন বেশি, মরিচ কম। ভাঙা গালে ক'দিনের বাসি দাড়িতেও সাদা আঁচড়ের বাড়াবাড়ি। ভেতরমুখো দু চোখে রাজ্যের ক্লান্তি, বিরক্তি, বিষণ্ণতা।

ফোঁত করে নাক টেনে সাধু কালাচাঁদ বলল, 'স্কুল ফাইনালে তো পাশ করা হল না, ভেবেছিলাম এই বুড়ো বয়েসে মাধ্যমিকটা নিদেনপক্ষে পি ডিভিশনে পাশ করব। আজকাল তো বুড়োহাড়িদের হালচযা আঙুলে কলম ধরাবার জন্যে নানান নন্ ফর্মাল স্কুল হচ্ছে। পাশটা করতে পারলে ওই ধেড়ে ছাত্রদের না হয় হায়ার হিস্ট্রি, হায়ার জিওগ্রাফি পড়াতাম। কিন্তু তা আর হল না। আমি সেই সিনিয়ার স্টুডেন্টই থেকে গেলাম।'

ছাত্রজীবনের জেলখানায় চিরবন্দী কালাচাঁদ ডান হাতের উলটো পিঠে নাক মুছে বলল, 'কাজটা কিন্তু ভালো করলেন না শ্যামলবাবু। আমাকে একাই শুধু দ'য়ে মজিয়ে যাননি, আরো অনেকের নালিশ আছে ওঁর বিরুদ্ধে। তারাও এল বলে।'

বলতে বলতে সাধু কালাচাঁদ ঢাকা পড়ে গেল তার চেয়ে, দেড় গুণ লম্বা সোনাদানা, হিরেজহরত, সলমা-চুমকি, রেশম-কিংখাবে ঢাকা, একজনের আড়ালে। মেঘভাঙা সূর্যাস্তের ফ্যাকাশে রক্তের মতো যাই-যাই রোদের বিষণ্ণতায় ঢাকা দুই চোখ। দেখলে মনে হয় নিউ তরুণ-অপেরা নয়, স্যার রিচার্ড অ্যাটেনবরো-র পরিকল্পিত কোনও ফিল্মের সেটে আরো মানানসই। শাহজাদা দারাশুকো ভারী, ম্লান গলায় বললেন, " এটা কি করলেন বেরাদার শ্যামল। উনিই নাকি বন্ধুদের বলতেন — একশো বছর বেঁচে থাকাটা এমন কিছু ব্যাপার নয়। অথচ আমাকে আট-ন বছর হল সেই সাঁইত্রিশে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। ঘাড়ের ওপর মাথাটা এখনও রয়েছে। বিয়াল্লিশ বছর বয়েস পর্যন্ত থাকার কথা। আজ গোঁড়ামির দুর্গন্ধে আকাশবাতাস বিষিয়ে উঠছে। ঘাতকের খড়্গের চেয়ে তো ওঁর কলমের জোর বেশি। আজ কে ধরবে দামাস্কের সামসের-এর মতো ধারালো সেই কলম?"

" কি মেখেছো বলো তো মিয়া সাহেব, গন্ধে চারদিক একেবারে ম-ম করতেছে" বলে গামছা দিয়ে মুখ, ঘাড়, গলার ঘাম মুছতে মুছতে যে শক্তপোক্ত চেহারার লোকটি এগিয়ে এল, সে হয়তো পঁয়ত্রিশের আশেপাশে। আবার বছর পনেরো-কুড়ি বাড়িয়ে বললেও অবাক হবার কিছু নেই। নিজেকেই যেন শুনিয়ে বলল, "বাবু গেলেন শুক্লপক্ষের সপ্তমীর দিন। সামনেই পুন্নিমে। ওই গান্ধীজীর জন্মদিনে, ভেবেছিলাম বাবুকে আমার গাড়িতে বসিয়ে পুন্নিমের চাঁদের আলোয় গা ভাসিয়ে দিয়ে যাব, হ্যাঁ, ভগবান দেখাতে। সেই চন্দনেশ্বরের মাচানতলায়। কিন্তু তা আর হল কই। বাবু একাই চলে গেলেন তেনাকে দেখতে।"

"কি অশেষদা, দেখলেন তো শ্যামলদার কাণ্ডটা", এবারের বক্তা আমাদের চেয়ে বয়েসে অনেক ছোটো এক বন্ধু। হাসিখুশি আর প্রাণোচ্ছলতায় টগবগে, গায়ের রঙে প্রায় কাশ্মিরি, অমল মুখোপাধ্যায়। একদা মোটামুটি স্বাচ্ছল্যের ফ্রেমে বাঁধানো এক কলেজের অধ্যাপক।

স্ত্রী-সন্তান নিয়ে, সুখী পরিবারের ছবি। জীবনের পাঁচটা দশক পার করার ঢের আগেই তেমন কোনো অসুখবিসুখে না-ভোগা অমল হুট করে চলে গেল। সবাই থ একেবারে। শেষবার দেখেছি সুস্থ, সজীব। সুশ্রী ধারালো মুখে কচি আম পাতার, আলো-ঠিকরানো চেকনাই। তার চিরসঙ্গী উজ্জ্বল হাসিটা গর্জন তেলে পালিশ করা। সে বলল "আমি চলে গেলে শ্যামলদা রেগেমেগে গল্প লিখেছিলেন 'খুব অন্যায়' নাম দিয়ে। তা আমি না হয় খুব অন্যায় করেছিলাম। কিন্তু শ্যামলদা যে বাংলা সাহিত্যের বাড়তি পাওনাগণ্ডা না মিটিয়ে, তাঁর অজস্র ভাবশিষ্য, মন্ত্রশিষ্য, লেখক-পাঠকদের মনটাকে বোতলচুর করে কেটে পড়লেন, তার বেলা? সেটা বুঝি অন্যায় নয়?"

এবারে আমার মনের ইন্টারনেটে অজস্র কথার হুড়োহুড়ি— শ্যামলরে, তুই অনেক সময় বলতিস: তোদের জীবনে আমি কত আনন্দ, কত মজা দিয়েছি, কত হাসিয়েছি, একবার ভেবে দেখেছিস। সত্যি রে, তোর সঙ্গে প্রচণ্ড তর্ক, গলা চড়িয়ে প্রায় ঝগড়া। তোর গায়ের জোর, মনের জোর, কলমের জোরের মতো গলার জোরটাও মাননসই ছিল। কিন্তু অন্ত পর্বে চড়া-মেজাজের পাহাড়চুড়ো থেকে, তোর চালানো পাগলা হাসির টু সিটার রেসিং কারে চড়ে সাঁ সাঁ করে ফের নেমে এসেছি স্থায়ী বন্ধুত্বের সমতল পাকা চাতালে।

শ্যামল, তুই তখন পুরোদস্তুর বড়ো ঘুমের জন্যে লম্বা রিহার্সাল দিচ্ছিস। কত যে কাণ্ড ঘটে গেল, এই দুনিয়ায়, তুই টের পেলি না। তুই তো আসল সুবিনয় মুস্তাফি। তুই-ই পারতিস "একসাথে বেরাল ও বেরালের মুখে-ধরা ইঁদুর হাসাতে।" জানা হল না ডাঁসের কামড়ে অস্থির পৃথিবীর সবচেয়ে হেভিওয়েট মাস্তানের পাগলা-জগাই মার্কা নাচন দেখে তুই কি বলতিস। এই অলীক কুকাব্য তোর মনের সেনসিটিভ অ্যান্টেনায় কোন তরঙ্গ তুলত কে জানে। এ নিয়ে তর্ক, ঝগড়া, আড়ি, ভাব— আর কার সঙ্গে করব।

তোর লেখা নিয়ে আমি কোনও বেসুরো মন্তব্য করলে— কচ্চিৎ, কালেভদ্রে— তুই কখনও নিজের উকিল সাজিসনি। উলটে শান্ত গলায় বলেছিস, কি জানি, চেষ্টা তো করেছিলাম, পারিনি হয়তো। তোর বাঘা দাপুটে গলায় একেবারে স্বভাববিরুদ্ধ এত নরম সুর। উলটে আমিই তখন তোতলা।

এমনিতে আমি শ্যামলের অন্যতম জোরালো পি.আর.ম্যান। আমার তো মনে হয় শ্যামলই একমাত্র বাংলা সাহিত্যের লেখক যার কোনও বাজে বা অসার্থক গল্প বা উপন্যাস নেই। লেখার মধ্যে মেজর বা মাইনর ভাগ করা যায়। কিন্তু কোনোটাই বাঁ হাতে লেখা অপাঠ্য নয়। সব লেখার মধ্যে দিয়ে শ্যামলের একান্ত নিজস্ব মেদহীন, ঋজু গদ্য কথা বলে। ফ্লুরেলিজ্, যা ডোরবেল, গাড়ির চমক-লাগানো হর্ন কিংবা সেলফোনের ঘণ্টিতে আজকাল হরবখত শোনা যায়, বীঠোফেন-এর এমনি একটি মাইনর পিয়ানো কম্পোজিশন। কিন্তু যে সৃজনশীলতার গোমুখ থেকে হ্যামারক্লাভিয়ের, এম্পারার বা ক্রয়েটজার সোনাটার সৃষ্টি, তার এক চিলতে কিন্তু এই হালকা চালের মিনিট তিন-চারের রচনাটির মধ্যেও পাওয়া যায়। পকেট গীতাও তো আসলে গীতা-ই।

লেখক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে বোঝাতে সব চেয়ে লাগসই এক লাইনের ডেফিনিশন দিয়েছেন সাংবাদিক-লেখক মনোজিৎ মিত্র, টাইমস্ অফ্ ইণ্ডিয়া দৈনিকের পাতায়। পাঁচ কলমে মনোজিতের শ্যামলকে নিয়ে লেখাটির হেডিং : হি ড্র্যাংক লাইফ্ টু দা লীস উইথ আ

ড্যাশ অফ্ হিউমার। তিনি মজার টাক্‌না দিয়ে জীবনটা একেবারে তলানিশুদ্ধ পান করেছেন। একেবারে মোক্ষম কথা। শুধু চা নয়, ছাঁকনি-এড়ানো চায়ের পাতা, পিঁপড়েশুদ্ধ চিনি—সব এক চুমুকে খেয়ে ফেলা। অমৃত গরল সমজ্ঞানে পান। এ না হলে, জীবনকে চেনা। হাঁটুজল থেকে ডুব জল, সেখান থেকে আরো অতল, গভীর, অজানা অন্ধকার— জীবনের নানান তলে ডুব দিয়ে মুক্তো তোলার অভিজ্ঞতা হয় ক'জন লেখকের। সে রকম মজবুত সাহসের বেলুন আমার জানাশোনায় কুল্যে তিনজন বড়ো লেখকের ছিল। শরৎচন্দ্র, সমরেশ বসু আর শ্যামল। শুধু অভিজ্ঞতার খুচরোই যথেষ্ট নয়। শীতকালে উষ্ণতাপ্রত্যাশী বেড়ালের মতো সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে মানুষের হৃদয়ের ওম ঘেঁষে বসার তীব্র আগ্রহ। এ ব্যাপারে শ্যামল অনন্য। ডাঙায় সে ঘাসের পোকা থেকে নারকেল গাছের মাথায় তিরতিরে নতুন পাতা, সব পজিশানেই স্বচ্ছন্দ। জলে সেই আবার মাছ, আকাশে পাখি। সব ধরনের মানুষের সঙ্গে, যেকোনো পরিবেশে সে সাবলীল। আদিগঙ্গার ওপর বানানো বাঁশের মাচার জলটুঙিতে ছিল তার আসর। সঙ্গী নানান ধরনের বেকার, বাতিল, ব্রাত্য মানুষ। তাদের সঙ্গে অতি নোংরা ধাঙড় বস্তিতে রান্না শুয়োরের মাংসের চাট সহযোগে চুল্লু পান। তাতেই তার পাঁচ তারা-মার্কা আনন্দ। এই রকম এক আড্ডা থেকে ফিরে শ্যামলের গল্প— একটি শিক্ষিত বেকারের কাহিনী। ঘোর কমিউনিস্টবিরোধী শ্যামল লিখেছে মধ্যপ্রদেশের অতি দরিদ্র অথচ খালিপেটেই হাসিতে খলবলে আদিবাসী মেয়েদের কথা। জঙ্গলের ইজারাদার আর তার সরকারি পেট্রনদের প্রায় আক্ষরিক অর্থে, তাদের চিবিয়ে খাওয়া। শোষণের এই দগদগে কাহিনী পাঠককে অভিভূত করে ক্রোধে, ঘৃণায়। শ্যামলের খোদাইকরা ভাষা কোনো পক্ষ নেয়নি। জঙ্গল আর তার সব কিসিমের মানুষদের রূপ, রঙ, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ গল্পটাতে হাজির। একেবারে নিস্পৃহভাবে। যে কোনো কমিটেড বামপন্থী লেখক ইজারাদার আর আমলাদের গায়ে ক পোঁচ বেশি আলকাতরা লাগাতেন। জোরালো আঙুলে প্রয়োজনমাফিক চাপে চিনেবাদাম ভাঙলে বাদামটা নিটোল থাকে। দাঁতে কামড়ে ছাড়াবার চেষ্টা করলে বাদাম আর খোলা মুখের নালে লেপটে আর খাদ্য থাকে না। এই পরিমিতিবোধ, ডিটাচ্‌মেন্ট শ্যামলের সহজাত কবচকুণ্ডল। কি লিখব, কতটা লিখব বা লিখব না, তার নজরদারির দায়িত্বও লেখকের।

মানুষের সহজ সহচর শ্যামল কি করে মানুষের লেখক শ্যামল হল, তারই একটা টেস্ট কেস সাজালাম। বাই দা বাই, শ্যামল কিন্তু রবীন্দ্র বা বঙ্কিম কোনো পুরস্কারই পায়নি। তাতে কি? ম্যাক্সিম গোর্কিও তো নোবেল প্রাইজ পাননি। পেয়েছেন হোয়াইট রাশিয়ান লেখক আইভান বুনিন। তেমনি 'কুবেরের বিষয় আশয়' বা 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' উপেক্ষিত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছে —যাক, নামটা আর করলাম না। নিজের পয়সায় ছাপানো বইটির নাম কা ওয়াস্তে প্রকাশক আমায় বলেছিলেন, এমনই উপন্যাস যা পুরস্কারের তকমা লাগানোর পরেও কাটলো না। বিজ্ঞাপনের টাকাটাই জলে গেল। এই সব পুরস্কারের নির্বাচকদের মধ্যে কিছু টিপিক্যাল অ্যাকাডেমিক থাকেন যাঁদের চোখে অক্ষম পিচুটি। তার ওপর স্বার্থ, ধান্দা আর তোষামোদির ঠুলি। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্রের অনুধাবনেই বেদম, এঁরা বড়োজোর তারাশঙ্কর বা বিভূতিভূষণ পর্যন্ত এগোতে পারেন। কিন্তু তার পরে? নৈব নৈব চ। অথচ রবীন্দ্র পুরস্কার প্রথম আবির্ভাবেই ভাস্বর করেছিল ভিড়ভাট্টা এড়িয়ে চলা সতীনাথ ভাদুড়িকে। আবার মানিকবাবু, জীবনানন্দ, বেঁচে থাকতে ভাত-কাপড়ের অভাবে কষ্ট পেয়েছেন। সরকারি খেতাব আর পুরস্কারের মেল ট্রেন এঁদের নগণ্য হল্ট স্টেশান

জ্ঞান করেছে। অথচ আদাড়পাদাড়ে মধ্যেমাঝেই থেমেছে, ফুল-বাতাসা ছড়িয়েছে। তার ওপর ইনি সেঞ্চুরির দিকে, উনি একে কমিটেড লেখক, তায় যে কোনো দিন টুপ করে ঝরে যেতে পারেন। অতএব দে দেও।

শ্যামলের ভাগ্য হয় তো বরাভয় হয়ে মাথায় হাত রাখেনি। কিন্তু বিশ্বস্ত বন্ধু হয়ে কাঁধের ওপর নিশিদিন ভরসা রাখিস বলে আলতো চাপ ঠিকই দিয়েছে। নাই বা হল ল্যান্সিয়া চড়ে টানা দৌড়। সেকেন্ড হ্যান্ড অ্যামবাসাডরে চেপে ভিড়ে ভরতি হাওড়ার গ্রান্ড ট্রাংক রোড দিয়ে হর্ন বাজাতে বাজাতে তো সে যেতে পেরেছে। ওর লেখাই সেই হর্নের শব্দ। আরো বেশি বেশি লোকজন তথা পাঠক, প্রতিটি দশকের কুড়ি-বাইশ বয়েসি পাঠকদের নজর কেড়েছে, ভালোবাসায় অভিষিক্ত হয়েছে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। এটা কি কম পাওয়া? কোথায় লাগে জ্ঞানপীঠ এর কাছে।

শ্যামলের ফেলে-যাওয়া পার্থিব খাঁচাটা তাই শেষবারের জন্যে দেখতে শুধু কিন্নর, স্বপ্নময়, অরিন্দম, রবিশঙ্করের মত ওর একান্ত অনুরক্ত পরের প্রজন্মের লেখকরাই আসেনি, এসেছে লোকের বাড়ির কাজের মেয়ে, বিহারি ভুজাওয়ালা, পাঞ্জাবি হোটেলের সর্দারজি, সঙ্গে তার স্ত্রী। এরা এসেছে মানুষ শ্যামলের টানে। যে শ্যামল কলকাতা ও মফস্বলের বহু বাজারের সব্জিবেচা মাসি, চুল্লু প্রভাবে দ্রবীভূত বন্ধ কারখানার শ্রমিক, মাছের নদী বা পুকুর থেকে কড়ায় ভাজা হবার মধ্যেকার জার্নির সঙ্গে জড়িত গ্রাম ও শহরের তাবৎ সংশ্লিষ্ট মানুষ, তবলাগলির বেশ্যা, এই ক্যাসেট, সি.ডি-র যুগে ফুটপাথে পুরোনো রেকর্ডের দোকানদার, এমনি আরো কত কিসিমের মানুষজন, যাদের না-বলা কথা, না-বোঝাতে-পারা-কষ্ট — সব কিছুর ওয়েভ লেংথ শ্যামল ধরতে পারত হ্যাম অপারেটারের নিষ্ঠায়।

রবীন্দ্রনাথের গান আছে না— আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না। সেই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা। শ্যামলের জীবনজিজ্ঞাসার নানান এক্সারসাইজই এই লাইন দু-টির সেরা ভাব সম্প্রসারণ। প্রতিটি মানুষই এক একটি ছোটো বড়ো মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং। তার বিভিন্ন সত্তা, নিজস্বতা নিয়ে থাকে একেক ঘরে। একে অন্যকে চেনে, আবার চেনে না। মৌচাকের রানি মৌমাছি বা অর্কেস্ট্রার কনডাক্টারের মতো বাড়ির মালিক সবাইকে চেনে, জানে, চালায়। এক শ্যামলই নিজের মধ্যে পাঁচ সেলের টর্চের ফোকাস মেরে নিজেকে খুঁটিয়ে দেখে। তারপর নিজের অনুসন্ধান, তার জীবন সাঁতারুর লম্বা দৌড়ে শরীরে, মনে লেগেথাকা নানান জনের ঘ্রাণ, স্পর্শ, দেখা-শোনার জগতের নানান রূপ, শব্দ ছড়িয়ে দেয় একেক শ্যামলের মধ্যে। তাই শ্যামলই কুবেরের বিষয় আশয়ের কুবের সাধুখাঁ, ঈশ্বরীতলা রূপোকথার অনাথ বসু কিংবা হাওয়া গাড়ির দিলীপ বসু। এই শ্যামলই নৌকায় ভেসে যায় যুধিষ্ঠির মাঝির সঙ্গে ইলিশ মাছের সাতকাহন কুলুজির খোঁজে। সে-ই দেখতে পায় গ্রাম বাংলার কালজয়ী পরম্পরাকে, একটি মহীরুহসদৃশ তেঁতুলগাছের মধ্যে। সে গাছের কাটা ডালগুলির প্রত্যেকটি চ্যালা কাঠ হয়ে গাছের মালিকের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সহমরণে গেছে চিতার কাঠ হয়ে। বিদেশে ব্যাঙ চালানদারের জোগাড়ে, আর এক বিশাল গোখরো সাপ, একই সঙ্গে এক মস্ত সোনা ব্যাঙের ওপর তাক করতে গিয়ে থমকে যায়। দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর পারস্পরিক ভয়, মরিয়া জেদ—সব কিছুর নিস্পৃহ কিন্তু সতর্ক দর্শক ওই শ্যামলই।

গত তিন চার দশক ধরে শ্যামল একটা কথা মাঝেমাঝে বলত : আমার খুব ইচ্ছে করে একটা গোলমাল বাঁধাতে। তারপর ওই গোলমালের নাগরদোলায় দু-চার ঘুরপাক খেয়ে

কায়দা করে নিজের বাঁধানো গোলমাল কাটিয়ে বেরিয়ে আসতে। এটাই হল জীবনের মজা। এই মজার কিক্‌টা না থাকলে জীবনটা একেবারে পানসে। এই মজাই আমাকে চাগিয়ে তোলে, নতুন লেখার আইডিয়া দেয়।

তা এই উদ্ভট মজার হাড়িকাঠে শ্যামল সেই কলেজ জীবন থেকে বার বার মাথা গলিয়ে দিয়েছে। কখনো নিজের উপভোগের জন্য, কখনো আমাদের মতো ভিতুদের মনোরঞ্জনের জন্য। সতেরো-আঠারোর শ্যামল, মেদহীন সুঠাম চেহারা, এক মাথা কোঁকড়া চুল, পদ্মপলাশ আয়ত, গভীর দুই চোখে কিছুটা আলগা বিষাদ, বাকিটা শিশুর সারল্য। (কিন্নর, স্বপ্নময়, অরিন্দম, রবিশঙ্কর, তোমরা তো আশি কেজি-উত্তর শ্যামলকে দেখেছো। সেই রূপসাগরে ডুব দেওয়া নবীন কিশোরকে দেখোনি।) তা এই শ্যামলই আমাদের —আমি, অকাল প্রয়াত কবি শংকর চট্টোপাধ্যায়, লেখক সত্যেন্দ্র আচার্য—প্ররোচনায় ছোটো ব্রিস্টলের উলটোপিঠে এক ভেজিটেরিয়ান রেস্টুরেন্টে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ভোজনরত মারোয়াড়ির সঙ্গে খেজুরে আলাপ জমায়। তারপর তার বিপুল খাদ্যসম্ভার থেকে স্বচ্ছন্দে একটা তাগড়াই সিঙাড়া তুলে নিয়ে খেতে খেতে বেরিয়ে যায়। কিংবা তখনকার এসপ্ল্যানেড ইস্ট বরাবর হেঁটে যাওয়া এক বিদেশি পর্যটকের হাতের কমলালেবুটি ভাগ করে আধখানা নিয়ে আমাদের দঙ্গলে ফিরে আসে। 'কি ভাষায় কথা বললি' প্রশ্নের জবাবে বলে — দূর ব্যাটাচ্ছেলে, লোকটা ক্যানাডিয়ান ফ্রেঞ্চ, ওর ইংরেজি বিদ্যে আমারই মতো। অথবা বসুশ্রী সিনেমার বুকিং কাউন্টারে একদম অচেনা এক তন্বী, গৌরীর কাছ থেকে একটি আধুলি প্রার্থনা এবং লাভ। আমাদের তিন বন্ধুর দশ আনা সিটের টিকিট কাটতে ওই আট আনারই ঘাটতি ছিল। কিন্তু আপাততুচ্ছ এই তিনটি নিরীহ অ্যাডভেঞ্চারে সে চাঁদা করে ধোলাই খেতে পারত। বিশেষ করে শেষরটিতে, কারণ ঘটনাটির পরিপ্রেক্ষিত পঞ্চাশ বছরের বেশি পুরোনো। (আমার তো মনে হয় মেয়েটি সেই আধুলিদানের মুহূর্তে মনে মনে গেয়ে উঠেছিল: অর্জুন তুমি অর্জুন।) এমনও হয়েছে প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে যাবে শ্যামল। ধুতি, পাঞ্জাবি সবই ডিটারজেন্টের বিজ্ঞাপন। কিন্তু গেঞ্জিটা কিটকিটে নোংরা, ছেঁড়া। কুছ পরোয়া নেহি। পাঞ্জাবির নীচে শ্যামল মায়ের শাদা ব্লাউজ গায়ে দিয়ে চলে গেল। পরে বিলেত থেকে এই মেয়েটি শ্যামলকে চিঠি লিখত। তার সম্বোধনে লিপস্টিক দিয়ে লেখা থাকত শ্যামলু সোনা। মেয়েটি ওকে ডিচ করে। বিলেতেই এক ডাক্তারের সঙ্গে প্রেম এবং তাকেই বিয়ে। শ্যামল তখন বিলেত ফেরত প্রেমিকার থেকে দু -মাথা উঁচু হবার জন্যে আই.এ.এস. পরীক্ষার্থী। পরীক্ষাটা দিয়েও ছিল। ওর রোল নাম্বারটা কিন্তু দুই সফল পরীক্ষার্থীর মাঝখানের ফাঁক দিয়ে গলে অদৃশ্য। ভাগ্যিস শ্যামলের এই প্রেমটা, দুই আর দুই-এ চার হয়নি। আর আই.এ.এস.-এও ডাব্বা মেরেছিল। প্রেমের এই সরবত খাওয়ার পর মচকানো স্ক্রু-এর অবস্থাপ্রাপ্ত শ্যামলের আগাপাস্তলায় এক মস্ত ঝাঁকুনি।

লেখক শ্যামলের জন্যে এই চোটটা জরুরি ছিল। লেখকের বাঁধা সেতারের মতো অনুভূতিতে টনটনে মনে একটা তরফের তার, ছেঁড়া থাকা ভালো। তারের ওপর মেজরাপ বোলালে একটা ফাঁক থেকে যায়: কোমল ঋষভ ছাড়া ভৈরবী। এই ফাঁকটা দিয়ে দুঃখ গলে গলে পড়ে। সেই হারানো কোমল রেখাব-ই কখন মনের অগোচরে ফল্গু। অন্তঃসলিলা নদী শাখাপ্রশাখা ছড়ায়, ছড়াতে থাকে অন্য কোনো পরিপূর্ণতার সমুদ্রের দিকে। তার অদৃশ্য সিক্ততায় নতুন সৃজনশীলতায় মাটি নরম হয়, ফসল ফলে। শ্যামল হয় তো সেই ফসলই ফলিয়েছে। নিজের মতো করে। জীবনভর। নিজের অজ্ঞাতে। বহু বছর পরে দুই মেয়ের বাবা শ্যামলের

সঙ্গে সেই মেয়ে বা মহিলার আবার দেখা। চূড়ান্ত অসুখী সেই একদা-প্রেমিকা কিন্তু শ্যামলের ট্র্যাক রেখে গেছে। এতগুলো বছর ধরে। শ্যামলের তাবত প্রকাশিত বই আলমারিতে সাজানো। শ্যামলের কোনো ভাবান্তরই হয়নি। তবে সেই আধা-সন্ন্যাসিনী মহিলা থেকে গেছেন নির্বিকার নিরাসক্ত কথাশিল্পী শ্যামলের একটা উপন্যাসে।

শ্যামল শুধু নির্মোহ আর মহাকালের মতো নির্মমই নয়, তার নানান রকম মানুষে-ভরা সৃষ্ট পৃথিবীতে, ঈশ্বর অনুচ্চারিত, বলতে গেলে নির্বাসিত। বাড়িতে ওপার বাংলা থেকে আনা গৃহদেবতাকে নিয়মমাফিক ফুল-চড়ানো ময়লা পৈতে, পুরুতকে মাস মাইনে ঠিকই দিয়েছে। নিজে কিন্তু কখনও পুজোআচ্চা করেনি। জ্যোতি বসুর মুখে গড্ ফরবিড্-গোছের কথা হয় তো কালেভদ্রে শোনা যায়। শ্যামলের কথাবার্তায় ঈশ্বর বা ভগবান কখনও উচ্চারিত হতে —আমি তার তিপ্পান্ন বছরের বন্ধু—অন্তত শুনিনি। এ দিক দিয়ে অনেক পাঁজিদেখা কমিউনিস্টদের থেকে অনেক এগিয়ে র‍্যাশানাল কিন্তু অ্যান্টি-স্ট্যালিনিস্ট, অ্যান্টি-মাও, ঘোর হিউম্যানিটেরিয়ান শ্যামল। এমনিতে প্রকৃত সেকুলার, মানে ধর্মনিঃসম্পর্কিত শ্যামল —আক্ষরিক অর্থে সেকুলার ধর্মনিরপেক্ষ নয়— আবার মহরমের দিন টালিগঞ্জ পাড়ার মুসলমানদের সঙ্গে শোভাযাত্রায় সামিল হত এবং তা শুধু মানুষের টানে। এবং শ্যামলের সতেরো বছর বয়সে লেখা প্রথম গল্প চর,তার নায়ক জয়নাল নামে এক মুসলমান মাঝি।

আসলে মানুষটা জীবনরসিক। আঁশফল বা আলফানসো আম, কোনো কিছুর রসেই তার অরুচি নেই। জীবনকে নানানভাবে তারিয়ে তারিয়ে চেখেছে। শরীরে নানান ফ্যাঁকড়া —চড়া ব্লাড সুগার, হার্টে গড়বড়, থাইরয়েডের গণ্ডগোল— তবু খেয়ে গেছে। কখনও প্রবল হেলথ কনসাস হয়ে খাওয়াদাওয়ায় দারুন ছাঁটকাট। নিয়ম করে মর্নিং-ওয়াক। ক'দিন পরেই কোথায় কি। সব বাধানিষেধ এক তুড়িতে বাতিল। ফের রাত ন'টার পর বাজারে মাছের দোকানিদের সঙ্গে দ্রাক্ষারস সহযোগে জীবনরহস্য নিয়ে গভীর আলোচনা। নিজের চাপানো নিয়ম নিজেই ভেঙেছে। তার বাড়ির ফ্যামিলি গ্যাদারিং-এ মাছমাংসের সঙ্গে মদের সমান মান্যতা। নিজে, ভাইরা, ভগ্নিপতি সবাই এই মোচ্ছবের সমান ভাগীদার। বাড়তি পাওনা, ওর একমাত্র বোন রমার তৈরি গলায় গাওয়া ঠুংরি।

গানবাজনা শ্যামলকে টানত। তবে ভিন্টেজ ওয়াইনের মতো ভিন্টেজ গান। বিশেষ করে ঠুংরি, জদ্দনবাঈ বা জোহরাবাঈয়ের, শুনতে ভালোবাসত। আর ফৈয়াজ খাঁ, আবদুল করিম খাঁ সাহেব কিংবা ভীষ্মদেব। সব আটাত্তর আর.পি.এম-এর। ফুটপাথে অবহেলায় পড়ে থাকা খোসা ছাড়ানো ভাঁই করা রেকর্ড ঘেঁটে কেনা। কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতে, যা কিনা আমাদের নিঃশ্বাস নেবার বাতাস, তৃষ্ণার জল, (শক্তি, শক্তি চট্টোপাধ্যায় তো রবীন্দ্রসঙ্গীতে নেশা করত) শ্যামলের কাছে কোনো বাড়তি ইজ্জত পায়নি। গায়ক শ্যামল কিন্তু একেবারে কাঁটা বনবিহারিণী সুরকানা দেবীর গাণ্ডাবাঁধা সার্গিদ। সম্ভবত একমাত্র সেলিব্রিটি লেখক, যে একটি গানও, তা যাই হোক না কেন, মনে করতে পারত না। তবে টোকিওতে টেলিভিশনে কিমোনো-পরা শ্যামলের মাইক হাতে একটা ছবি দেখেছি। সেখানে গানই গেয়েছিল। একটা মাত্র গানের দুটো লাইনের বেশি ওর মনে থানা গাড়তে পারেনি। এবং সেটা কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীত : 'আমি তোমায় শুনিয়েছিলাম গান'। সে গানের সুর তার কণ্ঠগুণে বেলাইনে চলে যেত। তবে লেখার সময় গানবাজনার খুঁটিনাটি নিয়ে তার তাবত জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজত আমার কাছে। একদিন আমি ওর বিখ্যাত গল্প পরী-র সেই বেহালা বাজিয়ের রোল-এ। শ্যামল—হঠাৎ হঠাৎ আসত—

বলল: কি বাজাচ্ছিস রে, ভারি সুন্দর সুরটা তো। একটা টি.ভি.-তে দেখা নাম ভুলে-মারা রাশিয়ান ছবির থিম মিউজিক। বললাম। ও সমস্ত চোখমুখ একাগ্রতার ছুঁচের ডগায় এনে বলল : থামিস না, বাজিয়ে যা। এও অনেক শ্যামলের আরেক রকমফের। আমি উপলক্ষ মাত্র।

ওই যে বলেছিলাম না ওর মাথার মধ্যে একটা সদা অস্থির, ওপার বাংলার ভাষায় ক্যারা —বা ইংরেজিতে ইম্প— তার বাসা ছিল। তার খোঁচায় শ্যামল সারেং তার জীবনের স্টিমারটা ইচ্ছে করে টাল খাওয়াত, ভেড়াত আঘাটায়। আমার প্রতাপাদিত্য রোডের বাড়ির তিনখানা বাড়ি পরে এক বাসায় শ্যামলের বয়েস বেড়েছিল অনেকগুলো বছর। ওর বালক ভৃত্যের কাছে তলব পেয়ে ঢুকতেই জোড়া ল্যালসেশিয়ানের উদ্দাম অভ্যর্থনা। দুটোই বিচ। তখনকার পনেরো থেকে পঁচাশি, সিনেমা দর্শকদের হার্ট থ্রব এক হলিউড নায়িকার নাম দু'ভাগ করে দুই স্বচ্ছন্দচারিণীর নামকরণ। না, ওই অভিনেত্রীর প্রতি কোনো বিরাগ ছিল না শ্যামলের। নেহাতই খেয়াল। (ভাগ্যিস সেই নায়িকা —এখনও প্রবলভাবে আছেন— তাঁর কান পর্যন্ত পৌঁছয়নি।) জয়পুর থেকে তার তখন-কিশোরী বড় মেয়ে মলির জন্যে ঘাঘরা-চোলি এনেছিল। শ্যামলের মিডিয়াম ওয়েট কুস্তিগির মার্কা শরীরে সেই পরিধেয় হয়েছে স্কটিশ হাইল্যাণ্ডারের কিস্ট আর বুকখোলা পাঠানি ওয়েস্ট কোট। জলচৌকিতে বসে তোলা উনুনে, মস্ত হাণ্ডাতে খুন্তি নেড়ে মাংস কষছে শ্যামল। চার দিক গন্ধে ম-ম। হেসে বলল, দুপুরে খেয়ে যাবি। এই বিচিত্র বেশকে মানানসই করতে গলায় পরেছে ওর স্ত্রী ইতির বারোমেসে বিছে হার। কপালে সিঁদুর দিয়ে আঁকা ঢাউস নিপ্পনি পতাকার সূর্য।

ওর বাবা, পাকাচুল ছোটোখাটো মানুষটি, কানের সাউন্ড বক্স পার্মানেন্টলি ড্যামেজড, শ্যামলকৃত ডাকনাম লর্ড বাক্ল্যান্ড সংক্ষেপে বাকু, বারান্দা দিয়ে খড়ম পরে খটাস খটাস করে হাঁটছিলেন। মধ্যেমাঝে দুর্বাশা-চোখে দেখছিলেন তার মাংস রন্ধনরত বিচিত্রবেশী চতুর্থ পুত্রকে। শ্যামল হঠাৎ গিয়ে বৃদ্ধের চলার রাস্তায় পাঁচিল। নাকটা বাবার মুখের দু-ইঞ্চির মধ্যে এনে বলল: এতগুলো পোলা তো পয়দা করসিলা। কিন্তু অ্যামন অ্যাকখান দ্যাখসঅ; লেখতে পারে, ধান চাষ করতে পারে, রান্ধতে পারে, নাচতেও পারে। বলেই বাবাকে সার্কল করে তাকধিনাধিন তাকধিনাধিন বোল আওড়াতে আওড়াতে নিজস্ব ঘরানার উদ্দাম নাচ। বৃদ্ধ ক্রোধে, বিস্ময়ে পাথর।

ঘটনাটি তুচ্ছ। কিন্তু একেবারে আনপ্রেডিক্টেবল শ্যামল চরিত্রের দিক্‌নির্দেশক। শ্যামল নামক মূর্তিমান এনিগ্‌মা-কে — কি লেখায়, কি চলনে-বলনে —বুঝতে সাহায্য করে। আর মুখের কথা কি কল্পনার উড়ান— দুই-এর কাছেই প্রচলিত ধ্যানধারনার বেড়ি একেবারে কাগজের শিকলি। একটা যদি হয় মাছের চোখ তাক-করা তীর, তাহলে অন্যটা উচ্চতা অভিসারী কম্ভর ঈগল। যাকে যা বলার তা তো বলেই, যা না বলার তাও বলে। তার কথা অনেক সময় আচমকা ছড়িয়ে দেওয়া গোল্লা পাকানো কাঁটা তার।

তার প্রতি একান্ত ন্যাওটা এক লেখককে : স্বামী-স্ত্রী মিলে বিশ-বাইশ হাজার টাকা রোজগার, সুখী, নিশ্চিন্ত জীবন, রাত্তিরে বউয়ের সঙ্গে রুটিনমাফিক সঙ্গম, অবসরের ফাঁকফোকরে টুকটাক লেখা। না হে না , ওই উত্থানপতনহীন সুখী গৃহকোণ শোভে গ্রামাফোন-মার্কা জীবনে বাস করে কোনো বড়ো লেখা হয় না।

তার কলেজজীবনের বন্ধু, এক তখনই বেশ নাম করা লেখিকাকে : আচ্ছা কেন লিখিস বল্ তো? তোর লেখাটেখা কিছু হয় না। বরং শেয়ালদা স্টেশানের গায়ে ঘুঁটে দে। তাতে কাজের কাজও হবে, দু'টো পয়সাও হবে। এই লেখিকাকেই— তিনি এখন আর নেই — পরে তার একটি বড়ো উপন্যাস উৎসর্গ করেছে। (শ্যামলেরই এক মারাত্মক মজার খেলায় এর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্কটা পাকাপাকি ভাবে চটকে যায়। যাক গে।)

আর ফ্লাইট অফ্ ইম্যাজিনেশান? ভাবা যায় মধ্য ষাট পেরিয়ে কেউ টালিগঞ্জের পুকুরে হাজির করতে পারে লচ্ লমন্ড মনস্টারের মতো প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী! বুঝতে পারে গির অরণ্যের এক সিংহের সঙ্গে এক আধুনিক রমণীর মানসিক অনুরণনের কম্পনাঙ্ক! ঠিকমতো বিদেশিভাষায় অনুবাদ হলে বিশ্বজগৎকে দেখানো যেত মার্কোয়েজ না পড়েও কতকাল আগে থেকে শ্যামল বাংলা সাহিত্যে ম্যাজিক রিয়েলিটির ইন্দিরা নহর কেটেছে। কিংবা সার্ত্র নামের বানান না জেনেও বানিয়েছে একজিস্টেন্সিয়ালিজম্-এর হাইওয়ে। সেই কতকাল আগের উপন্যাস, পেছনের সারির লেখা, 'নতুন ভুবন'। তাতে দেখি কলকাতার আকাশে উড়ছে হেলিকপ্টার ট্যাক্সি। স্কুলে, পাঠশালায়, গ্রামার শেখাচ্ছে কম্পিউটার। ঘরের মধ্যে কিন্তু চিরন্তন মধ্যবিত্ত গৃহস্থালি। এই বিন্দুতেই সিন্ধুর নাগাল: টিপিক্যাল শ্যামল— ট্রাডিশানের মাটিতে গোড়ালি গাঁথা, তার চোখ পেতে চায় হর্স নেবুলার নাগাল।

শ্যামলের জীবনে একটা ক্ষত বড়ভাই তনুদা-র অপহৃতি। বি.এসসি-র ছাত্র কেন পটাশিয়াম সায়ানেড-এর মারণশক্তির পরীক্ষায় নামল তার হদিশ না-জানাই থেকে গেল। শ্যামলের লেখায় আত্মঘাতী ভাই বারবার ঘুরে এসেছে এই নিরুত্তর জিজ্ঞাসার খোঁজে। আর যে রমণীর উল্লেখে শ্যামলের দাবানল-মার্কা মেজাজের ওপর স্বচ্ছন্দে বসে যেত পোলার ক্যাপ, তিনি তার জগদ্ধাত্রীরূপিনী মা। শ্যামল আক্ষরিক অর্থে মাতৃমুখী সন্তান। এই মায়ের মুখে শোনা গল্পই শ্যামলের লেখালেখির উৎসমুখ খুলে দিয়েছিল। শ্যামলের কথায়—মা কথকতায় তারাশঙ্করের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবেন। তার অজস্র লেখায় নানারূপে এই অসাধারণ মহিলার আসা-যাওয়া। তেমনি বার বার এসেছে তার সর্বংসহা স্ত্রী ইতি। পান-ভোজনবিলাসী, মেজাজি, খামখেয়ালি স্বামীর নানান হরকতেও মাথায় ভরা কলসি নিয়ে নীরবে চলতে অভ্যস্ত। এবং তাকে গলা চড়াতে আমি কখনও শুনিনি।

চব্বিশে সেপ্টেম্বর বেলা পৌনে একটায় কবি, গল্পকার চিরঞ্জীব বসু টেলিফোনে জানাল: শ্যামলদা চলে গেলেন, বেলা বারোটা দশ মিনিটে। কবি তুষার চৌধুরী, শ্যামলের বড়ো জামাই, আগের দিন রাত্তিরে বলেছিল তার মহানিদ্রার প্রস্তুতির কথা। তিনটে বেডসোর হয়ে গেছে। শুনে বলেছিলাম —আর বোলো না। ওর মতো প্রচণ্ড প্রাণবন্ত, কথায় মজার ফুলঝুরি, মানুষটার একেবারে চুপ মেরে যাওয়া, গত প্রায় একবছর না লিখতে পারা, সারা মনে গরম লোহা দেগে দেয়। তাই তুষারকে বলেছিলাম: ঈশ্বর যদি থেকে থাকেন, তবে এবার ওকে তুলে নিন। আর কষ্ট যেন না দেন। ক্রনিক্লার অফ্ টাইম শ্যামল এবার সময়ের ল্যান্ডমার্ক হয়ে যাক—মনেপ্রাণে এই চেয়েছিলাম। তাই হল।

শ্যামলের নিজের জীবন নিয়ে একাধিক বই আছে। একটার নাম সময় বড়ো বলবান। সে বইটাতে দুই পাশে দুই মহারাজ, সুনীল আর শ্যামলের মধ্যে এক নিরর্থক কলাগাছ হয়ে আমিও আছি। আমি সবেতেই ছোটো হয়ে শুধু বয়েসে শ্যামলের চেয়ে এক বছরের বড়ো।

সুনীল ওর থেকে এক বছরের ছোটো। এই অসমান তিনটে উইকেটের মাঝখানেরটা ও নিজেই হিট উইকেট হয়ে উড়িয়ে দিল। সুনীল বলে— ওর ইঞ্জিনটা খুব মজবুত। তাই থাকুক বহু বছর ধরে। ও এখনও অনেক দেবে, নেবে। শ্যামলটাই শুধু কাগজপত্র ছড়িয়ে, পেনের ক্যাপটা পর্যন্ত না লাগিয়ে চলে গেল। আমার থাকা, না-থাকা শালগ্রামের শোওয়া-বসা। শ্যামল ক' মাস আগে তুষারকে বলেছিল: হু হু করে আইডিয়া আসছে নতুন নতুন। কনসেনট্রেট করতে পারছি না, লিখতেও পারি না। এই আফশোসটা কুরে কুরে খাবে। অনেককে। চিরটাদিন।

কমিউনিস্ট না হয়েও শ্যামল পেরেছিল নিজেকে ডিক্ল্যাসিফাই করতে। তাই তারকাটা, ডাকাত, তাবত ব্রাত্যদের সঙ্গে মিশে গিয়ে ধানক্ষেতের আলে বসে ওদের সঙ্গে তাড়ি খেতে পারত। ওই তাড়ির সঙ্গে জীবনকে সে পান করত চুমুকে চুমুকে। একেবারে তলানিশুদ্ধু। তেমনটা ওর উত্তরসূরিরা কি পারবে? সংশয়টা থেকেই গেল।

রইল বাকি দুই

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

আমরা ছিলাম ছয়জন। শ্যামল, শংকর, বিমল রায়চৌধুরী, মিহির, অশেষ এবং আমি। মিহির মুখোপাধ্যায়ের টালিগঞ্জ ব্রিজের পাশের বাড়ির একতলায় আমরা তখন বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ তৈরি করছি। অবশ্যই মুখে মুখে। কবিতা সিংহের স্বামী বিমল তখন বেশ কয়েকটি ভালো গল্প লিখে ফেলেছে, শংকর পূর্বাশায় 'শীতের কোকিল' গল্পটি লিখে একটু গম্ভীর হয়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে কথা বলছে। মিহির তাঁর 'ছোট বিবির রয়ানি' নামে বিখ্যাত গল্পটি সবেমাত্র লিখেছে।

একান্ন সালের শেষ দিকে যখন পূর্ববঙ্গ থেকে এ বঙ্গে আসি তখন এরাই ছিল আমার প্রথম বন্ধু। এদের মধ্যে একমাত্র শংকর ছাড়া সকলেই আমার চেয়ে দুই তিন বছরের বড়ো। আমি সম্ভবত সর্বকনিষ্ঠ ছিলাম এদের মধ্যে। শংকর, বিমল, মিহির আগেই শব্দের সীমা ছাড়িয়ে চলে গেছে। শ্যামলের পর রয়ে গেলাম আমি ও অশেষ।

শ্যামল যেদিন চলে গেল ঠিক সেদিনই আমি লন্ডনের প্লেনে উঠছি। খবর পাইনি। আমার বড়ো ছেলে, যে এয়ারপোর্টে আমাকে তুলতে এসেছিল, সে কিন্তু জানত। কিন্তু যাত্রা শুরুতেই সে আমাকে বিষণ্ণ করতে চায়নি। পরে ফোনে জেনেছি আমাকে তুলে দিয়ে শুভ শ্মশানে ছুটেছে। মৃত্যুর বর্ণনায় অক্ষর সব সময়ই অযোগ্য। শ্যামলকে বোধহয় আমি ও অশেষই সবচেয়ে আগে চিনতে শিখি। মানুষ শ্যামল এবং লেখক শ্যামলকে আমাদের চেয়ে বেশি আর কে চেনে এটা বলার জন্য আমি ছাড়া রয়ে গেল শুধু অশেষ।

শ্যামল যে কত বড়ো লেখক ছিল তা সে নিজে কি জানত? জানি না । কত আনন্দঘন মুহূর্ত, কত কৌতুকস্নিগ্ধ পরিবেশ যে আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছি তা আজ মনে ভিড় করছে। তাঁর 'কুবেরের বিষয় আশয়', 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা'-র মতো উপন্যাস বাংলা ভাষায় খুব বেশি লেখা হয়নি।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের সমান লেখক কি খুব বেশি এসেছে আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যে। এই প্রবাসে যখন আকাশ, শ্যামল গাছপালা ছাড়া পাশে মনঃ-সঙ্গী কেউ নেই, তখন গাছপালার সমস্ত শ্যামলিমা যেন শ্যামল হয়ে আমার নিঃশ্বাসে চলে আসছে।

মৃত্যুর আগে, না না মৃত্যু নয়, যখন স্তব্ধ-কলম শ্যামলকে হাসপাতালে দেখতে গেলাম তখন তো জানতামই কি হবে বা হতে যাচ্ছে। দিব্যেন্দু পালিত ও বুদ্ধদেব দাশগুপ্তকে সেদিন আমার সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। তখনও তার স্বভাবসিদ্ধ কৌতুক বিচ্ছুরণ বজায় ছিল। অসুখের কয়েকদিন আগেও তাঁর টালিগঞ্জের বাড়ির ছাদে শ্যামল, আমি ও আমার ছেলে একই সঙ্গে আকাশের তারা দেখেছিলাম। অনেক দুঃখ, বহু অপ্রাপ্তির বেদনা সেদিন তার অ-স্বভাবসিদ্ধ উচ্চারণে উঠে এসেছিল। আসলে মানুষের প্রধান শত্রু বিষাদ। মনে হয় বিষাদই শ্যামলের হত্যাকারী। বিষাদ আমাদেরও কি প্রতিনিয়ত আক্রমণ করছে না!

শ্যামল তুই একদিন বলেছিলি তুই আমার সবচেয়ে যোগ্য অবিচ্যুয়ারি লিখবি। কিন্তু আমার বিশাল সেই অস্ত্রোপচারের পরে কিংবা দু-দুবার অন্ধ হতে হতে ভালো হয়ে যাওয়ার পরে আজ আমাকেই তোর বিদায় লিখতে হচ্ছে। বিদায়। না তোকে মন থেকে বিদায় দেবার সাধ্য আমার নেই। বাংলাভাষাও কি তোকে কখনও বিদায় দিতে পারবে।

বন্ধু, প্রণাম

কিন্নর রায়

২৪ সেপ্টেম্বর ঠিক সকাল সাড়ে আটটায় ফোন পাই কবি সমীর চট্টোপাধ্যায়ের। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটো জামাই সমীর ফোন করে জানাল, কাল খুব শরীর খারাপ হয়েছে শ্যামলবাবুর। রাইস টিউব দিয়েও খাওয়ানো যাচ্ছে না। রক্ত-বমি করেছেন কয়েকবার। তাই আবার ভরতি করতে হয়েছে সিঁথির মোড়ে ডা. সুদীপ্ত রায়ের 'সরযূ' নার্সিং হোমে। ওইদিনই বেলা বারোটা কুড়িতে আবার ফোন পেলাম সমীরের। তখন রীতিমতো ফোঁপাচ্ছে। তার মধ্যেই কষ্ট করে বলল, কিন্নর, মারা গেছেন। মারা গেছেন। তুমি সবাইকে খবর দাও। এর আগে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটো মেয়ে ললিতার ফোন পেয়েছি। সেই দূরভাষ কণ্ঠেও উদ্‌বেগ ছিল। ছিল রাতজাগার ক্লান্তি। তারপর আবার ললি-র (ললিতা) ফোন। — বাবা মারা গেছে। কিন্নরদা, আমার বাবা মারা গেছে। তুমি এখনই চলে এসো। ললিকে কথা দিলাম—যাচ্ছি। একটু পরেই ললি-সমীরদের মেয়ে সুচরিতা ফোনে জানিয়ে দিল —দাদু আর নেই।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় চলে গেলেন বেলা বারোটা সাত কি আটে। আকাশে তখন শরতের আভাস। কয়েকদিন আগেই রোদের রং দেখে তিনি বলেছিলেন, পুজো এসে গেল। সমীর জানতে চাইল কী করে বুঝলেন?

রোদের রং দেখে।

এত সূক্ষ্ম অনুভূতির মানুষ, মৃত্যুর দশ বারো দিন আগে থেকেই তেমন করে কথা বলছিলেন না কারও সঙ্গে। খাওয়াতে হত জোর করে। চোখই খুলতে চাইতেন না। কখনও দু-একটা কথা। এমনকী ১৭ সেপ্টেম্বর — মহালয়া আর বিশ্বকর্মা পুজোর দিন (এবার মহালয়া, বিশ্বকর্মা পুজো একদিন পড়েছে পঞ্জিকার হিসেবে।) আশ্বিন মাসে এবার দুটো অমাবস্যা, তাই মল মাস, সমস্তরকম 'শুভ কর্ম নিষিদ্ধ'। তাই দুর্গাবোধন কার্তিকে। সে সব অবশ্য একেবারেই অন্য প্রসঙ্গ। তো যা বলছিলাম। ১৭ সেপ্টেম্বর শরৎ-সমিতি শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে সম্মানিত করল শরৎ-পুরস্কারে। ত্রিকোণ পার্কের শরৎসমিতি ভবনের তিনতলায় সেই অনুষ্ঠানে শ্যামলবাবুর লেখালেখি নিয়ে মিনিট পনেরো-কুড়ি বলতে হয়েছিল। সে সব কথা এখন থাক। ওঁর লেখা নিয়ে বলতে গেলে তো মহাভারত হয়ে যাবে। সেই অনুষ্ঠানে ললিতা, মল্লিকা, সমীর, তুষার—ওঁর দুই মেয়ে দুই জামাইদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ছিল দুই নাতনি। কথা বলে জেনেছিলাম সেদিন বেশ বাড়াবাড়ি চলছে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের।

গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকেই ওঁর অসুস্থতা। অজ্ঞান হয়ে যাওয়া। ১০ অক্টোবর পার্ক নার্সিং হোমে ব্রেন টিউমার অপারেশন, সেই টিউমার বায়াপসি করে ম্যালিগন্যান্ট হয়েছে এমন রিপোর্ট পাওয়া, তারপর বুকে পেসমেকার বসানো, পার্ক নার্সিং হোমে ভরতি থাকার আগে 'গামা'- য় থাকা। পার্ক নার্সিং হোম থেকে সোজা কাশীপুরে —উদ্যানবাটির পরের স্টপে সরকারি কোয়ার্টার্সে ললির ওখানে চলে যাওয়া— সবই পরপর মনে পড়ে।

মনে আছে পার্ক নার্সিং হোমে ওঁকে দেখতে গেছি একদিন সকালে। বসে আছেন বিছানায়, মাথা কামানো। কথা বলতে বললেন, আমার বন্ধুদের মধ্যে আমারই প্রথম ব্রেন অপারেশন

হল। দারুণ অভিজ্ঞতা। কি বলিস! এ নিয়ে দারুণ গল্প হয়।

তখনও তাঁর মাথায় বাসা-বাঁধা কর্কটরোগের কথা তিনি জানেন না। বলেছিলেন, মাথার ভেতর অল্প জল জমেছিল। সেটা বার করে দিয়েছে।

সেদিন সকালে নার্সিং হোমে শ্যামলবাবুর বড় মেয়ে মল্লিকা(মলি) ছিল। ছিল বড়ো জামাই তুষার চৌধুরীর ছোটোভাই ডুটন (প্রসেনজিৎ)। ছিলেন 'আজকাল'-এর সহযোগী সম্পাদক অলক চট্টোপাধ্যায়। অলকবাবু আস্তে আস্তে 'ফরেস্ট গাম্প' নামে একটি বিদেশি সিনেমার গল্প শোনাচ্ছিলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে। সেই চিত্রকাহিনী শুনতে শুনতে শ্যামলবাবু বারবার বলছিলেন, ফরেস্ট গাম্প মানে এলেবেলে। তাই না?

যতদূর মনে পড়ছে পার্ক নার্সিং হোম থেকে অপারেশনের দিন দশ-বারো পরই কাশীপুরে ছোটো মেয়ের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় শ্যামলবাবুকে। তখনই একটু একটু করে পায়ে জোর কমে আসছে। হাঁটতে চান না। আর মুখে প্রায়ই 'বাবা, ও বাবা — ও বাবা' — এই শব্দটি ফুটে ওঠে। কাশীপুরের ফ্ল্যাটবাড়ির তিনতলায় ওঁকে ধরে বহুদিন এঘর ওঘর হাঁটানোর চেষ্টা করেছি। একটু হয়তো হাঁটলেন তারপর আবার বসে পড়লেন। একেবারেই ইচ্ছে ছিল না হাঁটার। সকালের দিকটা বেশির ভাগ দিনই তখন আচ্ছন্ন মতো থাকতেন। কেমন যেন ঘুম ঘুম ভাব। চোখ বুজে শুয়ে থাকেন। তবু এরই মধ্যে 'আলো নেই' উপন্যাস কি ভাবে শেষ করা হবে, সে ব্যাপারে নোট দিয়েছেন। কথা বলেছেন। নবনীতা দেব সেন ওঁকে একটা সুন্দর নোট বই দিয়ে এসেছিলেন। যা ইচ্ছে, যা মনে হয়, সেই নোট বইয়ে লেখার জন্য।

২৭ নভেম্বর, সোমবার, ঠাকুরপুকুর ক্যানসার হাসপাতালের ২৪ নম্বর কেবিনে ভরতি হলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। চব্বিশটা রে দিতে হবে। সপ্তাহে পাঁচটা — সোম থেকে শুক্র। শনি রবি বন্ধ।

কাশীপুরে যেমন যেতাম, ঠাকুরপুকুরেও গেছি। শুধু আমি নয়, অনেকেই গেছেন এই সময়ের লেখকেরা। ভগীরথ মিশ্র, শৈবাল মিত্র, সাধন চট্টোপাধ্যায়, অমর মিত্র, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিতা অগ্নিহোত্রী, কুণালকিশোর ঘোষ, রবিশংকর বল, গৌর বৈরাগী, উজ্জ্বল চক্রবর্তী, অরিন্দম বসু — এরকম আরও অনেকেই। পুরোনো ডায়েরি খুলে দেখতে পাচ্ছি, ৭ ডিসেম্বর বিকেলে ঠাকুরপুকুর ক্যানসার হাসপাতালে অমর, অনিতা, গৌর বৈরাগী, উজ্জ্বল চক্রবর্তী, সজল চক্রবর্তীরা গেছিলেন শ্যামলবাবুকে দেখতে ঠাকুরপুকুরে। সেদিন বিকেলে আটার লুচি আর বেগুনভাজা খেলেন শ্যামল। বার বার তিনি অনিতার কাকার কথা বলছিলেন, যিনি খুলনায় থাকতেন।

২ মিনিট ২০ সেকেন্ডের রে। ২৫টা রে দিতে হল। শুধু রে দেয়ার খরচ চার হাজার টাকা। তারপর ওষুধ, কেবিন ভাড়া — সব মিলিয়ে বিপুল ব্যয়। ১৫ ডিসেম্বর শুক্রবার গৌরকিশোর ঘোষ মারা গেলেন। সেদিন ঠাকুরপুকুরে গিয়ে দেখি শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ড্রিপ চলছে। ওঁর শরীর বেশ খারাপ। হঠাৎ শরীরে সোডিয়াম পটাসিয়ামের পরিমাণ কমে গেছে। ১৪ তারিখ প্রস্রাব বন্ধ হয়ে গেছিল। খুব কষ্ট পেয়েছেন। ১৬ তারিখেও ঠাকুরপুকুরে গিয়ে দেখতে পাই ড্রিপ চালু আছে। পনেরোটা রে হয়েছে শুনলাম। এখনও দশটা বাকি। ৩০ ডিসেম্বর রে দেয়া শেষ হল। ৩০ ডিসেম্বরই ওঁকে নিয়ে চলে আসা হল কাশীপুরে। তারপর শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় একদম চুপচাপ। অত্যন্ত গম্ভীর। কথাই বলেন না। ললির সঙ্গে কথা বলে জানি সেরিব্রাল ইডিমা হয়েছে। এখন দিন কুড়ি এমন চলবে। ১১ জানুয়ারি গজেন্দ্রকুমার মিত্র স্মারক পুরস্কার

ওঁকে গিয়ে দিয়ে আসা হল কাশীপুরের ফ্ল্যাটের তিনতলায়। সেদিন বহু মানুষ ছিলেন সেখানে। সবিতেন্দ্রনাথ রায় (ভানুবাবু), সুধাংশুশেখর দে, শঙ্কু মহারাজ, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, ভগীরথ মিশ্র, অমর মিত্র। আমার পৌঁছতে একটু দেরি হয়েছিল। ধর্মতলা থেকে ৪৩ নম্বর বাসে যাওয়া। সে তো রাজ্য ঘুরে যায়। আসলে কথা ছিল শঙ্কু মহারাজ, ভানুবাবুদের সঙ্গে গাড়িতে যাওয়ার, কলেজ স্ট্রিট থেকে। ওঁরা পাঁচ মিনিট আগে গাড়ি ছেড়ে দিলেন।

মলি যাওয়া মাত্রই বলল — বাবা, বার বার তোমার কথা বলছিল। কিন্নর এল না! কিন্নর এল না! ২০০১ সালের জুনে ২-৩ তারিখ থেকেই শরীর অনেক বেশি খারাপ হতে শুরু করে শ্যামলবাবুর। ৭ জুন দুপুরবেলা ওঁকে ভরতি করা হয় এস.এস.কে.এম-এর উডবার্ন ওয়ার্ডে। কুড়ি নম্বর কেবিনে।

সেদিন ঘোর বর্ষা। অসম্ভব বৃষ্টি। কয়েকদিন ধরেই পালস রেট খুব পাগলামি করছে। ব্লাডপ্রেসারের হিসেব মিলছে না। তাই ললি শেষপর্যন্ত উডবার্নে ভরতির সিদ্ধান্ত নিল। দুপুর দুটো নাগাদ অ্যাম্বুলেন্সে চাপিয়ে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে আমরা রওনা দিয়েছিলাম কাশীপুর থেকে। তারপর এস এস কে এম-এর উডবার্নের তিনতলায়। কেবিনটা খুব সুন্দর। ওখানে পৌঁছে ড্রিপ লাগাতেই শ্যামলবাবু চাঙ্গা। উঠে বসলেন বিছানার ওপর। বিস্কুট খেলেন। জল। তপন বন্দ্যোপাধ্যায় আর অমর মিত্রকে দেখে বললেন, এবার আমরা একটা খুলনা ক্লাব করব — সেখানে সবাই খুলনার লোকজন থাকবে। তারপর আমায় বললেন, তুই কোথাকার? বললাম, ঢাকার। অমর বলল, ওকে আমরা খুলনার করে নেব। সেদিনই অমরের কাছে বার বার একটা — একটাই সিগারেট চাইছিলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। অমর অবশ্য দেয়নি। না দেয়ারই কথা। সিগারেট তো তখন বিষ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে। দিন দশেক ছিলেন এস.এস.কে.এম-এর উডবার্নে। সেখান থেকে আবার কাশীপুর — ললির বাড়ি। এই সময় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে হাসপাতালে ভরতির ব্যাপারে খুব বড়ো ভূমিকা নিয়েছিলেন।

১০ জুলাই বুকের ভেতর প্রচণ্ড অস্বস্তি, শ্বাসের প্রবল কষ্ট নিয়ে এস.এস.কে.এম-এর কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্টের দোতলায় ভি.আই.পি কেবিন নম্বর ওয়ান-এ ভরতি হলেন। সেই কেবিন থেকে কদম গাছ দেখা যায়। তার ডালে অনেক ফুল। সেদিন তিনি অসম্ভব রেস্টলেস। ভায়োলেন্ট। হাতের স্যালাইন নল, ইনজেকশন চ্যানেল, ক্যাথিটার পাইপ — সব টেনেটুনে খুলে ফেলতে চাইছেন। সে এক রক্তারক্তি ব্যাপার। ১২ জুলাই এস এস কে এম-এর দোতলায় কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্ট থেকে সিঁথির মোড়ে 'সরযূ' নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হল অ্যাম্বুলেন্সে। ললিতার ফোন পেয়ে বেলা ১২টা নাগাদ এস.এস.কে.এম পৌঁছেছি। কাগজপত্রে সই-সাবুদ করে, ডিপার্টমেন্টাল ভারী খাতা, ওপর থেকে এমারজেন্সির পাশে ক্যাশ কাউন্টারে নিজেরা (আমি আর মলি) নিয়ে এসে, দৌড়াদৌড়ি করে ওঁকে নিয়ে এস.এস.কে.এম থেকে রওনা হলাম বেলা তিনটে দশ মিনিটে। সেদিন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান শৈলেন দাশগুপ্তর শেষকৃত্য। রাস্তায় বড়ো মিছিল। ময়দানের পাশ দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স যাওয়ার সময় শোয়া অবস্থা থেকে উঠে বসলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। কি যেন তাকিয়ে দেখলেন বাইরের দিকে। আবার শুয়ে পড়লেন। উঠছেন, শুচ্ছেন। ওঁকে নিয়ে বেলা তিনটে পঞ্চাশ মিনিটে 'সরযূ' নার্সিংহোম। অ্যাম্বুলেন্সে শ্যামলবাবুর সঙ্গে আমি ললি আর মলি।

১৪ জুলাই খুব শরীর খারাপ হয়েছিল শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের। সেদিন সন্ধেবেলা 'সরযূ'

নার্সিংহোমে যাই। সমীর ললিদের মেয়ে সুচরিতার ফোন পেয়ে ললির বাড়ি গেছিলাম দুপুরবেলা। সেখান থেকে রিকশায় আমি আর অমর মিত্র গেলাম নার্সিংহোমে। সেদিন 'সরযূ'-তে মতি নন্দী এসেছিলেন। এসেছিলেন 'আজকাল' সম্পাদক অশোক দাশগুপ্ত, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, 'আজকাল'-এর সহযোগী সম্পাদক অলক চট্টোপাধ্যায়। ১৩ জুলাই থেকে খুব অসুস্থ হয়েছিলেন শ্যামলবাবু। ভয়ানক শ্বাসের কষ্ট।

আমরা সবাই ভেবেছিলাম সেদিনই হয়তো বা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় চলে যাবেন। কিন্তু অফুরান প্রাণশক্তি, আত্মবিশ্বাস, গায়ের জোরে তিনি ফিরে এলেন মৃত্যুর দরজা থেকে। মরণ হেরে গেল সাময়িকভাবে। ১৪ জুলাই মতি নন্দীকে চিনতে পেরেছিলেন 'কুবেরের বিষয় আশয়'-এর লেখক। বলেছিলেন, মতি এসেছিস! আয়।

১৬ জুলাই সন্ধেবেলা দে'জ পাবলিশিং-এর কর্ণধার সুধাংশুশেখর দে, সুধাংশুর বউ রীতাঞ্জলি(টুকু) আর আমি দেখতে যাই শ্যামলবাবুকে। তখনও তিনি সুস্থ নন। একগাল দাড়ি। চোখের চাউনি স্বাভাবিক নয়। সুধাংশুকে দেখিয়ে ললি জানতে চাইল, বলো তো, ইনি কে?

'শ্যামলবাবু একটু জড়ানো গলায় জবাব দিলেন, ইনি কবি তারাপদ রায়।

তারপর তো ২৪ সেপ্টেম্বর, সোমবার। বেলা বারোটা সাত-আটে সব শেষ হয়ে গেল। ঠিক চারটেয় শিখ গুরুদোয়ারার কাচের গাড়িতে ফুলে ফুলে ঢাকা শ্যামলবাবুকে, 'সরযূ' নার্সিংহোম থেকে নিয়ে আমরা বাংলা আকাদেমির পথে।

সামনে কলকাতা পুলিশের হুটার বাজানো মোটরসাইকেল। 'আকাশবাণী'-র গাড়িতে আমি, অমর, স্বপ্নময়, অরিন্দম বসু, অতনু। সে দিন 'আকাশবাণী'-র এফ এম ওয়ান-এ 'আলাপন', 'সায়াহ্নে' বেলা চারটে থেকে সন্ধে ছ'টা — পুরোটাই শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় স্মরণে। স্বপ্নময়ই পুরোটা করালো। নিজে ধারাভাষ্য দিয়ে গেল শ্যামলবাবুর অন্তিমযাত্রার।

দু'ঘন্টাই শ্যামলে শ্যামল। এফ এম-এ কথা বললাম আমি, অমর, অরিন্দম। বেলা ৫.২০ তে বাংলা আকাদেমি। তখন সন্ধে নামছে। সেখানে মালা, শ্রদ্ধা, স্মৃতি, পুষ্পস্তবক, টি.ভি. ক্যামেরার আলো।

পৌনে ছ'টায় আবার রওনা দেয়া।

৭৯ দেশপ্রাণ শাসমল রোডের সামনে পৌঁছলাম ছ'টা বাজতে পাঁচে। অধ্যাপক অমিয় দেবের মারুতিতে আমি, কবি ভূমেন্দ্র গুহ, অমিয় দেব, আর 'পর্বসন্ধি' কাগজের সম্পাদক অম্লান দত্ত।

সামনে কলকাতা পুলিশের জোড়া সার্জেন্ট, মোটরবাইক নিয়ে। কলকাতা পুলিশের ভ্যানও চলেছে আগে আগে। অনেকগুলো গাড়ি। গুরুদোয়ারার কাচ ঢাকা গাড়িতে শ্যামলবাবু। সেখানে অনেক ফুল, মালা, ফুলের রিং।

ছ'টা বাজতে পাঁচে ৭৯ দেশপ্রাণ শাসমল রোডে কনভয় থামল। তারপর স্ট্রেচারে শোয়ানো শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে সেই খাড়াই সিঁড়ি ধরে ধরে তোলা হল। তাঁর ফ্ল্যাটের সামনে। ফুটপাথ ভরতি মানুষ, মিডিয়ার লোকজন। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ঘরের সামনেও বহু লোক। স্ট্রেচারে শোয়ানো শ্যামলবাবুকে তাঁর ফ্ল্যাটে ঢোকাতে গিয়ে সমস্যা হচ্ছিল। স্ট্রেচার ঢোকানো গেল না। কাপড়, বেডশিট সমেত বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখকটিকে নিয়ে শুইয়ে রাখা হল তাঁর ঘরে।

পৌনে সাতটা নাগাদ তাঁকে নামিয়ে আনা হয় ওপর থেকে। এই সিঁড়ি দিয়ে কতবার ওঠানামা করেছেন শ্যামলবাবু। আমাদের এগিয়ে দিয়েছেন রাত-বিরেতে। দাঁড়িয়ে থেকেছেন সিঁড়ির মুখে। যতক্ষণ না বাসে উঠি হাত নেড়েছেন।

ঠিক সাতটায় কেওড়াতলার বৈদ্যুতিক চুল্লির কাছাকাছি এসে পৌঁছলাম শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে। তখন লাইনে, সামনে আরও দু'জন। তার মধ্যে একজন মিলিটারি ক্যাপটেন। বাইশ-তেইশ বছর হবে বড়ো জোর।

আটটা পঞ্চাশে তাঁকে ভাসিয়ে দিলাম আগুনের ভেলায়। দুটো চুল্লির ভেতর, ডান দিকেরটায়। ভেতরে রাঙা আগুন। তারপর এক-সরা ছাই হয়ে তিনি বেরিয়ে এলেন রাত নটা চল্লিশে।

পোড়ামাটির সরায় গঙ্গামাটির চাপা দেয়া অস্থি, নাভি নিয়ে রওনা দিলেন তাপস গঙ্গোপাধ্যায়। বড় গঙ্গায় তাঁর প্রিয় মণিদার অস্থি, নাভিকুণ্ড বিসর্জন দেবেন বলে। কেওড়াতলা মহাশ্মশানের ইলেকট্রিক চুল্লির সঙ্গে লেগে থাকা ইলেকট্রনিক ঘড়িতে তখন রাত নটা পঞ্চান্ন। আকাশে আশ্চর্য একফালি চাঁদ।

আসলে এসব কথা বলা এই জন্যে, এভাবেই একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ হল। সেই সার্কলটির নাম শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। যিনি ছাত্র রাজনীতি, ইস্পাত কারখানা, চম্পাহাটির ধানজমি, বাড়ি, গরু, ইটভাটা, বিদ্যেধরীর মরা বুক, অনেক অনেক বছরের পুরোনো তেঁতুল গাছ, মজে যাওয়া নদীর বুকে বহু বছর আগে হারানো নৌকোর গলুইয়ের হঠাৎ জেগে ওঠা, ভূমিহীন হাভাতে মানুষ, স্বৈরিণী নারী, সাপ, ইঁদুরের গর্তে জমা ধান, সেই ধান চুরি করতে আসা মানুষ, নানান রকম পুরোনো গাড়ির পাগলামি — সব কিছুকেই শিল্প করে তুলতে পেরেছিলেন নিজের জীবনের অমিত প্রাণশক্তি দিয়ে। অপমান, আহ্লাদ, আনন্দ, প্রেম — এইরকম নানা মশলা দিয়ে পাকা রাঁধুনি হিসেবে তিনি একের পর এক অভিজ্ঞতাকে শিল্পরূপ দিয়েছেন। এর সঙ্গে মিশেছে কল্পনা আর দৈবী পাগলামি। 'দৈবী পাগলামি' শব্দটি শ্যামলবাবুর থেকেই ধার করলাম।

২৪ সেপ্টেম্বর বেলা বারোটা সাত-আটে তিনি প্রয়াত হওয়ার পর থেকেই খবরের কাগজ ও পত্রিকার পাতায় পাতায়, টি ভি ক্যামেরার সামনে অনেক অশ্রুপাত হচ্ছে তাঁর জন্যে। সেটাই স্বাভাবিক। আরো হবে অনেকরকম লেখা। এদের মধ্যে সকলেই শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় নামের হিমশৈলটির আদৌ বন্ধু ছিলেন কিনা, এ বিষয়ে গভীর সন্দেহ হয়। আমরা জানি সমুদ্রে ভাসা হিমশৈলের বারো ভাগের এক ভাগ, জলের ওপরে ভেসে থাকে। বাকি এগারো ভাগ নীচে। তাঁর বহু লেখা — গল্প, উপন্যাস, ফিচারই হিমশৈল।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় আমাকে অন্যদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতেন 'বন্ধু' বলে। সঙ্গে জোর করে 'গল্পকার', 'ঔপন্যাসিক' বিশেষণ। আমি তাঁর থেকে কুড়ি বছরের ছোটো। তাঁর থেকে তিরিশ-চল্লিশ বছর কম আয়ুষ্কালের মানুষদের সঙ্গেও তিনি 'বন্ধু' হয়ে মিশতে পারতেন। এমনকী আমার মেয়ের সঙ্গেও। নবীনদের পছন্দ করা, ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

শুধু নবীন মানুষ নয়, নতুন লেখা, নতুন রান্না, নতুন প্রেম, নতুন গান — সব বিষয়েই তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। বহু মেশার মানুষ থাকলেও তিনি নিঃসঙ্গ ছিলেন। ২০০০ সালে, ৭৯ দেশপ্রাণ শাসমল রোডে তাঁর ফ্ল্যাটে, কিংবা আমার ব্রহ্মপুরের ফ্ল্যাটে এসে বহুবার তাঁকে বলতে শুনেছি, আমার যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। কোথায় যাব! কার সঙ্গে মিশব বলো

তো! তোমাদের সঙ্গে আড্ডা দিতে লোভ হয়। তোমার মেয়ের নবীন মুখশ্রী দেখে আহ্লাদ হয়। তাই আসি।

মনে পড়ে একদিন — গরমের রাত্রে ঘোর জ্যৈষ্ঠ তখন, অনেকটা হুইস্কি খাওয়ার পর চারখানা রুটি, গোটা তিনেক পাকা ল্যাংড়া আম নিয়ে তিনি আমার ব্রহ্মপুরের ফ্ল্যাটে এসেছিলেন।

৭৯ দেশপ্রাণ শাসমল রোড থেকে আমরা অটোয় অটোয় ব্রহ্মপুর এসেছিলাম। তখন রাত এগারোটা বেজে গেছে। শ্যামলবাবুর পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। পায়ে চামড়ার ব্যাকবেল্ট। আদির পাঞ্জাবি ঘামে ভিজে লেপটে গেছে গায়ের সঙ্গে। রাস্তায় বার বার বলছিলেন, তোমার শিক্ষিত সুন্দরী বউ রাগ করবেন না তো আমার ওপর?

শুভ্রা ফ্ল্যাটের দরজা খুলে দেয়ার পর তিনি হাতজোড় করে বলেছিলেন, এত রাতে তোমাদের বিরক্ত করতে এলাম। তারপর আম আর দুধে মেখে এক খানা রুটি খেয়ে তিনি শুয়েছিলেন আমার পাশে — খাটের ওপর। সেদিন সারারাত আমরা গল্প করেছিলাম। মাঝে মাঝে উনি ঘুমিয়ে পড়ছিলেন, আবার জেগে কথা বলতে শুরু করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাণিকবাবু, সতীনাথ ভাদুড়ী, জীবনানন্দ দাশ, তলস্তয়, দস্তয়েভস্কি, চেখভ, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু, আকবর, কবীর, ভারতের সমন্বয়বাদী ধর্ম আন্দোলন — নানা বিষয়ে কথা হয়েছে আমাদের। তারপর খুব ভোরে উঠে হঠাৎই — 'সারারাত ইতি একা আছে। সারারাত তোমাদের বৌদি একা আছে', বলে কোনোরকমে এককাপ চিনি ছাড়া কালো চা খেয়ে তিনি আমার হাউজিং কমপ্লেকস-এর মুখ থেকে অটোয় উঠেছিলেন। ৭৯ দেশপ্রাণ শাসমল রোডে ফিরে যাবেন বলে। তার আগে অবশ্য ইতি বৌদিকে একটা ফোন করেছিলেন।

তিনি সুস্থ আছেন কিনা জানতে চেয়ে ওর সব বাড়িতেই বিভিন্ন সময়ে গেছি। অদ্ভুত নেশা ছিল বাড়ি পালটানোর। কিন্তু সবার ওপরে তিনি ছিলেন একজন রূপমুগ্ধ প্রেমময় মানুষ। হৃদয়বান পরোপকারী। বাংলা সাহিত্যে তিনি সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ লেখক মনে করতেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বিভূতিবাবুর গল্প উপন্যাস নতুন করে পড়তে শিখিয়েছিলেন তিনি। তাঁর বাড়িতে গেলে বহুবার রাতে থেকে যেতে অনুরোধ করেছেন। বলেছেন, আয় না ভাই, রাতে দুই ভাই মিলে পাশাপাশি শুয়ে থাকি। অনেক গল্প করব। কথা বলব। তাঁর সময়ের কোনো লেখককে এভাবে বলতে শুনিনি। ক্ষমতার মাউস হাতে এঁদের কেউ কেউ তো 'অপদার্থ' গদ্যপদ্য লেখককেও মহান স্রষ্টা বানিয়ে ছাড়েন। গলায় দুলিয়ে দেন পুরস্কার ও খেতাবের মালা। এই সব ল্যাজমোটা বড়দাদাদের ক্রমাগত তৈলদান না করলে, তাদের কথার সুরে সুর মিলিয়ে হেঁ হেঁ না করতে পারলে সাংস্কৃতিক জগতে কলকে পাওয়া মুশকিল।

বড়োদাদার বদলে 'দাদা' বললেই এঁদের কারও কারও গোঁসা চরমে পৌঁছয়। তখন খুদে ভাইটির পরান যায় আর কি।

মা ছোটোবেলায় আমাদের একটা গল্প শোনাতেন। তার খানিকটা এরকম ছিল। 'যখন বলিব বাবু সিগারেটো, ধাঁই করি এনে দিবি সিগারেটো। যখন বলিব বাবু ওয়াটারো, ধাঁই করি এনে দিবি জলো। যখন বলিব বাবু ড্যামো রাসকেলো, তখন বুঝিবি তোর পরান গেল।'

আসলে কলকাতায় বহুদিন কাজ করা এক ওড়িয়া কর্মচারী দেশ থেকে সদ্য আসা তাঁর

গ্রামের কোনো ছেলেকে নতুন চাকরির 'বাবুটিকে' কীভাবে সামাল দেবে, সেই উপদেশ দিচ্ছিলেন। আমাদের বাংলাভাষায়, সংস্কৃতি-শিল্প-সাহিত্য জগতে এমন 'বাবুর' অভাব নেই। পুরস্কার, খেতাব, সংবর্ধনা, নানা সেমিনারে বলার সুযোগ পাওয়ার জন্যে তাঁদের মোটা লাঙ্গুলে ক্রমাগত তৈলমর্দন করতে হয়। কিন্তু শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় একেবারেই সে রকম ছিলেন না। লেখা ভালো লাগলে তাঁকে নিঃস্বার্থভাবে সজোরে বুকে টেনে নিতেন। খারাপ লাগলে বলতেন, হয়নি। কারও আচরণ সম্পর্কেও একই নীতি ছিল তাঁর। শাদাকে শাদা, কালোকে কালো বলতে গলায় আটকাত না। এভাবে নিজেও বহু শত্রু অর্জন করেছিলেন তিনি।

তাঁর সম্বন্ধে বহু গল্প, অতিকথন, অতিরঞ্জন ছড়িয়ে আছে বাজারে। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যকর্ম বাদ দিয়ে, সেই সব অতিকথা নিয়েই অনেকে নাড়াঘাঁটা করতে পছন্দ করেন। মজা পান। এইসব অর্ধসত্য, কখনও শাদা মিথ্যেও জুড়ে গেছে তাঁর জীবনের সঙ্গে। কোনো একটি পাক্ষিকে একজন বাজার-চলতি লেখকের একটি লেখার কিছু অসত্য মন্তব্য তাঁকে পীড়া দিয়েছিল। এর প্রতিবাদ করে তিনি চিঠি দিয়েছিলেন। সেই চিঠি ছাপাও হয়েছিল। যাক সে সব কথা।

তিনি ছিলেন রূপকথার মানুষ। রূপকথার চরিত্রদের নিয়ে এমন তো প্রায়ই হয়। আমাদের পাশ থেকে ক্রমাগতই তো মুছে যাচ্ছেন কিংবদন্তীর মানুষেরা। সময়ের নিয়মে মুছে যাবেনও। ডাইনোসররা তো লক্ষ লক্ষ বছর আগেই মুছে গেছে পৃথিবী থেকে।

তিনি চলে যাওয়ায় বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যের বিরাট ক্ষতি তো হয়ে গেলই, ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতি হল আমারও। আর দশটা বছর সুস্থভাবে বেঁচে থাকলে তিনি আরও এমন সব লেখা লিখতে পারতেন, যা আমাদের বিস্মিত করত, মুগ্ধ করত। আমরাও অনেক কিছু লিখতে পারতাম।

শুধু সেরা সাহিত্যিকই নন, তিনি ছিলেন একজন জবরদস্ত সাংবাদিক। তিনটি বড়ো বাংলা দৈনিক কাগজে ও একটি সাহিত্য সাপ্তাহিকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরি করেছেন। খবরের কাগজ তার রক্তে ছিল। চাকরি ছেড়ে পুরো সময়ের লেখক হওয়ার পর তিনি আমায় বহুবার বকেছেন। যেমন বকেছেন অগ্রজ সাহিত্যিক প্রফুল্ল রায়। শ্যামলবাবু বলেছেন, তোর এই আর্থিক কষ্ট, অস্বচ্ছলতা তো তোর স্বনির্বাচিত।

২৮ সেপ্টেম্বরের 'আজকাল'-এ 'বড় সাংবাদিক' নামে সম্পাদকীয়-তে সম্পাদক অশোক দাশগুপ্ত ঠিকই লিখেছিলেন, 'বড় সাহিত্যিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বড় সাংবাদিকও ছিলেন।' আনন্দবাজার ও যুগান্তর হয়ে শেষ পর্বে ছিলেন আজকাল-এ। এখানেও তরুণ সাংবাদিকদের বড়ো কাছের মানুষ। বার্তা সম্পাদনায় উজ্জ্বল মানুষটি আজকালে প্রধানত লিখেছেন বিশেষ প্রতিবেদন। প্রাণবন্ত 'বাজার সফর'। কাশীবাসী বাঙালি বিধবাদের নিয়ে তাঁর অবিস্মরণীয় প্রতিবেদন পাঠক-পাঠিকাদের আলোড়িত করে। রাজ্য সরকার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বালক ব্রহ্মচারীর 'নির্বিকল্প সমাধি' পর্বে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় পেশ করেন চাপা কৌতুক ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে ভরা দুর্দান্ত প্রতিবেদন। বড়ো মাপের সাহিত্যিক, সমান বড়ো মাপের সাংবাদিক। শেষ প্রণাম।'

ইদানীং জীবনের নানা ক্ষেত্রেই বড়ো মাপের হৃদয়বান রসিক মানুষজনের বড়োই অভাব। সেখানে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন একেবারেই ব্যতিক্রম। যেমন সুন্দর মুখশ্রী, রূপবান,

তেমন সাহস, গায়ে জোর, হজম ক্ষমতা, তেমনই লোকের ভালো করার তীব্র ইচ্ছে বুকের ভেতর। এমন মানুষ এখন আমাদের সামনে কোথায়? তাঁকে কোনো কথা বলার আগে ভেবে বলিনি। জানি উনি রাগ করলেও, তখনই 'বেরিয়ে যা, দূর হয়ে যা' বললেও শেষপর্যন্ত ক্ষমা করে দেবেন। ফোন করে বলবেন, 'কি কিঙ্কর, আসিস না কেন অনেকদিন! কৃতদিন তোর মুখখানা দেখি না। এরপর কি আমার মরা মুখ দেখতে আসবি! শালা!' নয়তো পায়ের ব্যথা, হাজারটা শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে নিজেই হাজির হবেন আমার ব্রহ্মপুরের ঠিকানায়।

বন্ধুর বিয়োগে বেশি কিছু লিখতে নেই। তাঁর চলে যাওয়া আমার কাছে ব্যক্তিগত ক্ষতি। বন্ধুত্বের প্রয়াণ।

বন্ধুকে জড়িয়ে ধরা যায়। চুম্বন করা যায়। বুকে নিয়ে কাঁদা যায়। হাসা যায়। আবার প্রণামও করা যায়। প্রণাম বন্ধু। প্রণাম।

সম্পাদকীয় সংযোজন : শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কিত আগের তিনটি রচনার সঙ্গে এই লেখাটির কিছু চরিত্রগত পার্থক্য রয়েছে। লেখাটির শেষদিকে লেখকের ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ থাকলেও, এর অনেকটা জুড়েই রয়েছে সাহিত্যিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনের শেষ কয়েকদিনের অনুপুঙ্খ বিবরণ। ভবিষ্যতে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে যাঁরা কাজ করবেন — আজ না হলেও কাল যেটা হবেই বলে আমাদের বিশ্বাস — তাঁদের এই লেখাটির কাছে ফিরে আসতেই হবে।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস গ্রন্থের তালিকা (অসম্পূর্ণ তালিকা)

জলপাত্র/সতী অসতী/নির্বান্ধব/ গোলকধাম/সওদাগর/স্বর্গে তিন পাপী /ফিরোজা (যখন বই হয়েছে , ফিরোজা উপন্যাস ছাড়াও দু'টি গল্প-নিশীথে সুকুমার, নৃপেনদের বাড়ি)/সরমা ও নীলকান্ত/স্বর্গের পাশের বাড়ি/ পরবর্তী আকর্ষণ/ সিদ্ধকামিনী (দু'টি উপন্যাস-এক গেরস্তর তিন সংশয়, সিদ্ধকামিনী)/ তারসানাই (দু'টি উপন্যাস -'সুশ্রী গৌরী এবং', তারসানাই) / পারুলডাঙার লাল রাখাল (দু'টি উপন্যাস-শেষ দরবার, পারুলডাঙার লাল রাখাল)/ ভোরবেলার ভালবাসা (দু'টি উপন্যাস- বাম অলিন্দ, ভোরবেলার ভালবাসা)/কাপ্তেনগঞ্জের কুন্দনলাল (দু'টি উপন্যাস-গতজন্মের রাস্তায়, কাপ্তেনগঞ্জের কুন্দনলাল)/ বেঁচে থাকার স্বাদ/নতুন ভুবন/ ভালবাসলে জ্বর হয় (পূর্বনাম-নতুন নগরের চিন্ময়ী)/ একদা ঘাতক /হাওয়া গাড়ি (১ম ও ২য় পর্ব)/অলীকবাবু/ভাস্কো দা গামার ভাইপো/ ক্লাস সেভেনের মিস্টার ব্লেক (কিশোর উপন্যাস)/ মহাজীবন/জীবনরহস্য/ভালবাসিব না আর (পূর্বনাম-বালকের ভালবাসা। চারটি উপন্যাস - নয়ন, তৃতীয় মেরু, সূর্যাস্তের আগে, ভালবাসিব না আর)/ কন্দর্প দর্পণ/ মানুষের রহস্য (তিনটি উপন্যাস - নতুন চরিত মানস, ভগবান বুনো রায়ের বংশধর, মানুষের রহস্য)/ দূরবীণের উল্টোদিকে (দু'টি উপন্যাস-সরমা ও নীলকান্ত, দূরবীণের উল্টোদিকে)/ অদ্য শেষ রজনী/আবিষ্কার/ ঈশ্বরীতলার রূপোকথা/অনিলের পুতুল/ কুবেরের বিষয় আশয়/পরীর সঙ্গে প্রেম (পূর্বনাম-রূপোকুঠির পরী। দু'টি উপন্যাস- এক গেরস্তর তিন রক্ষিতা, পরীর সঙ্গে প্রেম)/হিম পড়ে গেল/যতীন দারোগার বেদান্ত/ হননের আয়োজন/সুধাময়ীর দিনলিপি (তিনটি উপন্যাস-শিকড়, একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা, সুধাময়ীর দিনলিপি)/ বেডসাইড শ্যামল (উপন্যাস-বড় হওয়ার আগে । তৎসহ কয়েকটি গল্প)/ অতি বড় ঘরণী (তিনটি উপন্যাস-টানেলের ভেতরে ট্রেন, মাছের পেটে আঙটি, অতি বড় ঘরণী)/ আলো নেই / শাহজাদা দারাশুকো (১ম ও ২য় পর্ব) /দশ লক্ষ বছর আগে/ বেঁচে থাকার স্বাদ (দু'টি উপন্যাস-স্বপ্নসম্ভব, বেঁচে থাকার সাধ)/ কঠিন সময় (পূর্বনাম-কায়কল্প। দু'টি উপন্যাস — শেষ বিকেলের আলো, কঠিন সময়) / ক্ষমতার বারান্দায়/ স্বর্গের আগের স্টেশন/ অর্জুনের অজ্ঞাতবাস (পূর্বনাম - বৃহন্নলা)/ চন্দনেশ্বর জংশন / পরস্ত্রী /হলদি নদীর সারেঙ / ভাসামানিকের ভালবাসা/ কামিনীকাঞ্চন / অদৃশ্য ভূমিকম্প / এখানে বিরাজি শুয়ে আছে / অগস্ত্যযাত্রা/ গঙ্গা একটি নদীর নাম।

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি এমন কয়েকটি উপন্যাস (অসম্পূর্ণ তালিকা)

এক সিংহ ও তার রমণী/ গভীর গোপনে (শারদীয় দীপবাণী পত্রিকা) / অকাল গোধূলি ('সাহিত্য প্রতিবেশ'। 'আলো নেই' উপন্যাসের বীজ)/ সেই বয়স/ সূর্যাস্তের আগে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

(১) 'কুবেরের বিষয় আশয়' যখন ছোটো একটি পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বেরোয় তখন নাম ছিল, গণেশের বিষয় আশয়, কেন্দ্রীয় চরিত্র গণেশ সাধুখাঁ। দেশ পত্রিকায় বেরোবার সময় উপন্যাস ও কেন্দ্রীয় চরিত্রের নাম বদল হয়।

(২) 'আড়িয়া হাফেজ' নামে একটি উপন্যাস, বেলুড়ের কারখানায় কর্মরত থাকার সময় তিনি লিখেছিলেন। উপন্যাসটি পরে হারিয়ে যায়।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের আত্মজীবনীমূলক লেখা (অসম্পূর্ণ তালিকা)

জীবন রহস্য (উপন্যাস) / সময় বড় বলবান (গদ্য) /এই জীবনের যত মধুর ভুলগুলি (অসমাপ্ত রচনা । বাংলাদেশের দৈনিক 'যুগান্তর')।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্যান্য গদ্য ও ব্যক্তিগত গদ্য (অসম্পূর্ণ তালিকা)

মনে কি পড়ে/কি খাব /কলকাতা সম্পর্কিত কয়েকটি গদ্য/ পুজোর ছবি/সংস্কৃত ভাষার কাছে আমার ঋণ /প্রেমেন্দ্র মিত্র (বিভাব)/ জীবনানন্দ স্মৃতি (প্রথম আলো - বাংলাদেশ)/ সুন্দর / বাজার সফর (আজকাল দৈনিক পত্রিকায় বহুদিন ধরে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত)।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কিশোর রচনা (অসম্পূর্ণ তালিকা)

মহাজাতক (উপন্যাস) / সোনার ঝাঁপি/ ক্লাস সেভেনের মিস্টার ব্লেক (উপন্যাস)/ ভাস্কো-দা-গামার ভাইপো (উপন্যাস) / সাধু কালাচাঁদ / সেনাপতি শঙ্কর (উপন্যাস। লেখক সংক্ষিপ্ত রূপ দিয়েছিলেন — শঙ্কর সেনাপতি) / কিশোর অমনিবাস (প্রথম পর্ব -'মহাজাতক' উপন্যাস। গল্পগুলির নাম - আবার কুরুক্ষেত্র, স্বল্প বাহিরদিয়া, ম্যাজিক লণ্ঠন, কাঁচা ওজন, কথক বিপুল। দ্বিতীয় পর্ব - সাধু কালাচাঁদ, সাধু কালাচাঁদের পালাকীর্তন, সাধু কালাচাঁদের নতুন কাজ, সাধু কালাচাঁদের ফিউচার, সাধু কালাচাঁদের ফলাও কারবার, সাধু কালাচাঁদের মেদিনীপুরাণ, সাধু কালাচাঁদের স্কুল ফাইনাল)।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের তালিকা (অসম্পূর্ণ তালিকা)

দে'জ পাবলিশিং (প্রকাশিত ১ম-৫ম খণ্ড)

১ম খণ্ড — দখল / উর্বরাশক্তি /পরী/তখন/ চন্দনেশ্বরের মাচান তলায় / একজন নিরাপদ ভীরুর কেচ্ছা / পারাপার/ সাক্ষী ডুমুর গাছ / তেওট তালে কনসার্ট / জীবন্ত বায়ুমান যন্ত্র/ আরোগ্যনিবাস / গতজন্মের রাস্তা / নিশীথে সুকুমার/ মাছের কাঁটার সফলতা / মানুষ হারায় কেন / কথাকোবিদ সনাতন হালদার।

২য় খণ্ড — বোকাডাক্তারের দুই রুগী/ যুদ্ধ / লক্ষ্মণ মিস্ত্রির জীবন ও সময় /হাজরা নম্বরের যাত্রাসঙ্গী / রাখাল কড়াই / কালকেপুরের রেলপুকুর / হরিয়ালদা / নৃপেনদের বাড়ি / পুরকায়েতের আনন্দ এবং বিষাদ /স্মৃতির চেয়েও ছোটো / নিজেদের শ্মশান /সুড়ঙ্গ/ লেভেল ক্রসিং /কন্দর্প/ অন্নপূর্ণা / ধানকেউটে / পরামর্শ/ কে আসেনি / পুরনো হিসেব/ তারাবাজি/ খরার পরে।

৩য় খণ্ড — তুষার হরিণী/ বৃহন্নলা / বিদ্যুৎচন্দ্র পাল সম্পর্কে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়/ কর্কটক্রান্তি/ শেষের দুই ঘোড়া / এক বন্ধু পড়ে আছে/ শশাঙ্কশেখরের জীবনের খুঁটিনাটি/ যারা অজ্ঞান করে/ টানাপোড়েন / ছায়া পূর্বগামিনী / স্বর্গে দুই পাপী / জীবনরহস্য/ রাজ রাজেশ্বর/ একজন সুদখোর বেকারের কাহিনী/ অজ্ঞাত অনুশাসন/প্রাতঃভ্রমণ/ ইয়ার্কি/ মেজবাবুর পেটি কেস / টেলিফোন।

৪র্থ খণ্ড— নিজেদের রেললাইন/উইপোকা/ ঘোড়ার মনমেজাজ/ চোরাস্রোত/মর্কটপুরাণ/ দুর্গাপুর হস্ট/ ভালবাসলে মেঘ হয়/ যৌবন-নিকুঞ্জে / বে -আব্রু/ টাকার বয়স / নখদর্পণ/ আত্মজা ও একটি অস্টিন ১৯২৯/ শিয়ালদা কেমন আছে?/ বেঁচে থাকার বিশেষ উপায়/ মানুষ হারায় কেন / সিমেন্টের আয়ু / শীর্ষ সম্মেলন / অপমানের স্বাদ/ জ্ঞান ও অজ্ঞান / পারিজাতের ইতিহাস ও ভূগোল / ঝিঝোঁটি দাদরা/ মানুষ কতদিন বাঁচতে পারে/ নেই।

৫ম খণ্ড — এক কাপ চা বইতো নয়/ আবার কুরুক্ষেত্র /অ্যানাটমি / বিলাসখানি / পাগলা ঘন্টি/ খুব অন্যায়/ বাসি পুরুষমানুষ / সিধু পালের হিমসাগর / পৃথিবীর ভার/ মৎস্যপুরাণ / সেই মাছটা/ অমৃতযোগ / শশাঙ্কর দোতলা / অনধিকারী / বোম্বে রোডের রাধা/ ঠাকুর ভরত সিংহের ব্যান্ডপার্টি /ভাসান / উত্তর কুরুক্ষেত্র / নবকান্তের আবিষ্কার / বিষয়আশয়, মেয়েমানুষ এবং রক্ত/ উপসংহার।

৬ষ্ঠ খণ্ড — যন্ত্রস্থ (এদের পরিকল্পনা আছে আরো কয়েকটি খণ্ড প্রকাশ করার।)

অন্যান্য যে গল্পগুলির সন্ধান পাওয়া গেছে (অসম্পূর্ণ তালিকা)

চেনা অচেনা/ বড় কুটুম্ব/ বৈতরণী পুরাণ/ গোবিন্দপুর কোথায় / অজগরী / স্নেহের জায়গাগুলি/ তবলাগলির কাফি / ধাত্রীগ্রামে সূর্যাস্ত / শিল্প দিদিমণি / জেল্লা/ অচেনা সঙ্গী / হাউস।

এছাড়া আরো অসংখ্য গল্প এই তালিকার বাইরে রয়ে গেল।

দ্রষ্টব্য : 'মহাকাল কেবিন' জীবনের প্রথমদিকে লেখা গল্প। ছাপা হয়েছিল 'তরুণের স্বপ্ন' পত্রিকায়। গল্পটি পরে হারিয়ে যায়।

বলা বাহুল্য এটি সম্পূর্ণ তালিকা নয়। রচনার কালানুক্রমও মানা যায়নি। আমরা শুধু কাজটা শুরু করলাম । ভবিষ্যতে গবেষক, যাঁরা সাহিত্যিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ওপর বিস্তারিত কাজ করবেন, তাঁদের জন্য এ তালিকাটি যদি আংশিক দিঙ্‌নির্দেশের কাজও করে, তবেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক।

তালিকা প্রণয়ন
অরিন্দম বসু
কিন্নর রায়

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি

জন্ম	:	১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ১১ চৈত্র/ ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ, খুলনায়
পড়াশোনা	:	খুলনা জেলা স্কুল/আশুতোষ কলেজের অনার্স গ্র্যাজুয়েট (বাংলা)/ যাদবপুরে খুব অল্পদিন তুলনামূলক সাহিত্য নিয়ে পড়েন।
চাকরি	:	প্রথমে বেলুড়ে ইস্পাত কারখানায়/ সাহাপুরে মথুরানাথ বিদ্যাপীঠে এক বছরের কিছু বেশি সময় শিক্ষকতা। তৎকালীন সহকর্মী বরেন গঙ্গোপাধ্যায় ও জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়/ ১৯৫৮-৭৬ আনন্দবাজার পত্রিকার সংবাদ বিভাগে/১৯৭৭-৯০ যুগান্তরের সাহিত্য বিভাগে। যুগান্তরে থাকাকালীন অমৃত সম্পাদনা/১৯৯১-আমৃত্যু আজকাল পত্রিকা।
বিবাহ	:	১৯৬০ সালের ২২ মে ইতি গঙ্গোপাধ্যায়কে/বড়োমেয়ে মল্লিকার জন্ম ১৯৬১ সালের ২ জুন/ ছোটোমেয়ে ললিতার জন্ম ১৯৬৫ সালের ২০ জুলাই।
প্রথম প্রকাশ	:	চর (গল্প) - অগ্রণী পত্রিকায় ১৯৫৩ সালে / বৃহন্নলা (উপন্যাস) - সরাসরি বই হয়ে ১৯৬১ সালে।
গ্রন্থসংখ্যা	:	৮০ টির কাছাকাছি।
পুরস্কার	:	আকাদেমি - ১৯৯৩ সালে / ভূয়ালকা পুরস্কার /শিরোমণি পুরস্কার / কথা পুরস্কার / মতিলাল পুরস্কার /বিভূতিভূষণ পুরস্কার / তারাশঙ্কর পুরস্কার / শরৎচন্দ্র পুরস্কার / গজেন্দ্রকুমার মিত্র পুরস্কার
মৃত্যু	:	২৪ সেপ্টেম্বর ২০০১ / ৮ আশ্বিন ১৪০৮

জ্যোৎস্না দেবী বিরচিত

তরু'র শ্বশুরবাড়ি

আলোকচিত্র : পরিমল গোস্বামী

আলোকচিত্র : পরিমল গোস্বামী

তরু'র শ্বশুরবাড়ি : পূর্বকথন

হিমানীশ গোস্বামী

রূপকথা ও রূপকথার শেষ

আমার মা জ্যোৎস্নার ডাকনাম ছিল পুন্টু। তাঁর ছিল সাত ভাই। আমাকে আমার এক বন্ধু প্রশ্ন করেছিলেন, আমার মায়ের নাম কেন চম্পা দেওয়া হয়নি, দিলে ভালো হত। রূপকথার সাত ভাই চম্পার কথা স্মরণ করেই বন্ধুর এই প্রশ্ন ছিল। কিন্তু সে-রকম কাহিনী তো কেবল রূপকথাতেই হয়, বাস্তবের পথ আলাদা। আমার মা ছিলেন দাদামশাইয়ের তৃতীয় সন্তান, সেই কারণেই মায়ের নাম চম্পা রাখা সম্ভব ছিল না, কেন না তাঁর পর যে আরও তাঁর চারটি ভাই এই পৃথিবীতে আসবেন সেটা জানার উপায় ছিল না। তবে মায়ের বাপের বাড়ি আমার কাছে ছোটোবেলায় ছিল সত্যি সত্যি রূপকথারই মতো উপভোগ্য এবং শিহরনীয়। সে শিহরনের অনেকটাই ছিল আনন্দের এবং নানা আমোদ এবং আহ্লাদে পরিপূর্ণ। কলকাতা থেকে প্রায় দুশো পনেরো কিলোমিটার দূরে তৎকালীন শেয়ালদহ-গোয়ালন্দ লাইনের ইস্ট-বেঙ্গল রেলওয়ের ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত পাংশা স্টেশনের কাছে চন্দনা নদীর প্রায় তীর ঘেঁসে ছিল আমার দাদামশাইদের বেশ বড় জায়গা-জমি। সেই জায়গা-জমি জুড়ে কয়েকটা বাড়িতে তাঁরা থাকতেন। সেখানে ছিল কাছারি ঘর, একটি মন্দির, মন্দিরের সামনে ছিল বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা, তারপরে দেয়াল-ঘেরা বসতবাড়ি। বসতবাড়িতে ঢুকতে হলে দুটো দরজা ব্যবহার করতে হত। কাছারি ঘরের পাশে একটা বড় ঘর ছিল, সেই ঘরের মধ্যে ছিল একটি ঘোড়ার গাড়ি — যেটা ছিল সম্পূর্ণ ভাঙা। আর ছিল দুটি পালকি — সে দুটোরও সেই একই দশা। এককালে দাদামশাইরা যথেষ্ট অবস্থাপন্ন ছিলেন, এগুলি তারই চিহ্ন। এই ঘরটি ছিল আমার নিজের কাছে দুপুরবেলার সবচেয়ে বড় আকর্ষণের জায়গা। আমি সেখানে রূপকথার জগতেরই যেন সন্ধান পেতাম। অনেকসময় আমার ছোটোমামা, যিনি ছিলেন আমার চাইতে বছর দুয়েকের বড়ো, এবং তাঁর উপরের মামা, যিনি ছিলেন ছোটোমামার চাইতে বছর দুয়েকের বড়ো — এঁদের সঙ্গে আমার নানারকম খেলা এবং আনন্দের নানাবিধ হুল্লোড় চলত। সেই ঘরটিতে পালকি ছিল কিন্তু বেহারা ছিল না, ঘোড়ার গাড়ি ছিল, কিন্তু ছিল না কোনও সহিস কিংবা ঘোড়াও। বলতে ভুলে গেছি, গ্রামের নাম ছিল কাল্‌কেপুর, ভালো করে বলতে হলে বলতে হয় কালিকাপুর। মন্দিরের পেছনে ছিল বড় একটা ফুল-ফলের বাগান। সেখানে কয়েকবার আনারস চাষ হতে দেখেছি! এই বাড়ি ছিল আমার ছুটির বাড়ি, অবসরের বাড়ি, রূপকথার বাড়ি। এই কাল্‌কেপুর থেকে আমাদের বাড়ির দূরত্ব ছিল সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার — কালুখালি রেলস্টেশনের কাছেই রতনদিয়া গ্রামে। ওই গ্রাম থেকে আমাদের দেশভাগের দশ-বছর আগে কলকাতার একটি ভাড়াবাড়িতে চলে আসতে হয় 'সাময়িক' ভাবে ১৯৩৭ সালের মাঝামাঝি। তারপর আর 'দ্যাশ' এর বাড়িতে যাওয়া হয়নি। বাবা এবং মা একেবারেই যাননি। চার ভাইবোনের মধ্যে আমি এবং দাদা শতদল দু-একবার গিয়েছি, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের আগে, তারপর আমি মাত্র একবার গিয়েছি ১৯৪৯ সালে এবং তখনই বুঝতে পেরেছিলাম ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট আমরা স্বাধীনতা পাইনি, হারিয়েছি। সেইদিন থেকে আমাদের একটা পরিচয় কপালে উলকি দিয়ে যেন লিখে দেওয়া হল — হিন্দু। তার আগে

হিন্দু ছিলাম এটা ভুলেই ছিলাম। কিন্তু সে-কথা এখন থাক। যে রূপকথা শেষ হয়ে গেছে সেটি স্মরণ করতেও কষ্ট হয়।

দাদামশাই যতীন্দ্রনাথ

মামাবাড়ির কথা আরও অবশ্য কিছু বলা দরকার। দাদামশাইয়ের নাম ছিল যতীন্দ্রনাথ বাগচী। চমৎকার দীর্ঘ সবল ব্যায়ামপুষ্ট চেহারা। দেখতাম তাঁর ছিল প্রবল একটা ব্যক্তিত্ব। দালানের একটা বড়ো ঘরে থাকতেন — তারপাশে আরও কয়েকটা ঘর থাকলেও সেগুলো বাড়িটি জীর্ণ হওয়ায় বাসের অযোগ্য ছিল। ফাটা ছাদ দিয়ে বর্ষায় জল পড়ত — মেরামত করার মতো অবস্থা ছিল না। তাঁর ঘরটাই কেবল বাসযোগ্য ছিল, কিংবা সেটাকেই বোধহয় মেরামত করা হত। ওই ঘরের একটা মজা ছিল — ঘর থেকেই দোতলার ছাদে ওঠা যেত সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে। ছাদটি ছিল বিশাল — তাতে নানারকম গাছ জন্মাত। বছরে দু-একবার সেগুলিকে সাফ করা হত। শুনেছিলাম কয়েকবছর আগেও ওই ছাদে প্রতিদিন সকালে একদল ময়ূর এসে বসত। আমার এক রসিক মামা বলতেন, ওরা রোজ এসে নাচ দেখিয়ে যেত! এমন চমৎকার কথা অবিশ্বাস করার কথা মনেই হত না। আমি যখন থেকে দাদামশাইকে দেখেছি তখন থেকেই তিনি স্ত্রী-হীন। দিদিমাকে আমি দেখিনি। তাঁর মৃত্যুর কথা মায়ের স্মৃতিকথায় লেখা আছে।

অন্যরকম জমিদার

যতীন্দ্রনাথ তবুও ছিলেন জমিদার। এককালে নানা গল্পে উপন্যাসে লেখা হত অত্যাচারী জমিদারদের কথা। আমি কিন্তু ঠিক উলটো ব্যাপারই দেখেছি যতীন্দ্রনাথের বেলায়। তিনি স্বভাবে কবি ছিলেন, প্রচুর কবিতা লিখতেন — সেগুলির মান কীরকম ছিল তা আমার পক্ষে বলা কঠিন। শুনেছিলাম তিনি রবীন্দ্রনাথকে তাঁর লেখা কবিতা পাঠিয়েছিলেন। শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ গেলে তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন বলে চিঠিও পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু খুব সম্ভবত তিনি রবীন্দ্রনাথের সম্মতিপত্র পাননি। যতীন্দ্রনাথের কবিতা ছাপা হত বিয়ের উপহারে, কোনও মান্যগণ্য সরকারি ব্যক্তিদের সংবর্ধনা কিংবা বিদায় উপলক্ষে। যাই হোক কবি হিসেবে তিনি গ্রামে ও জেলায় পরিচিত ছিলেন, কিন্তু জমিদার হিসেবে তাঁর প্রতাপ দোর্দণ্ড ছিল না। খাজনা না দেওয়ার নানা অজুহাত তাঁর প্রজারা খুঁজে বার করত। চমৎকার জাদুবিদ্যা জানতেন কিন্তু সেটা থেকে কখনও কিছু আয়ের চেষ্টা করেননি। এর সঙ্গে আরও একটি ঘটনা দাদামশাইয়ের আর্থিক অবস্থাকে শোচনীয় করে তুলেছিল। একবার ডাকাতরা এসে সিন্দুক ভেঙে অনেক মোহর আর গয়না নিয়ে পালিয়েছিল। তাঁর কৃতিত্ব এই ছিল যে তিনি সাহসের সঙ্গে গুলি চালিয়ে একজন ডাকাতকে মেরে ফেলেছিলেন, আর দু-জনকে করেছিলেন আহত। পালাবার সময় ডাকাতেরা কিছু মোহর আর গয়না রাস্তায় ফেলে গিয়েছিল। ভোর হলে গ্রামের দরিদ্র লোকেরা সেগুলি দাদামশাইকে পৌঁছে দেয়। যাই হোক জমিদারির কাল শেষ হতে চলেছে অথচ শিক্ষিত হয়েও প্রচুর বেকার — ধারেকাছে কোনও শিল্প নেই, উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা নেই, সেই কারণে গ্রামের মধ্যবিত্তদের অনেকেই সে যুগে — প্রায় এখনকার মতোই — শহরমুখো হয়েছিলেন। তাই ধীরে ধীরে কাল্‌কেপুরের সাত মামা — উপেন্দ্রনাথ,

জ্ঞানেন্দ্রনাথ, নৃপেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ও মণীন্দ্রনাথ — প্রত্যেকেই কাল্‌কেপুর ছেড়ে নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়লেন। ১৯৪৭ এর আগেই কাল্‌কেপুরের মামাবাড়ি ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। একেবারে ফাঁকা হয় যখন দাদামশাই চলে যান উত্তরবঙ্গের হিলা চা বাগানে, যেখানে তাঁর বড় ছেলে উপেন্দ্রনাথের জামাতা দুর্গাদাস ভট্টাচার্য কাজ করতেন।

রূপকথার শেষ

পুরোনো কথা সহজে শেষ হয় না। তবু সময় এবং লেখার আকার কমিয়ে রাখার জন্য কোথাও না কোথাও বিরতি টানতেই হয়। তাই মামাবাড়ির কথা, অর্থাৎ আমার ছোটোবেলার রূপকথার বাড়ির কথা — যেটি ছিল আমার মায়েরই বাড়ি — এখানেই থামাতে হচ্ছে। এবার বলা যাক আমার মায়ের অর্থাৎ জ্যোৎস্নাদেবীর শ্বশুরবাড়ির কথা — যে বাড়ির অভিজ্ঞতা নিয়ে মা কলকাতার 'বাসা'য় থাকাকালীন কিছু কিছু অবসর সময়ে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের দিকে 'তরু'কে প্রধান চরিত্র করে একটি লেখা শুরু করেছিলেন, কিন্তু শেষ করেননি। তিনি লেখিকা বলতে যা বোঝায় তা ছিলেন না। কখনও হওয়ার কথাও মনে হয়নি। এটি তিনি নিজের জন্যই লিখেছিলেন। হয়তো ভেবেছিলেন পরে কোনও এক সময়ে এটি পড়ে তাঁর পুরোনো কথাগুলো মনে পড়বে, অথবা হয়তো এটাও ভেবেছিলেন তিনি আমাদের পড়ে শোনাবেন। যাই হোক, লেখাটি তিনি আমাদের বাড়ির অনেক বই, অনেক খাতাপত্রের মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন। ১৯৫৭ সালে তাঁর প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সে মৃত্যুর পর এটি আবিষ্কৃত হয়। এটি তারপর পড়েই থাকে, মাঝে মাঝে খাতাপত্রের মধ্যে হারিয়ে যেত, আবার মাঝে মাঝে পাওয়া যেত। সম্প্রতি ১৯৯৭ সালে আমাদের সিঁথির বাড়িটিকে ছেড়ে আসার সময় যে-সব কাগজপত্র শেষপর্যন্ত আমার ক্ষুদ্র পরিসর ফ্ল্যাটে এসে পৌঁছয় তার মধ্যে এটিকে পুনরায় আবিষ্কার করি। আমার মনে হয় এটি আমার মায়ের ব্যক্তিগত লেখা হলেও তাঁর মৃত্যুর প্রায় সাড়ে চার-দশক পর এটিকে বাংলার পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। শাশুড়ি দ্বারা বহু অসহায় বধূর প্রতি অত্যাচারের অনেক কাহিনী লেখা হয়েছে কিন্তু বধূর নিজস্ব দৃষ্টিতে দেখা এবং নিজস্ব কলমে লেখা আর কোনও আখ্যান আছে কিনা তা আমার জানা নেই। এটিকে প্রকাশ করার জন্য আমি দু'টি কাগজে যোগাযোগ করেছিলাম। একটি কাগজ থেকে মাস-চারেক পর এটিকে ফেরত পাঠানো হয়। অন্য একটি কাগজ, এটি ছাপবার কথা বলতেই, আমাকে জানানো হয় যে তাঁদের এ ব্যাপারে আগ্রহ নেই। শেষে সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, আমার পুরোনো বন্ধু, তাঁর 'বিভাব' নামক অতি মর্যাদাপূর্ণ কাগজের জন্য এটিকে চেয়ে নেন। এ-জন্য আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।

আমাদের রতনদিয়ার বাড়ি

আমার মায়ের শ্বশুরবাড়ি রতনদিয়ায়। কাল্‌কেপুর থেকে আনুমানিক সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার দূর। এখানে আমার ঠাকুর্দা বিহারীলাল 'অস্থায়ী'ভাবে এসে নিজের শ্বশুরবাড়ির লাগোয়া একটি বিশাল জমির একপ্রান্তে কালুখালি-গোয়ালন্দ রেলপথের পঞ্চাশ মিটারের মধ্যে কোনওভাবে থাকবার মতো কয়েকটি কাঁচা ঘর তোলেন। চারটি আলাদা আলাদা ঘর, তার সঙ্গে আরও দুটি ঘর, রান্না এবং খাওয়ার একটি ঘর, আর কিছু দূরে ঢেঁকিঘর। বড়ো বড়ো

দু'টো উঠোন। বাড়িতে জলের জন্য ছিল কুয়ো, চমৎকার জল পাওয়া গেলেও আট-দশ মিনিট হাঁটা দূরত্বের চন্দনা নদীতে আমার মাকে রোজই জল আনতে পাঠানো হত। মায়ের বিয়ে হয় ১৯১৯ সালে, বাবা পরিমল গোস্বামী তাঁর 'স্মৃতিচিত্রণে' এইভাবে প্রকাশ করেন তাঁর বিবাহের কথা — '১৯১৯ সনে আমার সঙ্গে পাংশা-কালিকাপুরের যতীন্দ্রনাথ বাগচীর কন্যা শ্রীমতী জ্যোৎস্নার বিয়ে হয়। অভিভাবক-নির্দিষ্ট বিবাহ। বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে এতে পণ বা কোনোরকম দান গ্রহণ করা হয়নি — বিবাহের যাবতীয় খরচ বাবা বহন করেছিলেন।'

ঠাকুর্দা বিহারীলাল ছিলেন উদার মনের লোক। তিনি ছিলেন সত্যিকারের শিক্ষিত। কয়েকটি ভাষা তিনি জানতেন। পারস্য ভাষায় ছিল তাঁর যথেষ্ট দখল — তিনি শেখ সাদি-র পন্দনামা বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। এ-ছাড়া ভগবদ্গীতা এবং কালিদাসের মেঘদূতও অনুবাদ করেছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের সুপরিচিত ছিলেন, এবং তাঁর সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে বিহারী-লালের রচনা প্রকাশিত হত। এখানে রবীন্দ্রনাথের, বিহারীলালকে লেখা একটি চিঠির একটু অংশ তুলে দিতে ইচ্ছে করছে। আমাদের জানা আছে রবীন্দ্রনাথ অন্তত পাঁচখানি চিঠি বিহারীলালকে লিখেছিলেন। একটি চিঠির অংশ এই — '...ছন্দ ও ভাষার কারুনৈপুণ্যে পূর্ণ আপনার কুমারসম্ভবের অনুবাদে আমি হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করি না। আপনি যে দুঃসাধ্য কাজে আশ্চর্য্য সফলতা লাভ করিয়াছেন তাহা আমাদের কাহারও দ্বারা সম্ভব হইতে পারে বলিয়া আমি মনে করি না অতএব ইহার শোধনচেষ্টা করিতে গেলে ইহাতে বিকৃতি ঘটাইবার আশঙ্কা আছে।...' (চিঠি লিখছেন জোড়াসাঁকো থেকে, বিহারীলালের পোতাজিয়ার ঠিকানায় — যেখানে তিনি সরকারি হাইস্কুলের প্রধান-শিক্ষক ছিলেন। চিঠির তারিখ — ১লা ভাদ্র ১৩১৬ সাল, অর্থাৎ ইংরেজি ১৯০৯ সন।)

বিহারীলাল চিত্র-অঙ্কনে সুপটু ছিলেন। ছন্দ সম্পর্কে ছিল তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান। সংগীতচর্চা প্রসঙ্গে জানা যায় তিনি এসরাজ-বাদনে সুদক্ষ ছিলেন। পোতাজিয়া থেকে রতনদিয়ার দূরত্ব ছিল বেশ খানিকটা, সম্ভবত চল্লিশ কিলোমিটারেরও বেশি। পদ্মার ওপারে পাবনা জেলার সাতবেড়ে গ্রামে ছিল আমাদের আদি পুরুষদের বাড়ি।

পদ্মার প্রমত্ততা

আমাদের বাড়ি পদ্মার প্রমত্ত ব্যবহারে তলিয়ে যাওয়ার আশংকায় গত শতাব্দীর প্রথমদিকে হঠাৎই রতনদিয়ায় চলে আসতে হয়। নতুন জায়গায় এসে নতুন করে ঘরবাড়ি তৈরি করার জন্য প্রচুর খরচ এবং অন্যান্য অসুবিধেরও সৃষ্টি হয়। কিন্তু সবচেয়ে অদ্ভুত কথা এই, যে পদ্মার উন্মত্ততার ভয়ে সপরিবারে পালিয়ে আসা, সেই পদ্মা শেষপর্যন্ত আমাদের বাড়িটিকে ভাঙতে পারেনি — তিনি আমাদের বসতবাড়িটিকে অক্ষত রেখেছিলেন! তবু সে বাড়িতে আর ফিরে যাওয়া হয়নি।

ঠাকুরদা যখন বাড়িতে

বিহারীলাল প্রতি সপ্তাহে শনিবার গভীর রাত্রে রতনদিয়ায় আসতেন। আসতে এবং যেতে তাঁকে, শুনেছি ষাট কিলোমিটারের বেশি পথ হাঁটতে হত। ছুটির দিনটা রতনদিয়ায় কাটিয়ে ফের ভোরে রতনদিয়া ছেড়ে চলে যেতেন। ঠাকুরদা যখন বাড়িতে থাকতেন তখন

ঠাকুমা বেশ শান্তভাবেই থাকতেন, বউমার উপর নানারকম সোহাগও দেখাতেন, ফলে বউমার উপর যে সব কঠোরতা অন্যসময়ে চালু থাকত সেগুলোর কিছুই দৃশ্যমান হত না। বউমাও কারও কাছে নালিশ জানাতেন না। এই বউমার ছিল সহ্য করার অসাধারণ ক্ষমতা, যিনি প্রায় নীরবেই সমস্ত রকম বাক্যবাণ হজম করতেন।

রতনদিয়ার অনেক শিক্ষিত পরিবারেই এই দৃশ্য দেখা যেত। পুরুষেরা কাজের বা শিক্ষার জন্য গ্রামে থাকতেন কম — ফলে অনেক শিক্ষিত পরিবারেই কর্তৃত্ব এসে যেত নারীদের উপর। সেইসব নারীরা, যাঁদের পুত্রবধূ থাকত, তাঁরা কর্তৃত্ব করতেন প্রায় নিরঙ্কুশভাবে। এমনকী এটাও দেখেছি এবং শুনেছি, আমাদের গ্রামে বধূর উপর কোন শাশুড়ি কতখানি কর্তৃত্ব ফলাতে পারেন তা নিয়ে বেশ একটা প্রতিযোগিতাও চলত। অনেক বাড়িতেই সে আমলে এক বা একাধিক বিধবা ননদও থাকতেন, তাতে বধূদের কষ্ট অনেকক্ষেত্রেই বাড়ত। তবে গ্রীষ্মের বা পুজোর ছুটিতে পুরুষেরা গ্রামের বাড়িতে এলে বধূরা খুব খুশি হতেন, কেন না সে-সময় অনর্থক কোনও কাজ করতে হত না তাঁদের আর বাক্যবাণও অন্তর্হিত হত। ওই আমলে বিধবা হবার পর মেয়েদের শ্বশুরবাড়িতে স্থান প্রায়ই হত না। ওঁরাও বাড়িতে আসা বধূদের প্রতি সর্বদা প্রসন্ন থাকতেন না। আগেই বলেছি প্রধানত শিক্ষিত পরিবারেই নারীতান্ত্রিক শাসন চালু ছিল — অশিক্ষিতদের বাড়িতে মনে হয় বধূদের অবস্থা কিছুটা ভালো ছিল, কিন্তু এটা আমার ভুলও হতে পারে। বহু বাড়িতেই কাজের লোক, বা তৎকালীন ভাষায় ঝি বা চাকর রাখা হত না। আমাদের বাড়িতেও সে ব্যবস্থা ছিল না এটাই আমি দেখেছি।

অসচ্ছলতা

আমাদের অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল বলা যায় না। আমি ১৯১৯ সালের কথা জানি না, সে-সময়ে অবস্থা খারাপ থাকার কথা নয়, ঠাকুরদা সরকারি স্কুলের হেড-মাস্টার হিসাবে তৎকালীন মধ্যবিত্তদের তুলনায় ভালো বেতনই পেতেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর (১৯৩০) পর আমাদের অবস্থা অনেকটাই খারাপ হয়ে পড়ে। আগে যে অবস্থা ভালো ছিল তাঁর প্রমাণ আমাদের বাড়িতে আলমারি ভরতি ভরতি বই ছিল, ছিল একটা চোঙা-গ্রামোফোন, কয়েকশ' রেকর্ড, বড় একটা দেয়ালে টাঙানো পেন্ডুলাম ঘড়ি — তার উপর লেখা ছিল শেঠ-টমাস। ঘড়িটা চলত না, গ্রামোফোনের কল খারাপ ছিল তাই রেকর্ডগুলো নিয়ে আমরা রাস্তায় চাকা-চালিয়ে সেগুলোকেনষ্ট করেছি। প্রচুর বই ছিল, কিন্তু সেগুলো পড়ার সাধ্য আমার ছিল না— সেগুলোর বেশিরভাগই ছিল ইংরেজি ভাষায়। অনেক মাসিকপত্র বা সাপ্তাহিকপত্র এলোমেলোভাবে পড়ে থাকত। পড়ার টেবিল ছিল না, কাছারি-ঘর বা বারবাড়িতে একটা টেবিল ছিল, ছিল গোটা তিনেক চেয়ার। বারবাড়িতে দুটো বেঞ্চ ছিল। দাদার বা আমার জুতো ছিল না, দু'বছরে একবার খুব শস্তা — দশ আনা জোড়ার সাদা কাপড়ের ফিতে বাঁধা জুতো কেনা হত। সেগুলো পরে গাছে ওঠা যেত না, কাদায় চলা যেত না, জলে ঝাঁপ দেওয়া চলত না — সে-সব কারণে প্রথম দু-চারদিন পর সেগুলো খাটের তলায় ফেলে রাখা হত। স্কুলেও অন্য প্রায় সকলের মতোই খালি পায়ে যেতাম। কাকা লহরীলাল বাইরে পড়তেন, তাই তাঁর জুতো ছিল।

এবারে দেখছি নিজের কথাই বেশি বলে ফেলছি — দোষটা বোধহয় বয়সের। বয়সের

যখন গুণ নেই তখন এটাই স্বাভাবিক, পাঠকেরা দয়া করে ক্ষমা করবেন, এই প্রার্থনা।

মায়ের কথা মা নিজেই কিছুটা বলে গেছেন, হয়তো ইচ্ছে ছিল আরও লিখবার। এটি মায়ের বিয়ের প্রথম কয়েকবছরের স্মৃতির উপর ভিত্তি করে লেখা। এই লেখাটির ওপর মন্তব্য করে কিছু বলতে চাই না। পাঠকেরা এই রচনাটি পড়লে নিজেরাই অনেকটা বুঝে নিতে পারবেন আশা করি। সবসময়ে মনে রাখতে হবে যে রচনাটি প্রকাশ করার জন্য লেখা হয়নি, হয়তো লিখতে ভালো লেগেছিল। তাঁর জীবদ্দশায় এটি আর কেউ বোধহয় পড়েননি। এই প্রসঙ্গে বলি, মায়ের জুতো বা চটি কিছুই ছিল না — গ্রামের মেয়েরা ও বস্তু থেকে ছিলেন বঞ্চিত।

আমাদের বাড়িতে দু-জন পিসিমা ছিলেন, একজন স্বামীহীন — তিনি (সরলা) নিজের জীবন গড়ে নিয়েছিলেন, আমি তাঁকে রতনদিয়ায় বেশি দেখিনি। আর ছোটোপিসি মঞ্জু আচার্য ছিলেন আমার মায়ের এবং সকলের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন। অত্যন্ত নরম স্বভাবের এই পিসিমা পরে কলকাতার গুরুদাস কলেজে ইংরেজি পড়াতেন। এঁরা থাকলে মায়ের কষ্ট অনেকটা লাঘব হত। কিন্তু এঁরাও রতনদিয়ায় কমই থাকতেন। মায়ের একজন সমব্যথী ছিলেন, মায়েরই সম্পর্কিত বোন বনলতা চক্রবর্তী। তাঁর সঙ্গে চলত মায়ের সুখ দুঃখের নানা কথা। তাঁর পুত্র নির্মল ছিল আমার বাল্যবন্ধু — সে সম্পর্ক এখনও ছেদ হয়নি। সুখে দুঃখে সর্বদাই নির্মলের মায়ের স্নেহের সঙ্গে আমার মায়ের স্নেহ পেয়েছিলাম বলেই বোধহয় আমরা দুঃখটা অনেকটাই ভুলে থাকতে পারতাম।

আজ বৃদ্ধবয়সে মায়ের এই লেখাটি প্রকাশ করতে পেরে আমি যথার্থই ভাগ্যবান বলে মনে করি নিজেকে।

তরু'র শ্বশুরবাড়ি

জ্যোৎস্না দেবী

তরুর যখন বিয়ে হল তখন তার বয়স মাত্র ১৩ কি ১৪ বছর। সে যখন শ্বশুর বাড়ী চলে গেল তখন তার সমস্ত স্বাধীনতা ছেড়ে বন্দী এবং অসহায় মনে হল। বাড়ীতে মা বাবা এবং সাত ভাই, বোন সে একা, তাই জন্য তার আদর ছেলেদের চাইতে অনেক বেশী ছিল। তরু কখনও এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেত কিনা সন্দেহ। যখন তার ঠাকুমা, পিসিমা বেঁচে ছিল তখনকার কথা। তার পর তাঁরা মারা গেলে, মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ছোটখাটো অল্প সল্প কিছু কিছু করতে হোত, সে কাজে বাধ্য বাধকতা ছিল না। নুতন সংসারে পা দিয়েই তরুর মনে হতে লাগল যে বাপের বাড়ী থেকে মাত্র কয়েক মাইল তফাৎ, অথচ এদের কথা এবং ব্যবহারে কতখানি পার্থক্য। কিছুতেই তরু বুঝতে পারে না কেন এমন হয়। নুতন নুতন ৩/৪ মাস তবুও বিশেষ বুঝ্‌তে পারে নাই, বিয়ে উপলক্ষে আত্মীয় কুটুম্ব যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা সবাই যখন চলে গেলেন, অবশ্য একদিনে নয়, তার পর তরুকে নিয়ে শাশুড়ী ভবানী উঠে পড়ে লেগে গেলেন। তরুর কোন কাজ তাঁর পছন্দ হত না। প্রত্যেকটা কাজে তার ভুল চুক ধরে লোকের সামনে অপদস্থ করাই ভবাণীর প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ালো। বিয়ের পরে তরু শুনিয়াছিল যে শাশুড়ী রুগ্ন। তার যেন কোন কাজ না করতে হয়। ভবাণী অপারগ বলেই ছেলেকে বিয়ে দিয়েছেন। ভবাণীর অসুখ বাত এবং অম্বল, কিছু হজম হয় না আর বাতের জন্য সমস্ত গাঁঠে গাঁঠে ব্যথা। (অবশ্য মাঝে মাঝে ব্যথা হয়।) সকাল থেকে রাত ১২টা কিম্বা তারও বেশী তরুকে সমানে কাজ করতে হত, কোন কাজ তাঁর মনের মত হচ্ছে না এই কল্পনা করে কিছুটা — কিছুটা আবার বৌয়ের হাত থেকে কাজ কেড়ে নিয়ে নিজে করা সঙ্গে অবশ্য মুখোরোচক গাল। সেই গাল প্রথমে তরু সহ্য করতে পারত না, নিরবে কাঁদত, পরে যখন গালের মাত্রা বাড়লো তখন তরুরও অনেকখানি সহ্য হয়ে গেল।

তরুর পিসিমার একটি স্কুল ছিল, অনেকগুলি মেয়ে সেখানে পড়িত। প্রায়ই ঐ স্কুলে মেমসাহেব আসিত এবং খেলাধুলা প্রাইজ বিতরণ সব কিছুর ব্যবস্থা ছিল, স্কুলটা তরুদের বাড়ীতেই বাইরের ঘরে বসিত। পিসিমার উদ্দেশ্য ছিল মেয়েদের কিছুটা লেখা পড়া কিছু বোনা কিছু সেলাই ইত্যাদি শেখাতে পারলে অনেক উন্নতি করতে পারবে, কিন্তু অনেক মেয়েরাই স্কুল ফাঁকি দিত। কেবল মেম সাহেব যেদিন আসত সেদিন ছাত্রীরা ছাড়াও অনেক মেয়ে আস্‌ত। মেমসাহেব এলে বাতাসের সঙ্গে যেন খবর প্রচার হয়ে যেত। মেমের সঙ্গে ছাত্রীরা গান করত। মিস ইয়েল কিং বেশ ভাল না হইলেও বাংলা বলতে বা লিখতে পারত। তাই জন্য মেয়েরা তার কথা শুনবার এবং আবার কবে আসবে এটা নিজে কানে শুনবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ত। তরুর বিয়ের পর তার শ্বশুর বাড়ী ২ জন মেম গিয়েছিল বেড়াতে। সেখানে মেম দেখবার জন্য পাড়ার অনেক মেয়ে বৌরা এসেছিল। বাধ্য হয়ে মেমের সঙ্গে গান করেছিল তরু। এখনও তার মনে আছে দু এক লাইন

যীশু তোমা ছাড়ি আমি কোথা যাব,
হেন গুণনিধি আর কোথা পাব।

আর একটি গানেরও দু এক লাইন তার মনে পড়ে —

যীশু বিনে কেহ নাই এই সংসারে
এই মহা পাপের ভার কে উদ্ধার করে।

সেদিন তার দিকে তাকিয়ে সবাই বলেছিল মেমের কাছে পড়া মেয়ে তাই জন্য গান গাইতে লজ্জা পায় না। এই কথা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল মেমের সঙ্গে গান করেছে, ঘোমটা প্রায় ছিলই না মেমের স্কুলে পড়লে যা হয় আর কি। ইয়েল কিং যখন বার বার গানের জন্য বলছিল, তখন তরু চট করে মুখ তুলে একবার ভবানীর দিকে তাকালে ভবানী মুখ নেড়ে বললেন গাও। অত করে বলতে ভবানীরও মন হয়ত গলেছিল, তাই আওয়াজ কিছু হলো না তবে ইংগিতে মত দিলেন। মেমসাহেবরা যখন চলে গেলো তখন বলেছিল সম্ভব হলে আবার এসে দেখা করবে কিন্তু তারা আর আসে নাই। মেমের ছাত্রী হিসাবে তরুকে অনেক কথা শুনতে হয়েছে। অনেকে ভবানীকে বলত বৌ কেমন হল? ভবানী ঝংকার দিয়ে বলতে আরম্ভ করতেন বৌয়ের গায়ের রংই ফরসা তা ছাড়া কাজকর্ম মা বাপে শিখায় নাই। প্রতিবেশীরা মাঝে মাঝে ভবানীকে বলেছে এখন আপনি ওর বাপ মা, শিখাইয়া নিন, অল্প বয়স আছে যে পথে নেবেন সেই পথেই যাবে। এ কথায় ভবানী তাদের উপর চটিয়া যেতেন এবং বলতেন যা হবার নয় তা দেখলেই বোঝা যায়। ও নিয়ে যারা ঘর করবে তারা ভুগবে। আমার কি, আজ আছি কাল নাই। মানুষের রুপ দেখে যারা ভুলেছে তাদের তো আর আমার মত ভুগতে হয় না। এইখানে উল্যেক্ষ (উল্লেখ) করা যেতে পারে যে তরুকে তার শ্বশুর পচ্ছন্দ করে একে বারে পাকা পাকি বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন — তাই জন্য তাঁকে অনেক সময় জঘন্য গালা-গাল শুনতে হতো। কোথায় নাকি একটি মেয়ে ছিল তার রং একটু ময়লা কিন্তু পাঁচ হাজার নগদ এবং দান সামগ্রী প্রচুর পাওয়া যেত। আর এখানে কিছু নগদ নেন নাই তবে দান সামগ্রী তরুর বাবা বেশ ভালই দিয়েছিলেন। তরুর শ্বশুর কিছুই চান নাই, শুধু শাঁখা শাড়ি দিয়ে বিয়ে দিতে বলেছিলেন তরুর বাবাকে। তরুর বাবা তার এক মাত্র মেয়েকে বিয়ে দেবেন তাকি আর কিছু না দিয়ে পারেন? যে সব জিনিষ দিয়ে ছিলেন তরুর বাবা সেইসব জিনিস নিয়ে তরুর শ্বাশুড়ী নানা রকম খুঁত বের করতে লাগলেন। গ্লাসটা ভরনের, মোটেই কাঁসার নয় থালাগুলো কাঁসারই তবে উজ্জল নয় কলসিটা আছে কোন রকম।

গহনা ও তেমন ভাল না, আজকাল কত ভাল ভাল ডিজাইন পাওয়া যায়। খাট খানা দেখতেই বড় ইত্যাদি ইত্যাদি শুনে শুনে তরুর লজ্জায় মাথা কাটা যেত, তরু ভাবত তার বাবা তাকে কিছুই ভাল জিনিষ দেন নাই, ভাল হলে সবাই বাবাকে প্রসংসা করত। কেন যে বাবা তাকে এত জিনিস দিতে গেলেন, অথচ কারো পছন্দ হল না। তরুর ছোট দুই ননদ ছিল, বড় জনের নাম বিনু, ছোট জনের নাম মিনু। বিনু তরুর চাইতে এক বছরের বড়। মিনু অতি ছোট বছর ৪ হবে, এক দেবর তার বয়স ৯-১০। পরিবারটা খুব বড় নয় কিন্তু কাজ এত বেশী যে তরুর প্রাণের উপর উঠত। সে কিছুতেই পেরে উঠত না। বিয়ের দিন সে শুনেছিল সংসার আজ থেকে তারই এখন দেখে শুনে, বুঝে সুঝে সংসার কর। এখন তরুর হাতে সংসার, সব কাজের ভিতরেই তরু, অথচ প্রত্যেক বিষয় ভবানীর কাছে শুনে, কিম্বা দেখিয়ে করতে হবে। তরু বলছে মা আজ কিসের ডাল রান্না করব? ভবানী বললেন তোমাদের যা ইচ্ছা তাই কর, রোজ রোজ বলা যায় না, বুদ্ধি করে যা হয় রাঁধো। তরু বল্ল আধ সের নেব— না—এক পো? ভবানী বলিলেন বাজারে মাছ পাওয়া যাবে কিনা কে জানে আধ সেরই নেও। তরু তার ইচ্ছা মত মটরের ডাল নিয়েছে। খাওয়ার কিছু আগে ভবানী বললেন আজ

কিসের ডাল? তরু বল্ল মটরের। ভবানী বললেন যা ভেবেছি ঠিক তাই। ঐ ডালগুলো আমি কত কষ্টে জমাচ্ছি। সেকি জান না— আরও তো অন্য ডাল ছিল সেগুলো কি চোখে পড়ে না? সেগুলো সিদ্ধ হয় না বলে কি ফেলে দেবে? ছেলে মেয়েরা যখন বাড়ী আসবে তাদের জন্য এখন থেকেই কিছু কিছু না রাখলে তখন কোথায় পাব। এক ছেলে এবং এক মেয়ে। বিদেশে পড়াশুনা করে তাদের জন্য ঘি আমসত্ত্ব আচার ডালের বড়ি, মুড়ি, চিঁড়ে আতপ চাল মুড়কি নাড়ু ইত্যাদি ঘরে করা হোত।

বিনু আর তার দাদা সমর। প্রায় মাস আড়াই পরে বাড়ী আসবে পুজোর ছুটিতে, তার আগে তরুর কত কাজ। চিড়ে কুটতে হবে ধান ভানতে হবে খৈ ভাজতে হবে মোয়া মুড়কি নাড়ু আরও কত কি করতে হবে। গ্রামে পুজো হয় যাদের বাড়ী তাদের বাড়ীতেও অত তোড়জোড় হয় না যতখানি ভবানীদের বাড়ীতে হয়। তরুর শ্বশুর বিনয় বাবু এবং সমর তাঁরা কতগুলি কাজ অন্যকে দিয়ে করানোর জন্য বার বার ভবানীকে বলেছেন। যেমন দেয়াল নিকানো, কাপড় কাচা, ধান ভানা ইত্যাদি। ভবানী কখনও সে কথার কোন উত্তর দেন না, শুধু বলেন কিইবা কাজ, এর জন্য আবার লোকের দরকার কি? তরু শুনেছে সে আসবার আগে অন্য লোক দিয়ে কাজ করানো হতো। ধান না কিনে চাল এবং কড়াই না কিনে ডাল কেনা হোত। বিনয়বাবুর কিছু ধানের জমি ছিল, যা ধান পাওয়া যেত সেগুলি যারা ধান ভেনে খায় তাদের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে ভেনে নিতেন তাদের মুজুরী দিতেন। সেই চালে ৩।৪ মাস চলে গিয়েও বছরে চিঁড়ে মুড়ি খৈয়ের জন্য ধান ঘরে থাকতো। তরু আসবার পর ধান কেনা আরম্ভ হয়েছিল। ভবানী বলতেন ঘরের তৈরী চাল যেমন মিষ্টি তেমন কি আর বাজারের। সুতরাং আরও ৮ মাস যোগ হলো। ঘুম থেকে উঠিয়ে দিতেন ভবানী, প্রায় রাত্র থাকতে। তরুর ঘুম চট করে ভাঙ্গে না, ডেকে ডেকে ভবানী গাল দিতে আরম্ভ করে দিতেন। ঘুম থেকে উঠেই শুনতে হতো আজকেই সমরকে লিখে দাও ঝি চাকর, রাঁধবার জন্য লোক রাখতে। আমি অপারগ বলে এ বাড়ীতে যে আসবে তারই কি আমার মত হবে? আর যদি হয়েই থাকে তাহলে ব্যবস্থা করতে লেখোনা কেন, রোজই তো এখানে ওখানে চিঠি যাচ্ছে। কার সংসারের কাজ করে কৃতার্থ করছ? নিজেরই কাজ নিজে করছ সকালে না উঠলে শেষ পর্য্যন্ত তো কোন কাজই হয় না দেখি। এই পাপ যে কত কাল ভোগ করব তার আর সীমা সংখ্যা নাই ইত্যাদি। তরুরও এমন অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল যে গালের আওয়াজ কানে না যাওয়া পর্য্যন্ত তার মনেই হতো না যে সকাল হয়েছে। এমনি প্রতিদিন চলতো ভোরে উঠে গোবর ছড়া দিয়ে তার পর ৪।৫ খানা ঘর ঝাঁট দিয়ে প্রকাণ্ড উঠোন ঝাট দেওয়া, তাও একটু খানি জায়গা বাদ না পড়ে। লেবু গাছের তলায় শুক্‌নো পাতা, আমের পাতা জামের পাতা উঠোনের চার পাশেই ঘর এবং ঘরের পিছনে আম কাঁঠাল বেল ইত্যাদির গাছ। সারা দিন রাত্রে পাতা পড়ে পড়ে যা অবস্থা হতো সে দেখলে মনে হয় না যে এ বাড়ীতে মানুষ বাস করে। ঝাঁটা নিয়ে তরু জায়গায় জায়গায় পাতা জড় করে রাখে, কাঠের অভাবের জন্য, সে গুলি দিয়ে কাঠের সঙ্গে জ্বালানো হত। সেই প্রকাণ্ড উঠোন ঝাঁট দিতে গিয়ে তরু অনেক বার দাঁড়িয়ে একটু খানি বিশ্রাম না করে পারত না। তার পরে ঘর নিকানো বাসন মাজা, দেওর দুলাল গ্রামের স্কুলে পড়ে, তার জন্য সকালে ভাত কড়াতে করে চড়িয়ে যখন দেয় তখন ভবানী এসে জ্বাল দিতে থাকেন, তরু তখন ঘুঁটে দিতে যায়। বাগানের পাশে তক্তা পাতা আছে সেখানে, গোবর সংগ্রহ এ বাড়ী ও বাড়ী থেকে বালতি করে এনে দিতেন ভবানী। দুলাল দুপুরে টিফিনের সময় আবার ভাত খেয়ে যেতো। সকালে তরু এবং মিনুও ভাত খেতো। মিনুর মাষ্টার ছিল দুপুরে পড়াতে আসতেন।

তরুর ঘর নিকানো হয়ে গেছে এমন সময় ভবানী ঘরে ঢুকে খাটের নিচে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে ভালো করে দেখে তাড়াতাড়ি তরুর হাত থেকে নেতা কেড়ে নিয়ে ঝংকার দিয়ে বলতে থাকেন রাত্রে যে বেড়ালে মাটি তুলে রেখেছে সেগুলি কি ওপাড়ার লোকে এসে বন্ধ করবে? ঐ জায়গাটুকু দয়া করে বন্ধ করে দিয়ে যাও আর আমি যা পারি করব। তখন ভবানীর গায়ে এত শক্তি, দেখলে অবাক হতে হয়। ঝাঁট দেওয়া উঠোন আবার ঝাঁট দেওয়া, মাজা বাসন আবার মাজা, থালা বাসন ছুঁড়ে ছুঁড়ে উঠোনে ফেলে দেওয়া আর চিৎকার সমানে এক বেলা চল্‌ত। তার পর তরুকে বলতেন যে তোমাদের মত তোমরা রান্না করে খাওগে, আমি আর খাব না; যখন পারি নিজে রেঁধে খাব, না পারি খাব না। সে আর এক মুস্কিলে পড়ত তরু। কোন ডাল রাঁধবে কতগুলি চাল নেবে, বাজার হবে কিনা কিছুই সে বুঝতে পারত না। যতবার ভবানীকে বলতে যেতো ততবারই ঐ এক কথা। দুপুরবেলা রেল লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে দুধওয়ালাদের কাছ থেকে দুধ কিনে এনে জ্বাল দিয়ে মুড়কি চিঁড়ে দিয়ে খেয়ে মাদুর বালিশ গল্পের বই নিয়ে শুয়ে পড়তেন। রাগ কিছুটা কমে এলে রান্নার অর্ডার হোত, পরে আবার খেতেন। এই প্রকার মাসে প্রায় রোজই হোত, কখনও কখনও দুচার দিন বেশ ভাল ভাবেই কেটেছে। ছেলেমেয়েরা এবং তরুর শ্বশুর যখন বাড়ীতে আসতেন তখন তরুর নিন্দা প্রত্যেকের কাছে করতেন সেই সময় টুকু তরু রেহাই পেতো, কারণ তখন অত প্রবল হয়ে উঠতে পারতেন না। যাদের কাছে বলতেন তাঁরা মাঝে মাঝে তরুর উপর রাগ করতেন অবশ্য তরু বুঝতে পারত যে এটা আন্তরিক রাগ নয়। তরুর শান্তির সুব্যবস্থা হলো না দেখে ভবানী নিজে পৃথক খাওয়া দাওয়া আরম্ভ করলেন। তরুর শ্বশুর নিজে বাজার করতেন। মাছ দুধ ইত্যাদি যা আনতেন সমস্তই ভাগ হতো। ভবানী চট করে মাছ যেটুকু তাঁর দরকার ঠিক সেই টুকু কেটে নিয়ে ঢেকি ঘরে রান্না করতেন। বাকি মাছ উঠোনের এক কোণে পড়ে থাক্‌তো। বিনু মিনু দুলাল এরা সবাই এই ব্যাপারে ভয়ানক অশান্তিতে থাকতো, ওরা সবাই তরুকে বলত তুমি আজ মাকে রান্না করতে দিও না। ওদের কথা মত ভবানীকে বলতে গিয়ে তরু বেশী কথা বলতে পারত না, তার ভয়ানক লজ্জা করত।

বিনুর রাগও কম ছিল না প্রায়ই মায়ের সঙ্গে ঝগড়া লাগত তার কারণ তরু আর বিনু খুব হাসাহাসি করে ভবানী গেলেই চুপ করে যায় তাই মাঝে মাঝে বিনুকে শুনতে হোত, যে আমি যতই শাসন করি না কেন তোমরাই প্রশ্রয় দাও। ও তো বুঝতে পারে সবাই তার সঙ্গে গল্প করে হাসাহাসি করে শুধু আমিই করি না। তোমাদের জন্যই আমার শাসনের কোন মূল্য নাই। বিনুও রেগে গিয়ে বলত বেশী শাসন করতে গেলেই যে খারাপ হয় সেটা পরে বুঝতে পারবে। ঝগড়া করে বিনু না খেয়ে শুয়ে পড়ে, ভবানী খানিকক্ষণ গালাগাল দেন, উঠে দয়া করে দুটো খেয়ে মিটিয়ে দিয়ে শুয়ে থাকলেই তো হয়। কিছুতেই বিনু ওঠে না তরুও খেতে পারে না। এই জন্য মাঝে মাঝে তরুর মনে হয় যে কেউ যেন তার পক্ষ হয়ে কথা না বলে। কেউ কিছু একটু বল্‌লে, তরুর কতখানি দোষ আছে সেইটা প্রমান করবার জন্য ভবানীর অনেকখানি খাটতে হয়। দোষ পেলেই প্রত্যেকের সামনে সেই কথা বা কাজ নিয়ে ঠাট্টা হাসাহাসি চলে। তরুর এমন ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে সে একটা বোকা নির্ব্বোধ, তার কোন কথা বা কাজ, লোকের কথা বলবার বা দেখাবার যোগ্য নয়।

এমনি করে বড় দিনের ছুটি কেটে গেল। শ্বশুর, বিনু, সমর সবাই আবার বিদেশে চলে গেল। সেই দিন থেকে আবার খাওয়া দাওয়া এক সঙ্গেই চলতে থাকে। কাপড় জামা সোডা দিয়ে সিদ্ধ করছে ভবানী, তরু বাইরের কাজ করছে। ভবানী তরুকে ডেকে বললেন এক কাজ

কর, ঐ কলসিটার ভিতরে কাপড়গুলি নিয়ে চট করে ঘাটে গিয়ে কেচে নিয়ে এস। দেরী করো না। কলসির ভেতর কাপড় দেওয়া কেন? একটা ধামায় দিলে হয় এই কথাটা তরু কিছুক্ষণ ভাবল তারপর ভবানীকে বল্ল আচ্ছা মা এই ঝুড়িটায় কিম্বা বালতিতে করে নিয়ে যাই। ভবানী বললেন তা যাবে না, রায় বাড়ীর বাইরের ঘরে সর্ব্বদা ছোকড়ারা আড্ডা দেয়। দেখে যে টিটকারী দেবে সেটুকু বুদ্ধিও নাই। তরু ঘাটে কলসি নামিয়ে বসে আছে। একটুখানি ঘাট। একখানি খেজুর গাছের খণ্ড তার উপর বসে সাবান মাখা, কাপড় কাচা, গল্প করা ইত্যাদি চলে। খেজুর গাছটা হাত আড়াই হবে। ঘাটের দুধারে ঝাউয়ের গাছ। নদীতেও কিছু কিছু পানা, পানা ঠেলে একজন দুজন করে জলে নামে, ডুব দিয়ে উঠে চলে যায়। কেউ কেউ বহুক্ষণ দেরী করে। তাদের মন কিছুতেই শান্তি পায় না। ক্রমাগত ডুব দেয় আর বলে দেখো তো এবারে ডুবি কিনা। তরু মনে মনে ভাবে তুমি ত ডুবেছ সঙ্গে আমাকেও ডুবিয়েছ। তিনি চলে গেলে তরু ঘাট দখল করল। দু খানা কাপড় কাচা হয়ে গেছে এমন সময় গ্রামের জমিদার গরুকে চান করাতে নিয়ে এলেন, তরু আবার ঘাট ছেড়ে দুরে ঝাউয়ের গাছের কাছে ঘোমটা টেনে দিয়ে বসে রইল। গরু এবং জমিদার দুয়েরই চান শেষ হলো, এবার তরু তাড়াতাড়ি কাপড় গুলি কাচতে আরম্ভ করে। নদীতে স্রোত নেই কাদা জল। দুরে বেশ পরিস্কার জল। তরু কাপড় গুলি কাঁধে করে অনেক জলে ভাল করে ধুয়ে নিয়ে কলসি করে জল নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরল। ভবানী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে উলু দিলেন, শাঁখ খুঁজলেন। ব্যঙ্গ করে বললেন কিছু চিঁড়ে গুড় বেঁধে নিয়ে গেলেই পারতে তাহলে একেবারে সন্ধ্যায় ফিরলেই হোত। কেউ তো আর কাপড় কাচে না, তারা রান্নাও করে চুলও বাঁধে। তরু যত বলে ঘাট খালি না সে কথার উত্তরে ভবানী বলেন, তোমার বেলাতেই খালি থাকে না, ওই সে দিন চাটুজ্জে বাড়ীর বৌ এক মুহূর্ত্তে ২ টিন ২ ¼টিন কাপড় কেচে এনে, অতগুলি লোকের রান্না করে খাওয়ালো তারা কি মানুষ না? তারা বুঝি তোমার মত শিক্ষিতের বৌ নয়। শিক্ষিতের চাইতে অশিক্ষিতের বৌ যে কত গুণে ভাল তার খানিকটা জানিয়ে দিলেন।

তরুর বাপের বাড়ী থেকে চিঠি এলো, তরুর মায়ের অসুখ, চিঠি লিখেছেন তরুর বড়দা, পত্রপাঠ উত্তর দিতে লিখেছেন। একথাও জানিয়েছেন তরু না এলে আমাদের খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। আশা করি কয়েক দিনের জন্য পাঠাবেন। ইত্যাদি ইত্যাদি। চিঠি পড়ে ভবানী বললেন এখন কি করে যাবে আমার শরীর ভাল না নিজে নড়তে পারি না। শরীর যদি ভাল হতো যে কোনো কাজ এক মিনিটেই শেষ করতে পারতাম। তোমার দাদাকে লিখে দাও অন্য ব্যবস্থা করতে। টাকা দিলে রাঁধবার লোকের অভাব হবে না। আর ঐ সংসারের কাজ কি তুমি পারবে? একেবারে রাবণের গুষ্টি। তুমি কি অত কাজ পার, তোমার মা তো তেমন ভাবে তৈরী করেন নি। যাই হোক লিখে দাও যে যাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মার অসুখের জন্যই যাওয়া অসম্ভব। তরু দুই এক দিন কোন চিঠি দিল না, তার লজ্জা করতে লাগল। তার পর ভবানীর তাগিদে তরু যেতে পারবে না জানিয়ে চিঠি ডাকে দিল। তার কিছুক্ষণ মনটা ভারী হয়ে গেল। ভবানী বারান্ডায় বসে বঁটিতে তেঁতুলের বিচি ছাড়াচ্ছেন। তরু লণ্ঠনগুলো পরিস্কার করে রেখে হাতে সাবান দিয়ে হাত ধুচ্ছে। ভবানী বললেন নারকেলের পাতাগুলো নষ্ট হয়ে গেল আর কত দিন পড়ে থাকবে? পারো তো ওর একটা ব্যবস্থা কর — একা মানুষ যে দিকে না যাই সেই দিক একেবারে যায়। তরু উঠোনের এক কোণে দা দিয়ে নারকেলের ডাল থেকে পাতা ছাড়িয়ে নিয়ে পাতাগুলো জড় করে বাঁটি দিয়ে একটা একটা করে পাতা কেটে কাঠিগুলো বের করে আলাদা করে রাখছে। এমন সময় দেখে তার ছোট, দু ভাই তাকে নিতে এসেছে।

ভবানী বললেন যাবে কি করে। ভাই দুজন নেহাৎ ছোট তারা বলছে মাঝি নৌকায় আছে। তাতেই যাবে। মায়ের অবস্থা আরো খারাপ সুতরাং যেতে হবে। ভবানী কিছুক্ষণ ছটফট করে শেষে বললেন যাও। তবে যাওয়ার আগে নদী থেকে কয়েক কলসি জল এনে রেখে যেও। জান তো বড় কলসি টানতে পারিনা, ছোট কলসির জল দিয়ে লক্ষী পুজো করি আর এক ডাল রান্নার জল মাত্র থাকে। আমি আর জল টানতে পারবো না। তরু দুই ভায়ের সঙ্গে নদীতে জল আনতে গেল। দুই ভায়ের হাতে ছোট ছোট দুটো বালতি আর নিজে একটা কলসি এবং হাতে বালতি। নদীতে যেতে যেতে মায়ের কথা বাড়ীর আর আর সব কথা তরু জেনে নিল। মা নাকি কয়েকদিন একেবারেই উঠতে পারছেন না, কুমারখালির বড় ডাক্তার দেখছেন। সারা শরীর নাকি অবশ মত। তরুর মন অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেল। তবে আনন্দের বিষয় এই যে আজ নাকি জ্বর কয়েক দিনের তুলনায় কম। তরুরা ঘাটে এল। মাঝির নাম অভয়। তরু বলল অভয়দা তুমি বাড়ী যাও, বাক্সটা আন্‌তে হবে। অভয় বলল নৌকায় জিনিষপত্র আছে। চলে গেলে সব চুরি হয়ে যাবে। দাদা বাবুরা কেউ এক জন নৌকোয় থাক। তরু বলিল তুমি না গেলে আমার যাওয়া অনেক দেরী হয়ে যাবে। অভয় বলল মনোজ বাবু নৌকোয় বস আমি একটু শ্বশুর বাড়ী থেকে ঘুরে আসি। তরুর শ্বশুর বাড়ী থেকে অভয়ের শ্বশুর বাড়ী। খুবই কাছে। রেল লাইনের এপাশে তরুদের বাড়ী, ও পাশে অভয়ের শ্বশুর বাড়ী মনোজ নৌকায় বসে রইল তার ছোট শচিন সে দিদির সঙ্গে জল নিয়ে ফিরল। তরুরা ২/৩ বার যাতায়াত করল। ঘটি-গামলা ডেকচি ইত্যাদিতে নদীর জল ভরে রেখে দিল। তারপর কুয়োর জল তুলে সমস্ত বালতি ভরল। লঙ্কা গাছে জল দেবার জন্য মাটির কলসি ভর্ত্তি করে রেখে দিল। তরুর সর্ব্বদা ভয় হচ্ছে ভবানী যে কোন কারণে যাওয়া বন্ধ করে দিতে পারেন। আরও সেই ভয়ে তরু যত রকম কাজ ছিল করতে লাগল। বিছানার চাদর তুলে ধুলো ঝেড়ে পেতে রেখে দিল। ভবানী সকালে নালতে পাতা ভিজানো জল খান। চট করে সেটা ভিজিয়ে রেখে দিল। দুধ কড়া থেকে ঢেলে বড় বাটিতে করে সিকেয় তুলে রাখল। অভয়দা ভবানীকে বলছে তাড়াতাড়ি পাঠাবার জন্য। ভবানী বলছেন কারো মাথায় তো জট নেই। আজ যে আসবে কে জান্‌ত? কেউ তো আর পা বাড়িয়ে রয় নাই আর বললেই যাওয়া যায় না। তরু ভাবছে এত তাড়াতাড়ি এত কাজ সে করল হয়ত সবই অকারণ। তরু সব কাজ শেষ করে ভবানীর আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। ভবানী বললেন হয়ে থাকে তো গুছিয়ে টুছিয়ে নাও। তরু তাড়া তাড়ি ঘরে ঢুকে তার বাক্সটা টেনে বার করল, ভাল একটা শাড়ি পরল। ভবানী বললেন ২/৪ দিনের জন্য যাচ্ছ তা আবার সিন্ধুক নেওয়া কেন? আর ঐ কাপড়টা পরলে কেন? ও কাপড়টা বিয়ে বাড়ী টাড়ি পরে যায়। ২ দিনের জন্য যাচ্ছ ২ টো কি ৩টে শাড়ি কাগজে জড়িয়ে নিয়ে যাও। তরু মহা মুস্কিলে পড়েছে দেখে অভয় বলছে আবার গুছাতে গেলে দেরী হয়ে যাবে, আজ বড় বাবুর বাড়ীতে রান্না হয় নাই, দিদি যাবে তবে রান্না হবে।

ভবানী তরুর দিকে তাকিয়ে বললেন যাচ্ছ রোগী দেখতে তা অত ভাল কাপড়টা নষ্ট না করে ঐখানা পরে যাও। তরু সে কাপড়টা বদলে আরেকটা পরল। ভবানীকে প্রণাম করে ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে লাগল। ততক্ষণে অভয় অনেকদূরে বাক্স মাথায় করে চল্‌ছে। তরুরা বাগানের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। বাগানটার পরই তরুর মামাশ্বশুর বাড়ী, সেখানে দিদিশাশুরী দাদাশ্বশুর মামাশ্বশুর সবাই আছেন। তাঁদের সঙ্গে ভবানীর বিশেষ মিল নাই। মিল না থাকার কারণ ঐ তরুর জন্য তরুকে কেউ ভালো বল্লে তার প্রশংসা করলে ভবানী বিরক্ত হতেন। এক কথায় দু কথায় ঝগড়া বেধে যেত, সেই থেকে কথা বন্ধ। নদীতে যেতে

হলে ঐ বাড়ীর উপর দিয়েই যেতে হয়। অন্য রাস্তায়ও যাওয়া যায় তবে সে অনেক ঘুরে যেতে হয়। তরুকে মামা বাড়ীর সবাই ভালবাসত। তরু চলে যাচ্ছে দিদিমার খুব দুঃখ হয়েছে, তরুর সঙ্গে কারো কথা বন্ধ হয় নাই। ভবানীই বরং তরুকে বারণ করেছিলেন ও বাড়ীর কারো সঙ্গে কথা বলো না। দাদামশায় ডাকলেন তরুকে। তরুর মায়ের খবর আগেই শুনেছিলেন তরুর কাছে। দিদিমাকে ডেকে দাদামশায় বললেন তরুর ভাইকে দেখিয়ে ঐ নূতন কুটুমকে কিছু খাইয়ে দাও। তখন তরু বলল ভয়ানক দেরী হয়ে যাবে। বাড়ী গিয়ে রাঁধতে হবে, সন্ধ্যা হয়ে এল। দিদিমা বললেন সেই কখন তো মাঝি এসেছে, ভবানীর উচিত ছিল সকাল সকাল পাঠিয়ে দেওয়া। সেই বেলা থেকে তো জলই টানছে দেখছি, ধন্য বৌ পেয়েছিল ভবানী। মেয়ে মানুষের অত রাগ হলে কি সংসার চলে? কুয়োর জলে ডাল সিদ্ধ হয় না, ভাত ভাল হয় না, তাই বলে ১ মাসের জল এক দিনে টানতে হবে। এমন সময় ভবানী হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দেখেন তরুরা সবে হাঁটতে শুরু করেছে। ভবানী বললেন এখানে এত দেরী করছ অথচ বাড়ী থেকে পালাতে পারলে যে বাঁচ। ছোট ঘরের চাবি কোথায় রেখেছ? কোথাও খুঁজে পেলাম না। তরু বল্ল রান্না ঘরে ঢুকতে বাঁ ধারে বেড়ার সঙ্গে আছে। ভবানী বললেন অত ডাল তরকারী এখন নষ্ট হবে ভাইদের খাইয়ে দিলেই পারতে। আমি যে দিকে না দেখব সেই দিকই গোল্লায় যাবে। এমন তো নয় যে সব কিছু আমার হাতে। সমস্ত সংসারই তো তোমার হাতে। ঐ যে আমি বলিনি আর হলো না। রান্না ঘরে বহুক্ষণ দুই ভাই বোনে ছিল, আমি জানি খাওয়া দাওয়া করছে। দাদামশায় তরুকে বললেন, তুমি আর দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করো না। হয় খেয়ে যাও না হয় তাড়াতাড়ি রওনা হও। রাত হয়ে যাবে সঙ্গে বড় কেউ নেই। ভবানী তাড়াতাড়ি বললেন দুই বেড়ালের বাচ্চা পাঠিয়েছে। দাদা মশায় ভবানীকে বললেন তরু যত দিন না আসে তত দিন তোমরা এখানেই খেও। দুলাল যেন স্কুলে যাবার সময় এখান থেকে খেয়ে যায়। তরু ভাই কে বল্ল — তোর কি খুব ক্ষিদে পেয়েছে? ভাই বল্ল খেয়ে এলি না কেন দিদি? তরু বল্ল দেরী হতো না? তখন মনোজ তাগিদ দেওয়ার জন্য আসছে। তরুর তখনও মনে হতে লাগল এখনও তার যাবার কোন স্থিরতা নেই। হয়ত আরেকটা কিছু খুঁজে পাচ্ছে না। মনোজ ছোট্ট ভাইকে বল্ল তোরা তো খেয়ে এলি। আমার ক্ষিদে পেয়েছে। ভাই বল্ল খাই নাই দেরী হয়ে যাবে বলে দিদি খেলোনা। মনোজ বল্ল আমি আর কোন দিন দিদিকে নিতে আসব না। এত দেরী করে। ভাই বল্ল দিদি খালি কাজ করছিল মাঐমা - আসতে যখন বলবে তখন তো আসবে? পেছন থেকে কিরণ (তরুর বন্ধু) বাপের বাড়ী যাচ্ছ নাকি? তরু সংক্ষেপে উত্তর দিল মায়ের অসুখ। কিরণ বল্ল যেতে যেতে অনেক রাত হয়ে যাবে। এখন প্রায় ৬টা বাজে। তরু বল্ল ৩ ঘণ্টা প্রায় লাগবে। কিরণ বল্ল মা কেমন থাকেন একটা চিঠি লিখে জানিও। তরু আচ্ছা বলে নৌকার দিকে চলে গেল কিরণ বল্ল দাঁড়াও কলসিটা ভরি আগে তারপর নৌকায় পা দিও খালি কলসি দেখে যেতে নেই। তরু নৌকায় উঠেছে এবারে তার খুব আনন্দ হলো। অভয়দা বাঁধন খুলে বৈঠা দিয়ে জোরে মাটির সঙ্গে ধাক্কা দিয়ে মাঝ নদীতে নিয়ে গেল। কিরণ কে আর দেখা যাচ্ছে না, ঝাউয়ের গাছের আড়াল হয়ে গেল। অভয়দা খালি ভবানীর নিন্দে করতে লাগল। অভয়দা বল্ল শ্বশুরবাড়ী গেলাম, খেতে বল্ল শাশুড়ী, খেলাম না ভাবলাম দিদির শ্বশুরবাড়ীতে খাব, খাওয়া চুলোয় যাক এখন রাত করে ঠাণ্ডা লাগিয়ে দিদি দাদাবাবুদের অসুখ না করে।

আচ্ছা দিদি, তোমার শ্বাশুড়ী কেমন লোক, তোমাদের খেতে টেতে দেয় তো? দেখে তো মনে হয় না যে কাউকে খাওয়াতে পারে। তরুর রাগ হচ্ছিল সে বলল শ্বাশুড়ীকেই আমি

খেতে দেই। আমাকে আবার কে দেবে, তুমি এখন ঝগড়া করো না। অভয়দা আধ ঘণ্টার মধ্যে বাড়ী নিয়ে চল। অভয় বলিল বাতাস থাকলে আর বলতে হতো না। ভয় কি জ্যোৎস্না রাত আছে। আর আমি থাকতে কোন ভয় নাই। কবে ঠাকুর্দার আমলে তরুদের বাড়ীতে ভীষণ ডাকাতি হয়েছিল। একথা বহুবার বাড়ীতে এবং অভয়দার কাছেও তরুরা শুনেছে। অভয়দা কি করে ডাকাত ধরেছিল, অনেক সময় ডাকাতের সঙ্গে লড়াই করেছিল, চিৎকার করেছিল, কেউ নাকি ভয়ে এগোয় নাই, অভয়দা ডাকাতের একটা কান কামড়ে ছিঁড়ে দিয়েছিল। কোন গহনা, টাকাকড়ি ডাকাতরা নিতে পারে নি তবে সমস্ত মাঠ রাস্তা জংগল ইত্যাদিতে টাকা গহনার ছড়াছড়ি যাচ্ছিল। সৎ প্রজারা নাকি কুড়িয়ে এনে দিয়েছিল। হাতের একটা বালা বাড়ীতে ছিল অপরটি ডাকাতরা কোথায় ফেলে দিয়েছিল। সেটা নাকি অভয়দা ৬ মাস পরে পেয়েছিল গাব পাড়তে গিয়ে গাব গাছের তলায়। ফেরৎ দেওয়াতে ঠাকুর্দা নাকি ১০ টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন। অভয়দার গায়ে অসিম শক্তি। লোকটা মোটা বেঁটে। নাকটা অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে। চোখ দুটো ছোট। রং একেবারে ভয়ানক কালো। ৬০-৬৫ বয়স। দাঁত সব কটাই আছে; কিন্তু মাথার চুল একেবারে চুন মাখানোর মত সাদা। লোকটি অতি বিশ্বাসী এবং সৎ। তরুর বাবা অভয়কে যতখানি ভরসা করতেন, ততখানি বোধ হয় তাঁর নিজের উপরেও ছিল না। বাবার কাছে তরু গল্প শুনেছে, অভয়ের নৌকায় কোথায়ও নাকি যেতে প্রায় আধ মাইল মত জায়গা চর পড়েছিল। সেই জায়গাটা অভয়দা নাকি নৌকা শুকনো মাটির উপর দিয়ে টেনে জলে নিয়ে ফেলেছিল। আরও আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য খবর শুনেছে। অভয়দাকে তরুর শ্বশুর বাড়ীর লোকেরাও বিশ্বাস করত, কাজেই তরু যাবার সময় কোন বাধা বিশেষ দিত না, তবে তরুকে অনেক কথা শুনতে হতো। সেটা হয়েছে তরু চলে গেলে কাজের চিন্তায়।

যাই হোক বাজারের ঘাট দেখা যাচ্ছে, নদীর উপর দিয়ে সাঁকো বাঁধা, লোক যাতায়াত করছে। তরু ছইয়ের ভিতর জড়সড় ভাবে চুপ করে বসে আছে। ছোট দুই ভাই তরুর গায়ের সঙ্গে ঠেয়াস দিয়ে বসে গল্প করছে, সরস্বতি পূজোর সময় কত কুল পেয়েছিল, কত কড়াইশুটি তুলেছিল। বড় ঝুড়ির দুই ঝুড়ি ফুল। এবারের সরস্বতি নাকি খুব সুন্দর হয়েছিল। তরুদের বাড়ীতে প্রতি বছর সরস্বতি পূজো হয়। সরস্বতি পূজোর সময় ওরা অনেক কাল হল উপস্থিত থাকে নাই। তাই জন্য ভাইরা ওকে সত্যি মিথ্যে একধার থেকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলতে লাগল। তরু বল্ল আমাকে নিয়ে গেলে না কেন? ভাই বল্ল তোমাকে আনবার জন্য মা, বাবাকে বলেছিল, বাবা বললেন আম কাঁঠালের সময় আনবেন, এখন আনলে তো আম কাঁঠালের সময় আসতে দেবেন না। সরস্বতি কি ডুবিয়েছিস? ভাই, না দিদি রেখে দিয়েছি আসছে বছরে নূতন সরস্বতি এলে তবে পুরানোটা জলে দেব। তরু আচ্ছা গিয়ে দেখব কেমন ঠাকুর। ভাই বল্ল সবাই বলছে আগের বছরেরটাই নাকি ভাল হয়েছিল। আমার কাছে কিন্তু এবারকারটাই ভাল লাগছে। খুব ছোট আমি একাই তুলতে পারি। আগের সরস্বতি বড় আর ভারি। দেখতে দেখতে বাজারের ঘাটের কাছে নৌকা এল। অভয়দা বল্ল, এখানে নৌকা বেঁধে একটু বাজার থেকে আসছি। তরু বল্ল কেন যাচ্ছ অভয়দা? অভয় বল্ল একটা দেশলাই নিয়ে আসি তরু। অভয়দাকে বল্ল এখন বাজারে দৈ পাওয়া যায়? অভয় বল্ল কিনব নাকি? তরু চট করে বাক্স খুলে বাক্সের তলায় কাগজের নিচে থেকে একটা টাকা বের করে অভয়ের হাতে দিয়ে দই চিঁড়ে বাতাসা আনতে বলে, বল্ল কিসে খাওয়া হবে? মাটির সরা কিম্বা কলাপাতা যদি পাও, দেখে এনো অভয়দা। অভয় চলে গেল, তরু ভাবতে লাগল তরুর মা তরুকে শ্বশুর বাড়ী

যাবার সময় হাত খরচ বাবদ ৫-৭ টাকা দিয়ে দিতেন, তাছাড়া খাম পোঃ কার্ডও দিতেন। খাম পোঃকার্ড কয়েকদিনের ভিতরেই শেষ হয়ে যেত। ভবানীই সবার আগে চেয়ে নিতেন। ভবানী বলতেন বৌমা তোমার কাছে খাম বা পোঃ কার্ড আছে? থাকে তো দাও পরে দিয়ে দেব। তরু সঙ্গে সঙ্গে বের করে দেয়। ভবানী বলেন বৌমা তোমার কাছে পয়সা আছে? টাকা ভাঙ্গানো নেই পরে দেব, এমনি করে শেষ হয়ে যায়। তরু আর চাইতেও পারে না ভবানীও দেন না। এত দিন পর তরু বাক্স খুলে ভাবল টাকা হয়ত নেই, যাই হোক কিছু থাকবার কথা। তরুর মা কোন বারে হয়ত বলে দেন, এত দিল্লাম, কোন বার হয়ত বলেন বাক্সে কিছু দিয়েছি; তরুর মনেও থাকে না। পয়সা দিয়ে কোন কিছু কিনবার উপায় তো নেই। পরের হাত দিয়ে কোন একটা জিনিস কিন্‌তে দিলেই হয়ত ধরা পড়ে যাবে। তরুর কাছে কত আছে সব জেনে নিয়ে ধার চাইবে। তার চাইতে কোন প্রকার খরচ না করাই ভাল। তবুও মাঝে মাঝে ধার চাইলেই নাই বলতে পারে না তরু। শ্বশুর মাঝে মাঝে বাড়ীর প্রত্যেকেরই হাত খরচ দিতেন। তরুর টাকাটা কোন দিন বাক্সে ওঠে নাই। তখনি কোন না কোন জিনিসের এমন দরকার হয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিতে হয় অবশ্য ধার হিসাবেই।

অনেকক্ষণ হল অভয়দা বাজার চলে গেছে। তরুর ছোট ভাই তার দিদিকে বলছে দিদি তুই আর শ্বশুর বাড়ী আসিস না, তাহলে খুব ভাল হয়। একথা তরু বহু দিন ধরে ভেবেছে কিন্তু তা আর হয় না। তরুর মনে হতে লাগল তার আবার ফিরতে হবে আবার সেই ঘানি ঘাড়ে নিয়ে ঘুরতে হবে। তরুর মনটা ভারী হয়ে উঠলে তার ভাইকে বল্ল বিয়ে হলে শ্বশুর বাড়ী আসতেই হয়। ও বাড়ীর বড়দার বৌকে দেখছিস তো, বড়দা যদি বৌকে না আনতো তাহলে কি ভালো হত? একথায় ছোট ভাই খানিকটা যেন বুঝতে পেরেছে এমনি ভাব দেখালো। তরুর মনের ভিতর দিয়ে ঝড় বয়ে যেতে লাগল, তার সমস্ত জীবনটাই যেন ব্যর্থ হয়ে আসছে, কোন কিছুতে তার সেই আনন্দ আর নাই। তরু ভাবতে লাগল মা যদি ভাল হয়, ভগবান যেন তরুকে ঐ অসুখে অন্তত কিছুকাল শুইয়ে রাখে। তরুর সহজে অসুখও হয় না, কত ঝড়ে জলে ভেজে। পান্তা ভাত খেলে নাকি অনেকের অসুখ করে। তরুর তেমন কিছু তো হয় না। অনেক কথা এলোমেলো ভাবে তরুর মনে আসতে লাগল। কিছুতে কথাগুলো ভুলতে পারছে না, কত চেষ্টাই করছে তরু অন্য কথা ভাববার। তরুর সর্ব্বশরীর মন ভারী হয়ে উঠতে লাগল, অন্ধকার রাত্রের শ্মশানের মত থমেথমে।

কখন অভয়দা এসেছে তরুর খেয়াল নাই।

অভয়দা তরুর হাতে খাবার দিয়ে বলল, তোমরা সবাই খাও, আমার ভাগটা রেখে দাও বাড়ী গিয়ে খাব। একটা মাটির পাত্রে তরুরা তিন জনে খেলো। একজন খায় সেটা নদীর জলে ধুয়ে নিয়ে আবার আর এক জন খায় এমনি করে তিন জনেই খেলো।

কিছুক্ষণ গল্প গুজব করে দুই ভাই দিদির দিক থেকে বিশেষ উৎসাহ না পেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। তরু যেমনটি বসে ছিল ঠিক তেমনিই বসে রইল। অভয়দা কত রকমের গল্প জমাবার চেষ্টা করে না পেরে শেষে ভাবল তরুর হয়ত মায়ের জন্য মন খারাপ আছে তাই জন্য বেশী কথা বলতে চাইছে না। যাই হোক অভয়দা মায়ের কথা বলতে শুরু করে দিল, তাতেও তরু কিছু বিরক্তই যেন হচ্ছে, এটা বুঝতে পেরে অভয়দা বল্ল দিদির কি শরীর খারাপ লাগছে? তরু সোজা কথায় বল্ল, বেশী কথা বল্‌তে ইচ্ছা করছে না খুব মাথা ধরেছে। অভয়দা বল্ল বাতাস থাকলে মাথা ধরা সেরে যেতো, আজ একেবারেই বাতাস নাই, দেখো দিদি জ্বরটর না হয়, তোমার জ্বর হলে আরও মুস্কিল হবে।

তরুরা অনেকটা পথ এসেছে আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই আশা করা যায় বাড়ীর ঘাটে নৌকা আসবে।

অল্প চাঁদের আলোয় তরু চারদিকটা একবার দেখে নিয়ে অভয়দাকে জিজ্ঞাসা করল কটা সাঁকো ছেড়ে এলাম আমরা? অভয় বল্ল ৩টা, আর একটা আছে, সেটা এতো নিচু যে ছইয়ের সঙ্গে বেধে যায়, বাঁশ তুলে ধরতে হবে।

একফালি চাঁদ জলের উপর স্থির হতে পারছে না। অভয়দার বৈঠার আঘাতে ভেঙ্গে চুরে যেন শত খান হয়ে যাচ্ছে। তরু সেই দিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখতে লাগল। ছোট্ট নদী তার দুপাশে ঝাউ গাছ আরও কত আগাছা। মাঝে মাঝে নৌকার ছইয়ের সঙ্গে গাছের ডাল লেগে খরখর শব্দ হচ্ছে। আবার কোথায়ও বেশ বড় নদী বলে মনে হয়, তখন দুধারে ধান বা আখের ক্ষেত চোখে পড়ে। নদীর ধারে ধারে জোনাকির মালা, একটা জ্বলছে আরেকটা নিবছে। কাছেই একটা শ্মশান। কতকগুলো ছেঁড়া কাগজ, ভাঙ্গা কলসি, বাঁশ ইত্যাদি ছড়ানো পড়ে আছে। একটা শেয়াল আরাম করে সেইখানে দুপায়ের ভেতর মুখ রেখে চুপ করে শুয়ে আছে। সমস্তই ছবির মত চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল। সামনে ছোট সাঁকোটা দেখা যাচ্ছে। অভয়দা উঠে দাঁড়িয়ে বাঁশটাকে তুলে ধরে ছইটাকে বাঁচিয়ে জোরে ধাক্কা দিয়ে আবার জায়গায় বস্‌ল। মোড় ফিরতেই চন্দনা নদীর ব্রিজ দেখা যেতে লাগল, অভয়দাদের ঘাট দেখা যেতে লাগল। অভয়দাদের ঘাটে অনেক নৌকা বাঁধা আছে, একখানা নৌকা মাঝ নদীতে বাঁধা। তার ভিতর কে যেন শুয়ে আছে, মিট মিট করে প্রদীপ জ্বলছে। অনেক দুর থেকে প্রদীপটার আলো বেশ জোর মনে হচ্ছিল। কাছে এলে দেখা গেল সামান্য একটা কেরোসিন তেলের কুপি। তেল হয়ত খুব কম আছে। সামান্য বাতাসে কেঁপে কেঁপে উঠছে। বাতাস না লাগবার জন্য প্রদীপটার তিন দিকে মরচে পড়া একখানি টিন দিয়ে আড়াল করে রাখা হয়েছিল। নৌকা কাছে আসতে, অভয়দা হারান হারান করে সেই লোকটিকে ডেকে তুল্ল, তার পরে হারান আর অভয়দা অনেক গল্প করল। নারকেলের ছোবড়া হাতে পাকিয়ে আগুন ধরিয়ে তামাক খেতে খেতে অভয়দা হারানকে বল্ল, আজ হাটে কত করে মাছ বেচলে? নিতাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল? আমার পয়সার কথা কি বল্ল? জালের সূতো কিন্‌তে হবে সেকি জানে না, পয়সা আটকে রাখলে কত অসুবিধা হয়। হারানের কথা কিছু শোনা যায় না খুব আস্তে আস্তে কথা বলে। তারপর আবার নৌকা চলতে থাকে। ক্রমে বট গাছ দেখা যেতে লাগল। সেইটাই তরুদের ঘাট। তরু ভাইদের ডেকে তুললো। ছোট ভাইটি মিট মিট করে তাকিয়ে দেখে ধপ করে শুয়ে পড়ে বললো এখনও একটু দেরী আছে। ঘাটে ননী নামে তরুদের একজন চাকর ছিল। চাকরের মাথায় বাক্স চাপিয়ে দিয়ে মায়ের কুশল সংবাদ নিয়ে অভয়দা আবার নৌকা নিয়ে পিছিয়ে গেল। অভয়দা বল্ল কাল সকালে তরুদের বাড়ীতে আসবে।

২ দিন হল তরু এখানে আসিয়াছে। তরুর মা দাঁড়াতে পারেন না, বসে বসে অনেক কষ্টে চলা ফেরা করেন। মায়ের শরীরে অবস্থা ভাবতে গেলে তরুর বড় কষ্ট হোত। তরু একদিন মাকে বল্ল, আমার আয়ু তো শেষ হয়ে এল, এর পরে তুমি কি করবে? মা ধমক দিয়ে বললেন ও ভাবে বলিস না আমি যদি মরেও যাই, তাহলেও আমার কোন দুঃখ থাকবে না কারণ মরবার আগে তোর সঙ্গে তো দেখা হল। তরু বল্ল এখন বড়দার বিয়েটা হয়ে গেলে ভাল হত। বৌদি এলে তোমার কোন কষ্ট থাকতো না। মা ব্যথিত কণ্ঠে বললেন সে আর আমি বেঁচে থাকতে হবে না মাঝখানে তরু বাধা দিয়ে বল্ল কেন সেই যে বিয়ের কথা শুনেছিলাম, তারা নাকি ২/১ মাসের মধ্যেই বিয়ে দিতে চেয়েছিল? কি হল তার?

মা — সে মেয়ে দেখতে ভাল না তাছাড়া বয়সও বেশী

তরু — অল্প বয়স হলে কি এই সংসারে চলবে? তরু বুঝতে পারল, মায়ের ইচ্ছা নাই।

মা — আমি সত্যি বলছি তরু, তোদের মত একটা মেয়ে যদি ঘরে আনতে পারতাম তাহলে আমি যে কত সুখী হতাম তা আর তোকে কি বলব। তরু কুলুঙ্গি থেকে ঔষধের বোতল থেকে মাকে গ্লাসে ঔষধ ঢেলে দিতে দিতে বলল —

আমাদের মত মেয়েরা কি ভাল?

মা — নিশ্চয়ই ভাল, ভাল না হলে তোর শ্বশুর তোকে দেখা মাত্রই কথা দিয়ে গেলেন কেন?

তিনি তো আর বাজে কথা বলেননি।

তোকে দেখে যাবার সময়, আমাকে বলে গেলেন এই রকম মেয়েই চাচ্ছিলাম বেয়ান।

তরু — শাশুড়ী যদি দেখতেন আগে, তাহলে হয়ত এ বিয়ে হোত না।

মা — কেন তাঁর কি পছন্দ হয় নাই?

তরু — গাল দেন তো সর্ব্বদা, পছন্দ অপছন্দ বুঝি না।

তরুকে তার মা বার বার বলেছেন, যারা গাল দেয় তারা ভালও বাসে, যাই হোক শ্বশুর বাড়ীর নিন্দে কখনও এখানে কারো কাছে করবে না।

তবে আমার কাছে সব কথাই বলতে পার।

তোমার ও বাড়ীর বৌদিকেও বলো না। তোমার বৌদি যদিও খুব ভাল মেয়ে। সে তোমাকে খুব ভালবাসে। তোমার কষ্টের কথা শুনলে দুঃখ পাবে। দরকার কি অকারণ নিন্দে করা।

মা — তোমার যে ওখানে কষ্ট হচ্ছে সে তো বুঝি, কিন্তু কিছু জান না, আমরা শেখাই নাই সবই ঠিক, কাজ শিখিয়ে নেওয়ার পর তারপর আর গাল দেবেন না।

মায়ের অবস্থা খুব ভাল না হতেই তরুর ফিরবার সময় হয়ে এল। মা বসে বসে তরকারি কুটে দেয়, ভাতের হাঁড়ি নামাতে যায়। বসে বসে ভাত বেড়ে দিতে যায় সবাইকে। দুধটা জাল দেওয়া মাছটা ভেজে রাখা। বাবা কিম্বা বড়দার আড়ালে এইসব কাজ করবার জন্য ছটফট করতে থাকেন।

এই সব কাণ্ডকরে ভাল মানুষের মত শুয়ে পড়ে। দাদারা কেউ দেখলে ভয়ানক গোলমাল হোত। বড়দা আমাকে ডেকে এক দিন বললেন মাকে রান্না ঘরে ঢুকতে দিস না, ঘরে খিল দিয়ে কাজ করবি।

বড়দাদা — তরু তুই কি মাকে বারণ করিস না?

তরু — অনেকবার বারণ করি শোনে না। খালি বলে এখন বেশ ভাল আছি।

বড়দা — ভাল যদি থাকে তাহলে তোকে কালই রেখে আসি। মাঐমা রেগে আছেন জানিস তো? আরও দেরি হলে আর কোন অবস্থাতেই পাঠাবে না এটাও ঠিক।

মাকে সমস্ত কথাই তরু বল্ল, মা কেঁদে কেটে বল্ল শরীর যখন ভাল থাকে তখনই যাই আর রান্না ঘরে যাব না। আরও কিছু দিন তরুকে রাখতে ইচ্ছা করে। শরীরের অবস্থা ইত্যাদি জানিয়ে বড়দাকে দিয়ে সেই দিনই ভবানীকে চিঠি পাঠালেন। ভবানীর চিঠির উত্তর এল না। শ্বশুর তরুকে লিখলেন অমুক দিন বাড়ী যাব, তার আগে তুমি বাড়ি এস। বাড়ী গিয়ে তোমাদের না দেখলে ভাল লাগে না। বাড়ী গিয়ে ভাতই খাব, অন্য খাবার রেখো না। আশা করি বেয়ান ভাল আছেন। চিঠির উত্তর দিও না কারণ পাব না, তার আগেই রওনা হব। তরুকে রাখবার

আর কোনই উপায় নাই।

তরুর বাবার অবস্থা আগে খুবই ভাল ছিল, বিরাট জমিদার তাছাড়া ডাক্তারীও করতেন। বাড়ীতে গোমস্তা, পেয়াদা, চাকর ধান ভানার লোক গরু রাখবার লোক তারা কেউ এক বেলা কেউ দু বেলাই খেত। তরুর বাবার একটা ঘোড়া ছিল তার নাম লালমন। সেই ঘোড়ায় চড়ে রোগী দেখতে যেতেন। ক্রমে অবস্থা খারাপ হয়ে এল, সরিকের সম্পত্তি রাখবার জন্য তরুর বাবা এবং তরুর বাবার জেঠতুতো ভাই, দুজনেই প্রবল হয়ে উঠলেন। কেউ কম নয়, ভাই ভাই ঝগড়া। জমি নিয়ে মামলা কায়েমী করে বেড়া দেওয়া এই হল তাদের কাজ। এমন শিক্ষা হয়ে গিয়েছিল যে বাড়ীর ছেলে মেয়েরা থেকে আরম্ভ করে বেড়াল কুকুর পর্য্যন্ত পাশের বাড়ী যেত না। তরুর বেশ মনে পড়ে একবার তরুদের একটা কুকুর উঠোনে শুয়ে ছিল। পাশের বাড়ী থেকে তরুর জেঠা মহাশয় তুতু করে ডাকছেন। কুকুরটা কান খাড়া করে ভাল করে শুনে আবার ঘাড় নামিয়ে শুয়ে রইল। কখন কখন বিয়ে পৈতা বা অন্নপ্রাসনে দু বাড়ীর লোক এক হয়ে যেত। দালানের বারান্দায় দুটো দরজা খুলে দেওয়া হোত, তখন এক বাড়ী হয়ে যেত। আবার ঝগড়া হলে সেই দরজা পেরেক দিয়ে কায়েমী করে বন্ধ করিয়ে দিতেন তরুর বাবা।

প্রায়ই আমিন, কাছারীর পেয়াদা, নাজির আসতে লাগল, শেষে মাল ক্রোক করবার জন্য তারা বাধ্য হল। বাকি খাজনার জন্য কোন সরিকই বাঁচতে পারে না। এক সরিক হয়ত দিল অন্য সরিক দেয় নাই কাজেই টাকা ফেরৎ আসে। টাকাটা ফেরৎ এলেই তরুর বাবা সেটা খরচ করে ফেলেন, কিন্তু তরুর জেঠা তার টাকা ফেরৎ এলেই সেটা জমিয়ে রেখে দেন, পরে তরুদের বড় একটা মহল কিনে ফেলেন। তরুদের অবস্থা এমন হয়ে গেল যে সব সময় বাড়ীর সবারই বিষণ্ণ ভাব, গোমস্তা পেয়াদা প্রত্যেকই গম্ভির। নাজির আসবে তরুর বাবা কার কাছ থেকে যেন শুনে এসে বাড়ীতে বললেন। তখনই লোহার সিন্দুক, বাসনের বাক্স, খাট, চৌকি চেয়ার, টেবিল, ধান সমস্ত জিনিষ গ্রামের বড় বড় বাড়ীতে রাখা হল, যাতে ওরা এসে কিছু না পায়। দুই বাড়ীর প্রায় একই অবস্থা।

ভোর ৪টের আগে চাকররা উঠে গোরু বাছুর ও ঘোড়া নিয়ে গোয়ালের পিছনে সুপারি বাগানে বেঁধে রেখে আসতো। বেলা হলে গোরু দুইয়ে মাঠে নিয়ে যেত। বাড়ীর ভিতরের কাজেও ঐ প্রকার দামী যে সব জিনিস ব্যবহার হোত, সেগুলি ভোরে উঠে এমন জায়গায় রাখা হোত যে নাজির এসেছে শোনা মাত্র সরিয়ে ফেলা যায়। শেষটায় সস্তা দামের বাসন আর কলা পাতায় কাজ চলত।

বাড়ীতে ঔষধের আলমারী ৭টা ছিল। সমস্ত তছনছ হয়ে গেলে, কোন কোন বাড়ী। কি কি জিনিষ গেল তার একটা হিসাব পর্য্যন্ত রাখবার সময় কারো হয়ে ওঠে নাই, পরে অনেকেই ছোট খাট জিনিষ থেকে আরম্ভ করে বড় জিনিষগুলি পর্য্যন্ত অস্বিকার করেছে। সেই ব্যাপার নিয়ে কিছু কাল হৈ চৈ, তরুর বাবা বলেন আমার বেশ মনে আছে পাথরের যাবতীয় থালা বাটি গ্লাস তোমার এখানেই রেখেছি, তিনি বলেন না রাঙ্গাকাকা আপনি ভুল করছেন, ওগুলো অন্য কোন বাড়ী হয়ত রেখেছেন। মোট কথা এই ভাবে যাবতীয় জিনিস হাতছাড়া হয়ে গেল। লোহার সিন্দুকটা, প্রকাণ্ড সামিয়ানাটা খাট আরও কতক গুলো জিনিস তারা তরুর বাবার জিনিস বলেই স্বিকার করত, কারণ সেগুলি হজম করা তাদের উপায় ছিল না।

জেঠা মশায়রা ভাই বোনে ১৬/১৭ জন ছিল, তরু মাত্র ৫ জনকে দেখেছে। তিন পিসি এক কাকা এক জেঠা আর সবাই মারা গেছে। তরুর বাবার কোন ভাই ছিল না। (আগের পক্ষের এক বোন) তিন বোন ছিল, দুই বোন সধবা মারা যায় এক বোন বিধবা হয়ে বাড়ী এ

সে লেখাপড়া শিখে স্কুল খুলেছিলেন। তরুর ঠাকুর্দা দুইবার বিয়ে করেছিলেন আগের পক্ষের মাত্র একটি মেয়ে হয়েছিল, তার বিয়ে দিয়েছিলেন। মেলা নাতি নাতনী রেখে তিনি মারা গেছেন। কয়েক বার তরু তাঁকে দেখেছে কিন্তু ভাল করে মনে পড়ে না। ও বাড়ীর কাকা খুব ভাল। তরুকে মা বলে ডাকতেন, আর সত্যিই তিনি স্নেহ করতেন। তিনি যখন কাউকেই বলে বুঝিয়ে ঠিক করতে পারলেন না তখন তিনি বাড়ী থেকে চলে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন যে এই সম্পত্তির কিছু অংশ তিনি চান না, তিনি শান্তি চান সুতরাং বাড়ীতে থাকতে হলে মারামারি ঝগড়া ঝাটি করতেই হবে এ অসম্ভব।

তিনি উড়িষ্যায় কোন স্কুলে মাষ্টারী করতে লাগলেন, আর মাঝে মাঝে তরুর জেঠাকে চিঠিতে জানাতে লাগলেন যে এখনও যা সম্পত্তি আছে অন্তত কিছু বিক্রি করে বাকি খাজনা ইত্যাদি মিটিয়ে সুখ শান্তি আবার ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করো। যাই হোক এই সব উপদেশ বা অনুরোধ কোন কাজে লাগে নাই। যথারীতি আমিন আসে, জায়গা মাপা হয়, আবার কিছুদিন চুপচাপ। কাছারীর পেয়াদা এলে তাকে গালাগাল দিয়ে তাড়ানো হত, আর নাজির এলে তাকে ঘুষ দিতে হত, ঘরে মাল তো নেই কাজেই তাকে খুসী করবার জন্য এই ব্যবস্থা। তা ছাড়া প্রায়ই বলতে শুনেছি বাবু বাড়ীতে নেই, ৩/৪ দিন আগে নড়াইল গিয়েছেন। তখন হয়ত বাবু ঘরের ভিতর ঘন ঘন পাইচারি করছেন। দেখে মনে হত যেন, বাবুকে কেউ এই ঘরে বন্দি করে রেখেছে, কেউ তখন সামনে যেতে সাহস করত না।

তরুর বাবা নিজে খুব বেশী কথা বলতেন, অন্যকে কথা বলবার অবকাশ দিতেন না। তরুর জেঠা ছিলেন ঠিক তার বিপরিত। অন্যকে দিয়ে কথা বলাতেন নিজে চুপ করে থাকতেন, অতি চতুর ছিলেন এবং পরের সর্ব্বনাশের চেষ্টা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারতেন না। এই মোটামুটি তাঁদের ইতিহাস।

তরু প্রায় মাস খানেক আগে শ্বশুর বাড়ীতে এসেছে। আসবার সময় তরুর হাতের দুগাছি চুড়ি তার মায়ের হাতে পরিয়ে দিয়ে এসেছিল, অসুখে অসুখে অত্যন্ত রোগা হয়ে যাওয়াতে হাতের শাঁখা প্রায় খুলে পড়ে যাওয়ার মত হয়েছিল, ঘরে তখনও অনেক সোনার গহনা ছিল। কিন্তু তরু কোন দিন মায়ের গায়ে সোনার গহনা দেখে নাই।

দুগাছা চুড়ি পরবার জন্য অনেক করে বলাতে শেষে বলেছিলেন চুরি ডাকাতির পরে গহনা আর পরব না বলে প্রতিজ্ঞা করেছি আর এখন পরতে ভালোও লাগে না।

তরুর বিয়ের অনেক দিন পরে একটি মেয়ের হাতে দুগাছি সোনার চুড়ি দেখে তরুর খুব পছন্দ হয় এবং তার মাকে বলে, তার মা মেয়ের মনের ইচ্ছা বুঝতে পেরে ঠিক সেই রকম গড়িয়ে দেন, কিছু কালের মধ্যে সেই চুড়ি প্রায় প্রত্যেকেরই হাতে, তখন সেই চুড়ির উপরে তরুর আর লোভ ছিল না। যাই হোক আবার যখন আসব তখন নিয়ে যাব এই কথা ছিল। তরু জলের ঘটি হাতে গামছা কাঁধে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে ভবানীর পা ধুইতে দিতে লাগল উঠোনে। ভবানী যখন নদীতে চান করতে যান, শীত কাল হলে জল গরম করে তরু ঘর বার করতে থাকে, এলেই সঙ্গে সঙ্গে ধুইয়ে না দিলে অনেক কথা শুনান।

তরুর হাতের দিকে তাকিয়ে ভবানী বললেন সে চুড়ি কোথায়?

তরু — বাড়ীতে মায়ের হাতে আছে আনতে ভুলে গেছি।

তরু ভাবল এই কথা বললে হয়ত ভবানী থামবে,কিন্তু ভবানী না থেমে বলতে আরম্ভ করলেন।

তোমার ভাইরাও তো দিয়ে যেতে পারত, কতবার তো আসে যায়। শুনি যে তোমার

বাবার ঘরে কত সোনা দানা, দশটা না, পাঁচটা না, একটা মেয়ে, কত জিনিষ দিতে পারে। তা না একটা জিনিষ দিয়ে আবার নিল কি করে? আমরা হলে লজ্জায় মরে যেতাম।

তরু — নেয় নি আবার দেবে, ভাইদের কাছে দিয়ে সাহস পান না ওরা যদি হারিয়ে ফেলে।

তরু ভাত বাড়তে গেল। ভবানী লক্ষী পুজো সেরে খেতে বসলেন। তরুর বাপের বাড়ীর গল্প আরম্ভ করলেন। বৌমা তোমাদের তো গুড় কিনতে হয় না, গতবারে যেমন কিছু গুড় দিয়েছিল তোমার মা কত দিন গেল। এবারেও তোমার মাকে লিখে দিও মন দুই ডাল আর গুড় যেন পাঠায়।

নৌকায় আসা যাওয়া, কত মোয়া মুড়কি নাড়ু পাঠাতে পারে। তোমাদের কত প্রজা সব বিনি পয়সায় কাজ করে দেয়, আমি না হয় দাম দেব। এখানে দুধের সের ৪ পয়সা আর তোমাদের ওখানে তিন পয়সা। তেমন মা হলে প্রতি দিন মেয়ের বাড়ী জিনিষ পাঠাত।

তরু — মায়ের অসুখ সেই জন্য কিছু করতে পারছেন না। তবে গুড় নাকি আমার জন্য একটা বড় জালা ঠিক করে রেখেছেন, সেটা প্রজাদের বাড়ীতেই আছে সুবিধা মত পাঠাবে।

ভবানী — রায় বাড়ীর রানী এসেছে দেখেছ।

তরু — এসেছে নাকি দেখি নাই তো।

ভবানী — যদি যেতে চাও তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নাও, বেড়াতে নিয়ে যাব। রানীর হাতে কি সুন্দর চুড়ি খুব কম সোনায় কত সুন্দর জিনিষ দেখবে। ঐ রকম চুড়ি তিন গাছা করে পরলে হাত ভরা লাগে। তুমি আবদার করে মাকে বলো যখন যা তোমার ভাল লাগে।

তরু — এখন কিছু চাওয়া যায় না। বাবা অনেক ধার দেনা করে ফেলেছেন, সব সময় খালি অভাবের কথা শুনতে হয়।

ভবানী — ঘরে তো সোনা আছে, কিছু তোমাকে তো দিতে পারে।

তরু — ৭ ভাইয়ের বৌদের জন্য ঠাকুমা সব সেকালের গহনা ভাগ করে রেখে গেছেন।

(অসমাপ্ত)

সম্পাদকীয় সংযোজন : এই রচনাটি লেখিকা কখনই প্রকাশিত হবে ভেবে লেখেননি। তাই লেখাটির মধ্যে কথ্যভঙ্গির এক বিরল প্রসাদগুণ ছড়িয়ে রয়েছে। একান্ত ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণের ঢঙে লেখা রচনাটিতে কিছু কিছু গুরুচণ্ডালি ঘটিত ত্রুটি এবং অশুদ্ধ বানান রয়েছে। বহু জায়গায় যতিচিহ্নেরও কোনো পরোয়া করা হয়নি। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের রচনা হলেও লেখাটির সরসতা এবং আকর্ষণীয় প্রকাশভঙ্গি আজও পাঠকের কাছে সমাদৃত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। একইসঙ্গে এক তরুণী গৃহবধূর মর্মবেদনা, লেখাটি পড়তে পড়তে আমাদের আচ্ছন্ন করবে।

লেখাটিতে শুধুমাত্র কিছু অনিবার্য যতিচিহ্ন সংযোজন করে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে সামান্য সংশোধন করে প্রায় অবিকৃতভাবেই রচনাটি আমরা ছাপলাম। লেখাটিতে বহু জায়গায় ব্যবহৃত একই শব্দের বানানের সমতাও অনেক সময় রক্ষা করা হয়নি।

জ্যোৎস্না দেবীর সংসার

হিমানীশ গোস্বামী

আমার কাছে কেমন করে জানি না, মায়ের একটা হিসেব লেখার খাতা রয়ে গেছে। এটিতে পাচ্ছি ৩০ এপ্রিল ১৯৪৮ থেকে ১৯৪৯ এর ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত আমাদের কলকাতার 'বাসাবাড়ি'র খরচের হিসেব। বিবর্ণ এই খাতার মলাটে ছাপার অক্ষরে লেখা — The Universal Exercise Book, এরপর ছোটো করে লেখা — Made of Titaghur Paper। অতি সাধারণ খাতায়, অতি সরল এবং সংক্ষিপ্তভাবে বাড়ির হিসেবপত্র লেখা। এর আগে এবং পরেও নিশ্চয় হিসেবের খাতা রাখা হয়েছিল, কিন্তু সেগুলি হারিয়ে গেছে। ওই খাতা থেকে কিছু কিছু হিসেব এখানে এই কথা ভেবে দিচ্ছি যে এই হিসেবগুলি পঞ্চাশ বছরেরও বেশি পুরোনো। পুরোনো বলেই এর একটা মূল্য আছে, আর আমার কাছে এটি মায়ের নিজের হাতে নিজের সংসারের খরচ লেখার জন্য আরও বেশি আকর্ষক। শাশুড়ি শাসন থেকে বেরিয়ে আসা, নিজের সংসারের আর্থিক ভার পাওয়া এবং মোটামুটি নিজের ইচ্ছেয় খরচ করার যে স্বাধীনতা তিনি পেয়েছিলেন সে স্বাধীনতা তাঁর কাছে নিশ্চয় ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্টের স্বাধীনতার চেয়ে কম কিছু ছিল না। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৮, এই এগারো বছর এবং এরও পরে ১৯৫৭ সালের অনেকটাই কলকাতার বাসাবাড়ি ছিল তাঁর নিজেরই সংসার। ৩০ এপ্রিল ১৯৪৮ সালের হিসেব দেখতে পাচ্ছি, তাতে মায়ের হাত দিয়ে খরচ হয়েছে এই রকম : বাজার ২ টাকা (টাকা বোঝাতে ২-এর পর একটা হসন্তের মতো চিহ্ন), মেথর ১ টাকা, মাখন রুটি ২ টাকা। দেখা যাচ্ছে সেদিন বেশি লিখতে হয়নি। পরদিন ১ মে, সেদিনও বাজার ২ টাকা, মাখন ৭ আনা, রুটি ১০ আনা। নতুন পাঠকদের বলা প্রয়োজন, তখন এক টাকা ছিল ৬৪ পয়সায় অথবা ১৬ আনায়। এক আনা ছিল এখনকার হিসেবে ৬ পয়সার একটু বেশি। ৩ মের হিসেবে দেখছি বাজার ২ টাকা, চিনি ৮ আনা, হিমুকে ৮ আনা, নাপিত ৮ আনা (নিশ্চয় দু-জনের, কেন না ওই সময়ে সেলুনে চুল কাটতে লাগত ৪ আনা থেকে ৬ আনা। এরপর লেখা 'আজ হিমুর (অর্থাৎ আমার) পরীক্ষা আরম্ভ হল।' ৪ মে ১৯৪৮ এর ব্যাপারটা বেশ জমকালো। মাসকাবারি বাজার বলে নানা রকম জিনিসের হিসেব। বাজার এ-দিনেও ২ টাকা, হিমু ৮আনা, মুটে ১ আনা! ডাল, সাবান, সরষের তেল, মসলা, চিনি, কয়লা, নুন, টুথ পেস্ট, দোক্তাপাতা (মায়ের এই একটা নেশা ছিল, পানের সঙ্গে দোক্তা খাওয়া), চায়ের দুধ, চা ইত্যাদি ৪০ টাকা। এ ছাড়া ওই দিনই সিঁড়ির আলোর জন্য ১০ আনা, দীপুর মাইনে ১৬ টাকা — ফাইন ১ টাকা, মাখন রুটি ২ টাকা চার আনা। এরপর লেখা — স্বাধীনতার দাম ১ টাকা সাড়ে ১৫ আনা!! এটা একটা অদ্ভুত হিসেব মনে হতে পারে। স্বাধীনতার দাম কি অত কম? কিন্তু আসল কথাটা হল এই যে বাবা খবরের কিছু কাগজ অফিস থেকে পেতেন, যেমন অমৃতবাজার, যুগান্তর, আনন্দবাজার পত্রিকা ইত্যাদি, কিন্তু কমিউনিস্টদের খবরের কাগজ স্বাধীনতা কিনতে হত। এরপর ওইদিনই চিঁড়ে ইত্যাদি ১ টাকা, খাম পোস্টকার্ড ১ টাকা। এখানে বলে রাখি মা হিসেব ঠিক বুঝতে পারতেন না। একদিন মাকে বললাম মা এক টাকায় ২০ টা পোস্টকার্ড পাওয়া যাচ্ছে, একটা টাকা দাও কিনে রাখি, পরে দাম বেড়ে যেতে পারে। আসলে তখন একটা পোস্টকার্ডের দাম ছিল ৩ পয়সা, ২০টির দাম ৬০ পয়সা, এবং এক টাকা দিলে চার পয়সা ফেরত পাবার কথা! মা সরল মনে টাকাটা দিয়ে দিলেন। এটা একবারই

করেছিলাম কেন না পরে তিনি বুঝে গিয়েছিলেন চালাকিটা। এরপর ওই দিনেই লেখা — আজ লিলি দীপু কলেরার ইনজেকশান নিল।

তখন বাড়িতেআট কি ন-জন লোক। আমরা ছাড়াও আত্মীয় অতিথি কেউ কেউ থাকতেন। মামারাও মাঝে মাঝে থাকতেন। দুই মামা ভিন্ন সময়ে আমাদের বাড়িতেই থেকে পড়াশুনা করেছেন। ছোটোবাড়িতে ছোটো ছোটো পাঁচখানা ঘর, এর উপর একটা আবার কয়লার ঘরও। রান্নাঘর আর খাওয়ার ঘর একটাই। খাওয়ার ঘরে আসন পেতে খেতে বসা হত। মাঝে মাঝে বেরালগণও নিজেদের পুষ্যি হিসেবে আমাদের উপর নির্ভর করে থাকত। ওদের জন্য মাঝে মাঝে দু-এক পয়সার খুদে খুদে চুনোপুঁটি আনা হত। ওজনে মনে হয় অন্তত দুশো গ্রাম হত। এটা বলার উদ্দেশ্য এই যে ওই খুদে খুদে বেরাল-ভোগ্য মাছ এখন কলকাতার বাজারে পাওয়া যায় না এবং পাওয়া গেলে তার দাম পোনা মাছের চেয়েও বেশি!

এইবার দাদা শতদলের কথা বলি। শতদল এরই মধ্যে প্রায় নিয়মিতভাবে প্রুফ দেখে ভালই আয় করতেন। দিনে, আমার ধারণা, দু-তিন টাকাও হত। দু-একটি পত্রিকায় তাঁর কবিতা ছাপা হত। গল্প ছাপা হত সচিত্র ভারতে। মজাদার গল্প লিখতেন তিনি। মৃত্যুর কয়েক বছর আগে দেশ সম্পাদক সাগরময় ঘোষ তাঁকে ডেকে এনে বেশ কয়েকটি রচনা লিখিয়েছিলেন। দাদাঠাকুর, প্রেমাংকুর আতর্থী, হেমেন্দ্রকুমার রায়, শশীশেখর বসু, শিবরাম চক্রবর্তী সম্পর্কে তাঁর লেখাগুলি তখন উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল। তিনি আমাদের মেজমামা জ্ঞানেন্দ্রনাথ বাগচীকে নিয়েও একটি লেখা লিখেছিলেন। এই মেজমামাও আমাদের বাড়িতে বেশ কিছুদিন ছিলেন। ইনি ১৯৫৮ সালে মারা যান। যাই হোক, মায়ের লেখায় দেখছি — 'শত আজ শান্তিপুরে বেড়াতে গেল।' হিসাবে দেখা যাচ্ছে শত ১ টাকা! তারিখ ২৭ মে, ১৯৪৮, পরের দিনের হিসেবের খাতায় লেখা — 'আজ শত শান্তিপুর থেকে এল।' অর্থাৎ কেবল বাজারের হিসেব মাত্র নয় মাঝে মাঝে এটি ডায়েরিরও কাজ করেছে। ওই বছরেরই জুন মাসের ২ তারিখে লেখা — হিমুর জুতো ১টাকা ৮ আনা। কী জুতো মনে নেই, তবে ওই সময় কাবুলি চপ্পল ছিল আমার পছন্দের। ওই দিনেই গুঁড়ো দুধ কেনা হয়েছে ৩ টাকা ৮ আনায়। ১৯৩৯-৪৫ এর যুদ্ধের সময় এবং পর থেকে গুঁড়ো দুধ কলকাতার মধ্যবিত্তদের বাড়িতে প্রচলিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে বলি — যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মার্কিন সৈন্যদের ফেলে যাওয়া খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য দ্রব্য ডিস্‌পোজালস্‌ বিভাগ থেকে খুব কম দামে বিক্রি করা হত। গুঁড়ো ডিম, গুঁড়ো আলু এ-সবও খুবই কম দামে পাওয়া যেত। একটি কথা বললে এ-কালের পাঠকগণ ভাববেন এটা নিশ্চয়ই ঠিক নয় — কিন্তু পাঁচ পাউন্ড ওজনের টিনে ভরা ক্র্যাফট চীজ কিনতাম প্রতি টিন এগারো টাকায়। ওই আমাদের প্রথম চীজের স্বাদ গ্রহণ। রাস্তায় ঢেলে বিক্রি হত কত রকমের জিনিস। সেলোটেপ, খাওয়ার বা চোষা যায় এমন তামাক — অতি সস্তায়। খেলার তাস ক্যারাভান কিনতাম প্রতি প্যাকেট পাঁচ আনায়! জিলেট ব্লেড পাওয়া যেত প্রতি প্যাকেট ৫ আনায়, তাতে থাকত ১০টি ব্লেড।

একবার পেয়েছিলাম প্রচণ্ড টেকসই পেতলের তৈরি কম্পাস্‌ বা দিগ্‌দর্শন যন্ত্র, সেটি ছিল ঠিক পকেট ঘড়ির মতো — একটা চাকা ছিল, কম্পাসটি দেখতে হলে সেই চাকাটি খুলতে হত। একদিন এসপ্ল্যানেডে দেখলাম একজন ফুটপাথে প্রায় দু'শো কম্পাস বিক্রি করছে। "লেলে বাবু ৮ আনা!" আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার পকেটে যা ছিল তা দিয়ে তিনটি কম্পাস কিনে ফেললাম। সঙ্গে ছিল আমার বন্ধু মানব মিত্র। একটি সে পরে আমার কাছ থেকে কিনে নিয়েছিল। একটি কম্পাস এখনও আমার অধীনে কর্মরত!

ফুটপাথে ঢেলে বিক্রি হত টিনে-ভরা মাছ। হেরিং এবং সারডিন। দুটো মাছই ইউরোপ আমেরিকায় অতি সাধারণ। হেরিং খুবই শস্তা, কিন্তু আমার কাছে টিনের হেরিং-এর স্বাদ ছিল বড়ই উত্তম। ৩ আনা করে আধ পাউন্ড ওজনের মাছ কিনে আনতাম বাড়িতে। দু-একবার টিনে ভরতি রান্না করা (অর্থাৎ সামান্য মসলা দিয়ে সেদ্ধ করা) গোরুর মাংসও কিনেছি। তবে বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে মিলে লুচি সহযোগে খেয়েছি কোনও বন্ধুর নিরাপদ আস্তানায়। দু-পাউন্ড রান্না করা ওই রকম মাংসের দাম নিত ১ টাকা ১২ আনা। চুইংগাম পাওয়া যেত অজস্র। ১ আনা করে ১০টির প্যাকেট, ৫ প্যাকেট চার আনায় সস্তাই মনে হত তখন। চকোলেট পাওয়া যেত এক একটি ৪ আনায়, তবে অনেক সময়েই গরমে তার স্বাদ তত ভালো থাকত না। চকোলেট সর্বদা ভালো না হলেও টিনে করা কোকো—এক পাউন্ডের দাম নিত ১২/১৪ আনা, খেতে ছিল ভারি চমৎকার। চকোলেটের পুরো স্বাদই পাওয়া যেত, তবে গুঁড়ো অবস্থায়। রাস্তায় ঢেলে বিক্রি হত টিন টিন চিনা বাদাম, এক এক কৌটো ১০ আনা, একটু বেশি মনে হত দাম, কিন্তু অত ভালো চিনে বাদাম আর এ-দেশে খাইনি, সেগুলি ছিল আমেরিকায় ভাজা, সামান্য নুন দেওয়া বড়ো বড়ো আকারের বাদাম। আমাদের চিনে বাদাম এখনও উন্নত হয়নি।

কিন্তু সব চাইতে যে বিষয়টি আমাদের ভালো লাগত তা হল ১ আনা, ২ আনা, ৩ আনা দামের ব্রিটিশ বা আমেরিকান সাহিত্যের ভালো ভালো বই। পকেটে রাখা যায় এমন আকারে তৈরি। ক্লাসিক যেমন মার্ক টোয়েন, থরো ডিকেন্স ওয়েলসদের বই, (আধুনিক ক্লাসিক বলা যায়) এমনই পেয়েছিলাম জীবনে প্রথম জেমস্‌ থারবার, রবার্ট বেঞ্চলির সব অপূর্ব মজাদার লেখা।

অনেক কথাই মনে পড়ে যাচ্ছে — একটা থেকে হঠাৎই যেন পিচ্ছিল পথে অন্য পথে চলে যাচ্ছি। বলে রাখি এই সময়ে মায়ের মে মাসের ২১ তারিখে দেখছি ট্রাম ভাড়া বাবদ হিসেব - ২ পয়সা। অর্থাৎ সেকেন্ড ক্লাসের ভাড়া, দুপুরে ১২টা থেকে ৪টে পর্যন্ত বিশেষ ছাড় পাওয়া যেত ১ পয়সা করে। এ-সব কথা লেখা নেই হিসেবের খাতায়। তবে মনে পড়ছে। তখন শ্যামবাজার-এসপ্ল্যানেড-ডালহৌসি স্কোয়ারের মাসিক টিকিটের দাম ছিল ৪ টাকা ৪ আনা। আর রবিবার এবং ছুটির দিনে 'সারা দিন ট্রাম গাড়িতে, মাত্র ৬ আনা!'

১৮ই জুনের হিসেবে দেখছি — বেতারজগত ৩ আনা। তখন রেডিয়োতে বাবা মাঝে-মাঝেই কথা বলতেন, ওঁর লেখা ছাপা হত কখনও, কিন্তু প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই ওঁর তোলা রেডিয়ো শিল্পীদের ছবি ছাপা হত। জুলাই মাসের ৫ জুলাইতে লেখা আনন্দবাজারের দাম ৩ টাকা ১২ আনা, অর্থাৎ ওই সময়ে আনন্দবাজারের দাম ছিল প্রতিদিন ২ আনা, গত জুন মাসের ৩০ দিনের কাগজের দাম। ১১ জুলাই সংবাদ কাগজ ১ আনা, এটা ঠিক কি বোঝা গেল না, পরে ১৩ জুলাইতে সংবাদ কাগজের দাম লেখা আছে ১ টাকা ৪ আনা। মনে হয় "সংবাদ" নামক কোনও একটি দৈনিক কিংবা সাপ্তাহিক পত্র ওই সময় প্রকাশিত হত। এই নামের কোনও কাগজের কথা আমার মনে পড়ে না অবশ্য।

এবারে হিসাবের খাতা বেয়ে আর একটু এগিয়ে যাই —সাধারণত বাজার খরচ প্রতিদিন দু টাকা কি তিন টাকা হত, কিন্তু ১২ আগস্ট ১৯৪৮ সালে হঠাৎ দেখি খরচ হচ্ছে ৫ টাকা ৮ আনা! এর কারণ কি আমার জানা নেই, হয়ত বাইরের কোনও আত্মীয় বা বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল খাবার।

২৪ আগস্ট একটা অদ্ভুত জিনিস কেনার খবর পাওয়া গেল হিসেবের খাতায় — মাটি

৪ আনা! সত্যি কথা বলতে কি মাটি ভরা গ্রাম ছেড়ে যখন কলকাতায় আসি তখন মোটর গাড়ি, বড়ো বড়ো প্রাসাদ, মেডিক্যাল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, জাদুঘর চিড়িয়াখানা দেখে যত না বিস্মিত হয়েছিলাম তার চাইতে বেশি বিস্মিত হয়েছিলাম মেয়েরা কাঁকে করে ঝুড়িতে মাটি বিক্রি করছে দেখে! তারা বলত মাটি লেবে গো, মাটি! প্রথমদিকে দেখেছি ১ আনায় এক ঝুড়ি পাওয়া যেত, সে দাম এগারো বছরে দ্বিগুণ হয়েছে। ৩০ আগস্ট মা লিখছেন আরও একটি অদ্ভুত জিনিস — বাজে ঘি ১ টাকা ৮ আনা! বাজে ঘি ব্যাপারটা ঠিক বোঝা গেল না। মনে হয় ভাল ঘি মনে করেই কেনা হয়েছিল, পরে বোঝা যায় সেটি বাজে। ১ সেপ্টেম্বর একটা বেয়ারিং চিঠি নেওয়া হয়েছিল — খরচ? ২ আনা। ৩ সেপ্টেম্বর দেখছি লেখা নারানবাবুকে আসাবাবপত্রের জন্য ২০ টাকা। এখানে বলা দরকার বিখ্যাত বিপ্লবী নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ওই সময় পুরোনো আসবাবপত্রের ব্যাবসা করতেন। যেমন তিনি জলের দামে কিনতেন তেমনই বেচতেনও খুবই কম দামে। একটা বইয়ের আলমারি — চার পাল্লার, কেনা হয়েছিল, আমার বেশ মনে আছে মাত্র ১৫ টাকায়। সেটি ১৯৯৮ সালে বেশ খারাপ অবস্থায় তিনশো টাকায় বিক্রি করা হয়েছিল।

৮ সেপ্টেম্বর লেখা রয়েছে বাবুলের রবার স্ট্যাম্প ১ টাকা ৪ আনা। এই বাবুল বা বাবলু হলেন সরোজ আচার্য — অর্থাৎ আমার পিসেমশাইয়ের বড় ছেলে অভিজিৎ, যে বহু বছর হল আমেরিকাবাসী।

এরপর চলে আসা যাক ৪ সেপ্টেম্বরের মাসকাবারি বাজারের হিসেবে। সেদিন দৈনন্দিন বাজার খরচ ৩ টাকা, ঝিকে দেওয়া হয়েছে ৭ টাকা — এক মাসের মাইনে। কেনা হয়েছে ডাল মশলা, নারকেল তেল ৫ ছটাক। (১৬ ছটাকে ১ সের হত, ১ সের মোটামুটি আন্দাজে বলি এখনকার ৮৫০-৯০০ গ্রামের মতো।) চিনি ৫ সের, নুন, সাবান, কয়লা ৪ মন (৪০ সের মানে ১ মন), গুড় ২ সের, সুপুরি দোক্তা "ইত্যাদি"তে খরচ হয়েছে ৪৪টাকা! ইত্যাদির পরও কিছু খরচ হয়েছে ওই দিন, যেমন ট্রাম ২ আনা। প্রায় প্রতিদিনই ট্রামের খরচ লেখা হয়েছে, এটি কার জন্য তা লেখা নেই, বাবার তো একটা মান্থলি টিকিট থাকত। এরপর "মেজদার" (জ্ঞানেন্দ্রনাথ বাগচী) কাছ থেকে চাল নেওয়া হয়েছে ১৫ আনায়। উনি হয়তো ভালো কিছু চাল সংগ্রহ করেছিলেন, কেন না আমাদের মায়ের হিসেবের খাতায় র‍্যাশানের চালের কথাই দেখছি লেখা মাঝে মাঝেই, অন্যরকম চালের কথা এখনও চোখে পড়েনি। সিঁড়ির আলো ১০ আনা, এবং নূতন সংবাদ ১ টাকা ৪ আনা। মনে হচ্ছে এটি একটি সাপ্তাহিক পত্রই ছিল। এরপর মেথর ১ টাকা।

৭ সেপ্টেম্বরের হিসেবে দেখছি অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে শ্রীঘি কেনা হয়েছে ১ সের, দাম? ৭ টাকা ৮ আনা। ১৪ সেপ্টেম্বরে এক জোড়া ধুতি কেনা হয়েছে দাম পড়েছে ৯ টাকা ৮ আনা, আর ১ জোড়া শাড়িও, দাম ১২ টাকা ১ আনা! (পুজোর মাস)। ২০ সেপ্টেম্বর ময়দা চালুনি ১০ আনা — মনে হয় লুচির ব্যবস্থা হয়েছিল ওই সময়ে। ২৩ সেপ্টেম্বর কেনা হয়েছে বেলন, দাম পড়েছে ১ টাকা। ওই দিনে ক্যালসিয়াম কেনা হয়েছে ১ টাকা ২ আনার। ১৫ সেপ্টেম্বর কেনা হয়েছে জিলিপি, কত খরচ পড়েছে? ২ আনা! এরপর ২৭ সেপ্টেম্বর একটা অদ্ভুত খরচ। মা লিখছেন ইনজেকশন (বেরিবেরি) সবার জন্য ৫ টাকা। সাংঘাতিক ব্যাপার! কিন্তু ঘটনাটি আমার একেবারেই মনে ছিল না। ৩০ সেপ্টেম্বরে দেখছি "কালো" দুল এক জোড়া ৪ টাকা — কিন্তু পাশে দাম লেখা নেই। কালো, মনে হয় স্যাকরার নাম। ৪ টাকা হয়তো অগ্রিম।

৪ অক্টোবর দেখা যাচ্ছে ৬ টি গেঞ্জি কেনা হয়েছে — দাম? ১০ টাকা ৮ আনা। এর আগের একটা হিসেব উল্লেখ করি — (৩০ সেপ্টেম্বর) "জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের চাঁদা" ৫ টাকা। এটা বাবার ব্যাপার।

৮ অক্টোবর : "আজ দুধ নেওয়া বন্ধ করা হইল।" ৯ অক্টোবর : বিপ্রদাস থিয়েটারের খরচ ৯ আনা (বোধহয় রিকশা ভাড়া?) ১০ অক্টোবর : দুধওয়ালা ৫ টাকা ৮ আনা। ১৬ অক্টোবর : "সিগারেট ৭ আনা।" বাবা তখন সিগারেট চুরুট এবং পাইপ এই তিনটিই ব্যবহার করতেন। ২৫ অক্টোবর : শুকনো আলু ৩ টাকা ২ আনা। এটাই নিশ্চয় সেই আমেরিকানদের ফেলে যাওয়া ডিসপোজালস্ থেকে কেনা টিনে ভরা আলুর গুঁড়ো — একটি টিনে থাকত ৫ পাউন্ড ওজনের গুঁড়ো। ওই একই দিনে কেনা হয়েছিল শুকনো কপিও। দাম পড়েছিল ১ টাকা ৮ আনা। এটার কথা আমার মনে পড়ছে না। ১৬ অক্টোবর কেনা হয়েছে বিস্কুট আর বোর্নভিটা, দাম ৫ টাকা ৮ আনা। ৩০ অক্টোবর মা লিখেছেন — কয়লা চার মন দাম দেওয়া হয় নাই। ১ নভেম্বর কেনা হয়েছে ডি.ডি.টি., খরচ হয়েছে ৯ আনা। এই প্রথম ডি.ডি.টির উল্লেখ পাওয়া গেল। ৪ নভেম্বর একটা অন্য রকম ব্যাপার। সেদিন বাজার হয়েছে ২ টাকা ৮ আনা, কিন্তু মায়ের হিসেবে এটাও পাচ্ছি — "হোটেল থেকে ভাত ১০ আনা।" কেন হোটেল থেকে ভাত আনাতে হয়েছিল কে জানে। এবারে ৭ নভেম্বর জুতোর কালি — ৭ আনায় কেনা হয়েছে। "বাড়ী-ভাড়া" দেওয়া হয়েছে ৩৩ টাকা। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলি — বাড়িটা যখন প্রথম ভাড়া নেওয়া হয় ১৯৩৭ সালে তখন ভাড়া ছিল ৪২ টাকা। যুদ্ধের সময় কলকাতায় লোক অনেক কমে যেতে থাকল প্রথম দিকে — এই সময় আমরা আমহার্স্ট স্ট্রিটে একটা পুরো তিনতলা বাড়ি ভাড়া করতে চাইলাম, ভাড়া ৬২ টাকা! একতলা দোতলায় ২ টো করে ঘর, রান্না ঘর ইত্যাদি, এর উপরে ছাতের ঘর একটা। আলো এবং হাওয়া বেশ ভালোই। রামমোহন রায়ের বাড়ির উল্টোদিকে, সুকিয়া স্ট্রিটের কাছাকাছি। আমাদের বাড়িওলা ছিলেন ভক্তরাম মিত্র। তিনি শুনে বললেন, পরিমলবাবু আপনি এখানে থাকুন, ভাড়া কমিয়ে দিচ্ছি। ১৯৪২ থেকে ভাড়া ৯ টাকা কমে হল ৩৩ টাকা। বাবা এই রকম আশ্চর্য ঘটনাকে স্মরণীয় করে রেখেছেন তাঁর "হিটলার ও আমি" নামক একটি চমৎকার গল্পে। যেখানে দেখানো হয়েছে হিটলার যুদ্ধে যখন জিতছে তখন "আমি"র মহা আনন্দ। শহর থেকে লোক পালাচ্ছে আর বাড়িভাড়া কমে যাচ্ছে। পরের দিকে হিটলার যখন পরাজয়ের মুখে তখন ফের "আমি"র দুরবস্থা শুরু। লোকেরা সব শহরে ফিরে আসছে, বাড়িভাড়া দ্রুত বাড়ছে।

১৮ নভেম্বরে বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য নেই, তবে তিনটি জিনিসের দাম লিখে জায়গা না হওয়ায় মা লিখেছেন, "চতুর্থ কলমে দ্রষ্টব্য" — একটি পাতায় চারটি কলাম তৈরি করে নিতেন তিনি, কিন্তু এই পৃষ্ঠার চতুর্থ কলামটি ছিল খুবই সরু! যাই হোক এ থেকে এটা মনে করা যেতে পারে যে তিনি খবরের কাগজ পড়তেন। অর্থাৎ পড়ার সময় পেতেন।

মায়ের বই পড়ার একটা অভ্যেস ছিল। দুপুরে কাজকর্ম শেষ করে ঘুমোতেন — ঘুমোনোর আগে একটা না একটা বই পড়তেন। তিনি খুব পছন্দ করতেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা। বিভূতিবাবু কয়েকবার আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। একবার হল কি, বাবা বলবার আগেই মা বিভূতিবাবুর জন্য চা এবং বিস্কুট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। অথচ মা বিভূতিবাবু এসেছেন জানতেন না, কেউ তাঁকে বলেওনি। তবে কেমন করে তিনি বুঝলেন? — বুঝলেন বাবার ঘরের সামনের জুতো দেখে। "জুতোর কালি নেই, তালি দেওয়া — দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম।" মা পরে বলেছিলেন। ১৯ নভেম্বর "নারী সেবা সমিতির চাঁদা" ৮

আনা দিচ্ছেন মা, খাতায় লেখা আছে।

এগিয়ে চলে সময়। রেশন, বাজার চায়ের দুধ, বিস্কুট, ঘি, শাড়ি, ধুতি, জুতো, বিদ্যুতের দাম ইত্যাদির একঘেয়ে হিসেব চলতেই থাকে। টুথপেস্ট ১ টাকা ৬ আনা, " cod liver oil " দাম ৪ টাকা ৮ আনা। এক শিশি ডেটল ১ টাকা ৪ আনা। ওই বছরেরই ডিসেম্বর মাসে।

ডিসেম্বরের ৯ তারিখে উনুনের টিন কাটানো ৪ আনা ওই তারিখেই লেখা শতদল আজ জলপাইগুড়ি থেকে ফিরল। ওই মাসেই একদিন ফরেন-মেল দুই খানা ১২ আনা। ১৮ ডিসেম্বর দেখছি জামা রিপু করানোর খরচ ১৬ টাকা! এই পরিমাণ বেশ বেশিই মনে হচ্ছে। ডিসেম্বর মাসে দু-দিন ফিল্ম কেনার হিসেব পাচ্ছি — একদিন ১ টাকা ১৪ আনার অন্যদিন ৩ টাকা ১১ আনার। একদিন ফোটার দোকানে দেওয়া হয়েছে ২ টাকা ১৩ আনা। ১৯৪৯ এসে গেল। প্রথম দিনের একটি কথা "নববর্ষ উপলক্ষে শতদল ২ টাকার সন্দেশ দিয়েছে।" ৪ জানুয়ারি নারানবাবুকে দেওয়া হল ৩০ টাকা। নারায়ণবাবু অর্থাৎ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা আগেই বলা হয়েছে।

মায়ের লেখার মধ্যে দেখি নানা ভাবে ডিজাইন আঁকার চেষ্টাও হয়েছে। কলমের মাঝামাঝি বা দুটি তারিখের হিসেবের মধ্যে ফুলের মালার মতো ডিজাইন। মাকে কিন্তু ছবি আঁকতে দেখিনি কখনও।

৪ মার্চ ১৯৪৯, একটা কড়াই কেনা হয়েছে ২ টাকা ১০ আনা দিয়ে। ওই তারিখে ৪ মন কয়লা কেনা হয়েছে খরচ ৮ টাকা। কুলি খরচ ৩ আনা! তখন দেশলাইয়ের দাম প্রতিটি ১ আনা। ১২ মার্চ একটা অন্যরকম ব্যাপার — কাগজ বিক্রি ৯ টাকা। মা দেখছি লেবু লিখতেন না, লিখতেন নেবু! কিন্তু কমলা নেবু নয়, সেখানে হয়ে যেত কমললেবু। কলকাতার নেবু উচ্চারণ কেমন করে মা ব্যবহার করলেন? এর কারণ বাবাও লেবু না বলে বলতেন নেবু। এ নিয়ে বাবার সঙ্গে তর্কও হয়েছে, কেন না তিনি আমাদের "পূর্ববঙ্গীয়" উচ্চারণ শুনে আপত্তি করতেন প্রায়ই। ২৭ এপ্রিল ১৯৪৯ এ লেখা — ট্রাম বন্ধ। প্রায় প্রতিদিনই ট্রাম ১ আনা ২ আনা ইত্যাদি লেখা হত, তাই সেদিন ট্রাম বন্ধ লিখেছেন মা। মনে হয় এই সময় ট্রাম কয়েক দিন বন্ধ ছিল। টিকিট প্রতি ১ পয়সা ভাড়া বাড়ানোর প্রতিবাদে ট্রাম ধর্মঘট একরার দীর্ঘকাল চলেছিল। ১৪ মে ১৯৪৯ — ঝিকে দেওয়া হয়েছে ৮ টাকা। ১ টাকা মাইনে বেড়েছে। ১৪ জুন ১৯৪৯ — মায়ের লেখায় পাচ্ছি, "আজ পরিমলবাবু ইউপিতে রওনা হলেন।" বাবা এই ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখেছিলেন প্রবাসীতে। এই ভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন শিল্পী কালীকিংকর ঘোষ দস্তিদার। সিমলা ভ্রমণের সময় উনি কয়েকটি চমৎকার জলরঙা ছবি আঁকেন। সেগুলি এখনও রয়েছে। ২৯ জুনে লেখা — "পরিমলবাবু বাড়ী ফিরলেন।" ৪ জুলাই কেনা হয়েছে রেঞ্জার্স টিকিট। দাম ২ টাকা। ওই সময় আমাদের বাড়িওলার গাড়ির চালক মাঝে মাঝে বাবাকে ধরে টিকিট গছাতেন। ৯ আগস্ট ১৯৪৯ — "সরোজের জন্য পাইপ" ২ টাকা ৮ আনা। সরোজ হলেন পিসেমশাই সরোজ আচার্য, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড-এর সহ-সম্পাদক ছিলেন, পরে আনন্দবাজার পত্রিকার যুক্ত সম্পাদক হয়েছিলেন। ১৯৬৮ সালে তিনি মারা যান। ১৯৪৯ এর ৭ সেপ্টেম্বর— "হিমুর জুতো ১৬ টাকা ১১ আনা।" দামটা অদ্ভুত। কী জুতো? মনে নেই।

কয়েকদিন "পরিমলবাবুর" জ্বর লেখা হয়েছে হিসেবের খাতায়, ইনজেকশন ওষুধ ইত্যাদির খরচও লেখা আছে। শেষে নিশ্চিন্ত একটা সংবাদ (১০ সেপ্টেম্বর) "আজ পরিমলবাবুর জ্বর ছেড়েছে।" ৭ অক্টোবরে দেখছি " Taxi" ভাড়া ২ টাকা ২ আনা, যাওয়া হয়েছিল চশমার দোকানে। ৮ টাকা ৪ আনায় চকোলেট কেনা হয়েছে ৯ অক্টোবরে, বাবলু তপন আর রন্টুর

জন্য। রন্টু হল জয়ন্ত আচার্য, সরোজ আচার্যের দ্বিতীয় পুত্র, ১৯৯৯ এ পুকুরে ডুবে মারা গিয়েছে যাদবপুরে, তার বাড়ির কাছেই। তপন (ভট্টাচার্য) বাবলুদের পিসতুতো ভাই। ১৬ অক্টোবর "মায়ের জন্য এলাচ" ৬ পয়সা। ইনি অর্থাৎ "মা" হলেন ওঁর শাশুড়ি। দেশ ভাগের আগেই তিনি আমাদের কলকাতার "বাসায়"। এখন ছেলের বউয়ের হাতে সংসার। তাঁর সে দাপট আর নেই। এটাই বোধ হয় "পোয়েটিক জাস্টিস"।

১৩ অক্টোবর — "ঝিয়ের অসুখের জন্য আসতে পারছে না।"

১৮ অক্টোবর — কালি(ink)১ টাকা ২ আনা, নিব ১ আনা। অর্থাৎ তখন ফাউন্টেন পেনও ব্যবহৃত হচ্ছে, আবার হ্যান্ডেলে নিব লাগিয়ে লেখাও চলছে। ১৮ তারিখে একটা মজার কথা "ধোপাং" ক্লিনিং", ডাইং ক্লিনিং-এর কৌতুক নাম, এটা আমাদের কারও তৈরি কথা, মা বেশ ব্যবহার করলেন।

শেষ হয়ে গেল মায়ের হিসেবের খাতা! উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের নয়, নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারও নয় — বলা যায় মধ্য-মধ্যবিত্ত পরিবারের খণ্ডচিত্র, তাও সবটা দেওয়া গেল না; এখানে তার প্রয়োজনও নেই। আমার মা কেমন ভাবে হিসেব লিখতেন এখানে রইল তারই সামান্য একটু পরিচয়।

এখন মনে হয় হিসেব আরও পরিষ্কার হতে পারত। বাজার ২ টাকা ৩ টাকা কিংবা যাই হোক — বাজার থেকে কী কেনা হয়েছিল, কত দাম পড়েছিল প্রতিটির জন্য তা পাওয়া যাচ্ছে না। ওজনও দেওয়া নেই জিনিসপত্রের। মা তো জানতেন না এই খাতাটি একদিন এভাবে কাজে লেগে যাবে? অতএব সে জন্য তাঁকে দোষ দিই না। এই খাতা থেকে অনেক কথাই ইচ্ছে করেই বাদ দিতে হল। বাড়ির কিছু কথা এ থেকে প্রকাশ করা হলে অন্য কারও তা হয়তো পছন্দ হবে না। তাই, খাতা থেকে আহরণ যেটুকু করা গেল তা থেকেই আমাদের বাড়ির, এবং বিশেষ করে মায়ের সংসারের পরিচালনার কথা জানা যাবে — আংশিক ভাবে হলেও।

হিসেবের খাতা অবশ্যই সামান্য ব্যাপার নয়—অনেক ইতিহাসই এ থেকে পাওয়া যায়। বাবা হিসেবের খাতা নিয়ে 'শেষের হিসাব' বলে একটি চমৎকার গল্প লিখেছিলেন। অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তির একটি হিসেবের খাতায় কয়েক বছরের হিসেব লেখা ছিল, সেটা থেকে বেছে বেছে কয়েকটি দিনের হিসেব থেকে একটি পরিপূর্ণ গল্প তৈরি হয়েছিল। প্রতি মাসে ৪০ টাকার নিখুঁত হিসেব — প্রথম দিক থেকে একদিনের হিসেবে দেখা গেল হিসেবরক্ষক সিনেমা দেখছেন, থিয়েটার দেখছেন ইত্যাদি। ক্রমশ সংসারে টানাটানি দেখা গেল, চালের পরিমাণ কমল, জামাকাপড়ও কেনা কমে গেল, চালের পরিমাণ কমল, জামা-কাপড়ও কেনা কমে গেল। শেষের দিকে লটারির টিকিট কেনা হল, মাদুলিও। দারিদ্র্যের শেষ সীমা। শেষ হিসেবও নিখুঁত — তারমধ্যে পরিবারবর্গকে দেশে পাঠানোর খরচ, এবং একেবারে শেষে দড়ি ও কলসি। ৪০ টাকার হিসেব নিখুঁতভাবে মেলানো।

তরুর শ্বশুর বাড়ির লেখিকা জ্যোৎস্না দেবী যদি তাঁর লেখাটি সম্পূর্ণ করতেন তা হলে মনে হয় তরুর আপেক্ষিক স্বস্তির কথাও তিনি সরসভাবেই লিখতে পারতেন, কিন্তু সে সব আন্দাজি ধারণার মধ্যে বোধহয় না যাওয়াই ভাল।

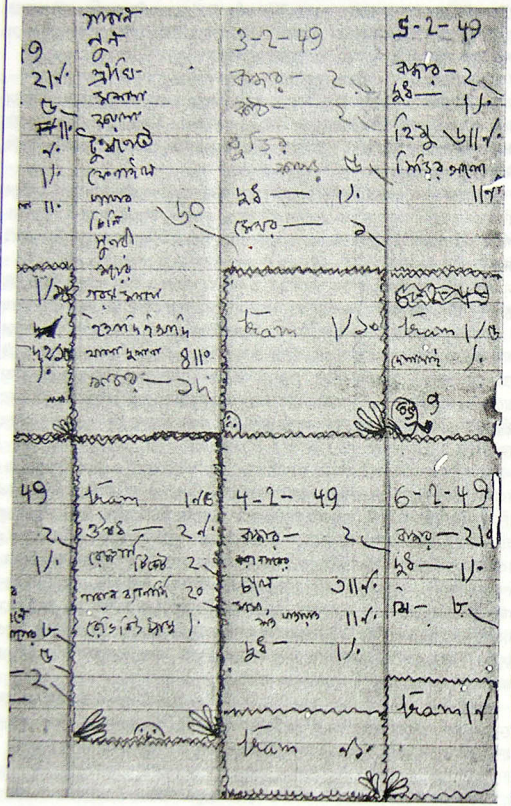

জ্যোৎস্না দেবীর হিসেবের খাতার একটি পাতা

অগ্নিযুগের সূচনা ও স্বরূপ

(ইতিহাস-সংসদে অপ্রকাশিত ভাষণ)

হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ইতিহাস-সংসদের সভাপতি শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায় মাননীয় অতিথিবর্গ এবং সমবেত ঐতিহাসিক বন্ধুগণ।

আজকের অধিবেশনে মূল নিবন্ধ পেশ করার আমন্ত্রণ পেয়ে আমি তো যাকে বলে সম্মানিত বোধ করছি, কিন্তু খানিকটা সন্ত্রস্তও। ভাবছি আপনারা না শেষপর্যন্ত এর জন্য অনুতাপ করেন। কেননা, যাঁরা আমার কাজকর্মের খোঁজ রাখেন তাঁরাই জানেন, আমি আর যাই হই না কেন, পেশাদার ইতিহাসজীবী নই। বলতে পারেন আমি শুধুই ইতিহাসপ্রেমিক। আমাদের চতুর্দিকে ইতিহাস ঘটে চলেছে — কখনো নিঃশব্দে, কখনো সশব্দে — এই চেতনা আমাকে স্পন্দিত করে; ইতিহাসের মূল প্রশ্ন নিয়ে আমি ভাবিত হই; ইতিহাসের বই পড়তে ভালোবাসি যদি অবশ্য পাঠযোগ্য হয়, কিন্তু ইতিহাস লিখতে গেলেই গায়ে জ্বর আসে। সংস্কৃত বচন অনুসারে মূর্খের পক্ষে চুপচাপ থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। ছেলেবেলায় শেখা এই সাবধানবাণী ভুলে গিয়ে বুক্‌নি কিংবা হালফ্যাশানের jargon-এর জালে আপনাদের জড়াতে সাহস পাই না। সোজা কথায় আমি মানুষটা একটু পুরোনো। কলেজে আমার কাছে যাঁরা টিউটোরিয়াল করেছেন, কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসার্চ, লেখার ব্যাপারে আমার এই ভীরু খুঁতখুঁতুনির কথাটা অনেক দুঃখের মধ্য দিয়েই জেনে গেছেন তাঁরা।

সুতরাং আজকের অধিবেশনের জন্য কী উপহার আনব তা নিয়ে আমার দ্বিধা ছিল। আমার রচনার বিষয়বস্তু কী হবে এই সাত-পাঁচ চিন্তা থেকে আমাকে উদ্ধার করেছেন ইতিহাস-সংসদের উৎসাহী কর্মী, আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। আজ আমার এই মূল নিবন্ধের বিষয় বাংলায় "অগ্নিযুগের সূচনা ও স্বরূপ"। বিষয়টি নিয়ে আমি গবেষণা করেছি, একদা ইংরেজিতে আমার ভাবনা গ্রন্থিতও করেছিলাম। কিন্তু আমার ভাগ্যবশত সেই লেখা বিশেষ কারও চোখে পড়েনি। রামকৃষ্ণ পরামর্শ দিলেন বাংলা ভাষায় আমার সেই ভাবনা সংক্ষেপে লিখে ফেলতে। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। যদিও জানিনা, মাতৃভাষায় ইতিহাসচর্চায় যাঁরা উৎসাহী, রামকৃষ্ণর এই মন্ত্রণায় তাঁরা শেষপর্যন্ত কতটা উপকার পাবেন।

অনেকদিন আগে বোধ হয় ইতিহাস-সংসদেরও জন্মের আগে, 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় ধারাবাহিক একটা বাংলা নিবন্ধ প্রকাশ করেছিলাম। নাম দিয়েছিলাম "বয়কট, বোমা ও ভদ্রলোক"। তাতে আমার অনুসন্ধানের বিষয় ছিল অগ্নিযুগের সামাজিক ও আর্থিক পটভূমি। ওই লেখার শিরোনামে একটা চমক ছিল, হয়তো সেজন্যই অনেকে আকৃষ্ট হয়ে থাকবেন। শুনেছি, অন্বিষ্ট বিষয়ের নতুনত্বও অনেকের কৌতূহল জাগিয়েছিল : ইংরেজিশিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি ভদ্রলোকের দুর্গতি যে কীভাবে চরমপন্থী রাজনীতির দিকে তাঁদের ঠেলে দিচ্ছিল তা নিয়ে অনুপুঙ্খ আলোচনা এর আগে হয়তো হয়নি। কিন্তু অনেকে আবার লজ্জিত, আহত ও বিরক্ত হয়েছিলেন স্বদেশি আন্দোলনের আর্থিক ব্যাখ্যায়। "অগ্নিযুগ" নিয়ে বাঙালির ভাবালু উচ্ছ্বাস হয়তো ধাক্কা খেয়েছিল আমার কথায়। তাঁরা বিস্মৃত হয়েছিলেন যে আন্দোলনের

মহত্ত্ব আর্থিক বিশ্লেষণে ক্ষুণ্ণ হয় না। বৃহত্তর তাৎপর্যময় ফরাসি বিপ্লবেরও তো আর্থনীতিক ব্যাখ্যা আছে।

তবে আর্থিক ব্যাখ্যাটাই একমাত্র নয়। কে যে কী কারণে একটা আন্দোলনে ভেসে পড়েন, পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকের পক্ষে তা শনাক্ত করা শক্ত। এমনকী যাঁরা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন তাঁরাও স্পষ্ট করে সবসময় বলতে পারেন না, কীসের ঝোঁকে তাঁরা প্রাণিত হয়েছিলেন। স্মৃতিকথার উপর আদ্যন্ত নির্ভর করা যায় না; তাছাড়া সবাই তো আর স্মৃতিকথা লিখেও যান না। প্রায় এক-শো বছর আগে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী বয়কট আর বোমার আন্দোলনে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে পুলিশি মন্তব্যও নির্বোধ ছেলেমানুষির উদাহরণ : অর্থাৎ এঁরা সব বাপে-তাড়ানো-মায়ে-খেদানো "semi-educated", "professional agitators"''; সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আর অরবিন্দ ঘোষ (তখনও তিনি ''শ্রী অরবিন্দ'' নন), এই দু-জন নাকি I.C.S. স্বর্গ হতে বিচ্যুত হওয়ার অভিমানে স্বদেশি নেতা হয়েছিলেন। অন্যদিকে অরবিন্দ কিংবা বিপিনচন্দ্র পাল মানতে নারাজ পুলিশি অপপ্রচার : স্বদেশি আন্দোলন, তাঁদের বিবেচনায় একেবারেই আদ্যন্ত আধ্যাত্মিক, পশ্চিমি বস্তুবাদের নিরিখে এর বিচার অচল। অর্থাৎ পুলিশ বলছে স্বদেশি আন্দোলনের পিছনে রয়েছে বাস্তব হিসেব, materialist calculation, ওদিকে নেতারা বলছেন তাঁদের প্রেরণা একেবারেই spiritual তাঁদের পূর্বসুরি বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা স্বামী বিবেকানন্দের বাণীতে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা সন্ধানে নেমেছেন পশ্চিমি প্রভাবমুক্ত বিশুদ্ধ ভারতাত্মার।

কোন দিকে যাই? তার উপর আমাদের বিচারবুদ্ধি আরও গুলিয়ে দিয়েছেন মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের বংশধর কেমব্রিজের কোনো অতিচতুর ইতিহাসবিদ। তিনি বলছেন : "Extremism was less an ideology than a technique" অর্থাৎ moderate-extremist-এ মতবাদের কোনো ফারাক নেই, প্রভেদ শুধু লড়াইয়ের কৌশলে। যাঁদের আমরা extremist আর moderate হিসেবে জানি তাঁরা নাকি একই সামাজিক শ্রেণীর মানুষ, ফলে একই ধান্দা তাঁদের : রাজানুগ্রহে সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভ আর উচ্চতর কর্মসংস্থান; তবে সরকারি চাকরির অভাববশত তাঁদের কেউ কেউ রাজসহায়ক-এর ("Collaborator") ভূমিকা ছেড়ে রাজ-সমালোচক ("critics") হয়েছেন। শীলবংশীয় এই ঐতিহাসিক যা বলছেন তা অনেক আগেই বলে গেছেন স্যর লিউইস নেমিয়ের (Sir Leuis Namier) Whig আর Tory দলের প্রভেদ প্রসঙ্গে। কিন্তু মুশকিল এই যে নেমিয়ের-এর কথাটা ছোটোখাটো দরবারি রাজনীতির (court politics) প্রসঙ্গে, যেমন অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে ব্রিটিশ রাজনীতির বিচারে। সেখানে ছোটো ছোটো clique, coterie-র মধ্যে প্রভাব-প্রতিপত্তির লোভে পারস্পরিক গাঁটছড়া সহজেই চোখে পড়ে; কিন্তু পরাধীন ভারতের বৃহত্তর রঙ্গমঞ্চে, যেখানে অনুগ্রহদাতার সঙ্গে উচ্চাশী ভারতীয়ের কোনো সামাজিক সম্পর্কই নেই, সেখানে Namierite-পদ্ধতি আমাদের পথনির্দেশ করতে পারে না।

আর তা ছাড়া স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি extremist-moderate-এ বিবাদ একটা বেশ ভালোরকমই ছিল। আমরা দেখতে পাব এই দুই দল দু-রকম ভাবে তাকাচ্ছেন ব্রিটিশরাজের দিকে, এঁদের বিচারভঙ্গিও দু-রকম। ফলে, যা শুরুতে ছিল নেহাত কর্মসংস্থানের কিংবা প্রতিষ্ঠালাভের আকাঙ্ক্ষা, তাই কালক্রমে হয়ে দাঁড়াল moderate-দের কণ্ঠে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি, এবং extremist-দের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের জন্য একটা পৃথক সাংস্কৃতিক-

রাজনৈতিক স্বরূপ আবিষ্কারের সাধনা। বিদেশি শাসন, কিংবা তার চেয়েও বড়োকথা, বিদেশি সংস্কৃতির সঙ্গে এই সংঘর্ষে ঐহিক হিসেব আর পারত্রিক মতবাদ যেন পরস্পর সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছিল।

আমি যতদূর বুঝেছি তা যদি আমার মতন করে বলতে চাই তাহলে এইরকম দাঁড়ায় যে, পৃথিবীর অন্যান্য আন্দোলনের মতোই আমাদের স্বদেশি-বিপ্লবী আন্দোলনে যাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে নানা ঝোঁক কাজ করে থাকতে পারে। তাঁদের কোনো এক জনের বেলায় হয়তো বিষয়-বিপন্নতা কাজ করেছে; আর এক জন অনুভূতিপ্রবণ বাঙালি কিশোরের ক্ষেত্রে হয়তো প্রবল হয়েছে সহপাঠী ও আদর্শবাদী কোনো বন্ধুর প্রভাব। কেউ কেউ ব্যক্তিগত আবেগের দ্বারা যেমন তাড়িত হয়েছেন, কেউ-বা তেমনই চালিত হয়েছেন বিশিষ্ট কোনো মতবাদের দ্বারা। বাস্তব বিপর্যয় তো ছিলই। আমরা ভুলে গেছি তার কথা। মনে আছে শুধু ''বন্দে মাতরম্'' slogan আর বোমা-বিস্ফোরণের শব্দ। ''চতুরঙ্গ'' পত্রিকায় প্রকাশিত আমার সেই প্রবন্ধে উল্লেখ ছিল বন্যা, অন্নাভাব, এবং আকস্মিক ও দ্রুত মূল্যবৃদ্ধির। তাতে যেমন একটা এপার-গঙ্গা-ওপার-গঙ্গা-মধ্যিখানে-চরজাতীয় পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তারই মধ্যে শিব-সদাগরের মতোই আসীন ছিলেন ইংরেজিশিক্ষিত অথচ আশাহত বেকার বাঙালি; তাঁর চেতনায় ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের মাধ্যমে পশ্চিমি রোম্যান্টিক (romantic) সাহিত্যের হাতছানি; কলেজ-পাড়ায় গোলদিঘিতে সুরেন্দ্রনাথের তপ্ত বক্তৃতার মধ্য দিয়ে তিনি গ্রহণ করেছেন ফরাসি বিপ্লব আর ইটালীয় অভ্যুত্থানের (risorgimento) মদিরা; তাঁর মর্মে লেগেছে মার্কিন প্রত্যাগত সদ্যপ্রয়াত বিবেকানন্দের বৈদান্তিক অভয়বাণীর অভিঘাত, ''ওঠো, জাগো...''। কিন্তু কে জাগবে? রবীন্দ্রনাথ থেকে ধার করে এবং একটু ঘুরিয়ে বলতে পারি অগ্নিযুগের বাঙালি যুবকের যৌবনস্বপ্নে ছেয়েছিল বিশ্বের আকাশ, কিন্তু অধিকার ছিল না সেই আকাশ পরিক্রমায়।

এইরকম একটা বৈদ্যুতিক বাতাবরণের মধ্যেই বুঝি বিপ্লব জন্ম নেয়! এই অগ্নিযুগের যাঁরা হোতা কী চাইছিলেন তাঁরা? ঐতিহাসিকেরা তাঁদের গায়ে "Extremist" লেবেল (label) সেঁটে দিয়েছেন, এবং তাঁদের ভাবখানা এইরকম যেন সমস্ত extremist একই শিবিরের অন্তর্গত, যেন উদ্দেশ্য ও প্রকরণে তাঁরা দুর্ভেদ্যভাবে যূথবদ্ধ। অর্থাৎ একদিকে দেখছি moderate নেতারা ব্রিটিশরাজের দৈব উপস্থিতি (providential nature) মেনে নিয়ে আইনসংগত উপায়ে, নামান্তরে "constitutional agitation"-এর মাধ্যমে, নিজেদের দাবিদাওয়া আদায় করতে আগ্রহী; ঠিক উলটো দিকে দাঁড়িয়ে আছেন ''চরমপন্থী'' নেতারা, তাঁদের সকলেরই এক হাতে boycott, অন্য হাতে বোমা।

আসলে কিন্তু moderate-বিরোধী শিবিরেও অনেক ভাগ, অনেক মতান্তর ছিল। প্রথমেই ধরুন রবীন্দ্রনাথ। তাঁকে স্মরণ করা হয় স্বদেশি আন্দোলনের চারণ-কবিরূপে; যেন তাঁর কাজ ছিল শুধু দেশাত্মবোধক গান আর কবিতা রচনা। আমরা ভুলে যাই যে, শ্বেতাঙ্গ শাসকের উপর নির্বোধ নির্ভরের ভঙ্গি ত্যাগ করে তিনিই প্রথম শেখালেন 'আত্মশক্তির' সাধনা। ছেলেবেলায় তিনি সঞ্জীবনী সভার সভ্যরূপে বিপ্লব-বিপ্লব খেলা করেছেন; যৌবনে সে-খেলায় ভঙ্গ দিলেও আর যাই হোক moderate সাহেব-ভক্ত সাজেননি। কুড়ি বছর বয়সে কবিতা লিখেছেন তিনি ''আবেদন আর নিবেদন''-এর ভিক্ষাপাত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে; তারও বারো বছর পরে রচনা করলেন ''ইংরাজ ও ভারতবাসী'' প্রবন্ধ — 'আত্মশক্তি'র সেই প্রথম

আবাহন। আমরা যেন শাসকের কাছে সমাদর আর সম্মান ভিক্ষা না করি; বরং সরকারকে সাত হাত দূরে রেখে নিজেদের কর্তব্য পালন করে সম্মান ও সমাদরের যোগ্য হতে পারি, — এই ছিল তাঁর স্পর্ধিত বক্তব্য। সরকারকে দূরে রাখার এই নীতি রবীন্দ্রনাথ আরও স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করলেন ১৯০৪ সালে "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধে। ইংরেজের কাছে নিজেদের নাবালকত্ব বিসর্জন দিয়ে সনাতন গ্রামীণ সমাজের চর্চা করতে পরামর্শ দিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেশবাসীকে।

কবির এই পরামর্শে বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষ স্বাগত জানালেও "আত্মশক্তি"কে তাঁরা যুদ্ধের হাতিয়ার হিসেবে শানিত করতে চাইলেন : সরকারকে শুধু দূরে রাখাই নয়, সরকারকে সম্পূর্ণ বর্জন করা হোক। বিপিন পাল তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতার মাধ্যমে এবং অরবিন্দ 'বন্দে মাতরম' পত্রিকায় প্রকাশিত The Doctrine of Passive Resistance (১৯০৭) নিবন্ধে ব্যাখ্যা করলেন কী কী উপায়ে এই অসহযোগ করা যেতে পারে : অর্থনৈতিক শোষণ রুখতে বিলিতি বর্জন (boycott) করে স্বদেশি সামগ্রী ব্যবহার; বিজাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা থেকে সরে এসে স্বদেশি বিদ্যালয় পত্তন; বিদেশি বিচারব্যবস্থার আশ্রয় না নিয়ে নিজেদের গ্রামপঞ্চায়েতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা; এবং সরকারি লাল-পাগড়িকে এড়িয়ে স্বদেশি সমিতির সাহায্য-গ্রহণ। আইনভঙ্গ না করেই এই কাজগুলি করা যায়; এই ধরনের অসহযোগে সরকারের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষের সম্ভাবনা নেই।

কিন্তু আইন অমান্য করে সম্মুখ সমরে নেমে পড়ার একটা আয়োজনও চলছিল সংগোপনে। তাই ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে নাম পাই বিপিনচন্দ্রের। এবং খুব শীঘ্রই তিনি মা কালীর পুজোয় শ্বেতছাগশিশু বলিদানের বিধান দিলেন মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়। অন্যদিকে, কলকাতা অনুশীলন সমিতির সদস্যদের মধ্যে শুধুই ডন-বৈঠক করে যেসব যুবক ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন তাঁদের "ছোট কর্তা" হয়ে দাঁড়ালেন বারীন ঘোষ, অগ্রজ অরবিন্দ "বড় কর্তা"। (এই সাংকেতিক পরিচয় রয়ে গেছে পুলিশ-ফাইলে।) তাঁদের প্রচারপত্র "যুগান্তর", যে-কারণে "যুগান্তর"-দল হিসেবে তাঁদের খ্যাতি।

"যুগান্তর" নামের মধ্যেই ছিল আসন্ন পরিবর্তনের অশনিসংকেত। কিন্তু পরিবর্তন যে এত দ্রুত ও আকস্মিক হবে সেটা বারীন্দ্র কিংবা অরবিন্দ কারো জানা ছিল না। বারীন ঘোষের স্বীকারোক্তি যদি অসত্য না হয় তাহলে বলতে হবে তাঁর দলবলের পরিকল্পনায় রক্তাক্ত বিপ্লব ছিল তখনও সুদূরপরাহত ("always thinking of a far - off revolution)— এখন চলছিল শুধুই তার প্রস্তুতি, অর্থ আর অস্ত্র সংগ্রহ; "মুক্তি কোন পথে" কিংবা "বর্তমান রণনীতি" জাতীয় পুস্তিকা আর "যুগান্তর" পত্রিকার গরম-গরম লেখার সাহায্যে, কিংবা যাত্রা-কথকতার প্রচারমাধ্যমে বিপ্লবের অনুকূলে জনমত তৈরি করা; সারা দেশ ঘুরে নিঃস্বার্থ দেশসেবক সংগ্রহ করে বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠী ধরনে "সন্তানদল" গড়ে তোলা, যে-দল স্বাধীনতার জন্য অকাতরে ও নিঃশেষে প্রাণদান করবে।

কিন্তু কার্যত দেখা গেল জনগণ তখনও সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত নয়। অথচ যাঁরা অর্থসাহায্য করছেন সেইসব ধনী জমিদার ও অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকেরা সমিতির যুবকদের কাছ থেকে কাজের প্রমাণ চান। যুবকেরাও অস্থির বাঙালির ভীরু কাপুরুষ পরিচয়ের কালিমা ঘোচাতে। সেই অস্থিরতার যাঁরা বলি হলেন, পুলিশের হাত থেকে তাঁদের ছাড়িয়ে আনতে গেলেও টাকার দরকার। অতএব টাকার জন্য ডাকাতি। সেই ডাকাতির মামলা ঠেকাতে ফের ডাকাতি। কোথায় গেল খোলাখুলি আমূল বিপ্লবের পরিকল্পনা? তার জায়গা নিল সন্ত্রাস

— ডাকাতি — সন্ত্রাসের গোপন বিষচক্র।

পথভ্রষ্ট সেইসব আদর্শবাদী যুবকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পথের মিল ছিল না ঠিকই, কিন্তু এঁদের তিনি ত্যাগ করেননি, এঁদের জন্য তাঁর শ্রদ্ধা ছিল ষোলো আনা। এবং এঁদের কথাই তিনি স্মরণ করেছেন "চার অধ্যায়" (১৯৩৪) কাহিনীতে এলার স্নেহাসক্ত কণ্ঠে : "যখন দেশের কথা ভাবি তখন সেই-সব সোনার টুকরো ছেলেদের কথাই ভাবি, আমার দেশ তারাই। তারা ভুল যদি করে, খুব বড়ো করেই ভুল করে। আমার বুক ফেটে যায় যখন ভাবি আপন ঘরে এরা জায়গা পেল না। আমি ওদেরই ... এই কথা মনে ক'রে বুক ভরে ওঠে আমার।"

দেখলাম অগ্নিযুগের নেতারা কেউই রাজভক্ত moderate নন, কিন্তু তা বলে তাঁদের সবাইকে একাকার করে মার্কা মেরে দেওয়াটা ঠিক হবে না। রবীন্দ্রনাথ-বিপিনচন্দ্র-অরবিন্দ এঁরা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল (কে না জানে "অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার" কবিতা?) কিন্তু পারস্পরিক শ্রদ্ধা সত্ত্বেও এঁরা পৃথক। যাঁরা তাঁর "ঘরে-বাইরে" (১৯১৫-১৬) পড়েছেন, তাঁরাই লক্ষ করেছেন একদা moderate নেতাদের ভিক্ষাবৃত্তি যেমন রবীন্দ্রনাথের চোখে অশুচি লেগেছিল, তেমনি বিলিতিবর্জন নিয়ে গরিব মানুষের উপর extremist জবরদস্তিও তাঁর কাছে রুচিকর হয়নি। দেশপ্রেমের ছদ্মবেশে যুক্তিহীন উন্মাদনা তাঁর কাছে মাতলামির নামান্তর। তাঁর 'ব্যধি ও প্রতিকার" কিংবা "পথ ও পাথেয়" প্রবন্ধ পড়লেই বুঝতে পারি তিনি আত্মশক্তির স্থির সাধক। বিদেশি শাসনের ফলেই ভারত দুর্বল একথা তিনি পুরো মানতে রাজি নন; তাঁর বিবেচনায় ভারতবর্ষের নিজস্ব আভ্যন্তরীণ সামাজিক দুর্বলতাই বিদেশি শাসনকে কায়েম করেছে। এবং যত বিলম্বই হোক, ধৈর্য ধরে স্বদেশি সমাজের চাষ করলে রাষ্ট্রনৈতিক লড়াই সেখানে সুফলা হতে পারে। পথিকের তাড়া থাকতে পারে, কিন্তু সেজন্য পথ তো ছোটো হতে পারে না এটাই রবীন্দ্রনাথের সাফ কথা। কিন্তু, অন্যদিকে, বিপিনচন্দ্র কিংবা অরবিন্দ এবং "যুগান্তর"-দলের ভয়ংকর দামাল শিশুরা (les enfants terribles) একটু অধীর, কেননা তাঁদের লক্ষ্য অবিলম্বে বিদেশি বিতাড়ন। রবীন্দ্রনাথ চাপ দিচ্ছেন সামাজিক প্রশ্নে, অন্যেরা জোর দিচ্ছেন রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের উপর। সমস্যা সমাধানের দিকে একজনের গতি গঠনমূলক, অন্যদের ধ্বংসাত্মক।

পথ ও প্রকরণ নিয়ে যেমন বিতর্ক ছিল, মতভেদ ছিল তেমনই পথের শেষে গন্তব্যের ঠিকানা নিয়ে। ১৯০৬ সালের কংগ্রেসে সভাপতি দাদাভাই নওরোজি গন্তব্য হিসেবে ঘোষণা করলেন "স্বরাজ" শব্দটি। moderate কংগ্রেসিরা এই শব্দের অর্থ করলেন "ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন", ইংরেজিতে "colonial self government"। সে-যুগে তার মানে ছিল ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বের প্রচ্ছায়ে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কিছু স্বাধীনতা যেমন ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে ছিল আর কী। প্রসঙ্গত বলি, আজকাল ঐতিহাসিকেরা সাম্রাজ্য আর উপনিবেশের তফাতটা গুলিয়ে ফেলেছেন : তাঁদের মুখে empire ও colony এবং imperial ও colonial একই অর্থে একই নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হয়। কিন্তু সে-আমলের নেতারা এখনকার নেতাদের চেয়ে তো বটেই। এমনকী, আধুনিক ঐতিহাসিকদের চেয়ে শিক্ষিত ছিলেন। রামমোহনের আমল থেকেই তাঁরা জানতেন ভারত, আর যাই হোক, British colony বা উপনিবেশ নয়, বরং ভারত একেবারেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যমণি। ভারতে যা চালু ছিল তা British imperialism; colonialism নয়। তাঁরা আরও জানতেন যে সাম্রাজ্যবাদী (imperialist) শাসনের

চেয়ে ঔপনিবেশিক (colonialist) শাসন ভালো (রামমোহন তাই British colony চেয়েছিলেন ভারতে)। এবং সবচেয়ে কাম্য অবশ্যই স্বাধীনতা।

বিপিন পাল তাই স্পষ্ট জানালেন ভারতবাসী যা চায় তা সত্যকার স্বরাজ, "absolutely free of the British Control", ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ব আর স্বায়ত্তশাসন পরস্পরবিরোধী অভিধা। 'হ্যাঁ, স্বরাজ' — বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে গলা মেলালেন অরবিন্দ, এবং তর্ক জুড়লেন যে, ব্রিটিশ শাসনের যা-কিছু ত্রুটি, moderate-রা তাকে "un-British" বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন; ভারতবাসীর দারিদ্র্য নাকি "un-British rule"-এর ফল। অন্ধ রাজভক্ত নেতারা বুঝতে চাইছেন না যে, ব্রিটিশ বাণিজ্যিক শোষণের ফলেই ভারতবাসীর দারিদ্র্য; pax Britannica বা ব্রিটিশ শান্তি-শৃঙ্খলার পরিণাম ভারতীয়ের ক্লীবত্ব; এবং ইংরেজি শিক্ষা কিংবা বিলিতি বুলির মোহে তাদের বিজাতীয়করণ (denationalisation)। সমস্ত নষ্টের গোড়া এই বিদেশি শাসন, আমলা আর বানিয়ার সংমিশ্রণে যা হয় তা-ই। সুতরাং — অরবিন্দ জানালেন — বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অর্থহীন; ভাঙা বাংলা জোড়া লাগুক — এ তো খুব সামান্য ভিক্ষা; দূর হোক ব্রিটিশ, চাই স্বরাজ।

কিন্তু স্বরাজ স্বরাজ করলেই তো হবে না, ওই স্বরাজের রাষ্ট্রনৈতিক চেহারাটা কেমন হবে? দেখা গেল অগ্নিযুগের নেতারা তার উত্তর জানেন না। স্বপ্নদ্রষ্টা অরবিন্দ বললেন, কী হবে ভবিষ্যতের নকশা এঁকে, "Revolutions are full of surprises" বিপিন পাল বললেন, মার্কিন কায়দায় একটা প্রজাতন্ত্রী United States of India তৈরি করতে হবে; তার নির্মাতা হবেন আফগানিস্থানের আমির, তাঁকে এনে সাময়িক dictator করে ভারতের সিংহাসনে বসাতে হবে, তাহলে নাকি দেশীয় রাজাদের আপত্তি থাকবে না, মুসলমান প্রজারাও খুশি হবেন। এই ব্যবস্থায় হিন্দুপদ-পাদশাহিতে বিশ্বাসী মারাঠা নেতারা কতটা খুশি হবেন, তা নিয়ে অবশ্য সন্দেহ ছিল। অন্যদিকে, "যুগান্তর"-দলের হেমচন্দ্র কানুনগোর স্মৃতিকথায় দেখছি, বিপ্লবী যুবকদের একটা আবছা-বালসরল-অবাস্তব রকমের বিশ্বাস ছিল যে একবার বিদেশি দৈত্যেরা নিধন হলেই সারা দেশে রামরাজ্য নেমে আসবে, সবাই সুখে নিদ্রা যাবে, — রূপকথায় যেমন হয় আর কী!

স্বাধীনতার পর ভারত-রাষ্ট্রের রূপরেখা নিয়ে extremist-দের ধারণা যে স্পষ্ট ছিল না, তার কারণ আর কিছুই নয় : Extremism ছিল একটা সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি; moderate-দের মতন একটা রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়। প্রশাসনিক স্বাধীনতা নিয়ে moderate দল ব্যস্ত; extremist-দের চিন্তা সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা নিয়ে। Union Jack নিয়ে চরমপন্থীদের আপত্তি মূলত এই যে, ওটা বিদেশি সংস্কৃতির জয়পতাকা, যার কাছে নির্লজ্জ নরমপন্থীরা স্বেচ্ছায় মাথা মুড়িয়েছেন। চরমপন্থীদের ইংরেজবিদ্বেষ যেন নরমপন্থীদের বিলিতিয়ানার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। moderate-রা তাকিয়ে আছেন পশ্চিমের ইতিহাস-অনুসারী ভবিষ্যৎ ভারতের দিকে; extremist-রা আবিষ্কার করতে চলেছেন সনাতন-শাশ্বত ভারতবর্ষ।

স্বভাবতই চরমপন্থী চোখে সনাতন দেখা দিল মোহময় রূপে। আর এই romanticism-এর পাশে চলতি বাংলা বুলির হাওয়া লাগিয়ে দিলেন "সন্ধ্যা" পত্রিকার ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। ফলে, বেশ একটু আঁতে ঘা লাগল সভ্যতা-অভিমানী শ্বেতাঙ্গ প্রভুর, যিনি কিপলিং-ঘোষিত White man's burden বহন করার অজুহাতে কৃষ্ণাঙ্গ native-দের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ পাকা করে তুলছিলেন। হাতজোড়-করা নরমপন্থীদের শুনিয়ে, ব্রহ্মবান্ধব বললেন, আমরা

আর্যদের বংশধর; ওরা আমাদের native বলে তো আমরাও ওদের "ফিরিঙ্গি" নামে ডাকব; এবং মুষ্টিমেয় ইংরেজি শিক্ষিতের বদলে যদি জনসাধারণকে দলে পেতে হয় তাহলে কংগ্রেসি মঞ্চে এখন থেকে আর ফিরিঙ্গি ভাষায় বক্তৃতা নয়। আবাল্য ইংরেজি-শিক্ষিত অরবিন্দও শিখলেন : আর নয় ইয়োরোপের অনুকরণ, ভারতকে ভারত হতে হবে, "The return to ourselves is the cardinal feature of the national movement" এখন থেকে "extremist" আখ্যায় তাঁদের মন ভরল না, তাঁরা জানালেন তাঁরাই সত্যকার nationalist party, অন্যেরা জাতিভ্রষ্ট (denationalised, déraciné)।

এই যে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ, বাংলায় অগ্নিযুগের মতোই এটা দেখা গেছে পৃথিবীর নানা জায়গায়, যখনই শক্তিশালী আক্রমণকারীর কাছে একটা উৎকৃষ্ট অথচ সামরিক দিক থেকে দুর্বল সংস্কৃতি মার খেয়েছে। এবং এই সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের অভিমানে প্রায় সর্বত্রই রসদ জুগিয়েছে প্রধানত ধর্ম। ভারতের ক্ষেত্রে এই রসদ পাওয়া গেল হিন্দুত্বে, Hidu revivalism-এ বিশেষত বাঙালি হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠানে। বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকের কথা বলছি, কেননা তাঁরাই প্রধানত পশ্চিমের দিকে ঝুঁকেছিলেন সেই Young Bengal-এর আমল থেকে। পশ্চিমের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সেজন্য তাঁদের অন্তরেই স্বাভাবিক। মুসলমানেরা তো পশ্চিমের মদিরায় মত্ত হননি।

সুতরাং পরাধীন আধুনিক ভারতের ইতিহাসে এই সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদে মুসলমানেরা যে শরিক হতে নারাজ হলেন তার জন্য অগ্নিযুগের হিন্দু বিপ্লবীকে দোষী করাটা ফ্যাশন হলেও অনুচিত হবে। বস্তুত, হিন্দু জাতীয়তাবাদের উত্থানের পূর্ব থেকেই, বা ১৮৫৭-র ব্যর্থতার পর থেকেই, মুসলমান নেতারা ব্রিটিশ বিরোধিতা থেকে সরে দাঁড়াচ্ছিলেন। কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে পাছে যোগ দিয়ে নিজেদের আখের গোছানোর কাজ নষ্ট করেন, সেই কথা ভেবে বছর কুড়ি আগেই, ১৮৮০-র দশকে, আলিগড়ের স্যর সৈয়দ আহমদ তাঁর সম-সাম্প্রদায়িক প্রজাবৃন্দকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন।

সব মিলিয়ে অগ্নিযুগের জাতীয়তাবাদ হয়ে দাঁড়াল প্রধানত হিন্দু জাতীয়তাবাদ। তার ধাক্কায় স্বাধীনতা-আন্দোলনে কতগুলি নতুন ও দেশি প্রকরণ দেখা দিল। যেমন বঙ্গভঙ্গ ঠেকাতে কালীপুজো, অনশন, গঙ্গাস্নান, রাখীবন্ধন। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের দু-টি নাটকে হিন্দু রাজা প্রতাপাদিত্য আর মুসলমান নবাব সিরাজ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে জাতীয়তাবাদীর মনোহরণ করলেন : তাতে ইতিহাসের সত্য কতটা রক্ষা হল সন্দেহ আছে, কিন্তু দেশপ্রেমের আগুনে তো বাতাস লাগল।

স্বাধীনতার যুদ্ধ দেখা দিল ধর্মযুদ্ধের সাজে। অরবিন্দ লিখলেন : Nationalism is not a mere political programme; Nationalism is a religion, "স্বাধীনতা" কিংবা "জাতীয়তাবাদ" প্রভৃতি শব্দ সাধারণ ভারতীয়ের কাছে তখনও প্রায় অচেনা। তাদের ভুলোতে তাই কাজে লাগানো হল তাদের চিরচেনা ধর্মশাস্ত্রের প্রতীকী শব্দ। দেশপ্রেমিকেরা হঠাৎ "যোগী" হয়ে দেখা দিলেন, বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর মতো তাঁদের অন্বিষ্ট হল "মোক্ষ" অর্থাৎ স্বাধীনতা। মানিকতলার বাগানবাড়ি যেন একটা "আশ্রম", নতুন আনন্দমঠ। শাক্ত কালীসাধকের মতো তাঁরা ধরে নিলেন স্বাধীনতার জন্য ডাকাতি কিংবা নরহত্যা কিছুই নয়, সবই "মায়ের লীলা"; বিপ্লবীরা "কর্মযোগী", তাঁদের উপর ভর করেছেন স্বয়ং কালী। অরবিন্দর ভাষায়, "Kali has entered into them". এ-সত্ত্বেও যুদ্ধে নামতে ইতস্তত করছিলেন

যেসব বোতাম-আঁটা নিরীহ ভদ্রলোক, তাঁদের বলা হল কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের মতোই তাঁরা "মায়া"-গ্রস্ত; যাদের বধ করতে হবে তারা যে আগে থাকতেই শারীরিক অর্থে মৃত সেকথা তাঁদের অজ্ঞাত। তাঁরা সান্ত্বনা পেলেন গীতায় বিধৃত শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে যে, আত্মা অবিনশ্বর, ফলত কেউই মৃত নয়, কেউই নয় পাপস্পৃষ্ট ঘাতক। বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীরা বাংলার নতুন কুরুক্ষেত্রে নব্য ক্ষত্রিয়, অরবিন্দর কাছে তাঁরা আশ্বাস পেয়েছেন জাতীয়তাবাদের হতাশার কারণ নেই : " Nationalism is an avatar and cannot be slain." মাত্র কয়েক বছর আগেই, উনিশ শতকের শেষ দিকে, তাঁরা শুনেছেন বিবেকানন্দর রোমাঞ্চকর বাণী— অভী, ভয় নেই। এখন পেলেন তাঁর শিষ্যা নিবেদিতার ভরসা। নিবেদিতা, যিনি তাৎপর্যময়ী ব্রিটিশ-বিরোধী আইরিশ নারী এবং কলকাতা অনুশীলন সমিতির অন্যতম নেত্রী, তিনি ডাক দিয়েছেন বিশ্ববিজয়ের : " On, on, in the name of a new spirituality, to command the treasures of the modern world! On, on soldiers of the Indian Motherland." "Hinduism is become aggressive.".

আর রবীন্দ্রনাথ? বিংশ শতাব্দীর সেই নব্য কুরুক্ষেত্রে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন একা, যেন সত্যনিষ্ঠ যুধিষ্ঠির। তিনিও একদা মোহান্ধ হয়েছিলেন প্রথম পাণ্ডবের মতোই, হিন্দু revivalism-এর প্রভাব পড়েছিল তাঁর উপরেও। ১৮৯৩ থেকে এক দশক ধরে তিনিও শিখ-রাজপুত-মারাঠা বীরত্বের কাহিনি শুনিয়েছেন আমাদের, কিন্তু এখন তিনি মোহমুক্ত। হিন্দু ঐতিহ্যের রোমাঞ্চ খসে পড়েছে যেন তাঁর চোখের সামনে, ভারত সমাজ তার সত্য, তার মিথ্যা নিয়ে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে এই কবির সামনে, যাঁর কাছ থেকে আমরা শিক্ষা নেব শুধু দেশপ্রেমের নয়, বিশ্বপ্রেমের। শুধু দেশ স্বাধীন করার প্রেরণা নয়, তিনি দেবেন এমন দেশ গড়ার ব্রত "চিত্ত যেথা ভয়শূন্য" যেখানে পূর্ব আর পশ্চিম এসে মিলবে সেই ভারতের "মহামানবের সাগরতীরে"। তিনি লিখছেন "গোরা" (১৯০৭-১০), যেন নতুন ভারতের মহাভারত।

রবীন্দ্রনাথ ও মেঘনাদ সাহা

অমিতাভ চৌধুরি

পরাধীন ভারতের নানা কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁকে আমরা কবি বা নাট্যকার হিসেবেই জানি, কিন্তু জানি না দেশগঠনের কাজে তাঁর ভূমিকার কথা। সেকালের ভারতবর্ষে তিন প্রধান জননায়কের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। নানারকম কাজকর্মে তাঁর চিন্তাভাবনা যুক্ত হয়েছিল। তার কিছু কিছু আমরা জানি, পড়েছিও, তবে সেই জানা অসম্পূর্ণ। আজ আমাদের দেশে, এই স্বাধীন ভারতে যে যোজনার কর্মকাণ্ড, তার মূলে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। দেশকে স্বয়ম্ভর করার লক্ষ্যে যেসব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছেন, তার প্রাথমিক প্রস্তুতিতে জড়িয়ে ছিলেন তিনি।

আমাদের দেশে বৈভাবিক উন্নয়ন পদ্ধতির কথা সর্বাগ্রে ভেবেছিলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. মেঘনাদ সাহা। তিনি তাঁর চিন্তাভাবনার কার্যকর রূপ দেওয়ার জন্য শরণ নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের। অন্য বিজ্ঞানী অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠতার কথা আমরা জানি। তাঁর লেখা একমাত্র বিজ্ঞানের বই 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থখানি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন সত্যেন বসু মশাইকে। কিন্তু বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের কথা আমরা কম জানি। সর্বভারতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগের কথা ভেবেই ড. সাহা তাঁর পরিকল্পিত চিন্তাধারা নিয়ে প্রথমে আলোচনায় বসেছিলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে।

১৯৩৮ সালের শেষ দিক। কংগ্রেস দলের সভাপতি — তখন বলা হত রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু। তা ছাড়া আর একজন সর্বজনমান্য নেতা জওহরলাল নেহেরু। এই দু-জনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতার কথা জেনেই ড. সাহা তাঁর পরিকল্পিত চিন্তাধারা নিয়ে কথা বলতে চান রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। সেই মতো তিনি রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লেখেন ১৯৩৮ সালের নভেম্বর মাসে। তখন কবির সচিব অনিলকুমার চন্দ। তাঁর মাধ্যমেই কবির সঙ্গে বিজ্ঞানীর যোগাযোগ ঘটে। চলে দীর্ঘ পত্রালাপ এবং অবশেষে জন্ম নেয় ভারতের প্ল্যানিং কমিটি — যা সেই সময় বোম্বাই-প্ল্যান নামে পরিচিত ছিল।

ড. সাহার অনুরোধে এবং রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে দুই প্রধান জওহরলাল নেহেরু ও সুভাষচন্দ্র বসু সাড়া দেন। ড. সাহার পরিকল্পিত রূপরেখা বাস্তবায়িত করার জন্য ওই দুই প্রধানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এক গোপন বৈঠকে মিলিত হন শান্তিনিকেতনে। তার পর সুভাষচন্দ্র বসুর পরামর্শেই ওই পরিকল্পনার শীর্ষপদে বসানো হয় জওহরলাল নেহেরুকে। এই গোপন-প্ল্যান স্বাধীনতা লাভের পর যোজনা বা কমিশনের রূপ নেয় পরবর্তীকালে — অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর, — যখন যোজনা কমিশনের কাজকর্মের যাবতীয় ভার দেওয়া হয় রবীন্দ্রনাথের একান্তজন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের ওপর। সেই কারণেই ওই কর্মকাণ্ডের নাম দেওয়া হয় 'মহলানবিশ প্ল্যান।'

বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রসদন থেকে আমি কিছু কাগজপত্র উদ্ধার করেছি। তাতে ড. মেঘনাদ সাহা ও অনিলকুমার চন্দের চিঠি আছে। তবে রবীন্দ্রনাথ ড. সাহাকে যা লিখেছিলেন তার কোনো হদিশ পাইনি। সাহা-পরিবারে হয়তো আছে।

আমি চিঠিগুলো একের পর এক সাজিয়ে দিচ্ছি। তারমধ্যে দু-খানি চিঠি জওহরলালকে লেখা। একটি রবীন্দ্রনাথের, অন্যটি অনিলকুমার চন্দের? বিষয় একই — ড. সাহার প্রস্তা

ব। তা ছাড়া এই সময় কবির আর একটি উদ্‌বেগের কারণ ছিল — কংগ্রেস সভাপতির নির্বাচন। রবীন্দ্রনাথ চাইছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু ওই পদে পুনর্নির্বাচিত হোন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী তা চাইছিলেন না। তাঁর ইচ্ছে পট্টভি সীতারামাইয়া হোন। শেষমেষ লড়াই হয় এবং সুভাষবাবু জয়ী হন। পরে তারই জেরে সুভাষবাবু কংগ্রেস ছাড়লেন এবং ১৯৪১ সালে দেশও ছাড়লেন।

রবীন্দ্রনাথ সেই সময় সুভাষবাবুর হয়ে জোর ওকালতি করেছিলেন এবং জওহরলালকে স্বদলে আনার চেষ্টাও চালিয়ে যান। রবীন্দ্রনাথের হয়ে তাঁর সচিব অনিলকুমার চন্দ জওহরলালকে যে চিঠি দেন ১৯৩৮ সালে, তাতে স্পষ্ট অনুরোধ ছিল, সুভাষবাবু আবার কংগ্রেসের কাণ্ডারী হোন এবং জওহরলাল যোজনা কমিটির ভার নিন।

আমি প্রথমে জওহরলালকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ও তাঁর সচিব অনিলকুমার চন্দের দু-খানি চিঠি তুলে দিচ্ছি। তার পর থাকছে মেঘনাদ সাহা — অনিল চন্দ পত্রালাপ। তাতে দেশের ভবিষ্যৎ রূপরেখা নিয়ে চিন্তাভাবনার কথা আছে। এবারে চিঠিগুলো তুলে দিচ্ছি। সবগুলি চিঠিরই ভাষা ইংরেজি। অনুবাদ বর্তমান লেখকের।

[১৯ নভেম্বর ১৯৩৮, শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে যে চিঠি লেখেন তার ঠিকানা — অবধায়ক মহাত্মা গান্ধী, ওয়ার্ধা]

প্রিয় জওহরলাল,

খবরের কাগজে পড়লাম, তুমি দেশে ফিরে এসেছ। সারা দেশের স্বাগতধ্বনির সঙ্গে আমার কণ্ঠস্বরও মিলিয়ে দিচ্ছি।

আমি তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য বড়ো উৎসুক। তুমি যদি অচিরে আমার সঙ্গে দেখা করতে শান্তিনিকেতনে আস, তাহলে বড়ো খুশি হব।

এই সেদিন ভারতীয় শিল্পের বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা নিয়ে ড. মেঘনাদ সাহার সঙ্গে দীর্ঘ ও চমৎকার আলোচনা করেছি। এর গুরুত্ব সম্পর্কে আমি স্থিরনিশ্চয় এবং যেহেতু এই সম্পর্কে সুভাষ কংগ্রেসকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য যে-কমিটি গঠন করেছে, তার সভাপতি হতে তুমি রাজি হয়েছ বলে এই ব্যাপারে তোমার অভিমত আমি জানতে চাই, ইন্দিরাকে আমার কথা বোলো এবং আমার ভালোবাসা জানিয়ো ইতি। স্নেহার্থী

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

[১৯৩৮ সালে রবীন্দ্রনাথের হয়ে তাঁর সচিব অনিলকুমার চন্দ জওহরলালকে একটি চিঠি লেখেন। চিঠির প্রথমার্ধ এইরকম।]

প্রিয় পণ্ডিতজি,

আজ আবার গুরুদেব আপনাকে চিঠি লিখেছেন। এটা আমাকে লেখা আপনার চিঠির মোটামুটি জবাব বলা যায়। কিন্তু তাঁর চিঠিতে আপনি যে খুব বেশি জানতে পারবেন, সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই।

তিনি ড. সাহার যুক্তিযুক্ত পরিকল্পনায় আকৃষ্ট এবং প্ল্যানিং কমিটির কাছ থেকে অনেক আশা করছেন। আপনি অন্য কাজ নেবার আগেই তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান — পাছে ঘটনার তাগিদে আপনি যোজনা কমিটির কাছ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।

এইটেই আপনার সঙ্গে তাঁর দেখা করার জন্য ব্যাকুলতার প্রধান কারণ।... ... ...

[১৯৩৮ সালের ১৫নভেম্বর ড. মেঘনাদ সাহা তাঁর শান্তিনিকেতন-দর্শনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে একখানি চিঠি লেখেন রবীন্দ্রনাথের সচিব অনিলকুমার চন্দকে। চিঠিটি যায়, ৯২ আপার সার্কুলার রোড, কলকাতার সায়েন্স কলেজের ঠিকানা থেকে।]

প্রিয় মি. চন্দ,

গোড়াতেই আপনাকে ধন্যবাদ জানাই, শান্তিনিকেতনে আমার প্রতি যে আতিথ্য দেখানো হয়েছে, তার জন্য। আপনার পরামর্শমতো গোটা ব্যাপারটা আমি এসোসিয়েটেড প্রেসকে বলে দিয়েছি। কবিকে আমার শ্রদ্ধা জানাবেন।

আশা করি, এতদিনে আপনি কবিকে রাজি করিয়েছেন — আপনাতে আমাতে যা কথা হয়েছিল — পণ্ডিত জওহরলাল ও মহাত্মাকে দু-টি চিঠি লেখার জন্যে। যে-দুটি চিঠি পাঠানো হয়েছে, তার নকল দয়া করে আমাকে পাঠাবেন। কবি চেয়েছিলেন আমার লেখা প্রবন্ধ, 'শিল্পায়নের দর্শন' — ফিলজফি অফ্ ইনডাস্ট্রিয়ালাইজেশন — পড়ে দেখতে। তাই আমি প্রবন্ধের দু-টি কপি পাঠালাম, তা ছাড়া পাঠালাম। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ইনস্টিট্যুটের গত সভায় আমারই দুটো সভাপতির ভাষণ। আমি অত্যন্ত অনুগৃহীত হব, যদি সেগুলি কবির কাছে পৌঁছে দেন। আমি অত্যন্ত আনন্দিত হব, যদি তিনি তাঁর শক্তিশালী কলমে আমার এই মতের সমর্থনে কিছু লেখেন। আমার মতে দেশের সব চিন্তাবিদেরই উচিত তা সমর্থন করা।

ইতি আপনার বিশ্বস্ত —

এম এন সাহা

[২২ নভেম্বর ১৯৩৮, ৯২ আপার সার্কুলার রোড কলকাতা থেকে আর একখানি চিঠি পাঠান ড. সাহা।]

প্রিয় মি. চন্দ,

গত ১৯ নভেম্বর তারিখে লেখা আপনার সহৃদয় পত্রের জন্য ধন্যবাদ। জাতীয় যোজনা কমিটিতে সভাপতির পদ গ্রহণের জন্য কবি পণ্ডিত জওহরলালকে যে চিঠি দিয়েছেন তার জন্যে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

অন্য বিষয় সম্পর্কে বলছি, আমি অত্যন্ত খুশি হব যদি কবি আমার সঙ্গে এই বিষয়ে মুখোমুখি বসেন এবং আমি যুক্তিগুলো আবার পেশ করতে পারব। সত্যিই বলছি, আমি কোনো ব্যক্তির জন্য উমেদারি করছি না, আমি জাতীয় যোজনার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেছি এবং আমার এই পরিশ্রম শুধু তাত্ত্বিক প্রচেষ্টা নয়, জাতীয় কংগ্রেসকে তার রূপদান করতে হবে। দেশের নেতাদের সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতা ব্যক্তিত্বের ওপর নির্ভরশীল। কলকাতায় আমার বহুদিন লেগেছে এই বিষয়ে মি. বসুর (সুভাষচন্দ্র বসু) সঙ্গে কথা বলে আমার যুক্তিতে তাঁকে আনতে। সুতরাং তিনি যদি আবার সভাপতি (কংগ্রেসের) হোন, তাহলে তিনি স্বাভাবিকভাবেই শিল্পযোজনা কমিশনের চেয়ারম্যান হবেন এবং তাঁর কাজ হবে কমিটির সুপারিশগুলো কার্যকর করা। মি. বসু সভাপতি থাকলে তাঁকে কাজ করার জন্যে চাপ দিতে হবে না, তিনি নিজের গরজেই তা করবেন। কিন্তু যদি অন্য কেউ কংগ্রেস সভাপতি হন, আমাকে আবার নতুন করে কাজ শুরু করতে হবে। তাঁকে আমার মতামতে আনতে হবে এবং পণ্ডিত জওহরলাল ও সুভাষ বসু ছাড়া অন্য কংগ্রেস নেতাদের এই কাজের গুরুত্ব

বোঝাতে বিশেষ বেগ পেতে হবে। আপনি বলতে পারেন — কেন? যোজনা কমিশনের চেয়ারম্যান হবেন কংগ্রেস সভাপতি, এর কোনো বিকল্প নেই, কারণ, তা, এ আই সি সি-র সভাতেই নির্ধারিত। আমি খুশি হব যদি আমার মতামত কবির কানে তুলতে পারেন এবং এই মহৎ কাজে তিনি তাঁর 'মহৎ কণ্ঠ' যুক্ত করতে পারেন।

মস্কো নিউজ — আমার কাছে যা পাঠিয়েছেন, আমি সেই বিষয়ে ভীষণ আগ্রহী, আপনি যদি তা নিজে জমিয়ে না রাখেন, তবে আমার কাছে দয়া করে পাঠালে আমি অত্যন্ত খুশি হব। আমার মনে হয় লেফ্‌ট্ বুক ক্লাব কর্তৃক প্রকাশিত এইসব মূল্যবান সোবিয়েত বই ভারতে আসার অনুমতি পায় না। আপনি বলেছিলেন যে, ইউসুফ মেহেরালির কাছে এই ধরনের বইয়ের সম্পূর্ণ সংগ্রহ আছে। আপনি কি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারেন? কবিকে আমার প্রণাম জানাবেন। ইতি আপনার বিশ্বস্ত —

এম এন সাহা।

পুনশ্চ ঃ আমার শান্তিনিকেতন দর্শন যে কত আনন্দের হয়েছে তা নতুন করে বলার প্রয়োজন রাখে না। আমি আরও বেশি দিন থাকার জন্য কিছুদিন পর আবার যেতে চাই। বোলপুরে (শান্তিনিকেতনে) আমার বক্তৃতা সংবাদপত্রে তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছে। মনে হচ্ছে আমি ভিমরুলের চাকে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়েছি।

[১৯৩৮ সালের ৩০ নভেম্বর শান্তিনিকেতন থেকে অনিলকুমার চন্দ ড. সাহাকে যে-চিঠি দেন তা এইরকম।]

প্রিয় ড. সাহা,

সুভাষবাবু সম্পর্কে গত পরশু আপনাকে লিখেছি, আশা করি তা পেয়েছেন। দু-দিন আগে পণ্ডিত জওহরলালের একটি চিঠি আমি পেয়েছি। তাতে তিনি লিখেছেন — "আমি জানতে চাই গুরুদেব কি কোনো বিশেষ বিষয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চান। যোজনা নিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন, আমি এই ব্যাপারে প্রচণ্ড উৎসাহী এবং আমি তাঁকে এ-নিয়ে অন্তত কিছু সময় দিতে চাই। তার আগে আমার ঠিক করে নিতে হবে কতখানি সময় আমি তার জন্যে দিতে পারব। এই ব্যাপারে যে-কমিটি ঠিক করা হয়েছে, তা পাঁচমিশালি। তার মধ্যে কয়েকজন বেশ ভালো — যেমন সাহা, কিন্তু অন্যরা তেমন উপযুক্ত বলে মনে হল না। যোজনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কিন্তু আমাকে অন্য একটি — আরও বড়ো সমস্যা — অর্থাৎ আমাদের রাজনৈতিক জীবনের ক্রমাবনতি নিয়ে ভাবতে হবে।..."

আমি তাঁকে (নেহরুকে) গত কাল দীর্ঘ চিঠি লিখেছি এবং বলেছি এই ব্যাপারে গুরুদেবের ধ্যানধারণা ও ইচ্ছার কথা। যদি ইতিমধ্যে পণ্ডিতজি আসতে পারেন গুরুদেব তাঁকে নিশ্চয়ই পুনর্নির্বাচনের জন্য পূর্ণ সমর্থনের অনুরোধ করবেন।

ইউসুফ মেহেরালি এখনও ইউরোপ থেকে ফিরে আসেননি। তিনি ফিরে এলেই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলব।

আপনার ঠিকানার আর এক সংখ্যা 'মস্কো নিউজ' পাঠানো হয়েছে। আপনি যদি তাদের কাগজপত্র নিয়মিত পান, সেই সম্পর্কে কবিকে লিখতে বলব।

সশ্রদ্ধ অভিবাদনসহ। আপনার বিশ্বস্ত —

অনিলকুমার চন্দ

যে পুনর্নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে উপরের চিঠিতে, তা হল, কংগ্রেস সভাপতি পদে সুভাষচন্দ্র বসুর পুনর্নির্বাচন। আর ইউসুফ মেহেরালি সেকালের বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা, তিনি জয়প্রকাশ নারায়ণের কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি তিনি শান্তিনিকেতনে এসে অনিলকুমার চন্দের অতিথি ছিলেন। রথীন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনী মেহেরালিকে উৎসর্গ করেন।

[৩ ডিসেম্বর, ১৯৩৮, ৯২ আপার সার্কুলার রোড কলকাতা থেকে চিঠির জবাব দেন ড. সাহা। তাতে তিনি লেখেন —]

প্রিয় মি. চন্দ

আপনার ৩০ নভেম্বর তারিখের চিঠির জন্য ধন্যবাদ। আমি পণ্ডিত জওহরলালকে চিঠি লেখার জন্য কবির কাছে সত্যিই কৃতজ্ঞ। তাঁর চিঠির কোনো কোনো উদ্ধৃতি — যা আপনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তা থেকে মনে হয় তিনি বিষয়টি গুরুত্ব সহকারেই বিবেচনা করেছেন। এটা উৎসাহব্যঞ্জক। উনি (জওহরলাল) যদি শান্তিনিকেতনে আসেন, তা হলে আপনি তাঁকে কমিটির সদস্য সম্পর্কে তাঁর অতিরঞ্জিত ভুল ধারণার কথা বুঝিয়ে বলবেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে ড. জে সি ঘোষ এবং মি. এ কে সাহা সম্পর্কে বলছি, যাঁরা অত্যন্ত সহায়ক হবেন এবং এই নীতির মধ্যে যে আদর্শ রয়েছে, তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারবেন। ড. জে সি ঘোষ একজন চিন্তাশীল ও যোগ্য লোক, যিনি যোজনা সম্পর্কে অনেক চিন্তাভাবনা করেছেন। সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক স্যার এস বিশ্বেশ্বরাইয়াও অত্যন্ত সহায়ক হবেন এবং এই কাজের জন্য তাঁর উৎসাহ এত প্রবল যে আশি বছরের কাছাকাছি বয়সেও তিনি একটি শিল্প সম্মেলনে যোগ দিতে দিল্লি ছুটে গিয়েছেন। বোম্বাইয়ের সদস্যদের আমি কম জানি, তবু মনে হয় তাঁরা কাজের হবেন। তবে তা সব সময়ই পণ্ডিতজির জন্য খোলা রাখা আছে, তিনি ইচ্ছে করলে যাঁদের ওপরে তাঁর বেশি আস্থা আছে, তাঁদের তিনি মনোনীত করতে পারেন। কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে কমিটিতে যোগ দিতে ভারত সরকার বাধা দিয়েছেন। আপনি সম্ভবত কাগজে দেখেছেন যে, আগামী জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি বোম্বাইয়ে ভাইসরয় বিভিন্ন প্রদেশের শিল্প অধিকর্তাদের একটি সভা ডেকেছেন। এতেই বোঝা যাচ্ছে যে, ভারত সরকার এ-ব্যাপারে পিছিয়ে থাকতে চায় না। এই কারণেও কংগ্রেসকে যোজনার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব নিয়ে সামলাতে হবে, যদি পণ্ডিত জওহরলাল বোলপুরে আসেন, তা হলে আমাকে জানাবেন এবং তক্ষুনি আমি চলে যাব। আশা করি ভালো আছেন। ইতি আপনার বিশ্বস্ত,

এম এন সাহা

পুনশ্চ ঃ কবিকে আমার প্রণাম জানাবেন। এম এন এস।

[১৯৩৮ সালের ১ ডিসেম্বর কলকাতার সায়েন্স কলেজ থেকে ড. সাহা তার উত্তরে লেখেন, —]

প্রিয় মি. চন্দ

আপনার সহৃদয় চিঠির জন্য ধন্যবাদ। আমার ইচ্ছাপূরণের জন্য কবিকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবেন। আশা করি ভালো আছেন। ইতি আপনার বিশ্বস্ত —

এম এন সাহা

পুনশ্চ ঃ আপনার পাঠানো 'মস্কো নিউজ' পেয়েছি। আমার খুব ভালো লেগেছে। এইরকম

ধরনের আরও কাগজপত্র পাঠালে খুশি হব।

[১৯৩৯ সালের ১৫ মার্চ কলকাতার সায়েন্স কলেজ, ৯২ আপার সার্কুলার রোড থেকে মেঘনাদ সাহা অনিলকুমার চন্দকে আবার লিখছেন —]

প্রিয় মি. চন্দ,

কবিকে উপহার দেওয়ার জন্য আমার বন্ধু অধ্যাপক আগারকর-এর লেখা বই 'ইফ্ ওয়ার কাম্‌স', আলাদা ডাকে পাঠাচ্ছি। ভূমিকা আমারই লেখা। তাতে আমি কবির সেই সুন্দর গল্পটি — যেখানে ভারতকে প্রবাদতুল্য 'শিশু' বলা হয়েছে, — আমি যুক্ত করেছি (পৃষ্ঠা ১৯)। আমি খুশি হব, যদি কবি বইটির কিছু কিছু অংশ পড়তে পারেন এবং তাঁর মতামত জানান। কবিকে আমার প্রণাম জানাবেন — আপনার বিশ্বস্ত

এম এন সাহা

[শান্তিনিকেতন থেকে ২০ মার্চ, ১৯৩৯ তারিখে অনিলকুমার চন্দের জবাব —]

প্রিয় ড. সাহা,

আপনার চিঠি এবং বইয়ের জন্য ধন্যবাদ। আমার মনে হয় না রবীন্দ্রনাথ বইটি পড়তে পারবেন। কারণ তাঁর দৃষ্টিশক্তি নিয়ে গোলমাল দেখা দিয়েছে। নিজে পড়াশোনাও বেশি করতে পারেন না। তবে তাঁর চিকিৎসা চলছে এবং আশা করি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন। তবে আমি নিশ্চয়ই দেখব তিনি যাতে বইটি খুব তাড়াতাড়ি পড়ে ফেলতে পারেন। প্রীতিপূর্ণ শ্রদ্ধা জানাই। ইতি আপনার বিশ্বস্ত —

অনিলকুমার চন্দ।

[১৯৩৯ সালের ৩০ মার্চ মেঘনাদ সাহা রবীন্দ্রনাথের সচিব অনিলকুমার চন্দকে কলকাতা থেকে আবার লিখছেন—]

প্রিয় মি. চন্দ,

আপনার ২০ মার্চ তারিখের চিঠির জন্য ধন্যবাদ। আপনাকে যখন বইটি পাঠিয়েছিলাম আমি ভাবতেই পারিনি রবীন্দ্রনাথ কষ্ট করে পড়বেন। আমি শুধু চেয়েছিলাম কেউ যেন তাঁকে বইয়ের কিছু কিছু অংশ, বিশেষ করে আমার ভূমিকা পড়ে শোনান। আমরা জেনে দুঃখিত যে দৃষ্টিশক্তি নিয়ে তিনি কষ্ট পাচ্ছেন। আশা করছি, তিনি শীঘ্রই ভালো হয়ে উঠবেন। শ্রদ্ধাপূর্ণ ভালোবাসা। আপনার বিশ্বস্ত —

এম এন সাহা

গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ্, আপনাকে যে-চিঠি পাঠানো হয়নি

অমিতাভ রায়

তিয়াত্তরটা বসন্ত পেরিয়ে আসার পর লাতিন আমেরিকার সাহিত্য কুলপতির হেমন্তকাল কেমন কাটছে? গাবো, আপনাকেই প্রশ্নটা সরাসরি করতে হল। আপনার আত্মজীবনী বা স্মৃতিচারণ থাকলে সম্ভবত এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হত না। হাজারও একটা দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এমন গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় কাজটা এখনও, এমনকী, ১৯৯৮-তে কথা দিয়েও, করে উঠতে পারেননি। একান্ত অনন্যোপায় হয়েই আপনার জীবন সায়াহ্নে আপনাকে এমন একটা চিঠি লিখতে হচ্ছে যার কেন্দ্রবিন্দু আপনি নিজে, মানে — গাব্রিয়েল হোসে গার্সিয়া মার্কেজ্ বা পাঠকদের প্রিয় 'গাবো'।

উনিশ-শো আঠাশের ছয়ই মার্চ কলম্বিয়ার উত্তরাঞ্চলের ছোট্ট শহর আরকাতাকায় আপনার জন্ম। অতলান্তিক মহাসাগরের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের ক্যারিবিয়ান সাগর তীরে আরকাতাকা-র অবস্থিতি। আপনার মাতামহ কর্নেল নিকোলাস রিকার্দো মার্কেজ্ মেহিইয়া। তাঁর সান্নিধ্যে আপনার জীবনের প্রথম আট বছর কেটেছিল। আরকাতাকা-কে শহরে পরিণত করার ক্ষেত্রে তাঁর অনেক অবদান ছিল।

আপনার মা, লুইসা সান্তিয়াগা মার্কেজ্ দে গার্সিয়া ইগুয়ারান এবং বাবা এলিগিও গার্সিয়া মার্কেজ্-এর ষোলোটি সন্তানের মধ্যে আপনিই জ্যেষ্ঠ। তরুণী লুইসা কেন যে এলিগিও-র প্রেমে পড়লেন তা আপনার দাদু-দিদিমা তো বটেই আরকাতাকা-র সমগ্র নাগরিকদের কাছেই তা ছিল এক পরম বিস্ময়।

কলম্বিয়ার ইতিহাসের বিখ্যাত অধ্যায় ১৮৯৯ থেকে ১৯০২ পর্যন্ত ঘটে-যাওয়া 'হাজার দিনের যুদ্ধ'-র সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব কর্নেল নিকোলাস রিকার্দো মার্কেজ্ ছিলেন আরকাতাকার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় চরিত্র। বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ এবং কিছুটা জটিল এই মানুষটি সম্পর্কে কলম্বিয়ার আকাশে-বাতাসে কতই-না গল্পগুজব ভেসে বেড়াত। কেউ বলত, যৌবনে কর্নেল 'ডুয়েল' লড়ে সরাসরি একজনকে গুলি করে হত্যা করেছিলেন। কখনও শোনা যেত যে কর্নেল-এর ঔরসে নাকি ডজন দেড়েক বাচ্চা জন্মেছে। অবিশ্যি আপনার চোখে তিনি ছিলেন একজন 'নিপুণ গল্প বলিয়ে।' জীবন বিপন্ন করে গৃহযুদ্ধে অংশ নেওয়া কর্নেল আদরের নাতি 'গাবিতো'-কে (মনে পড়ে, তখন এই নামেই আপনাকে ডাকা হত!) এমন ভাষা ও ভঙ্গিতে লড়াইয়ের কাহিনী শোনাতেন যা শুনে মনে হত কতগুলো ছেলে বন্দুক নিয়ে মজা করতে গেছিল।

ওদিকে আপনার বাবা এলিগিও গার্সিয়া মার্কেজ-এর পরিবার কলার ব্যাবসার সূত্রে আরকাতাকা-য় আসার জন্যে 'লা ওহারাস্কা' বা 'ঝোড়ো পাতা' নামে পরিচিত ছিল। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে জীবন শুরু করা এলিগিও গার্সিয়া মার্কেজ এখানে-সেখানে প্রেম করতে করতে চার-চারটে অবৈধ সন্তানের জনক হবার পরেও বেহালা বাজিয়ে, প্রেমের কবিতা লিখে, একের পর এক প্রেমপত্র পাঠিয়ে এমনকী টেলিগ্রাম মারফত প্রেম নিবেদন করে যেভাবে আরকাতাকা-র বিখ্যাত কর্নেল-এর পরিবারের প্রাণচঞ্চল মেয়েটির মনোবিকলন

ঘটালেন, তা বিশ্লেষণ করতে সাতান্ন বছর বয়সে এসে আপনাকে লিখতে হল—লাভ ইন দ্যা টাইম অফ কলেরা।

আপনার মাতামহ ও মাতামহী অনেক চেষ্টা করেও এই সম্পর্ক ছিন্ন করাতে পারেননি। অবশেষে বাধ্য হয়ে টেলিগ্রাফ অপারেটরে রূপান্তরিত চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রাক্তন ছাত্র এলিগিও-র হাতে মেয়ে লুইসা-কে সঁপে দিয়েছিলেন। সত্যি,— 'ধন্যি ছেলের অধ্যবসায়', তবে আপনার কর্নেল দাদুও কম যান না। 'রিওহাচা' শহরে, নিজের জন্মভিটেয় মেয়ে-জামাইয়ের বসবাসের বন্দোবস্ত করে দিলেন।

প্রথানুযায়ী দাদুর বাড়িতে আপনার জন্ম হল। আপনার মা-বাবা তখন দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠিন লড়াই লড়ছেন। দাদুর কাছে শোনা যুদ্ধের গল্প আর দিদিমা ত্রানকুলিনা ইগুরান কোতেস্-এর বলা ভূত-পেতনি-দৈত্য-দানো রূপকথায় আপনার শৈশব সম্পৃক্ত হয়ে গেল। আপনার পড়াশুনার সূচনা দাদুর কাছেই। নিয়ম করে তিনি আবার বছরে এক বার আপনাকে সার্কাস দেখাতে নিয়ে যেতেন। দাদুর কাছেই শিখেছিলেন,—'একজন মানুষকে হত্যার চেয়ে বড়ো বোঝা জীবনে আর কিছু হতে পারে না।' পাশাপাশি দিদিমা এবং তাঁর বোনেরা আপনার শৈশবকে স্বপ্ন-কল্পনা-রূপকথার মায়াজালে জড়িয়ে রেখেছিলেন। অবিশ্যি কর্নেল দাদু বলতেন — 'যত সব মেয়েলি ব্যাপার।' কিন্তু দিদিমা ও তাঁর বোনেদের গল্প বলার ভঙ্গি ও শৈলীতে আপনি এমনই বিভোর হয়ে যেতেন যে সবকিছুই আপনার বাস্তব বলে মনে হত— ঠিক যেন দাদুর যুদ্ধের গল্পের মতোই সত্যি।

লোকাচার ও সংস্কার পরিপূর্ণ দিদিমা ও তাঁর বোনেদের গল্প বলার রীতি-শৈলী আপনার মনে সেই শৈশবেই এমনভাবে গেঁথে গেছিল যে পরে নিজের সৃজনশীল সাহিত্যেও তা বারে বারে ঘুরে ফিরে চলে এসেছে।

১৯৩৬-এ, মানে যখন আপনার বয়স মাত্র আট বছর, মারা গেলেন আপনার মাতামহ— কর্নেল নিকোলাস রিকার্দো মার্কেজ মেজিয়া। হারিয়ে গেল আপনার সুখ স্বপ্নের শৈশব। একইসঙ্গে কলম্বিয়ার ইতিহাসের একটা যুগের অবসান হল।

আপনার জন্মভূমি কলম্বিয়া ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা লাভ করেছিল। স্পেন-এর উপনিবেশ কলম্বিয়া স্বাধীন হওয়ার পর সে-দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। আক্ষরিক পরিচয়ে লাতিন আমেরিকার প্রাচীনতম গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেলেও স্বাধীন কলম্বিয়ায় কি 'শান্তি' ও 'ন্যায়' প্রবর্তিত হয়েছিল? উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগে 'স্প্যানিয়ার্ড' ও 'ইন্ডিয়ান' নামে পরিচিত স্থানীয় বাসিন্দারা একে অপরকে সব সময় ঘৃণা করত। সোনার সন্ধান পাওয়ার পর স্প্যানিয়ার্ডরা ব্যাপক হারে ধর্মান্তরীকরণ করে এবং বিভিন্ন কৌশলে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে। ব্রিটিশরাও পিছিয়ে ছিল না। ১৫৬৮-তে ক্যাপ্টেন ড্রেক রিওহাচি আক্রমণ করার পর থেকে দু-তিন শতাব্দী জুড়ে ব্রিটিশ বাহিনী অসংখ্যবার কলম্বিয়ায় হানা দিয়েছে। অবশেষে ১৮১০-এ নেপোলিয়ান-এর নেতৃত্বে কলম্বিয়া প্রথম ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্তি পায়। তবে এই স্বাধীনতা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। মাত্র পাঁচ বছর বাদে স্প্যানিশ জেনারেল মুরিলো-র আক্রমণে কলম্বিয়া আবার রক্তাক্ত হল। লাতিন আমেরিকার প্রবাদপ্রতিম স্বাধীনতা সংগ্রামী সিমোন বলিভার-এর নেতৃত্বে ১৮২০-তে কলম্বিয়া পরিপূর্ণ স্বাধীন হল। রাষ্ট্রপতি সিমোন বলিভার কলম্বিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করলেন দ্বি-দলীয় গণতন্ত্র। উদারপন্থী ও রক্ষণশীল — এই দু-টি রাজনৈতিক দল আজও কলম্বিয়ায় সক্রিয়।

সদ্যস্বাধীন দেশ কলম্বিয়ায় নীতি-আদর্শের ভিত্তিতে দু-টি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হলেও ঔপনিবেশিক আমলের মারামারি-খুনোখুনির রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা কোনো পক্ষই ভুলে যেতে না পারায় 'প্রাতিষ্ঠানিক রাজনৈতিক দল' না হয়ে এরা দু-টি যুযুধান গোষ্ঠী হিসেবেই পরিচিত হল। দু-পক্ষই অত্যাচারী, দুর্নীতিগ্রস্ত এবং অবশ্যই ক্ষমতার অপব্যবহারকারী। কলম্বিয়ার গত (প্রায়) দু-শো বছরের ইতিহাস দুই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের দ্বন্দ্বে রক্তাক্ত।

রাজনৈতিক দলাদলি ছাড়াও দেশের দুই অঞ্চলের বিরোধ কলম্বিয়ায় বিরাজমান। ক্যারিবিয়ান উপকূলের উষ্ণমণ্ডলীয় জলবায়ু ও আবহাওয়ায় বসবাসকারী 'কোস্তেনোস্' এবং দেশের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের বাসিন্দা 'কাচাকোস্' বরাবরের বৈরী। কাচাকোসদের মতে,— 'কোস্তেনোস্‌রা চোরাচালানকারী এবং জলদস্যুদের উত্তরসূরি। ওদের অনেকেরই পূর্বপুরুষ ছিল ক্রীতদাস।' তবে কোস্তেনোস্‌রা আমুদে, অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় এবং প্রাণবন্ত। পক্ষান্তরে, কাচাকোস্‌রা নিজেদের অনেক বেশি আনুষ্ঠানিক, অভিজাত এবং জাতিগতভাবে শুদ্ধ বলে দাবি করে। রাজধানী বোগোতা-সহ অন্যান্য শহরগুলো এদের ঐতিহ্য। নিজেদের সম্পর্কে কাচাকোস্‌দের অভিমান,— তারা শুদ্ধ স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলে; দেশের ঐতিহ্য ও চরিত্র তাদের হাতেই সুরক্ষিত।

কলম্বিয়ার ইতিহাস ও ভূগোল বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে ক্যারিবিয়ান উপসাগরের উষ্ণমণ্ডলীয় উপকূল কোস্তোনোস্ তথা উদারপন্থীদের দুর্গ। পাহাড়-মালভূমি রচিত কলম্বিয়ার কেন্দ্রীয় অঞ্চলের বসবাসকারী কাচাকোস্ বরাবরের মতো রক্ষণশীল। আপনি অবিশ্যি নিজেকে সবসময় 'মধ্যপন্থায় বিশ্বাসী কোস্তোনোস্ -এর একজন' বলে পরিচয় দিয়েছেন।

স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের বিপ্লব-উপবিপ্লব-বিক্ষোভ-অভ্যুত্থান-গৃহযুদ্ধর ঘটনায় উনবিংশ শতাব্দীর কলম্বিয়া মুখর। শতাব্দীর প্রায় শেষে (১৮৯৯) শুরু হওয়া 'হাজার দিনের লড়াই' ছিল এই সব ঘটনাবলির চূড়ান্ত পর্যায়। উদারপন্থীদের পরাজয়ের পর ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে এই দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটল। এক লক্ষেরও বেশি মানুষ এই গৃহযুদ্ধে প্রাণ হারাল। নিহতদের অধিকাংশই ছিল কৃষক পরিবারের সদস্য। আপনার মাতামহ ছিলেন এই গৃহযুদ্ধেরই একজন সৈনিক। কোস্তোনোস্-এর পক্ষে নিকোলাস্ রিকার্দো মার্কেজ মেজিয়া 'কর্নেল' হিসেবে যুদ্ধ করেন।

হাজার দিনের লড়াই শেষ হওয়ার পর আপনার জন্মভূমির অর্থনীতি-রাজনীতি এক অন্য অবস্থায় উপনীত হল। এতদিন পর্যন্ত কফি-ই ছিল কলম্বিয়ার অন্যতম রপ্তানিযোগ্য পণ্য। তা সত্ত্বেও রপ্তানি ব্যবস্থাটি তেমন সুসংগঠিত ছিল না। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় রক্ষণশীলরা কলম্বিয়ায় ক্ষমতাসীন হওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানি (ইউ.এফ্.সি) * আপনার জন্মভূমিতে ব্যবসা করার অনুমতি পেল। সীমাহীন অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা এবং রাজনৈতিক সমর্থন নিয়ে ইউ.এফ্.সি কলম্বিয়ায় কলার ব্যবসা শুরু করল। কলা চাষ, উৎপাদন ও রপ্তানির কাজে ইউ.এফ্. সির প্রধান উপকরণ ছিল কলম্বিয়ার 'সুলভ শ্রম'। সুলভ শ্রম এবং শ্রমজীবীদের সর্বনাশ বোধ হয় সর্বত্রই একে অপরের পরিপূরক। অতএব ইউ.এফ্.সি-র উৎপাদন ও মুনাফা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক শোষণের মাত্রাও বাড়তে লাগল। শুরু হল শ্রমিক আন্দোলন। ১৯২৮-এর অক্টোবর মাসে কলম্বিয়ার কলা-বাগানের শ্রমিক আন্দোলন এক চূড়ান্ত রূপ পেল। বত্রিশ হাজার শ্রমজীবী মানুষ,—পর্যাপ্ত শৌচালয়, নগদ অর্থে বেতন প্রভৃতির দাবিতে লাগাতার ধর্মঘট শুরু করে দিল। ধর্মঘট চলাকালীন

শ্রমজীবীদের এক সমাবেশে কলম্বিয়ার রক্ষণশীল সরকারের সামরিক বাহিনী এলোপাথারি গুলি চালায়। সেদিন রাতের গুলিবর্ষণে কতজন ধর্মঘটী মারা গেছিল, তার কোনো হিসেব নেই। পরের কয়েকমাসে আরও কত ধর্মঘটী অকস্মাৎ অন্তর্হিত হয়েছিল, তারও কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। 'সিয়েন আনোস দে সলিদাদ্' বা 'একাকিত্বের একশো বছর' (ওয়ান্ হান্‌ড্রেড্ ইয়ার্স অফ্ সলিচ্যুড্) উপন্যাসে এই ঐতিহাসিক ঘটনা উপস্থাপিত হয়েছে। এবং এই সময় আপনার বয়স মাত্র ছয় মাস।

কলা-বাগানের গণহত্যার মধ্যেই পরবর্তী কয়েক দশকে ঘটে-যাওয়া 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস' বা 'লা ভায়োলেন্সিয়া'-র বীজ সুপ্ত ছিল। হোর্জে এলেসের গাইতান নামক উদারপন্থীদের এক অল্পবয়স্ক সাংসদ ইউ.এফ্.সি-র গণহত্যার তদন্তের দাবিতে সাংসদের ভিতরে ও বাইরে মুখর হয়ে ওঠেন। গাইতান-এর দাবির সমর্থনে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে ওঠা গণ আন্দোলনে রক্ষণশীলরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং ১৯৩০-এ ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হয়। ক্ষমতায় এসে উদারপন্থীরা গণহত্যার তদন্ত ধামাচাপা দেওয়ার উদ্যোগ নিলেও গাইতান-কে দমিয়ে রাখা যায়নি। বেতার ভাষণ, গণ জমায়েতের মাধ্যমে গাইতান, দুর্নীতি ও বিদেশি অর্থনৈতিক শোষণ দূর করে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানাতে থাকেন। গাইতান-এর সাংগঠনিক ক্ষমতা এবং দাবির যথার্থতায় উদারপন্থীরা অবশেষে ১৯৪৬-এ দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং রক্ষণশীলরা আবার ক্ষমতায় ফিরে আসে। ফিরে এল, রক্তক্ষয়ী অন্তর্কলহের যুগ। তবে ১৯৪৭-এর সাধারণ নির্বাচনে সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কলম্বিয়ার জনসাধারণ তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। এর আগে বা পরে কোনো সাধারণ নির্বাচনে কলম্বিয়ায় এত বেশি ভোট পড়েছিল কি? গাইতান-এর নেতৃত্বাধীন উদারপন্থী গোষ্ঠী, নির্বাচনে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল। সুদীর্ঘকালের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস 'লা ভায়োলেন্সিয়া' সাময়িকভাবে পর্যুদস্ত হল। কিন্তু ১৯৪৮-এর ৯ এপ্রিল রাজধানী বোগোতায় প্রকাশ্য দিবালোকে নৃশংসভাবে গাইতান-কে হত্যার পর লা ভায়োলেন্সিয়া আবার প্রবল বিক্রমে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বিবদমান দু-পক্ষের মধ্যে শুরু হয়ে গেল সশস্ত্র গেরিলা লড়াই। গাইতান খুন হওয়ার পরের তিন দিন শুধুমাত্র বোগোতাতেই আড়াই হাজারেরও বেশি মানুষ মারা যায়। কলম্বিয়ার ইতিহাসের ওই কুখ্যাত বাহাত্তর ঘন্টা 'এল বোগোতাজো' বলে পরিচিত। শিশু ও নারী-সহ অসংখ্য মানুষকে হত্যা করা হয়। গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। খেতখামার জ্বালিয়ে দেওয়া হল। দশ লক্ষাধিক কৃষক প্রতিবেশী দেশ ভেনেজুয়েলায় পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। সংসদের মধ্যেই ভাষণরত অবস্থায় জনৈক উদারপন্থী সাংসদকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এই ঘটনার পরই সংসদ ভেঙে দিয়ে রক্ষণশীলরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে নেয়। উদারপন্থীদের নির্বিচারে হত্যা অথবা গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৫৩ পর্যন্ত চলতে-থাকা লা ভায়োলেন্সিয়ার এই পর্বে দেড় লক্ষাধিক মানুষকে খুন করা হয়। আপনার বহু ছোটো গল্পে বা উপন্যাসে এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের কথা বারে বারেই ঘুরে ফিরে এসেছে। তবে, লা ভায়োলেন্সিয়া আপনার উপন্যাস 'লা মালা ওরা'-য় (ইংরেজি অনুবাদে 'ইন্ ইভিল্ আওয়ার') সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে সুবিন্যস্ত হয়েছে। ১৯৬২-তে প্রকাশিত এই উপন্যাসটি পুরস্কৃতও হয়েছিল।

হয়তো কাকতালীয়, তবু ব্যাপারটা কিন্তু সেইরকমই ঘটেছিল। না হলে স্বামীর মৃত্যুর কিছুদিন পর থেকে আপনার দিদিমার দৃষ্টিশক্তি আস্তে আস্তে হারিয়ে যাবে কেন? পারিবারিক

বিপর্যয়ের জন্যে আপনাকে মাত্র আটবছর বয়সে মা-বাবার কাছে সুক্রে শহরে চলে যেতে হল। আপনার বাবা তখন ওষুধের ব্যবসায়ী। সুক্রে শহরে পৌঁছানোর পরেই সিদ্ধান্ত হল,— গাবিতো এবার বোর্ডিং স্কুলে যাবে। অতএব, আপনাকে বারানকিলার বোর্ডিং স্কুলে যেতে হল। মাগদালেন নদীর মোহনায় অবস্থিত সুন্দর বন্দর-শহর বারানকিলার স্কুলের ছাত্র হিসেবে ওই বয়সেই মজার কবিতা আর কার্টুন এঁকে আপনি বিখ্যাত হয়ে পড়েছিলেন। অবিশ্যি খেলাধুলায় উৎসাহী ছিলেন না বলে সহপাঠীরা আপনাকে 'বুড়ো মানুষ' বলে ডাকত।

বারো বছর বয়সে একটা বৃত্তি পেয়ে গেলেন। অতএব, আবার বিদ্যালয় বদল। এবার ভরতি হলেন জিপাকিরা শহরের মাধ্যমিক স্কুলে। রাজধানী বোগোতা থেকে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার উত্তরের জিপাকিরা শহরে পড়াশোনা করার সময় আপনার উপলব্ধি হল, — বোগোতা আপনার পছন্দের শহর নয়। আরও বুঝলেন যে আদতে আপনি একজন কোস্তোনো। তবুও মা-বাবার মনোবাসনা পূরণ করার জন্যে ১৯৪৬-এ আইন পড়তে আপনাকে বোগোতায় যেতে হল। আর সেই সুবাদেই মার্সেডেস্ বার্চা পেদ্রো নাম্নী এক কিশোরীর সঙ্গে আপনার আলাপ হল। তেরো বছরের মার্সেডেস্-এর সঙ্গে পরিচয় হলেও প্রণয় হয়ে পরিণয় পর্বে পৌঁছোনো — সে তো এক যুগ বা বারো বছরের একাকিত্ব অথবা মন দেওয়া-নেওয়ার টানাপোড়েন!

আইনের ছাত্র হিসেবে বোগোতার 'ইউনিভের্সিদাদ্ নাশিওনাল্'-এ নাম লেখালেও আসলে আপনি করতেন কাব্যচর্চা। আইনের ক্লাস ফাঁকি দিয়ে ধূমপান, সমাজতন্ত্র-সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে আড্ডাই হয়ে উঠল আপনার উপজীব্য। কাফ্‌কা, ফক্‌নার্-এর সাহিত্যের সঙ্গে আপনার পরিচয় হল। এবং প্রকাশিত হল আপনার প্রথম গল্প 'লা তেরেসের রেসিগ্‌নিয়েশন' বা 'তৃতীয় পরিত্যাগ' (ইংরেজি অনুবাদে —দ্যা থার্ড রেজিগ্‌নেশন্)। বোগোতার উদারপন্থী সংবাদপত্র 'এল্ এস্‌পেক্তাদোর'-এ গল্পটির প্রকাশ মুহূর্তে আপনাকে 'কলম্বিয়ার সাহিত্যে নতুন প্রতিভা' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হল।

এদিকে ব্যক্তিজীবনে, উদারপন্থী ঘরানার প্রভাবে ১৯৪৮-এর 'এল্ বোগোতাজো' দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়লেন। গাইতান হত্যাকাণ্ডে এতটাই উত্তেজিত হয়ে পড়লেন যে নিজের বাসস্থান পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার ঘটনাকেও গুরুত্ব দেননি। এল্ বোগোতোজো-র দাপটে বন্ধ হয়ে গেল ইউনিভের্সিদাদ্ নাশিওনাল। আপনি ইউনিভের্সিদাদ্ দে কার্তেহানা-য় চলে গেলেন। তখনও আপনি নামেই আইনের ছাত্র। আসলে তখন আপনার সময় কাটত 'এল ইউনিভাস্তানি' সংবাদপত্রে নিয়মিত কলাম লেখায়।

অবশেষে ১৯৫০-এ সত্যি সত্যিই আপনি নিয়মতান্ত্রিক আইন পড়ায় ক্ষান্ত দিয়ে একনিষ্ঠভাবে সফোক্লেস, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, জেম্‌স্ জয়েস্, ভার্জিনিয়া উলফ্ এবং উইলিয়াম ফকনার্-এর সাহিত্যচর্চা সম্পর্কিত বিস্তারিত পঠনপাঠন শুরু করলেন। ফক্‌নার-এর 'ইয়োক্‌নাপাটাওফা'-র অনুকরণে আপনি 'মা কোন্দোর'-র খসড়া রচনা শুরু করলেন। পাশাপাশি সফোক্লেস্-এর 'রাজা অয়দিপাউস' এবং 'আন্তিগোনে' নাটক আপনার মস্তিষ্কে ক্ষমতার অপব্যবহারের ধারণা গেঁথে দিল। সাহিত্যে সমাজের স্থান সম্পর্কে আপনার ভাবনা নির্দিষ্ট রূপ পেল। নিজের পুরোনো রচনা সম্পর্কে বলতে শুরু করলেন—'ওগুলো ছিল বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন বুদ্ধিজীবীর বিবরণী। ফক্‌নার্ পড়ে আপনি বুঝলেন যে চারপাশের বাস্তবতাকে নিয়ে একজন লেখকের অবশ্যই লেখা উচিত।

আরকাতাকা থেকে মাকে নিয়ে আসার পর থেকে আপনার মাথায় সাহিত্য-সমাজ-কল্পনা-বাস্তবতা জাতীয় সাত-পাঁচ চিন্তা ঘুরপাক খেতে শুরু করল। অথচ আরকাতাকা-য় গেছিলেন দাদুর বাড়িটা বিক্রি করতে। মেরামতের অযোগ্য ভগ্নপ্রায় বাড়িটির দুর্দশা দেখে মনে পড়ে গেল শৈশবের কত কথা। পরিচিত শহর আরকাতাকায় কোনোরকম প্রাণের স্পন্দন খুঁজে পেলেন না। এই সব দেখতে দেখতে ততদিনে আপনি 'লা কাসা' উপন্যাসের খসড়া মনে মনে ছকে ফেলেছেন। হঠাৎই আপনার মনে হল যে 'লা কাসা' রচনার জন্যে আপনি তৈরি ন'ন। অতএব, বারানকিলা-য় ফিরে এসেই চট করে লিখে ফেললেন আপনার প্রথম উপন্যাস,— 'লা ওহারাস্কা' (ইংরেজি অনুবাদে লীফ্ স্টর্ম্। বাংলায় 'পাতার ঝড়' অথবা 'ঝোড়ো পাতা'?) সেটা ছিল ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ।

প্রথম উপন্যাসেই আপনার স্বপ্নের গঞ্জ, যা এখন আপনার সাহিত্যের অত্যন্ত স্মরণীয় চরিত্র 'মাকোন্দো' উপস্থিত। বান্টুভাষায় 'মাকোন্দো' মানে কলা বা কদলী। আর্‌কাতাকা-র কাছাকাছি কোনো এক কলা বাগানের নাম ছিল 'মাকোন্দো'। হয়তো ঔপনিবেশিক আমলে সুদূর আফ্রিকা থেকে নিয়ে-আসা ক্রীতদাসেরা নিজেদের নতুন কর্মক্ষেত্রের মাতৃভাষায় এমন নাম দিয়েছিল।

লা ওহারাস্কা-য় মাকোন্দো এক বিধ্বস্ত স্থান হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। কলা-বাগান অন্তর্হিত হওয়ার পর ভগ্নদশা এক জনপদ রূপে মাকোন্দো 'লা ওহারাস্কা' উপন্যাসে পরিচিত হল। বৃষ্টিতে গলে যাওয়া মাকোন্দো থেকে ক্ষয়ে যাওয়ার গন্ধ বেরোয়। মাকোন্দোর অধিবাসীরা কুয়োর ব্যাঙের মতো। তেতো অথবা জ্বালা-ধরানো ভাষায় তারা কথা বলে। এই মরণাপন্ন সমাজের সবচেয়ে সম্মাননীয় ব্যক্তিত্ব জনৈক কর্নেল নিজের দেওয়া এক প্রতিশ্রুতিকে বাস্তবায়িত করার জন্যে সদা ব্যস্ত। একাধারে লম্পট ও কৃপণ এক বিদেশি ডাক্তার, যে ছিল মাকোন্দোর সবচেয়ে নিন্দিত ও ঘৃণ্য চরিত্র, তার মৃতদেহ কবর দেওয়ার জন্যে কর্নেলের চিন্তার শেষ নেই। সমস্ত মাকোন্দোবাসী চায় যে এই ঘৃণ্য ডাক্তারের মৃতদেহটি পচে-গলে মাটিতে মিশে যাক। কর্নেলের কাজকর্মে তিতিবিরক্ত কর্নেল-কন্যা, কর্নেলের নিষ্পাপ পুত্র এবং সর্বোপরি কর্নেলের চোখে এই বিচিত্র দ্বন্দ্বের বিবরণী ফক্‌নার্-এর শৈলীতে 'লা ওহারাস্কায়' বিবৃত হয়েছে।

১৯৫২-য় 'লা ওহারাস্কা' লেখা হলেও প্রথম প্রকাশক উপন্যাসটিকে প্রত্যাখ্যান করেন। বাড়িতে পাণ্ডুলিপিটি পড়েছিল। বছর তিনেক বাদে আপনি তখন ইয়োরোপ সফর করছিলেন, আপনার বন্ধুরা উপন্যাসটি ছাপিয়ে দিল। নিজের লেখা উপন্যাসের মুদ্রিত সংস্করণ বন্ধুদের হাত থেকে উপহার হিসেবে পাওয়ায় আপনি চমকে উঠেছিলেন। আর উপন্যাসটি চমকে দিল স্প্যানিশ সাহিত্যকে।

১৯৫২-৫৩র দিনগুলো দিব্যি কাটছিল। দারিদ্র্য কে মহান আখ্যা দিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে কফির পেয়ালায় ঝড় তুলে আপনার দিন কেটে যাচ্ছিল। 'এল হেরাল্দো' পত্রিকায় নিয়মিত কলাম লিখে অবিশ্যি একটা নিশ্চিন্ত উপার্জনের বন্দোবস্ত হয়েছিল।

আচমকা একদিন নিয়মটাকে বাতিল করে বাক্স-প্যাঁটরা বেঁধে 'লা গুহানা'-র দিকে রওনা দিলেন। এনসাইক্লোপিডিয়া বিক্রি করে দিন গুজরান, না কি গল্পের সন্ধানে ঘুরে বেড়ানো— সত্যি সত্যি কোনটা আপনার উদ্দেশ্য ছিল— কে জানে। এই অদ্ভুত অনিশ্চয়তার মধ্যেই একদিন আনুষ্ঠানিকভাবে বাগদান সেরে ফেললেন।

১৯৫৪-য় আবার বেগোতা। 'এল এস্‌পেক্তাদোর' পত্রিকায় একটা চাকরিও জুটে গেল। সে এক বিচিত্র সাংবাদিকতা ! চলচ্চিত্র সমালোচনা, আর গল্প লেখা হল আপনার নিয়মিত কাজ। হয়তো চাকরিটা ভালোই লাগছিল। আর এই চাকরির সূত্রেই কিছুদিনের মধ্যেই পালটে গেল আপনার জীবনধারা।

'কাল্দাস্' নামে কলম্বিয়ার একটা ডেস্ট্রয়ার 'কার্তাহেনা' বন্দরে ফিরে আসার সময় ডুবে যায়। একজন বাদে ডেস্ট্রয়ারটির সমস্ত নাবিকই মারা যায়। তরঙ্গসংকুল ও ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে একটানা দশ দিন ভেসে থাকার পরও কাল্দাস্-এর নাবিক লুই আলেহান্দ্রো ভেলাস্কো যে কীভাবে বেঁচে ছিলেন সেটাই ছিল এক পরম আশ্চর্য। ভেলাস্কো-র জীবনের ওই দশদিনের রুদ্ধশ্বাস অভিজ্ঞতা আপনি সংগ্রহ করে আনলেন। চোদ্দোটি পর্বে, ভেলাস্কোর বয়ানে আপনার পত্রিকা এল এস্‌পেক্তাদোর-এ প্রকাশিত হল ওই ভয়ংকর অভিজ্ঞতা। 'আমার অ্যাডভেঞ্চারের অন্তর্নিহিত সত্য' শিরোনামে প্রকাশিত ওই ধারাবাহিক থেকে দুর্ঘটনার আসল কারণ জানা গেল। ততদিনে অবশ্য ভেলাস্কো কলম্বিয়ায় জাতীয় বীরের স্বীকৃতি পেয়ে গেছেন। তাঁকে নিয়ে হইচই, উল্লাস, উৎসবের ঘাটতি ছিল না।

ভেলাস্কোর বয়ানে লেখা আপনার ধারাবাহিকটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় অঘটন শুরু হয়ে গেল। সম্মান-স্বীকৃতির সঙ্গে ভেলাস্কো-র চাকরিটি চলে গেল। পোপ নবম পায়াস্-এর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার খবর সরাসরি ভ্যাটিক্যান্ থেকে সংগ্রহ করার জন্যে এল এস্‌পেক্তাদোর-এর তরফে আপনাকে ইয়োরোপে পাঠিয়ে দেওয়া হল। কলম্বিয়ার তৎকালীন ডিক্টেটর গুস্তাভো রোহাস্ পিনিলা-র কুনজর থেকে আপনাকে বাঁচানোর জন্যেই এল এস্‌পেক্তাদোর-এর সম্পাদক এমন সিদ্ধান্তটি নিয়েছিলেন। সে যাত্রায় আপনি রক্ষা পেলেও বাঁচল না আপনার পত্রিকা— এল এস্‌পেক্তাদোর। পিনিলা-র রোষে ১৯৫৬-য় পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গেল।

আপনার ধারাবাহিকটি পড়ে সবাই জানতে পেরেছিল যে কাল্দাস্ নিষিদ্ধ পণ্য পরিবহণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হত। নৌ-বাহিনীর ডেস্ট্রয়ারে নিষিদ্ধ সামগ্রীর উপস্থিতি যেকোনো সরকারের পক্ষেই মর্যাদাহানিকর। আরও জানা গেছিল—লুকিয়ে নয়, সরকারি উদ্যোগেই এই অপকর্মটি হত। এবং ডেস্ট্রয়ারটির রক্ষণাবেক্ষণের দিকে নজর দেওয়া হত না। অনেকদিন পরে (১৯৭০) যখন আপনার বেশ নামডাক হয়েছে, তখন হঠাৎই পনেরো বছরের পুরোনো সেই সাংঘাতিক ধারাবাহিকটিকে উপন্যাস আকারে ছাপার প্রস্তাব এল। প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে আপনি লিখলেন মানবিক আবেদনে সম্পৃক্ত এক বিচিত্র বিবরণী — রেলাতো দে উন্ নাউফাগো। ১৯৮৯-এ 'দ্যা স্টোরি অফ্ আ শিপ রেক্‌ড্ সেইলর' ইংরেজি অনুবাদে প্রকাশিত হয়। অনুবাদক র‍্যান্‌ডল্ফ হোগান।

এল এস্‌পেক্তাদোর-এর হয়ে জেনেভা, রোম, ভ্যাটিক্যান, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি ঘুরে প্যারিসে পৌঁছে জানতে পারলেন স্বৈরাচারী পিনিলার নির্দেশে আপনার কর্মস্থলে তালা পড়ে গেছে। প্যারিসের গরিব মানুষের এলাকা 'ল্যাটিন কোয়ার্টারে' বসবাস শুরু করলেন। ধারকর্জ করে দিন গুজরান। বাসাবাড়ির মালকিনের দাক্ষিণ্য ভরসা। মদ-বিয়ারের খালি বোতল কুড়িয়ে এনে বিক্রি করে মাঝেমধ্যে কিঞ্চিৎ বাড়তি উপার্জন। ওই দুরবস্থার মধ্যেই আর্নেস্ট হেমিংওয়ের অনুপ্রেরণায় লিখলেন 'এল কোরোনেল্ নো তিয়েনে কিয়েন লে এস্‌ক্রিবা'। একের পর এক, এগারোটি খসড়া ছিঁড়ে ফেলার পর শেষপর্যন্ত চূড়ান্ত রূপ পেল আপনার বিখ্যাত ছোটো গল্প —কর্নেলকে একজনও লেখে না। ১৯৬১-তে প্রকাশ পাওয়ার পরই গল্পটি স্প্যানিশ সাহিত্যে

ঝড় তুলল। পরে ১৯৬৮-তে জে.এস. বার্নস্টাইন-এর ইংরেজি অনুবাদ 'নো ওয়ান রাইট্স্ টু দ্যা কর্নেল' তো সারা পৃথিবীতেই সাড়া ফেলে দিল।

নদীর ধারের এক নাম-না-জানা গঞ্জের সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তিত্ব প্রবীন কর্নেলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই বিখ্যাত গল্প। যৌবনে যিনি গৃহযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে কর্নেল পদমর্যাদা অর্জন করেছিলেন, আজ তাঁর দু-বেলা খাবার জোটে না। একমাত্র ছেলেটিও কিছুদিন আগে মাফিয়াদের আক্রমণে মারা গেছে। তবুও বৃদ্ধ কর্নেল আশায় আছেন। প্রতি শুক্রবারের বিকেলবেলায় নিয়ম করে গঞ্জের ফেরিঘাটে পৌঁছে যান। গৃহযুদ্ধে অংশ নেওয়া সৈনিকদের সরকার থেকে পেনশন দেবার কথা ছিল। পেনশন মঞ্জুরির সেই সরকারি চিঠিটির জন্যে কর্নেলের নিশ্চিত প্রতীক্ষা। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা উপেক্ষা করে প্রতি সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময় লঞ্চঘাটে হাজির হওয়া এই বৃদ্ধের সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন স্তরের নানান মানুষের (কেউ চিকিৎসক, কেউ ঠিকাদার, কেউ দর্জির দোকানের কর্মচারী) কথাবার্তার সুযোগে আপনি বুঝিয়ে দিলেন—সমাজের মূল শত্রু স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা। আগাগোড়া মানবিক আবেদনে জড়িয়ে থাকা এই গল্পটির মান এতটাই অনন্য যে এর সঙ্গে তুলনা করার মতো গল্পের নাম উল্লেখ করা কঠিন।

'এন্তে পুয়েব্লো দে মিয়েরদা' শিরোনামের একটি উপন্যাস প্যারিসে প্রবাসী অবস্থায় লিখে ফেললেন। ক্ষুধা-দারিদ্র্যের সঙ্গে নিত্য লড়াই চালাতে চালাতে লেখা এই উপন্যাসটি আসলে ছিল আপনার পুরস্কৃত উপন্যাস 'লা মালা ওরা'-র প্রাথমিক খসড়া। কর্নেলের কাহিনীর বহু চরিত্র (কর্নেল ছাড়া) লা মালা ওরা-য় ফিরে ফিরে এসেছে। লা ভায়োলেন্সিয়ার মতো নৃশংস রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, লা মালা ওরা-য় সরাসরি উপস্থিত। সেই নাম উচ্চারণ না-করা শহর অথবা গঞ্জের বাসিন্দাদের সৌজন্যবোধ সামাজিক কারণেই লা মালা ওরা-য় অনেক কম। রাজনীতির প্রেক্ষাপটে জন্ম-নেওয়া সামাজিক ত্রাস ও শংকা এই উপন্যাসের অন্যতম উপজীব্য। গুণ্ডারা শহরে হাজিরা দেয়। নানান রকমের গুজব শহর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। আতঙ্কগ্রস্ত নাগরিকরা হিংস্র আচরণে অভ্যস্ত হয়ে যায়। কারণ, ভয় থেকেই তো হিংসার জন্ম। স্বৈরাচারী রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে রচিত সাবলীল সৃজনশীলতার এক অনবদ্য নিদর্শন 'লা মালা ওরা' ১৯৬২-তে মেক্সিকো শহর থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রেগরি রাবাসা-র অনুবাদে ১৯৬৮-তে 'ইন ইভিল আওয়ার' নামে ইংরেজিতে মুদ্রিত হয়।

পিনিলা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরে (১৯৫৭) প্যারিস থেকে লন্ডন হয়ে কলম্বিয়ার বদলে ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাস্-এ চলে গেলেন। পিনিলা-র দাপটে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া কলম্বিয়ার বহু মানুষ তখন ওখানে শরণার্থী হিসেবে ঠাঁই নিয়েছিল। বহুদিন বাদে পুরোনো বন্ধু, প্লিনিও আপুলেও মেন্দোজা-র সঙ্গে কারাকাস্-এই দেখা হল। প্লিনিও তখন ওখানকার সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'এলিতে'-র সম্পাদক। প্লিনিও-র আনুকূল্যে আবার শুরু হল ইয়োরোপ সফর। দুই বন্ধু ঘুরে বেড়ালেন পূর্ব ইয়োরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে নিয়মিত প্রতিবেদন পাঠাতেন লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। কোনো কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশের রাষ্ট্রীয় অনুশাসন সম্পর্কে আপনার ধারণা হয়েছিল— লা ভায়োলেন্সিয়া-র ইয়োরোপীয় সংস্করণ। লন্ডন হয়ে কারাকাস্-এ ফিরে দেখলেন—পরম সুহৃদ প্লিনিও 'মেমেন্তো' পত্রিকায় যোগ দিয়েছেন। প্লিনিও-র সহায়তায় আপনিও একই পত্রিকায় কাজ শুরু করলেন।

বাধ্যতামূলকভাবে ইয়োরোপে থাকার সময় আপনার অত্যন্ত প্রিয় ও পছন্দের বিষয় 'চলচ্চিত্র' সম্পর্কে প্রাথমিক পর্যায়ের প্রাতিষ্ঠানিক পাঠ সম্পন্ন করলেন। রোম-এর ফিল্ম সংক্রান্ত প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠান 'সেন্ত্রো স্পেরিমেন্তালে ডি সিনেমা'-য় একবছর ধরে হাতে-কলমে এবং পুঁথিগত পাঠ নিয়ে চলচ্চিত্র চর্চা করলেন। ভিত্তোরিয়া ডি সিকা, সিজার জাভাত্তিনি-র মতো যশস্বী চলচ্চিত্রকারদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেলেন। বছর খানেকের এমন নিয়মানুগ চলচ্চিত্র চর্চা পরবর্তীকালে আপনার সিনেমা সংক্রান্ত ক্রিয়াকর্মাদির পক্ষে সহায়ক হয়েছিল।

অনেকে বলেন যে রোম-এর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আগেই ১৯৫৪-য় কলম্বিয়াতেই 'লা লাঙ্গোস্তা আজুল' নামে একটি ২৯ মিনিটের সাদা-কালো ছায়াছবি আপনি নির্মাণ করেছিলেন। পারমানবিক বিস্ফোরণ নিয়ে এটি ছিল চমৎকার একটি প্রহসনমূলক চলচ্চিত্র। জনৈক গবেষক গোপনে গবেষণা করতে শুরু করেন; গবেষণার বিষয়, গলদা চিংড়ির কেন নীল হয়ে যাচ্ছে। পারমানবিক বিস্ফোরণই কি এর কারণ? এমন একটা অদ্ভুত প্রশ্নকে সামনে রেখে গড়ে ওঠে লা লাঙ্গোস্তা আজুল বা দ্যা ব্লু লবস্টার (নীল গলদা চিংড়ি)। অবশ্য আপনি বলেছেন যে এটি ছিল— আলভারো কার্সেদা সামুদিও, এনরিক্ গ্রাউ, লুই ভিসেন্স এবং আপনার যৌথ সৃষ্টি।

অনেক ঝুঁকি নিয়ে ১৯৫৮-য় কলম্বিয়ায় ফিরে গিয়েই চট করে বিয়েটা সেরে ফেললেন। বাগ্দত্তা মার্সেডেস্-এর সুদীর্ঘ চার বছরের প্রতীক্ষার অবসান হল। নববধূকে বারানকিলা-য় রেখে আপনি আবার কারাকাস্—এ ফিরে এলেন। ততদিনে সেখানেও পট পরিবর্তন হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি ও আচরণের প্রভূত সমালোচনার পর মেমেন্তো পত্রিকাও মার্কিনপন্থী হয়ে পড়েছিল। বন্ধু প্লিনিও-র সঙ্গে একইসাথে আপনিও মেমেন্তো ছেড়ে চলে এলেন।

ইতোমধ্যে কিউবার বিপ্লব ঘটে গেছে। কিউবার বিপ্লবের খবর প্রত্যক্ষ করার জন্য সস্ত্রীক আপনি হাভানায় চলে গেলেন। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পর্কে আপনার প্রত্যক্ষ ধারণা হল। তখন আপনি রীতিমতো উত্তেজিত। পরিচয় হল ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে, যার পরিণতি— চিরসখ্য। কিউবার বিপ্লবের উত্তেজনা মাথায় নিয়ে কলম্বিয়ায় ফিরে এসে গড়ে তুললেন— 'প্রেন্সা লাতিনা', প্রচার মাধ্যমের বোগোতা ব্যুরো।

১৯৫৯-এ আপনার সংসারের সদস্য সংখ্যা একটু বাড়ল। জন্ম নিল বড়ো ছেলে— রোদরিগো। ঠিক তার পরেই প্রেন্সা লাতিনার নিউ ইয়র্ক শাখা স্থাপনের জন্যে সপরিবারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রওনা দিলেন। নিয়মিত প্রাণনাশের হুমকি অগ্রাহ্য করে আপনি কাজ করে গেলেন। একই সঙ্গে প্রত্যক্ষ করলেন কিউবার ওয়ার্কাস পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্ব। বিরক্ত হয়ে পদত্যাগ করে মেক্সিকো চলে গেলেন। সেই থেকে সুদীর্ঘকাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দরজা আপনার জন্যে বন্ধ ছিল। পেট চালাবার জন্যে মেক্সিকোয় আপনি সিনেমার সাব-টাইট্ল লিখতেন। লিখলেন কয়েকটা চিত্রনাট্য। প্রকাশিত হল কর্নেলের অনবদ্য কাহিনী। এই সময়েই (১৯৬২) প্রকাশিত হয় আটটি ছোটো গল্পের সংকলন— লোস্ ফুনেরালেস্ দে লা মামা গ্রান্দে। 'বড়োমা-র অন্ত্যেষ্টি' পরে 'বিগ মামাস্ ফ্যুনারেল্' নামে ইংরেজিতে অনূদিত হয়। লাতিন আমেরিকার সমাজজীবনের অজানা তথ্যে সমৃদ্ধ এবং নতুন কায়দায় বলা এই আটটি গল্প পাঠককে এক আশ্চর্য জগতে পৌঁছিয়ে দিল। আর আপনি বললেন— ১৯৫৩ তে এনসাইক্লোপিডিয়া বেচবার সময় যেসব অভিজ্ঞতা সংগৃহীত হয়েছিল তারই প্রতিফলন এই গল্পগুলিতে পড়েছে। ওই বছরেই দ্বিতীয় পুত্রের পিতা হলেন।

১৯৬২-তেই আপনার প্রথম উপন্যাস 'লা মালা ওরা' পেল কলম্বিয়ার সাহিত্য পুরস্কার—

'কলম্বিয়ান এসো'। উপন্যাসটিকে সহজে বিশ্বসাহিত্যের আঙিনায় উপস্থাপনার জন্যে, কলম্বিয়ান এসো-র উদ্যোক্তা সংস্থা, 'লা মালা ওরা' মাদ্রিদ থেকে প্রকাশের ব্যবস্থা করলেন। মাদ্রিদের প্রকাশক অশালীন শব্দাবলী ছেঁটে ফেলে বিশুদ্ধ আভিধানিক স্প্যানিশ ভাষায় উপন্যাসটি প্রকাশ করলেন। তবে শালীনতার পালিশ লাগানোর সুবাদে হারিয়ে গেল লাতিন আমেরিকার কৃষ্টি-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি তথা সৌন্দর্য। আপনার অসন্তোষ চাপা ছিল না। অবশেষে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে মেক্সিকো শহর থেকে উপন্যাসটির মূল পাণ্ডুলিপির অনুসারী সংস্কারবিহীন সংস্করণ প্রকাশিত হবার পর আপনার বিরক্তি দূর হয়েছিল।

লা মালা ওরা-র প্রাথমিক সাফল্যের পর মাদ্রিদ সংস্করণ যে নৈরাশ্য সৃষ্টি করেছিল তা বেশ কিছুকাল স্থায়ী হয়েছিল। একটানা দু-তিন বছর হতাশায় হারিয়ে গেল। নতুন লেখায় মন বসছে না। বই-পত্রেরও বিক্রিবাটা নেই। এর আগে প্রকাশিত বইগুলির মাত্র সাত-আট শো কপি বিক্রি হয়েছে। প্রকাশক কোনো রয়্যালটিও দেয়নি। সংসার নির্বাহের জন্যে বিজ্ঞাপন সংস্থায় কাজ করতে হচ্ছে। পত্রিকা সম্পাদনার কাজও করছিলেন। সে-কাজ কি শখ করে করতেন, না অর্থোপার্জনের জন্যে —বলা মুশকিল। কারণ এ-ব্যাপারে আপনি নীরব।

১৯৬৬-র এগারোই অগাস্ট মেক্সিকো সিটিতে একটি নতুন ছবি মুক্তি পেল। ছবির নাম — তিয়েম্পো দে মোরির্ (বাংলায় 'মৃত্যুর সময়' বলা যেতে পারে)। ছবিটির পরিচালক — আর্তুরো রিপস্তেইন্। চিত্রনাট্যকার দু-জন—কার্লোস্ ফুয়েন্তেস্ এবং আপনি। ৮৫ মিনিট দীর্ঘ এই ছবিটি অবশ্য খুব জনপ্রিয় হয়নি। কুড়ি বছর বাদে একই গল্প নিয়ে একই শিরোনামে পুনর্নির্মিত ছবিটি কিন্তু বাজারে সাড়া ফেলেছিল। ৯৮ মিনিটের এই রঙিন ছবিটি কলম্বিয়া এবং কিউবায় নির্মিত হয়। পুনর্নির্মিত ছবিটির পরিচালক হোর্গে আলি ত্রিয়ানা চিত্রনাট্য রচনার দায়িত্ব শুধু আপনাকেই দিয়েছিলেন।

তিয়েম্পো দে মোরির্-এর চিত্রনাট্য যখন যৌথভাবে কার্লোস্ ফুয়েন্তেস্-এর সঙ্গে লিখছিলেন (১৯৬৫), সেই সময়েই আরও একটি ছবির চিত্রনাট্য এককভাবে আপনি লিখে ফেলেন। 'হুয়েগো পেলিগ্রোসো' নাম নিয়ে ফিল্মটির স্প্যানিশ সংস্করণ ১৯৬৬-তে মেক্সিকোতে মুক্তি পায়। আদতে ছবিটি পর্তুগীজ ভাষায় নির্মিত হয়েছিল। নাম ছিল, —হোগো পেরিগোজো (ভয়ঙ্কর খেলা)। দুটো আলাদা গল্প নিয়ে গড়ে উঠেছিল ব্রাজিলে নির্মিত ৯৪ মিনিটের এই রঙিন ছায়াছবির দুই অংশ। আরও সরলভাবে বলা উচিত দুটো ছোটো ছবিকে এক শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। কারণ, গল্পকার, চিত্রনাট্যকার এমনকী পরিচালকরাও ছিলেন আলাদা। আর্তুরো রিপস্তেইন পরিচালিত 'এইচ্ .ও'(H.O) অংশের চিত্রনাট্য রচনার সঙ্গে আপনি জড়িত ছিলেন।

সম্ভবত ১৯৬৪-র ডিসেম্বরের মধ্যেই এইসব চিত্রনাট্য সংক্রান্ত কাজকর্ম শেষ হয়ে গেছিল। ১৯৬৫-র জানুয়ারি মাসে ছুটি কাটানোর উদ্দেশ্যে সপরিবারে আকাপুল্‌কো-র দিকে রওনা দিলেন। গাড়ি চালাতে চালাতেই আপনার মনে হল— এতদিনের অন্বেষণ বৃথা যায়নি। হঠাৎই আপনার চোখের সামনে 'মাকোন্দো'-র সেই ছবিটা ফুটে উঠল যেভাবে আপনি কুড়ি বছর ধরে এই প্রবাদের জনপদটিকে দেখতে চাইছিলেন। পরে এই ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে আপনি বলেছেন,— অকস্মাৎ, জানি না কীভাবে যেন আমি উপন্যাসটার সম্পূর্ণ নকশা দেখতে পেলাম।..... আমার চিন্তাটা এতই স্পষ্ট, স্বচ্ছ এবং সম্পৃক্ত ছিল যে আমি যেন একের পর এক প্রতিটি শব্দই জনৈক টাইপিস্টকে গড় গড় করে বলে যেতে পারছিলাম।

গাড়ি ঘুরিয়ে বাড়ি চলে এলেন। গাড়ির চাবিসহ ঘর-সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব গৃহিণী মার্সেডেসের হাতে তুলে দিয়ে আপনি একরকম স্বেচ্ছানির্বাসন নিলেন। আঠারো মাস ধরে প্রতিদিন একটানা লিখে চললেন। দিনে ছ-প্যাকেট সিগারেট আর কাগজ-কলম ছাড়া অন্য কিছুকেই গুরুত্ব না দিয়ে আপনি লিখেই গেলেন।

ওদিকে সংসারে হাঁড়ির হাল। সংসার চালানোর জন্যে গাড়িটা বিক্রি করতে হল। বাড়ির অন্যান্য আসবাপত্র, বাসন-কোসনও মাঝে-মধ্যেই বিক্রি করতে হচ্ছে। ধারে দেনায় মার্সেডেস্ জেরবার। তবে সুখের কথা, আপনাদের বন্ধুবান্ধব, পাড়াপড়শিরা কিছুদিন বাদেই বুঝতে পেরেছিল যে আপনি কোনো এক গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত। সেই সুবাদেই ফেরত না দেওয়া সত্ত্বেও ধার পাওয়া যেত।

বছরখানেক বাদে প্রথম তিনটি অধ্যায়ের খসড়া কার্লোস্ ফুয়েন্তেস্-কে পাঠিয়ে দিলেন। এক লপ্তে অধ্যায় তিনটি পড়ার পর ফুয়েন্তেস্ তো রীতিমতো উত্তেজিত! তিনি গণমাধ্যমে বিবৃতি দিলেন— 'এই মাত্র আমি এক সাহিত্যাচার্যের একটি চিরায়ত লেখার প্রথম আশিটি পৃষ্ঠা শেষ করলাম।'

তখনও উপন্যাসটির নামকরণ হয়নি। স্ত্রী এবং বন্ধুবান্ধবদের উপন্যাসটি পড়ে শোনালেন। তারপর তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করতে করতে একেবারে শেষ পৃষ্ঠায় পৌঁছে পেয়ে গেলেন উপন্যাসের নাম— সিয়েন আনোস্ দে সোলেদাদ্ (একশো বছরের একাকিত্ব)। আঠারো মাসের নিঃসঙ্গতা তথা নির্বাসন পরিত্যাগ করে অথবা সিগারেটের ধোঁয়ার গুহা ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। হাতে তেরোশো পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি।

নিকোটিনে জর্জরিত ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত শরীরে বাস্তব জীবনে প্রবেশ করে দেখলেন মাথার উপর দশ হাজার ডলারের ঋণ। পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশকের দপ্তরে পাঠাবার জন্যে ডাকমাশুলও বাড়িতে নেই। অতএব বাড়ির দু-একটি সামগ্রী (গৃহিণীর হেয়ার ড্রায়ার ও একটি ইলেকট্রিক হিটার) বিক্রি করতে হল। অবশেষে কঠোর পরিশ্রম ও প্রভূত কৃচ্ছসাধনের ফসল হিসেবে ১৯৬৭-র জুন মাসে আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস্ এয়ার্স-এর প্রকাশন সংস্থা সুদামেরিকানা থেকে প্রকাশিত হল— সিয়েন্ আনোস্ দে সোলেদাদ্।

প্রথম সপ্তাহে বিক্রি হল আট হাজার বই। তারপর তো প্রতিসপ্তাহেই নতুন মুদ্রণ। তিন বছরে বিক্রি হল পাঁচ লক্ষ বই। প্রথম প্রকাশের পরবর্তী তেত্রিশ বছরে 'একশো বছরের একাকিত্ব' তেত্রিশটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। গ্রেগরি রাবাসা-র ইংরেজি অনুবাদ 'ওয়ান হানড্রেড ইয়ার্স্ অফ্ সলিচ্যুড' ১৯৭০-এ প্রকাশিত হয়। তার আগেই ১৯৬৯-এ ইতালির সেরা সাহিত্য পুরস্কার (চিয়ানচিয়ানো) পেলেন। উপন্যাসটি ১৯৭০-এ, ফ্রান্স-এর শ্রেষ্ঠ বিদেশি বই হিসেবে স্বীকৃতি পেল। ইংরেজি অনুবাদে উপন্যাসটি ১৯৭০-এ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'শ্রেষ্ঠ এক ডজন বই'-এর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হল। একই বইয়ের জন্যে ১৯৭২-এ পেলেন রোমুলো গালেগোস্ পুরস্কার এবং নিউস্টাড্ পুরস্কার। একই বছরে আপনি পেলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সাম্মানিক ডিগ্রি। এই সুবাদে পেরুর প্রখ্যাত সাহিত্যিক মারিও ভার্গাস্ লিয়োসা আপনার ৪৩ বছরের জীবন নিয়ে একটি পুস্তকও লিখে ফেললেন। আর খ্যাতি প্রশংসা পুরস্কার এবং অর্থের বন্যায় ভেসে গিয়ে আপনি ঘটালেন এক ব্যতিক্রমী ঘটনা।

সপরিবারে স্পেনের বার্সেলোনা শহরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। আপনার মাথায় তখন

স্বৈরাচারীদের নিয়ে একটি উপন্যাসের খসড়া ঘুরপাক খাচ্ছিল। প্রত্যক্ষভাবে স্বৈরাচারকে উপলব্ধি করার জন্যেই আপনি বার্সেলোনা-কে বেছে নিয়েছিলেন। কারণ, তখনও স্পেনে বিগত শতাব্দীর কুখ্যাত স্বৈরাচারী ফ্রান্সিস্‌কো ফ্রাঙ্কোর রাজত্ব কায়েম ছিল। চূড়ান্ত বিচারে ফ্রাঙ্কের চেয়ে বেশিদিন, কোনো স্বৈরাচারী ক্ষমতাসীন ছিল না। আর স্বৈরাচার বিরোধিতায় আপনি সর্বদাই মুখর। আপনার মতে— সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকা কেবলমাত্র স্বৈরাচারীকেই এক বিশেষ চরিত্ররূপে উপস্থাপিত করেছে। কোনো দেশ হয়তো অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় স্বৈরাচারী, আবার অন্য কোনো দেশ হয়তো রহস্যপ্রিয় স্বৈরাচারী উপহার দিয়েছে। তবে বাস্তবে শুধু কলম্বিয়ায় নয়, সমগ্র লাতিন আমেরিকার সব স্বৈরাচারীই প্রাথমিকভাবে একেকজন জমিদার।

এর মধ্যে ১৯৭২-এ প্রকাশিত হ'ল সেই বিখ্যাত ছোটো গল্প 'লা ইন্‌ক্রেইব্‌ল্ ই ত্রিস্তে ইস্তোরিয়া দে লা কান্‌দিদা এরেন্‌দিরা ই দে সু আবুয়েলা দেশালমাদা'। ১৯৭৮-এ গ্রেগরি রাবাসা-র ইংরেজি অনুবাদে ' দি ইন্‌ক্রেডিব্‌ল্ অ্যান্ড স্যাড টেল্ অফ্ ইনোসেন্ট এরেন্‌দিরা অ্যান্ড হার হার্টলেস্ গ্রান্ডমাদার' নামে প্রকাশ পাওয়া মাত্রই দুনিয়ার সাহিত্য মহলে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। পরে ১৯৮৩-তে এই গল্পটি চলচ্চিত্রায়িত হয় আপনারই লেখা চিত্রনাট্যে। রুই গুয়েরা পরিচালিত 'এরিন্‌দেরা' শীর্ষক সিনেমাটি স্প্যানিশ ও পর্তুগিজ্ ভাষায় নির্মিত হয়েছিল। ১০৩ মিনিট দীর্ঘ এই ছায়াছবিটি সর্বত্রই জনপ্রিয়।

উনিশশো পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে আপনার লেখা বেশ কয়েকটি সংবাদ প্রতিবেদন একত্রিত করে ১৯৭৩-এ বার্সেলোনা থেকে প্রকাশিত হল একটি সংকলন,— কুয়ান্দো এরা ফেলিজ্ এ ইন্‌দকুমেন্‌তাদো (আমি ছিলাম সুখী এবং অনবগত)। অনেকের ধারণা হয়েছিল যে সাংবাদিকতা থেকে পুরোপুরি অবসর নেওয়ার জন্যেই সংকলনটি প্রকাশ করেছিলেন। তবে সকলের চিন্তাভাবনা নিরসন করে ১৯৭৪-এ স্বদেশ কলম্বিয়ায় ফিরে রাজধানী বোগোতায় স্থাপন করলেন নিজের সংবাদপত্র—অল্‌তের্‌নাতিভা।

কলম্বিয়ার রাজনীতি-অর্থনীতি তথা সমাজ ততদিনে অন্য মাত্রা পেয়েছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম সামরিক স্বৈরাচারী গুস্তাভো রোহাস্ পিনিলা বহুদিন আগেই ক্ষমতাচ্যুত। দেশের প্রধান রপ্তানিযোগ্য পণ্য কফি-র দাম অত্যন্ত পড়ে যাওয়ায় সামরিক বাহিনীই পিনিলাকে সরিয়ে নেয়। দুই প্রতিপক্ষ রক্ষণশীল আর উদারপন্থীরা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ক্ষমতাসীন হওয়ার জন্যে গড়ে তুলেছে 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট'। সত্যি সত্যিই চুক্তি বাস্তবায়িত হয়েছিল। ১৯৫৮ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত প্রতিটি চার বছরের মেয়াদে দু-বার উদারপন্থীরা আর দু-দফায় রক্ষণশীলরা রাষ্ট্রপতি পদে নিজেদের প্রার্থীদের পেয়েছিল।

তবে ওই ষোলো বছরে দেশের অর্থনীতি পুরোপুরি বিপর্যস্ত। কফির দাম ক্রমাগত কমতে থাকে। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহে বিলগ্নীকরণ চালু হয়েছে। মার্কিন বহুজাতিক সংস্থারা নিশ্চিন্তে ব্যাবসা করছে। এবং কলম্বিয়ার অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক হয়ে গেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

১৯৪৬-এ শুরু হওয়া রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস 'লা ভায়োলেন্সিয়া' ১৯৬৪-তে সমাপ্ত হয়েছে। আঠারো বছরে দু-লক্ষেরও বেশি মানুষের প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার পর কলম্বিয়া কী পেল? এক দলের মতে—বেশ কয়েকটি জঙ্গি গেরিলা সংগঠন। আর অন্য পক্ষের দাবি—ড্রাগ, মাদক-সহ যাবতীয় নিষিদ্ধ নেশাসামগ্রীর ব্যবসায়িক আধিপত্য।

চূড়ান্ত বিচারে কোনো অভিযোগটিই অসত্য নয়। গেরিলা সংগঠন ই.এল.এন, ১৯৬৪-তে কাজ শুরু করে। বছর দুয়েক বাদে এল— এফ. এ. আর. জি। আর সব শেষে ১৯৭৪-এর

১৯ এপ্রিল জন্ম নিল—' মোভিমিয়েন্তো নাইন্‌টিন্ দে আব্রিল' বা এম-১৯ গোষ্ঠী।

মারিজুয়ানা, কোকেনসহ যাবতীয় নিষিদ্ধ ড্রাগ ও মাদকজাতীয় নেশার সামগ্রী উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা ভিত্তি করে ওই সময়েই নিষিদ্ধ ব্যবসায়িক তথা চোরাচালান চক্র কলম্বিয়ায় আত্মপ্রকাশ করে। পাবলো এস্কোবার-এর নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠীটি মাদেলিন শহরকে কেন্দ্র করে সর্বপ্রথম সক্রিয় হয়। কিছুদিন বাদে কালি শহরে অপর চক্রটি কাজ শুরু করে। মাদেলিন এবং কালি-র চোরাচালানকারী চক্র আজ এতই সক্রিয় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজনের সত্তর শতাংশ এরাই মেটায়। কলম্বিয়ার রাজনীতি তথা অর্থনীতিকেও এই দুই চক্র বন্দুকের নলের ডগায় নিয়ন্ত্রণ করে। এহেন বৈচিত্র্যপূর্ণ আর্থ-সামাজিক অবস্থায় শুরু হল আপনার বোগোতার জীবন।

দুর্নীতিগ্রস্ত এক স্বৈরাচারীর চরিত্রানুসন্ধানকে উপজীব্য করে লেখা উপন্যাস,— এল ওতোনো দেল্ পত্রিয়ার্ক, ১৯৭৫-এ বার্সেলোনা থেকে প্রকাশিত হল। পরের বছর ইংরেজি অনুবাদ (অটাম অফ্ প্যাট্রিয়ার্ক) বাজারে এল। আপনার বয়ানে— 'কুলপতির হেমন্তকাল আসলে ক্ষমতার একাকিত্ব নিয়ে গড়ে ওঠা এক পদ্য।' তবে সমালোচকদের বিচারে— উপন্যাসটি সহজপাঠ্য নয়; কঠোর এবং ইচ্ছাকৃত হেঁয়ালি সাজিয়ে এক অদ্ভুত কায়দায় দুঃস্বপ্নের গোলকধাঁধা গড়ে তুলে আস্তে আস্তে অতি সন্তর্পণে একটা ছবিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে; ছ-টি অধ্যায়ে বিভক্ত উপন্যাসটির প্রায় প্রতিটি বাক্যই অসম্ভব দীর্ঘ। হয়তো গল্প বলার ধরন নিয়ে এ এক বিচিত্র পরীক্ষা। তবে শেষ পর্যন্ত কুলপতির হেমন্তকাল পেরিয়ে আসার পর পাঠক আপনার সঙ্গে একমত,— সব সময়ই আমার উদ্দেশ্য লাতিন আমেরিকার, বিশেষত ক্যারিবিয়ান উপসাগরীয় এলাকার স্বৈরাচারীদের চরিত্র বিশ্লেষণ।

সংবাদপত্র পরিচালনা, উপন্যাস লেখার সঙ্গে সঙ্গে এই সময়েই শুরু করলেন কিছু সামাজিক এবং কিছুটা রাজনৈতিক কাজকর্ম। রাসেল ট্রাইবুন্যাল-এর সহ-সভাপতির দায়িত্ব কাঁধে নিলেন। স্থাপন করলেন 'হাবেয়াস' (HABEAS)। কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা, নিকারাগুয়া, আর্জেন্তিনা-সহ সমগ্র লাতিন আমেরিকার রাজনৈতিক বন্দীদের অবস্থা জনসমক্ষে তুলে ধরাই ছিল হাবেয়াস-এর প্রাথমিক উদ্যোগ। পরে রাজবন্দীদের মুক্তির জন্যেও হাবেয়াস্ সক্রিয় হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হাবেয়াস্-এর ওপর ইউ.এস. ইমিগ্রেশন অ্যাক্ট ২১২ (এ) (২৪) ধারা জারি করল। অর্থাৎ হাবেয়াস্-এর প্রতিনিধিদের জন্যে মার্কিন দেশে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করা হল।

এর মধ্যে ১৯৭৪-এ আপনার গল্পের ভিত্তিতে নির্মিত হয়েছে একটি পূর্ণদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র— প্রেসাজিও। মেক্সিকোর পরিচালক লুই আলকোরিজা এই স্প্যানিশ ছায়াছবিটি পরিচালনা করেন।

এত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও কিন্তু ফিদেল কাস্ত্রো-সহ অন্যান্য রাষ্ট্রনায়ক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক অটুট ছিল। উনিশশো সত্তর দশকের শেষ দিকে মধ্য আমেরিকার ছোট্ট দেশ পানামায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতি হলেন আপনার পুরোনো বন্ধু ওমার তোরিহোস্। 'পানামা খাল' চুক্তি নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনার জন্যে পানামা-র প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবার দায়িত্ব আপনার কাঁধে বর্তাল। বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করতে আপনাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেতে হল। সীমিত সময়ের জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশাধিকার পেলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অবজ্ঞার এমন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া ভার।

হাবেয়াস্ ছাড়াও ১৯৭৫-এই কলম্বিয়ায় একটি নতুন রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করলেন— ফির্মেস্ (আক্ষরিক অর্থে— স্থায়িত্ব)।

অ্যাঙ্গোলা-য় কিউবার ভূমিকা নিয়ে ১৯৭৭-এ প্রকাশিত হল,— অপারেশন কারোল্টা। প্রায় একই সময়ে লিখলেন সেই দুঃসাহসী অথচ আত্মপ্রত্যয়ী বই-এর পাণ্ডুলিপি, যে-বই এখনও ছাপা হয়নি। বিষয়— কিউবার বিপ্লব এবং বিপ্লবোত্তর কিউবার জীবনযাপন প্রক্রিয়া নিয়ে কঠোর ও খোলাখুলি সমালোচনা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কিউবার সম্পর্ক স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এই পাণ্ডুলিপিটিকে ছাপতে দেবেন না বলে আপনি নিজেই জানিয়েছেন। আমরা অপেক্ষায় রইলাম।

আপনার বহুলপ্রচারিত ও বিখ্যাত গল্প 'সোলো ভিনে আ আবলার পোর তেলিফোনো' (আমি শুধু ফোন করতে এসেছিলাম) নিয়ে ১৯৭৯-এ মুক্তি পেল স্প্যানিশ চলচ্চিত্র— মারিয়া দে মি কোরাজন্ (মারিয়া, আমার প্রিয়তমা)। মেক্সিকোর পরিচালক হাইমে উম্বার্তো আর্মোসিল্লো নির্মিত ১৩৭ মিনিট দীর্ঘ এই ছায়াছবিটি যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিল। আপনার সঙ্গে যৌথভাবে পরিচালক ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন। একই বছরে আপনার লেখা চিত্রনাট্য নিয়ে মেক্সিকোর আরেক পরিচালক ফেলিপে কাজালস্ তৈরি করলেন,— এল আনো দে লা পেস্তে।

বহুল পঠিত বিখ্যাত উপন্যাস ' রবিনসন ক্রুশো'-র স্রষ্টা ড্যানিয়েল ডিফোর একটি স্বল্পখ্যাত উপন্যাস 'আ জার্নাল অফ্ দ্যা প্লেগ্ ইয়ার' নিয়ে ১৯৭০-এর দশকের শেষ দিকে আপনি রচনা করলেন 'এল আনো দে লা পেস্তে' ছায়াছবির চিত্রনাট্য। এ কাজে আপনাকে সহায়তা করেছিলেন —অতুরো ব্রেনান। সংলাপ লিখেছিলেন,— হোসে অগুস্তিন। ফেলিপে কাজালস্ পরিচালিত ছবিটি ১৯৭৯-তে মেক্সিকোয় মুক্তি পায়।

গল্পের পটভূমি— হল্যান্ড। সময়— ১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ। শোনা যাচ্ছে— প্লেগ রোগ আবার হল্যান্ডে ফিরে এসেছে। এর আগে ১৬৩৩ নাগাদ প্লেগ হল্যান্ডে হানা দিয়েছিল। রাজধানী আর্মস্টার্ডাম ছাড়াও রটারডাম্ শহরে ব্যাপকভাবে প্লেগ সেই সময় ছড়িয়ে পড়েছিল। তারপর আবার এতদিন পরে প্লেগের হল্যান্ডেপ্রত্যাবর্তন। কেউ বলছে— এটা ইতালি থেকে এসেছে। কারও মতে তুরস্ক থেকে আসা মালপত্রের সঙ্গে প্লেগ এসেছে। আরও অনেকে অন্য আরও অনেক জায়গার কথা বলছে, যেখান থেকে প্লেগ আসার সম্ভাবনা আছে। তবে আসল কথা হল, অনেকদিন পর প্লেগ আবার হল্যান্ডে ফিরে আসার কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেছে— এল্ আনো দে লা পেস্তে।

মেক্সিকোর চলচ্চিত্র জগতের সেরা পুরস্কার 'গোল্ডেন আরিয়েল' পেলেন পরিচালক কাজালস্। সহযোগী-সহ আপনি পেলেন চিত্রনাট্য রচনার জন্য সেরা পুরস্কার 'সিলভার আরিয়েল'। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৮০-তেও ওই একই ছবির জন্যেই আবার আপনারা পুরস্কৃত হলেন। মেক্সিকোর চলচ্চিত্র সাংবাদিকদের বিচারে পাওয়া গেল এই স্বীকৃতি।

ঘন ঘন মেক্সিকো যাওয়ার প্রয়োজনে উনিশশো সত্তরের দশকের শেষদিকে মেক্সিকোতে একটা বাড়ি কিনে ফেললেন। সবদিক থেকেই ভালো হল। আপনি নিশ্চিন্তে রাজনীতি ও লেখালেখি করে যেতে লাগলেন। সম্পাদনার কাজও অব্যাহত থাকল।

সৃজনশীল সাহিত্যের জন্যে ১৯৮১-তে পেলেন ফ্রান্সের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান,— লেজিয়ঁ অফ্ অনার্'। কলম্বিয়া ফেরার পথে অবকাশ যাপনের উদ্দেশ্যে হাভানায় প্রিয় বন্ধু ফিদেল কাস্ত্রোর

আতিথ্য গ্রহণ করলেন। দুই বন্ধুতে মিলে 'ক্রনিকা দে উনা মুয়ের্তে আনুন্সিয়াদা' উপন্যাসের প্রুফ সংশোধন করলেন। ফিদেল আবার খানিকটা সম্পাদনাও নাকি করেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই বার্সেলোনা-র ব্রুগুয়েরা সংস্থা বইটি প্রকাশ করল। গ্রেগরি রাবাসা-র অনুবাদে ১৯৮২-৮৩তে প্রকাশিত হল— ক্রনিক্ল্ অফ আ ডেথ্ ফোরটোল্ড। পরে (১৯৮৭) একই শিরোনামে ইতালি, ফ্রান্স ও কলম্বিয়া-র যৌথ উদ্যোগে ১০৯ মিনিটের একটি পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। ফ্রান্সেস্কো রোসি পরিচালিত ছায়াছবিটি ইতালীয় ভাষায় তৈরি হয়েছিল। আরও পরে নব্বই-এর দশকে কলম্বিয়ার প্রখ্যাত পরিচালক হোর্গে আলি ত্রিয়ানা, একই কাহিনীর ভিত্তিতে রচিত নাটক, নিউ ইয়র্কের ব্রডওয়েতে মঞ্চস্থ করেন।

পূর্বাহ্নেই ঘোষিত একটি মৃত্যুর কাহিনী অনবদ্য ভঙ্গিতে আপনি বলে গেছেন। সংবাদ পরিবেশনের কায়দায় যেভাবে আপনি ধাপে ধাপে উপন্যাসটি গড়ে তুলেছেন তা বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয়। অনেক পরে আপনি জানিয়েছেন যে ১৯৫১-র ২২শে জানুয়ারি কলম্বিয়ার সুক্রে শহরে ঘটে-যাওয়া একটি হত্যাকাণ্ডই এই কাহিনীর সূত্র।

আপনি তখন সাংবাদিকতা সূত্রে কার্তাহেনায়। সেই অভিশপ্ত সোমবারের সকালে অনাবাসী ইতালীয় পরিবারের সুদর্শন ছাত্র কায়েতানো জেস্তিলে মৃত্যুর খানিকক্ষণ আগে আপনার বাবাকে চিঠি পাঠিয়েছিল। ছুরিকাহত হবার প্রাক্মুহূর্তে কায়েতানো আপনাদের বাড়িতে প্রাতরাশ সেরেছিল। জনৈকা মার্গারিতা চিকা সালাস্ স্বামীর বাড়ি থেকে ফিরে আসে। মার্গারিতা-র দুই ভাইয়ের ধারণা হয় যে বিয়েটা ভাঙার জন্যে কায়েতানো দায়ী। আরও আশ্চর্য ব্যাপার— ভাইদের ধমক-হুমকিতে মার্গারিতাকে বিয়েটা করতে হয়েছিল। মার্গারিতার ভাইরা মাছের ব্যবসা করলেও কসাইয়ের দক্ষতায় কায়েতানো-কে খুন করেছিল। সংবাদপত্রের পাতায় খবরটা বড়ো করে ছাপা হয়নি। তবে মায়ের কাছে পুরো ঘটনাটি সবিস্তারে শোনার পর পুরো হত্যাকাণ্ডটি বোধহয় আপনার মনে গেঁথে গেছিল। তার ফলেই বিশ্বসাহিত্যে পেল এমন একটি টান টান উপন্যাস যা একটি নতুন কায়দায় কথিত। অবশ্যই বাস্তব ঘটনাটির সঙ্গে মুদ্রিত উপন্যাসের অনেক পার্থক্য আছে।

তবে নতুন করে স্বদেশে বসবাস সুখকর হল না। 'এম নাইন্টিন্' গেরিলা গোষ্ঠীকে নিয়মিত অর্থসাহায্যের অভিযোগ উঠল আপনার বিরুদ্ধে। বয়স কম হওয়া সত্ত্বেও এই সংগঠনটির তখন কলম্বিয়ায় ব্যাপক নামডাক। এম নাইন্টিন্ লাতিন আমেরিকার সেরা স্বাধীনতা সংগ্রামী সিমোন বলিভার-এর তলোয়ার চুরি করেছে বলে গুজব রটেছিল। তবে গুজব যা-ই রটুক না কেন বাস্তবে এম নাইন্টিন্ এক শ্রমিক নেতাকে ১৯৭৬-এ অপহরণ করে হত্যা করেছিল। গোপনে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে বোগোতা-র সরকারি অস্ত্রাগার থেকে ১৯৭৯—এ অস্ত্রশস্ত্র চুরি করেছিল। আর এম নাইন্টিন্-এর ১৯৮০-র কীর্তি তো সারা দুনিয়ায় শোরগোল তুলেছিল। বোগোতা-য় ডমিনিকান রিপাবলিক-এর দূতাবাসের এক নৈশভোজে উপস্থিত অতিথিদের এম নাইন্টিন্ অপহরণ করে।

অস্বস্তির হাত থেকে বাঁচতে কিছুদিন বাদেই আবার মেক্সিকোর পুরোনো আবাসে ফিরে এলেন। ১৯৮২-র অক্টোবর মাসে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারের জন্যে আপনার নাম ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ছবিটা পুরো পালটে গেল। সরকারি তরফে তো বটেই, স্বয়ং কলম্বিয়ার রাষ্ট্রপতি বেলিসারিও বেতানকুর্ কুয়ারতাস্ আপনাকে দেশে ফেরার আহ্বান জানালেন। রক্ষণশীল রাষ্ট্রপতি বেতানকুর্ কুয়ারতাস্-এর আমল (১৯৮২-৮৬) ইদানীং কালের মধ্যে

হিংস্রতম বলে স্বীকৃত। মাদক চালান, জঙ্গি আক্রমণ প্রভৃতি নিয়ে জর্জরিত রাষ্ট্রপতি বেতানকুর্ কুয়ারতাস্, আপনার নোবেল পুরস্কার নেওয়ার জন্যে, স্টকহোল্ম যাত্রার প্রাক্কালে, নিজে বিমানবন্দরে উপস্থিত হয়ে বোধহয় আগেকার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। এমনকী নোবেল পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানেও কলম্বিয়ার রাষ্ট্রপতি উপস্থিত ছিলেন।

এই সুযোগে নোবেল পুরস্কার নেওয়ার আগে পরের কয়েকটা ছোটোখাটো ঘটনার কথা সেরে নেওয়া যাক। পুরোনো বন্ধু ও সহকর্মী প্লিনিও আপুলেও মেন্দোজা-কে ' এল ওলোর দে লা গুয়াইয়াবা' শীর্ষক একটি বই প্রকাশ করতে সাহায্য করলেন। সাংবাদিক জীবনের কয়েকটি প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্লিনিও-র নেওয়া সাক্ষাৎকার বইটির মূল উপাদান। 'দ্যা ফ্রাগন্যান্স অফ্ গুয়াভা' নামে বইটি ১৯৮৩-তে ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়। ১৯৮২-তেই লিখলেন— ভিভা সান্দিনো। নিকারাগুয়া-র বিপ্লব (১৯৭৯-তে সংঘটিত) এবং যারা বিপ্লব ঘটিয়েছিল সেই সান্দানিস্তদের নিয়ে রচিত এ এক নতুন ধরনের চিত্রনাট্য। চিত্রনাট্যটি নিকারাগুয়ার রাজধানী মানাগুয়া থেকে প্রকাশিত হয়। নন্-অ্যালাইন্মেন্ট মুভমেন্ট (ন্যাম্) বা জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সপ্তম শীর্ষ সম্মেলনের সংবাদ সংগ্রহ করতে ১৯৮৩-র ৬ মার্চ আপনি নতুন দিল্লি এলেন। ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে একই বিমান থেকে অবতরণ করলেন। ফিরেও যান একই বিমানে। কিন্তু সম্মেলন চলাকালীন আপনি ছিলেন অন্য অনেক সাংবাদিকের অন্যতম। একই পেশার অন্যান্যদের মতো দায়িত্ব পালন করে গেছেন। আপনাকে ঘিরে নিরাপত্তার কড়াকড়ি ছিল না। চাইলেই দেখা করেছেন। আপনার সাদামাটা ভঙ্গির সদাহাস্য কথাবার্তা শুনে কেউ কি বুঝতে পেরেছিল যে মাত্র কয়েক মাস আগেই আপনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। আপনাকে দেখে কেউ ভাবতেও পারেনি যে কলম্বিয়ায় ফিরে গিয়েই আপনি প্রকাশ করবেন নিজের সম্পাদনা ও মালিকানায় একটি নতুন দৈনিক সংবাদপত্র,— এল ওতো (বিকল্প)।

চুয়ান্ন বছর বয়সে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর প্রকৃত অর্থেই আপনি বিশ্বপথিক হয়ে গেলেন। চলচ্চিত্র ও সাহিত্যচর্চায় ঘাটতি পড়ল না। মেক্সিকো-কার্তাহেনা-হলিউড-বার্সেলোনা এবং অবশ্যই হাভানা-র পথে নিয়মিত যাতায়াত-দৌড়ঝাঁপে আপনি অভ্যস্ত হয়ে পড়লেন।

১৯৮৩-তে 'এরেন্দিরা'। হোর্গে আলি ত্রিয়ানা-র পরিচালনায় ১৯৮৫-তে 'তিয়েস্পো দে মোরির' ছবির পুনর্নির্মাণ। ১৯৮৮-তে পরপর মুক্তি পেল ছ'-ছটি ছায়াছবি। 'ফাবুলা দে লা বেলিয়া পালোমেরা', 'উন্ ওমরে মুই ভিয়েহো কোন্ উনাস্ আলাস্ এনোর্মেস্ ', ' এল ভেরানো দে লা সেনোরা ফোরবেস্', 'ইয়ো সোয় এল্ কে বুস্কাস্', উন্ দোমিঙ্গো ফেলিজ', এবং মিলাগ্রো এন্ রোমা', ছ-টি ছবিই স্প্যানিশ ভাষায় নির্মিত। ছবিগুলি কলম্বিয়া, কিউবা, ব্রাজিল, স্পেন, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশে তৈরি হয়েছিল। ঠিক এক বছর আগে মুক্তি পেয়েছিল,— ' ক্রনিকা দে উনা মোর্তে আনুন্সিয়াতা'। আপনার বহুল পরিচিত ও প্রচারিত উপন্যাসকে ভিত্তি করে ইতালীয় ভাষায় গড়ে উঠেছিল এই ছায়াছবি। তারও একবছর আগে (১৯৮৬) হাভানায় গড়ে তুলেছেন আপনার স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান— হোসে সার্তি নাশিওনেল ফিল্ম ইনস্তুতে। আজও আপনি এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ।

উনিশশো আশির দশকেই প্রকাশিত হয়েছে,— 'লা আভেন্তুরা দে মিগুয়েল লিতিন ক্লান্দেস্তিনো এন চিলে' (১৯৮৬), 'এল্ আমোর এন্ লোস্ তিয়েম্পোস্ দেল্ কোলেরা' (১৯৮৫), 'এল্ আসাস্তো : এল ওপেরাতিভো কোন্ এল্ এফ.এস.এল.এন সে লান্জো আল্

মুন্দো' (১৯৮৩) এবং ' এল সেকুয়েস্ত্রো' (চিত্রনাট্য১৯৮২)।

১৯৮৬-তে প্রকাশিত হল আপনার লেখা সেই আশ্চর্য উপন্যাস,— 'লা আভেন্তুরা দে মিগুয়েল লিতিন ক্লান্দেস্তিনো এন চিলে ' অনুবাদক আসা জাংজ্।

১৯৭৩-এর সেপ্টেম্বর মাসে রাষ্ট্রপতি সালভাদোর আলিয়েন্দের গণতান্ত্রিক সরকারকে সশস্ত্র উপায়ে অপসারণ করে জেনারেল অগাস্তো পিনোশে চিলিতে এক সামরিক স্বৈরাচার স্থাপন করে। নৃশংস অত্যাচার, গুপ্তহত্যা, বহিষ্কার প্রভৃতি স্বৈরতন্ত্রের সাধারণ উপাদান পিনোশে-র প্রশাসনেও ছিল। অন্য অনেকের সঙ্গেই চিলির প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার মিগুয়েল লিতিনও চিলি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। চিলির স্বৈরাচারের প্রকৃত পরিস্থিতি সারা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরার জন্যে লিতিন একটি তথ্যচিত্র নির্মাণে উদ্যোগী হন। ১৯৮৫-তে লিতিন গোপনে চিলিতে প্রত্যাবর্তন করেন। সঙ্গে ছিল সুদক্ষ কারিগরি বিশেষজ্ঞ ও কলাকুশলীবৃন্দ। ছ-সপ্তাহ ধরে ছবিটি নির্মিত হল। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে,অসীম সাহসে বুক বেঁধে তৈরি হল ছবিটির দুটি সংস্করণ। টেলিভিশনের জন্যে চার ঘন্টা ও সিনেমা হলের জন্যে দু-ঘন্টা।

মাদ্রিদে বসে লিতিন-এর মুখে শুনলেন গোপনে চিলিতে ছায়াছবি নির্মাণের অনুপুঙ্খ বিবরণ। এই বিবরণীর ভিত্তিতে আপনি লিখলেন এক বিচিত্র স্বাদের রাজনৈতিক থ্রিলার। অথবা স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এক নতুন ভঙ্গির প্রতিবাদ। 'লাভ্ ইন্ দ্যা টাইম্ অফ্ কলেরা' নামে ১৯৮৮-তে 'এল্ আমোর্ এন্ লোস্ তিয়েম্পোস্ দেল্ কোলেরা'-র ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হবার পর সারা পৃথিবীতে আলোড়ন উঠল। মা-বাবার প্রেম-পরিণয়--মধুচন্দ্রিমা-দাম্পত্য এবং ছোটখাটো বিচ্ছিন্নতা-বিশ্বাসহীনতা, সাময়িক ভুল বোঝাবুঝি নিয়ে গড়ে ওঠা এক সুদীর্ঘ প্রণয়কে আপনি স্বচ্ছন্দে আপনার উপন্যাসের উপজীব্য করে তুললেন।

কলেরা-র প্রেম কাহিনীতে বিশ্বসাহিত্যের আঙিনা যখন মাতোয়ারা, ঠিক সেই সময়ে প্রকাশিত হল (১৯৮৯),— এল্ জেনেরাল এন্ সু লাবেরিন্তো। পরের বছর প্রকাশিত হল ইংরেজি অনুবাদ,—'দ্যা জেনারেল ইন হিজ ল্যাবিরিন্থ'। পাঠক-পাঠিকা তো বটেই সমগ্র লাতিন আমেরিকাই এবার মোহিত হয়ে গেল। কলম্বিয়ার প্রবাদপ্রতিম স্বাধীনতা সংগ্রামী সিমোন বলিভার-কে নিয়ে এমন সাহসী কথাশিল্প প্রণয়নের সাহস এবং ক্ষমতা আর কারও ছিল কি? পঞ্চাশ বছর বয়স্ক বলিভার-এর সাত মাস ব্যাপী এক নৌ-যাত্রার কাহিনী এই উপন্যাসে বিবৃত। বোগোতা থেকে যাত্রা করে বলিভার বন্দর থেকে বন্দরে যাচ্ছেন আর তাঁর স্মৃতির পাতা একের পর উন্মোচিত হচ্ছে। যুদ্ধ, ভালোবাসা, ঘৃণা, দেশপ্রেম ইত্যাদি নিয়ে উপন্যাসটি আসলে বলিভারের স্বপ্নভঙ্গের কাহিনী। সশ্রদ্ধ চিত্তে এবং বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে আপনি উচ্চারণ করলেন— বলিভারের মতাদর্শ আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বলিভারের-এর আদর্শ রূপায়ণের জন্যে অর্থাৎ লাতিন আমেরিকার ঐক্য স্থাপনে প্রয়োজনে আমি মরতেও রাজি।

সাহিত্য কিংবা চলচ্চিত্র অর্থাৎ সৃজনশীলতার যে-ক্ষেত্রেই আপনি বিচরণ করুন, অথবা যখনই যেখানে থাকুন না কেন আপনার সৃষ্টির মূল উপকরণ কিন্তু লাতিন আমেরিকার সমাজ-সভ্যতা-ঐতিহ্য এবং অবশ্যই সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপন প্রক্রিয়া। সমগ্র লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশের রাষ্ট্র পরিচালনার পদ্ধতি, অর্থনীতি মূলত একইরকম। কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা, আর্জেন্তিনা, চিলি, এমনকী পর্তুগিজ ভাষাভাষী ব্রাজিলও এর ব্যতিক্রম নয়। (স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলা হয় সমগ্র লাতিন আমেরিকা ও মধ্য আমেরিকায়, একমাত্র

ব্রাজিলের ভাষা পর্তুগিজ্) প্রতিটি দেশেই লাতিন আমেরিকার আদি বাসিন্দা, স্পেন-সহ ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের অধিবাসী এবং আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের মানুষেরা একই সঙ্গে প্রায় চার-শো বছর বসবাসের ফলে একটি নতুন সমাজ গড়ে উঠেছে।

উষ্ণমণ্ডলের যেকোনো সমাজের মতো লাতিন আমেরিকার প্রতিটি দেশেরই অন্যতম সংস্কৃতি হল— আড্ডা। সন্ধের পর শহর বা গঞ্জের ময়দানে, প্লাজায় বা বুলেভার্ডে, নিদেনপক্ষে সিনেমা হলের সামনে জটলা হবেই। ফুটবল, বক্সিং-এর মতো উত্তেজনাকর খেলা স্পেনের উত্তরাধিকার বলে অনেকের ধারণা। ঘর-সংসারের ব্যাপারটা পশ্চিম ইয়োরোপ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো খোলামেলা। সমাজে ইয়োরোপের মতো চার্চের প্রভাব আছে। আফ্রিকা বা মধ্যপ্রাচ্যের মতো জাদুবিদ্যা-আধিভৌতিক ব্যাপার-স্যাপারের প্রভাব সমাজে যথেষ্ট প্রবল।

ধর্ম-বর্ণ-বিত্ত-শিক্ষার ভেদাভেদ থাকলেও সব মানুষই এ বিষয়ে মোটামুটি একই মানসিকতা সম্পন্ন। অতএব কুসংস্কারের প্রভাব সর্বত্রই কম-বেশি ছড়িয়ে আছে। অলৌকিক-তুকতাক-জাদুবিদ্যায় অল্পবিস্তর সবারই বিশ্বাস আছে। আপনি নিজেই এ-বিষয়ে বলেছেন—(লাতিন আমেরিকায়) যেসব কাণ্ড ঘটে, যাদের-আপনারা ম্যাজিক রিয়্যালিজম্ বলেন, আসলে তা আফ্রিকা ও আরবের প্রভাবেই গড়ে উঠেছে।

অনেক সমালোচক-গবেষকের মতে সাহিত্যে আলৌকিক-তুকতাক -জাদুবিদ্যার সাবলীল উপস্থিতিই আপনার জনপ্রিয়তার একমাত্র কারণ। অথচ, হোর্হে লুই বর্হেস্, আলেহো কার্পেন্তিয়ের, হুয়ান রুলফো, হুলিও কোয়ার্তসার, লে জামা লিমা, কার্লোস্ ফুয়েন্তেস্, মারিও ভার্গাস্ লিয়োসা প্রমুখ জনপ্রিয় সাহিত্যিকের মতো লাতিন আমেরিকার স্থানীয় সমাজজীবন আপনার সৃজনশীলতার পটভূমি। আসলে ইয়োরোপীয় ও মার্কিন সাহিত্য-তাত্ত্বিকদের অধিকাংশই এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার সাহিত্যে জাদু-ভেলকি-মন্ত্র-তন্ত্র-ডাকিনীবিদ্যা জাতীয় আধিভৌতিক-অলৌকিকের অনুসন্ধানে সদা ব্যস্ত। বাস্তবে কিন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্য-সংস্কৃতিতেই ডাকিনীবিদ্যা তথা 'ব্ল্যাক কাল্ট'-এর প্রভাব অনেক বেশি। এ-প্রসঙ্গে আপনার সরাসরি মন্তব্য— এ-কথা আমি সবসময়ই বলে এসেছি যে জাদু-বাস্তবতা বা ম্যাজিক রিয়্যালিজম্ হল বাস্তবের দিকে সরল চোখে তাকানো— খোলা চোখের নিষ্পাপ দৃষ্টি—পূর্ব নির্ধারিত কোনো দৃষ্টিভঙ্গি বা ধারণার বশবর্তী হয়ে দেখা নয়।

'ম্যাজিক রিয়্যালিজম্' শব্দবন্ধ-র প্রথম ব্যবহারও ইয়োরোপে। অঙ্কন বা চারুশিল্পের একটি বিশেষ ধারাকে ১৯২৫-এ জার্মান সমালোচক ফ্রান্জ্ রো ম্যাজিক রিয়্যালিজম্ নামে আখ্যা দিয়েছিলেন। যদিও 'পোস্ট-এক্সপ্রেসানিস্ট ধারার' এই সব ছবি পরে 'নিউ অবজেক্টিভিটি' নামে খ্যাত হয়। ছবির ক্ষেত্রে 'ম্যাজিক রিয়্যালিজম্'. শব্দবন্ধ সম্ভবত ১৯৪৩-এ শেষবারের মতো ব্যবহৃত হয়েছিল। নিউইয়র্কের 'মিউজিয়াম অফ্ মর্ডার্ন আর্ট' ১৯৪৩-এ 'আমেরিকান রিয়্যালিস্টস্ অ্যান্ড ম্যাজিক রিয়্যালিস্টস্' শিরোনামে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করে। এই প্রদর্শনীতে এডওয়ার্ড হপার এবং চার্লস্ শীলার-এর ছবিও প্রদর্শিত হয়।

ততদিনে অবশ্য 'ম্যাজিক রিয়্যালিজম্' সাহিত্যের আঙিনায় পৌঁছে গেছে। ফ্রান্জ্ কাফ্কা, জন ফাওলস্, গুন্টার গ্রাস্ প্রমুখ ইয়োরোপীয় সাহিত্যে ম্যাজিক রিয়্যালিজম্-এর অন্যতম প্রবর্তক। যদিও লাতিন আমেরিকার সাহিত্যে সেই উনিশশো তিরিশের দশকেই ম্যাজিক রিয়্যালিজম্ ঠাঁই পেয়ে গেছে। হোর্হে লুই বোর্হেস সম্ভবত এই ধারার প্রথম সাহিত্যিক। ১৯৩৫-

এ প্রকাশিত 'হিস্তোরিয়া উনিভের্সাল দে লা ইন্ফামিয়া'-র আগে এই ধারার কোনো উপন্যাসের খোঁজ কিআধুনিক সাহিত্যে পাওয়া যায়? হুলিও কোয়ার্তসার হোসে দন্স্কো, কার্লোস্ ফুয়েন্তেস্, মারিও ভার্গাস্ লিয়োসা প্রমুখ অনেকেই ম্যাজিক রিয়্যালিজম্ সমৃদ্ধ উপন্যাস লিখেছেন। তবে এ-বিষয়ে আপনার মুনশিয়ানা যে সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে— সে ব্যাপারে সবাই একমত। প্রখ্যাত চিত্র ও নাট্য পরিচালক হোর্গে সালি ত্রিয়ানার মন্তব্য এ-প্রসঙ্গে চিরস্মরণীয়। আমেরিকার দেশগুলির মধ্যে নিউইয়র্ক হল সবচেয়ে বড়ো মাকোন্দো। এত বেশি ম্যাজিক রিয়্যালিজ্ম্ জীবনে আর কোথাও দেখিনি।

কোনোরকম পূর্ব সৃষ্ট ধারণা না নিয়ে বাস্তবের দিকে তাকানোই লাতিন আমেরিকার প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে অনবরত দ্বন্দ্ব-লড়াই, অবিরাম সামরিক অভ্যুত্থান, স্বৈরতন্ত্র, গুপ্তহত্যা, ক্ষুধা, অপহরণ, ধর্ষণ, দুর্নীতি যে মহাদেশের নিত্য-নৈমিত্তিক বিষয়, যে মহাদেশের অর্থনীতি বহুজাতিক সংস্থারা সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করে — সেই বাস্তবতায় কোন মতাদর্শ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবে? টিকে থাকার জন্যে সেইসব দেশে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে বাঁচার লড়াইয়ের আদবকায়দা পরিবর্তনশীল হতে বাধ্য। কোনো পূর্বপরিকল্পিত নিয়মতান্ত্রিকতায় এইসব লড়াই পরিচালিত হতে পারে না। আপনিও এই ধারণার অনুসারী। মেক্সিকোর সাহিত্যিক এবং প্রিয় বন্ধু কার্লোস্ ফুয়েন্তেস্-এর অনুরণনে তাই আপনি বললেন— কনজিউমারিজ্ম্ (পণ্যবাদ) বা কমিউনিজ্ম্ (সাম্যবাদ), কোনো বিষয়েই আমরা চিন্তিত নই। প্রতিদিনের জীবনযাত্রার সঙ্গে জড়িত নানান বিষয় নিয়েই আমাদের ভাবনা সংবৃত। লাতিন আমেরিকা এমন এক অঞ্চল যেখানে (কুড়ি কোটি বা) দু'শো মিলিয়ন মানুষের রোজগার মাসে ষাট ডলারেরও কম। কাজের খোঁজে বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রতিদিনই বহুলোক কাজ না পেয়ে ফিরে যায়। এই অবস্থাটার পরিবর্তন করাই হল আসল কাজ। মতাদর্শের প্রশ্ন এখানে অচল, সেই কারণেই হয়তো বারে বারেই আপনার আকুল আকুতি— দোহাই, আমার গায়ে কোনো ছাপ্পা মেরো না।

সত্যি সত্যিই হাজার চেষ্টাতেও আপনাকে আজও কেউ দাগাতে পারেনি।

লাতিন আমেরিকার ঐতিহ্য, উপনিবেশের যুগ, ঔপনিবেশিকতা বিরোধী সংগ্রাম, দেশি-বিদেশি পুঁজির দাপট, স্বৈরতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা অর্থাৎ মহাদেশের চিরন্তন ব্যবস্থা, আপনার সৃজনে সর্বদাই ব্যক্ত। কখনো কাব্যিক ঢঙে, আবার কখনো সাংবাদিকসুলভ প্রতিবেদনে, কখনো-বা আখ্যান বর্ণনার শৈলীতে লাতিন আমেরিকার চিরন্তন বিষয়গুলি আপনি সাবলীল গতিতে এবং স্বচ্ছন্দ ছন্দে ফুটিয়ে তোলেন। ম্যাজিক রিয়্যালিজ্ম্-এর বৈশিষ্ট্য ছাড়াও ঈষৎ যৌনতার ছোঁয়া-মাখানো শরীরকেন্দ্রিক ঘটনা উপস্থাপনের জন্য অনেকে হয়তো একটু অন্য চোখে আপনার দিকে তাকিয়ে থাকেন। কিন্তু তাতে কী আসে যায়! লাতিন আমেরিকার সমাজ সম্পর্কে সামান্য অবগত থাকলেই বোঝা যায় — এসব চিন্তা একেবারেই ভিত্তিহীন। সবমিলিয়ে সাধারণ পাঠক-দর্শকের চোখে আপনার সাহিত্য-চলচ্চিত্র লাতিন আমেরিকার মূর্ত প্রতীক।

আপনার বরাবরের ঘৃণার বিষয়— স্বৈরাচার। তীব্র ঘৃণা নিয়ে আপনি স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছেন। এই কঠিন যুদ্ধে অনেকেই আপনার সহযোগী। হুলিও কোয়ার্তসার, স্বদেশের (আর্জেন্তিনা) স্বৈরাচারী শাসক ইভা পেঁরন্-এর উপর উপন্যাস লিখে বিখ্যাত হয়েছেন। মেক্সিকোর সাহিত্যিক কার্লোস্ ফুয়েন্তেস্ আরেক স্বৈরাচারী সান্তা আনাকে নিয়ে উপন্যাস

লিখেছেন। আলেহো কার্পেন্তিয়ের-এর উপন্যাসের নায়ক স্বৈরতান্ত্রিক নেতা মাশাদো। হুয়ান রুলফো-র উপন্যাসে বিবৃত হয়েছে স্বৈরতান্ত্রিক নেতা ক্রশিলো-র কাণ্ডকারখানা। কিন্তু স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা, সমাজ-সভ্যতা নিয়ে লেখা উপন্যাসদের মধ্যে, কুলপতির হেমন্তকাল বা এল ওতোনো দেল পাত্রিয়ার্কা-র তুলনা কোথায়?

ভেনেজুয়েলায় স্বৈরাচারী শাসক মার্কোস্ পেরেজ্ হিমেনেজ্-এর পতনের আপনি প্রত্যক্ষদর্শী। সাংবাদিক হিসেবে ১৯৫৮-য় ক্ষমতাচ্যুতির সেই দৃশ্য আপনি দেখেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদি স্বৈরাচারী ফ্রাঙ্কো-র স্পেনে আপনি বসবাস করেছেন। জুলিয়াস সিজার থেকে শুরু করে মুসোলিনি, হিটলার সবার উপর আপনি অনেক পড়াশুনা করেছেন। বিপ্লবের পর কিউবার সাবেক স্বৈরতান্ত্রিক প্রশাসক বাতিস্তা-র বিচার আপনি স্বচক্ষে দেখেছেন। পঞ্চাশের দশকে বন্ধু প্লিনিও-র সঙ্গে পূর্ব ইয়োরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি-সহ সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরের সময় বোগোতার সংবাদপত্রে যেসব প্রতিবেদন পাঠিয়েছিলেন (যা পরে 'লৌহ যবনিকার আড়ালে নব্বই দিন' নামে সংকলিত হয়) তাতে সহানুভূতির সঙ্গেই আপনি সর্বহারার একনায়কতন্ত্র-এর সমালোচনা করেছিলেন। আপনার নিজের কথায়— ভেনেজুয়েলার স্বৈরাচারী শাসক হুয়ান ভিসেন্তে গোমেজ-এর প্রভাব এই উপন্যাসে সুস্পষ্ট। সামগ্রিকভাবে, বিশ্ব সাহিত্যে স্বৈরাচার বিরোধী উপন্যাস হিসেবে 'কুলপতির হেমন্তকাল' চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আপনার উপন্যাস ও ছোটো গল্প লেখার গতি বেশ কমে গেল। পূর্ব প্রকাশিত ডজন খানেক গল্পের সংকলন ১৯৯২-এ বোগোতা-র 'ওভেহা নেগ্রা' সংস্থা 'দোসে সুয়েস্তোস্ পেরেপ্রিনোস্' শিরোনামে প্রকাশ করল। এডিথ্ গ্রস্ম্যান্-এর ইংরেজি অনুবাদ ১৯৯৪-এ প্রকাশিত হল। বহুপঠিত ইংরেজি সংকলনটির নাম— 'স্ট্রেঞ্জ পিলগ্রিমস্', প্রকাশক সংস্থা— পেঙ্গুইন। এই বইটিরই একটি গল্প (বঁ ভয়েজ্, মিস্টার প্রেসিডেন্ট) আলাদা বই হিসেবে পেঙ্গুইন-এর হীরকজয়ন্তী উদ্‌যাপনের সময় প্রকাশিত হয়।

১৯৯৪-এ প্রকাশিত হল উপন্যাস— দেল আমোর ই ও ত্রোস্ দেমোনিওস্। এডিথ গ্রস্ম্যান্-এর ইংরেজি অনুবাদ— 'লাভ অ্যান্ড আদার ডেমনস্' প্রকাশিত হল পরের বছর। ভালোবাসা, নিরাশা, বিষণ্ণতায় পরিপূর্ণ এই উপন্যাসটি পড়ার পর মনে হয়,—এ যেন 'একশো বছরের একাকিত্ব'-র এক হারিয়ে যাওয়া অধ্যায়।

১৯৯৫-এ প্রকাশিত হল আপনার জনপ্রিয় নাটক 'দিয়াত্রিবা দে আমোর্ কস্ত্রা উন্ ওমব্রে সেস্তাদো'-র প্রথম সংস্করণ। বাংলায় বলা যায়—ক্ষমতাসীনের বিরুদ্ধে ভালোবাসা মেশানো ভর্ৎসনা। উনিশশো আশির দশকের শেষ দিকে নাটকটি বুয়েন্স্ আয়ার্স-এ নিয়মিত অভিনীত হত। সম্ভবত একই বছরে প্রিজাল্‌বো মোন্দাদোরি, প্রকাশনী নাটকটির একটি ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ করে।

এত ব্যস্ততার মধ্যেও আপনি একটি অভিধান সম্পাদনা করলেন। 'ক্লাভে দিক্‌সিওনারিও দে উশো দেল্ এস্পানোল আকুয়াল'। তিনজন সহযোগী সম্পাদককে নিয়ে গ্রথিত এই স্প্যানিশ্-ইংরেজি অভিধানটি এখন তো খুবই জনপ্রিয়।

অভিধান প্রকাশের অব্যবহিত পরেই প্রকাশিত হল — নোতিশিয়া দে উন্ সেকুয়েস্ত্রো (একটি অপহরণের সংবাদ)। একটি অপহরণের সংবাদ কি উপন্যাস? আপনার নিজের ভাষ্যে—অ-উপন্যাস বা নন্-ফিকশন। ১৯৯৬-এর ৮ মে বোগোতার 'পেরিয়া ইন্তারনাশিওনাল্

দেল্ লিব্রো'-র (আন্তর্জাতিক বইমেলা) আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধনের সময় বইটি প্রকাশিত হয়। বইমেলা শেষ হওয়ার আগেই প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত।

অথচ জনপ্রিয়তার জন্যে বইটির চোরাই সংস্করণ সমগ্র লাতিন আমেরিকায় অত্যন্ত সস্তায় বিপুল পরিমাণ বিক্রি হচ্ছে। বছর দুয়েক বাদে এডিথ্ গ্রসম্যান কৃত ইংরেজি অনুবাদ বাজারে এসে গেছে। কলম্বিয়ার ড্রাগ সাম্রাজ্যের প্রবাদপ্রতিম হর্তা-কর্তা-বিধাতা, পাবলো এস্কোবার-এর নির্দেশে সংঘটিত অপহরণ সমূহ বইটির মূল উপজীব্য। পক্ষান্তরে পুস্তকটির প্রতিপাদ্য— মাফিয়াদের সমূলে ধ্বংস না করলে আগামী শতকেই দেশ-সমাজ-সংস্কৃতি গোল্লায় যাবে।

অন্ধকার জগতের মাফিয়া ডন, ড্রাগ ব্যবসায়ী, মাদক চালানকারী প্রভৃতির বিরুদ্ধে আপনার একটানা কলম-যুদ্ধ বা সামাজিক দায়িত্বপালনের প্রক্রিয়ায় সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান— একটি অপহরণের সংবাদ। অপরাধ জগতের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আক্রমণাত্মক রচনা প্রণয়নের জন্যে আপনার জীবনহানির সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে। চিঠি টেলিফোন মারফত আপনি অনবরত হুমকি পেয়ে থাকেন। এবং কলম্বিয়ার সরকারি প্রশাসন এই ব্যাপারে অবশ্যই উদাসীন। বাধ্য হয়েই নিজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিজেই করেছেন। বোগোতা-য় আপনি বুলেটপ্রুফ কাঁচে-ঢাকা লাম্বিয়া টুর্বো গাড়ি ব্যবহার করেন। গাড়িটির স্যাসেও বোমা-নিরোধক। আপনার গাড়িকে অনুসরণ করে ছ-জন রক্ষীবাহী অন্য একটি গাড়ি। তবু আপনার যুদ্ধ থামেনি।

সরকারি ঔদাসীন্যে নির্বাসিতের মতো নিরাপত্তার বলয়ে কাটাতে আপনার কেমন লাগে? আপনি নিরুত্তর। অথচ দায়িত্বপালনে কোনো ত্রুটি নেই। কয়েকবছর আগেকার (১৯৯৫, অক্টোবর) একটা ঘটনা মনে করিয়ে দিই। কার্তাহেনা-য় জোট নিরপেক্ষ দেশগুলির শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সরকারি কর্তারা নিয়মিত বহিরাগত শীর্ষ নেতৃত্বদের মধ্যাহ্নভোজ বা নৈশভোজে আপ্যায়ন করছেন। শহরের অন্যতম বিশিষ্ট বাসিন্দা হিসেবে আপনাকে আমন্ত্রণের সৌজন্যও দেখানো হল না। এমনকী, কোথাও উচ্চারিতও হল না যে, কার্তাহেনা-র অন্যতম বিশিষ্ট নাগরিকের নাম,— গ্যাব্রিয়েল হোসে গার্সিয়া মার্কেজ। অথচ সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের জন্যে নির্দিষ্ট আসনে আপনার উপস্থিতি কারও নজর এড়ায়নি। এমন নৈর্ব্যক্তিক ও নির্লিপ্ত আচরণই হয়তো আপনার এগিয়ে চলার পাথেয়।

ড্রাগ, মাদক-সহ নিষিদ্ধ নেশা সামগ্রী নিয়ে আপনার নিজস্ব একটি অভিমত আছে। স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ভাষায় আপনি উচ্চারণ করেছেন,— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি ড্রাগ ব্যবহৃত হয়। উৎপাদন ব্যবহার বাড়ায় না। বরং ব্যবহারের মাত্রা উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ড্রাগ ব্যবহারের বাজারে প্রতিযোগিতা বাড়িয়ে তুলেছে। অসংখ্য ড্রাগ ব্যবহারকারীদের নিয়মিত ড্রাগ সরবরাহের কাজে মার্কিন মাফিয়ারা কলম্বিয়ার মাফিয়াদের তুলনায় অনেক বেশি পারদর্শী। অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি কলম্বিয়ার তুলনায় অনেক বেশি।

এপ্রিলের (১৯৯৬) শেষ সপ্তাহের একদিন সকালবেলায় 'নোতিশিয়া দে উন্ সেকুয়েস্ত্রো'-র কেন্দ্রীয় চরিত্র মারুহা পাচোন-এর স্বামীর ফোন মারফত জানতে পারলেন— কিছুক্ষণ আগে দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সেসার গাভিরিয়ার ভাইকে অপহরণ করা হয়েছে। হয়তো কাকতালীয়— ফোনটা পাওয়ার কিছুক্ষণ আগেই 'নোতিশিয়া দে উন্ সেকুয়েস্ত্রো বা একটি অপহরণের সংবাদ শীর্ষক উপন্যাসের (আপনার মতে অবিশ্যি অ-উপন্যাস অথবা

প্রতিবেদন) শেষ ও চূড়ান্ত প্রুফ সংশোধন এবং সম্পাদনা করে প্রকাশকের দপ্তরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেইদিনই প্রচার মাধ্যম মারফত অপহরণকারীরা আবেদন করল — গাবো, আপনি দেশের হাল ধরুন।

পশ্চিম বাংলার আয়তনের প্রায় তেরো গুণ ভৌগোলিক পরিসরের (এগারো লক্ষ একচল্লিশ হাজার সাত-শো আটচল্লিশ বর্গ কিলোমিটার) দেশ কলম্বিয়ার জনসংখ্যা চার কোটি দশ লক্ষ। সোনা, রূপা, তামা, সিসা, ম্যাঙ্গানিজ, সর্বোপরি খনিজ তৈলে কলম্বিয়া সমৃদ্ধ। এ ছাড়াও পাওয়া যায় মহার্ঘ রত্ন। পৃথিবীর অর্ধেকেরও বেশি পান্না কলম্বিয়ায় উৎপাদিত হয়। আলু, ধান ও ভুট্টা প্রধান কৃষিজ উৎপাদন। আর বাগিচায় ফলানো হয়— কফি ও ফুল। বাগিচাজাত এই দুই পণ্যের উৎপাদনে কলম্বিয়া এতই সফল যে দু-টি বিভাগেই দেশটি পৃথিবীর দ্বিতীয় সেরা রপ্তানিকারক হিসেবে পরিগণিত হয়। শিক্ষা-সংস্কৃতি—সাহিত্য-শিল্পচর্চায় কলম্বিয়া সবসময়ই এগিয়ে। এত বেশি বই-এর দোকান অন্যত্র দেখা যায় কি? প্রতিবেশী দেশগুলিতে যাবতীয় বই তো কলম্বিয়াই রপ্তানি করে। লাতিন আমেরিকার সর্বকালের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী ফের্নান্দো বোতেরো-র জন্মভূমি কলম্বিয়া। সাহিত্য ও শিল্পের দুই স্তম্ভ কলম্বিয়ার সন্তান। প্রাকৃতিক কৃষিজ, প্রাণী সম্পদ সর্বোপরি মানব সম্পদের এত প্রাচুর্য সত্ত্বেও গত বেশ কয়েক দশক ধরেই কলম্বিয়া অশান্ত। অর্থনৈতিক দুরবস্থা, রাজনৈতিক অশান্তি, সামাজিক অসন্তোষ এমন ভয়ংকর অবস্থায় এর আগে কখনো পৌঁছেছিল কি? ১৯৩০-এর ‘ গ্রেট্ ডিপ্রেশন্’ বা সুদূরপ্রসারী বিশ্বব্যাপী মন্দা, তার চেয়েও অনেক খারাপ অবস্থায় পৌঁছে গেছে কলম্বিয়ার অর্থনীতি। সরকারি বা সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থাসমূহ ব্যক্তি মালিকানায় বেসরকারি বিলগ্নীকরণ চালু হয়ে গেছে। বিদেশি বহুজাতিক সংস্থাগুলি চুটিয়ে ব্যাবসা করছে। দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা অন্ধকার জগতের কালো হাতের থাবায় আক্রান্ত। ফলে দেশের প্রধান রপ্তানিযোগ্য পণ্য কফির উৎপাদন ১৯৯৫-এর তুলনায় ২০০০ খ্রিস্টাব্দে দুই তৃতীয়াংশেরও কম হয়ে গেছে (মাত্র ৬ লক্ষ টন)। পক্ষান্তরে নিষিদ্ধ মাদক, ড্রাগ প্রভৃতির প্রাথমিক কৃষিজ উপাদান কোকো’-র উৎপাদন বেড়েছে। ১৯৯২-এ প্রায় ৩৬ হাজার হেক্টর জমিতে কোকা চাষ হত। ২০০০খিস্টাব্দে কোকোচাষের জমি ১লক্ষ ৩৫হাজার হেক্টরে পরিণত হয়েছে। অথচ প্রতিবেশি দেশগুলিতে (পেরু, বলিভিয়া প্রভৃতি) কোকো চাষের জমি প্রায় এক-চতুর্থাংশে এসে ঠেকেছে। দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর এবং শিল্প সমৃদ্ধ নগর ‘মেদেলিন’ আজ মাফিয়া গোষ্ঠীর নামে সর্বত্র পরিচিত (‘ মেদেলিন কার্তেল’)। মেদেলিন-এর উৎপাদন ও রপ্তানি ব্যবস্থা আজ মাফিয়াদের নিয়ন্ত্রণে। ফলে শিল্প ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের সমৃদ্ধ এলাকা ‘কালি’-ও মাফিয়া গোষ্ঠীর নামে অনেক বেশি পরিচিত। মেদেলিন ও কালি কার্তেল-এর লড়াই তো কলম্বিয়ার রাজনীতিতেও প্রভাব ফেলেছে। কালি কার্তেল-এর সঙ্গে নির্বাচনের চাঁদা নিয়ে দর কষাকষির খবর জানাজানি হয়ে যাবার পর রাষ্ট্রপতি এর্নেস্তো সাম্পার পিজানো-কে পদত্যাগই করতে হল।

পাবলো এস্কোবার ১৯৯৩-এ জেল থেকে পালানোর কিছুদিন বাদেই খুন হয়ে গেলে মেদেলিন কার্তেল-এর রমরমায় কিছুটা ভাটা পড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র বিভাগের মতে বিংশ শতাব্দীর শেষ পনেরো বছরে কলম্বিয়ার রাজনীতি ও মাদক ব্যবসায় যে হাজার কুড়ি মানুষ মারা গেছে, পাবলো এস্কোবার-এর মৃত্যু তাদের মধ্যে একটি। আর আপনি বললেন— জনমত সৃষ্টি করতে কলম্বিয়ার ইতিহাসে পাবলো এস্কোবার-এর মতো প্রতিভা আর কারও

ছিল না। দুর্নীতির এত ব্যাপক দাপট আর কেউ দেখাতে পারেনি।

যে দেশের সেরা কৃষি জমির চল্লিশ শতাংশের বেশি ড্রাগ মাফিয়াদের করায়ত্ত সে দেশের রাজনীতি-অর্থনীতিতে অন্ধকার জগতের প্রভাব পড়াটাই স্বাভাবিক। জনজীবনে আলোড়ন তুলে যেসব রাজনৈতিক গেরিলা-জঙ্গি গোষ্ঠী গত দু-তিন দশকে জন্ম নিয়েছিল তারাও কখন যেন নিষিদ্ধ সামগ্রীর ব্যাবসার জালে জড়িয়ে গিয়ে নিজেদের মাফিয়া-জঙ্গিতে পরিণত করে ফেলেছে। হারিয়ে গেছে তাদের রাজনৈতিক আদর্শ-অস্তিত্ব। কাজেই কুড়ি হাজার মানুষের হত্যা বা পনেরো লক্ষ মানুষের ঘরছাড়া হওয়ার কাহিনীই নয়, বাস্তবে আজকের কলম্বিয়া ড্রাগ মাফিয়াদের রণক্ষেত্র। নানা রকমের যুদ্ধে আক্রান্ত স্বদেশভূমিকে ভিত্তি করেই আপনি লিখলেন (১৯৯৮তে) — ‘ফর দি সেক্ অফ্ আ কান্ট্রি উইদিন রিচ্ অফ্ দ্যা চিলড্রেন।’

বোগোতার থমথমে ভারী আবহাওয়া আপনার পছন্দ নয়। তা ছাড়া বিভিন্ন কাজে আপনাকে নিয়মিত ঘোরাঘুরি করতে হয়। সেই সুবাদে স্পেনের বার্সেলোনা, ফ্রান্সের প্যারিস, মেক্সিকোর কুয়ের্নাভাকা, কিউবার হাভানায় নিজস্ব বাসস্থান গড়ে তুলেছেন। কলম্বিয়ার অন্যতম বন্দর শহর কার্তাহেনায় কয়েক বছর আগে নির্মিত হয়েছে আপনার ‘ লা কাসা দেল্ এস্ক্রিতোর’ বা ‘লেখকের বাড়ি’। ক্যারিবিয়ান সাগরের তীরে অবস্থিত কলম্বিয়ার আরেক প্রাচীন শহর বারানকিলাতেও রয়েছে আপনার আরেক বাসস্থান।

প্রতিটি বাড়িই একইরকমভাবে সুসজ্জিত। মেঝেতে বিছানো সাদা কার্পেট। ঘরের দেওয়াল সাদা। সোফার আবরণও সাদা। দেওয়ালে টাঙানো বোতোরো-র আঁকা ছবি। সোফার সামনে বিশাল কফি টেবিল। ঘরের এক কোনায় সাউন্ড সিস্টেম। এবং অবশ্যই একটি ম্যাকিন্টোশ্ কম্পিউটার।

আসলে যখনই যেখানে থাকুন না কেন, আপনি যে দৈনন্দিন জীবনযাপন প্রক্রিয়ায় একনিষ্ঠ ও অবিচল থাকতে চান। ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে একটি বই নিয়ে বসে পড়েন। সাতটায় খবরের কাগজ পড়তে পড়তে কফি পান। অতঃপর প্রাতঃকৃত্য । পোশাক পরিবর্তন ও প্রাতরাশ। চিঠিপত্র ও ই-মেল পড়া ও উত্তর দিতে দিতে সকাল দশটা। তারপর— পৃথিবী উচ্ছন্নে যাক— আপনি বসে পড়েন আপনার কম্পিউটার-এর সামনে। আড়াইটে পর্যন্ত একটানা লেখালিখি। তারপর সপরিবারে মধ্যাহ্নভোজ। এরপর ছোট দিবানিদ্রা। অপরাহ্ন ও সন্ধ্যা কাটে বন্ধুবান্ধব, পরিজন এবং অতিথিদের সান্নিধ্যে।

ফিদেল কাস্ত্রো-র সৌজন্যে হাভানা-র উপকণ্ঠের সিবোনে এলাকায় প্রাসাদোপম বাড়িটি আপনি পেয়েছেন। বিপ্লবের আগে কিউবার বড়লোকেরা অতিথি আপ্যায়নের জন্যে সিবোনে-তে বেশ কিছু অতিথিশালা নামক প্রাসাদোপম অনুপম বাংলো তৈরি করেছিল। তারই একটি আপাতত আপনার বাসস্থান।

কলম্বিয়ার বিখ্যাত স্থপতি রোজেলিও সালমোনা আপনার কার্তাহেনা-র বাড়িটির নকশা করেছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর এই ঐতিহাসিক শহরের সঙ্গে সমতা রেখেই আপনার বাড়িটি গড়ে তোলা হয়েছে। এই বাড়িটিই আপনার পরিবারের অলিখিত সদরদপ্তর। কারণ, আপনার মা লুইসা সান্তিয়াগো এখানে থাকেন। লুইসা-র জন্ম ১৯০৫-এর ২৫শে জুলাই। এই বয়সেও তিনি নিজের এগারোটি এবং প্রয়াত স্বামীর চারটি ছেলে-মেয়ে, ছেষট্টিটি নাতি-নাতনি, নাতি-নাতনিদের তিয়াত্তরটি সন্তান এবং পঞ্চম প্রজন্মের পাঁচটি বাচ্চার নিয়মিত খোঁজখবর নেন।

এই ২০০১-এ আপনি নিজেই জানিয়েছেন যে এখনও আপনার মা-ই সংসার-পরিবার-পরিজনের ক্ষেত্রে শেষ কথা বলেন। এমনকী আপনার স্ত্রী মার্সেডেস্, বলা হয় যার হিসেবি আচরণের ফলাফল আপনাদের এত পার্থিব সম্পদ, তিনিও কিন্তু শাশুড়িকে অমান্য করেন না। আপনার বড়ো ছেলে রোদরিগো, যে আমেরিকার হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা করার পর এখন লস্ এঞ্জেলস্-এ থাকে এবং যে-সদ্য নিজের লেখা চিত্রনাট্যর ভিত্তিতে প্রথম ছায়াছবি পরিচালনা করেছে, সেও সময় করে ঠাকুমার খবর নেয়। মেক্সিকোবাসী ছোটো ছেলে গঞ্জালো যে পেশায় গ্রাফিক ডিজাইনার সেও এর অন্যথা করে না। সব মিলিয়ে দেশ-মহাদেশের সীমানা পেরোনো এক যৌথ পরিবার।

হয়তো এই যৌথ পরিবারের ধারণাই সব সময় আপনাকে সেই স্বপ্ন দেখতে সাহায্য করে। সিমোন বালিভার-এর সেই স্বপ্ন— 'লাতিন আমেরিকার ঐক্য'-কে বাস্তবায়িত করার লক্ষে আপনি সদা সক্রিয়। আপনি বিশ্বাস করেন— 'প্রচলিত রাজনীতির আঙিনায় ধরা-বাঁধা ছকে এই ঐক্য সম্ভব নয়। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পটভূমিতেই হিস্পানি দুনিয়ার ঐক্য গড়ে উঠবে।'

লাতিন আমেরিকার ঐক্য সাধনের লক্ষেই সম্ভবত আপনার জীবনযাপন প্রক্রিয়া এত বৈচিত্র্যময় এবং ঘটনার ঘনঘটায় রঙিন। নোবেল পুরস্কার পাবার আগে কলম্বিয়ার সেনাবাহিনী তথা প্রশাসন আপনাকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছিল। আর গত কয়েকবছর ধরে দেশের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে আলোচনার জন্যে প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর কর্তারা আপনার কাছে ছুটে আসেন। এক সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আপনার প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ছিল। আর কিছুদিন আগে তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিন্টন হোয়াইট হাউসে আপনাকে নৈশভোজে আপ্যায়িত করেছিলেন। জাপান, ইয়োরোপ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেলিভিশন সাক্ষাৎকারের জন্যে আপনি যা পারিশ্রমিক দাবি করেন তা এক কথায় অবিশ্বাস্য— ঘন্টায় পঞ্চাশ হাজার ডলার। আবার আপনার আর্থিক আনুকূল্যে মেক্সিকোর গুয়াদালাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'কোয়ার্তসার অধ্যাপক' পদ সৃষ্টি হয়েছে। আর্জেন্তিনার প্রয়াত কথা সাহিত্যিক হুলিও কোয়ার্তসার-এর সৃজনকে এত সম্মান আর কোনো সংস্থা বা ব্যক্তি জানিয়েছেন কি? আপনার উদ্যোগেই কার্তাহেনা-য় গড়ে উঠেছে 'ফাউন্ডেশন ফর নিউ আইবেরো-আমেরিকান জার্নালিজম।'

একই সঙ্গে সমান্তরালভাবে এত কাজ করার জন্যে শুধু উদ্যম থাকলেই চলে না, অর্থেরও প্রয়োজন। সুতরাং বই-এর দাম, বিক্রির হিসেব-নিকেশ ইত্যাদি বিষয়ে আপনি (অথবা আপনার স্ত্রী) সদা সতর্ক। আপনার মতে— 'বই বেশি বিক্রি না হলে লোকে লেখকের দিকে ফিরেও তাকায় না। বিখ্যাত মানুষেরই সমাজে বিশিষ্ট ভূমিকা থাকে .... লোকে তাঁর কথা শোনে।' লেবানন্-এর নামজাদা প্রকাশক রিয়াদ এল-রাইস্ জানিয়েছেন যে বিগত কয়েক বছরে আরব দুনিয়ায় আপনার বই-ই সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে। লন্ডন-এর ডাকসাইটে বই-এর দোকান 'ফয়েলস্'-ও একই অভিমত পোষণ করে।

সাফল্যের সঙ্গে সমালোচনার সবসময়ই একটা সরাসরি সম্পর্ক আছে। এল সালভেদর ও নিকারাগুয়া-র গৃহযুদ্ধ নিরসনে বারে বারেই আপনি মধ্যস্থের ভূমিকা পালন করেছেন। এবং এ-কাজে আপনি সফল। অথচ এই সাফল্য সম্পর্কে আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মারিয়া এলভিরা সাম্পের-এর মন্তব্য— 'গাবো ষড়যন্ত্র পছন্দ করে। গোপনে কাজ সারতে ওর কোনো জুড়ি

নেই।'

কিউবার কবি হেবার্তো পাদিলিয়া ১৯৭১-এ প্রতিবিপ্লবী কাজকর্মের অভিযোগে কারারুদ্ধ হন। পাদিলিয়া-র গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে লাতিন আমেরিকার বহু বুদ্ধিজীবী ফিদেল কাস্ত্রোকে একটি খোলা চিঠি পাঠালেন। আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে প্লিনিও আপুলেয়ো মেন্দোজা চিঠিটিতে আপনার নামও দিয়ে দিয়েছিলেন। পাদিলিয়া মুক্তি পেলেন। কিন্তু তার গণ-বিচারের বন্দোবস্ত হল। বুদ্ধিজীবীরা আবার খোলা চিঠি লিখলেন। এবার কিন্তু আপনি আর হুলিও কোয়ার্তসার প্রতিবাদে যোগ দেননি। অনেক পরে মেন্দোজা-র কাছে আপনি জানিয়েছেন যে পাদিলিয়া সম্পর্কে অনেক তথ্য আপনার কাছে ছিল। অবশেষে ১৯৮০-তে আপনার প্রচেষ্টায় পাদিলিয়া কিউবা পরিত্যাগ করার পর বলা হল— কাস্ত্রো সভাসদের অনুরোধ রক্ষা করলেন।

১৯৯৪-এ কিউবার -এর এক সাহিত্যিক নরবার্তো ফুয়েন্তেস্-এর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাকাপাকি থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। প্রথম সুযোগেই নরবার্তো মন্তব্য করল— 'গাবো! ওতো স্বৈরাচারীর (কাস্ত্রো) আজ্ঞাবহ এক বার্তাবাহক।' আপনি অবিশ্যি এ-সব মন্তব্যকে গুরুত্ব দেন না। আপনি বলেন— কিউবাকে আমি সবসময় সদর্থক বা ইতিবাচক দিক থেকেই দেখে থাকি। আজকের কিউবার অস্তিত্ব না থাকলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এতদিনে পাতাগোলিয়া (চিলি, আর্জেন্তিনা পেরিয়ে দক্ষিণ মেরুর সীমানা) পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ত।

রাজনীতির আঙিনায় আপনার এহেন স্বচ্ছন্দ বিচরণ অনেকে বাঁকা চোখে দেখেন। ফিদেল কাস্ত্রোর বৈঠকখানায় আপনি উপস্থিত। ফ্রাঁসোয়া মিতেঁর আপনার সঙ্গে অবসর যাপনের জন্যে জরুরি বৈঠক বাতিল করেন। বিল ক্লিন্টন আপনার জন্যে রাষ্ট্রপতি ভবনে সরকারি নৈশভোজের আয়োজন করেন। স্পেনের গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধানমন্ত্রী ফেলিপে গঞ্জালেজ্ আপনার জন্যে উন্মুখ হয়ে প্রতীক্ষা করেন। পানামার প্রয়াত রাষ্ট্রপতি ওমার তোরিহোস্ আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দায়িত্ব দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হন। আপনার জনৈক ঘনিষ্ঠ বন্ধু জানিয়েছেন— 'গাবো সবসময় ক্ষমতার অলিন্দে থাকা পছন্দ করে। আবার লাতিন আমেরিকার সমস্ত রাষ্ট্রনায়কই গাবোর সাহচর্যে আগ্রহী'। সম্ভবত এ এক অতি সরলীকৃত মন্তব্য। লাতিন আমেরিকার কতজন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আপনাকে দেখা গেছে? ১৯৯৮-এর জানুয়ারি মাসে পোপ দ্বিতীয় জন পল কিউবা সফরে যান। হাভানার 'লা প্লাজা দে লা রেভোলুসিয়ন'-এ পোপ ভাষণ দেন। দর্শক আসনের প্রথম সারিতে ফিদোল কাস্ত্রোর পাশে আপনাকে দেখা যায়। দৃশ্যটি অত্যন্ত বিরল। কারণ, প্রচার মাধ্যমের মতে আপনাকে প্রকাশ্যে এত ঘনিষ্ঠভাবে কোনো রাষ্ট্রনায়কের সঙ্গে এর আগে নাকি খুবই কম দেখা গেছে। সমালোচকরা ভুলে যান যে আপনিই একমাত্র ব্যক্তিত্ব যিনি মার্কিন রাষ্ট্রপতির নৈশভোজে বসে সরাসরি বলতে পারেন— দক্ষিণপন্থী মৌলবাদই আমার একমাত্র শত্রু।

সমালোচকদের খেয়াল থাকে না যে আপনি মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে তাঁর সরকারি বাসভবনে বলেছিলেন— ড্রাগ ও মাদক-সহ যাবতীয় নিষিদ্ধ পণ্যের ব্যবহার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বন্ধ করলেই দুনিয়া-জোড়া এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। কলম্বিয়ায় শান্তি আনার জন্যে আপনিই মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিয়েছিলেন— এ-বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবার সাহায্য নিতে পারে। হয়তো এই কারণেই আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এনরিক্ সান্তোস্ কাস্দেরোন্ মন্তব্য করেছেন— গাবো এখন একজন সোশ্যাল ডেমোক্রাট হলেও ওর হৃদয়ে একটা কমিউনিস্ট

বসবাস করে।

আপনাকে নিয়ে এত তর্ক বিতর্ক, আপনার পক্ষে-বিপক্ষে এত বাদানুবাদের পরেও কিন্তু অধিকাংশ কলম্বিয়াবাসী মনে করেন যে আপনিই একমাত্র চরিত্র যিনি যুযুধান দুই পক্ষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়তে পারেন— 'ঢের হয়েছে, আর নয়'। কলম্বিয়ার বর্তমান রাষ্ট্রপতি আন্দ্রেস্ পাস্ত্রানা ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় চৌত্রিশ বছরের গেরিলা যুদ্ধের অবসানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনিও আজ আপনার দিকে তাকিয়ে আছেন। তাকিয়ে আছে সমগ্র কলম্বিয়া। অপেক্ষা করছে সমস্ত বিশ্ব। সবারই প্রার্থনা,— কলম্বিয়ায় শান্তি ফিরে আসুক।

সেই সঙ্গে আমাদের প্রার্থনা— আপনি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন। আপনার পরিকল্পিত স্মৃতিচারণা 'ভিভির পারা কোনতার্লো' বা 'সেই গল্প বলার জন্যে বেঁচে আছি'-র ছ-টি খণ্ড দ্রুত সমাপ্ত হোক।

আমরা জানি অসম্ভবকে সম্ভব করতে আপনি পারদর্শী। ১৯৯০-এর দশকের প্রথম কয়েক বছরে গল্প-উপন্যাস-অ উপন্যাস ছাড়াও আপনার বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র মুক্তি পেয়েছে। 'দ্যা ট্রু ওয়ে মিরর'(১৯৯০), 'লা মুহের কে লিয়েগাবা আ লা সেইস্'(১৯৯১), 'কোন্তিয়াগো এন্ লা দিস্তান্সিয়া' (১৯৯১), 'স্যাটারডে নাইট্ থিফ্'(১৯৯২), 'আইজ্ অফ আ ব্লু ডগ্' (১৯৯৪) ছবিগুলির চিত্রনাট্য আপনার গল্পের ভিত্তিতেই রচনা করেছিলেন। এ ছাড়াও লিখলেন 'টকো স্মের্ত প্রিখোদিত্ ওবাইয়াজ্ নাতেলনো' নামের একটি ছবির চিত্রনাট্য যা জর্জিয়ান ও রুশ ভাষায় নির্মিত হয়েছিল। জর্জিয়ান ও রুশ ভাষায় ছবিটির নাম ছিল—'এমখোলোদ্ সিক্ভদিলি মোদিস্ আউত্সিলেব্লাদ্।' আর লিখলেন সেই বিখ্যাত ছবির চিত্রনাট্য 'এদিপো আলকালিয়ান্দে' (ঈদিপাস্ দ্যা মেয়র)। প্রাচীন গ্রিক নাট্যকার সোফোক্লেস্-এর বিখ্যাত নাটক 'রাজা ঈদিপাস'-কে বর্তমান লাতিন আমেরিকার রাজনৈতিক সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করলেন এক আধুনিক স্বৈরতান্ত্রিক সংস্করণ— মেয়র ঈদিপাস্। কলম্বিয়ার প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার হোর্গে আলি ত্রিয়ানা নির্মিত এই ছবিটি কান্ চলচ্চিত্র উৎসবে (১৯৯৬) প্রদর্শিত হয়। এবং অবশ্যই যথেষ্ট উন্মাদনা সৃষ্টি করে। সেই উন্মাদনার ছোঁয়ায় কি আপনি আবিষ্ট হয়েছিলেন?

কঠিন ব্যাধির সঙ্গে আপনার লড়াই চলছে। সমান্তরালভাবে এগিয়ে চলেছে আপনার আত্মজীবনীমূলক স্মৃতিচারণের কাজ। আপনার আগে লাতিন আমেরিকার বিশ্ববিখ্যাত কবি পাবলো নেরুদা (চিলি) ১৯৭১-এ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। তাঁর আত্মজীবনীর সততা ও শৈলী বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করেছিল। আমরা বিশ্বাস রাখি আপনার আত্মজীবনীও আমাদের মোহিত করে দেবে। কারণ বিস্ময় সৃষ্টিতে আপনি সুদক্ষ। আমাদের মনে আছে, ১৯৮২-তে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর আপনি বলেছিলেন— 'রসায়ন ও শান্তি-র জন্যে যাঁরা নোবেল পুরস্কার পায় তাঁদের আমি হিংসা করি। ওঁদের কোনো ভাষণ দিতে হয় না।' নোবেল পুরস্কার গ্রহণের সময় পুরস্কার প্রাপকদের যে 'টেইল কোট' পরতে হয় তা নিয়েও আপনার আপত্তি ছিল। হয়তো এইসব রীতি নীতি-প্রথার বিরোধিতা করার জন্যেই ১৯৮২-র ১০ই ডিসেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় স্টকহোল্ম-এ সুইডেন-এর রাজা কার্ল গুস্তাভ্-এর হাত থেকে নোবেল পুরস্কার নেবার জন্যে যখন আপনি সতেরো-শো বিশিষ্ট অতিথির সমাবেশে উপস্থিত হলেন তখন আপনার পরনে কলম্বিয়ার উত্তরাঞ্চলের কৃষকদের নিজস্ব পোষাক 'লিকি লিকি'। রূঢ়

বাস্তবতা, প্রচলিত সংস্কার ধারণা-কল্পনার অদ্ভুত সংমিশ্রণে সম্পৃক্ত লাতিন আমেরিকার মর্মবাণী আপনি সমবেত অতিথিদের শুনিয়েছিলেন। সেই সুবাদে জেনেছিল বিশ্ববাসী।

তার পর প্রায় দু-দশক কেটে গেছে। আপনার খ্যাতি-পরিচিতি অনেক বেড়েছে। বেড়েছে আপনার ক্রিয়াকর্মাদির পরিধি। অথচ আপনার সৃষ্টির চরিত্র-বৈশিষ্ট্য এতটুকুও পালটায়নি। আমাদের আশা আগামী দিনেও আপনার সৃজনশীলতায় বজায় থাকবে সেই অনন্য-স্বাতন্ত্র্য যা নোবেল পুরস্কার প্রদানের প্রাক্-মুহূর্তে 'সুইডিশ্ আকাদেমি অফ্ লেটার্স্'-এর স্থায়ী সচিব লার্স্ গিলেন্টন-এর বয়ানে উচ্চারিত হয়েছিল— 'লাতিন আমেরিকার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিকের মতো গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ-এর সাহিত্যে একটা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক উপলব্ধি নিহিত আছে; সেই অভিমত হল— বিদেশি অর্থনৈতিক শোষণ এবং দেশীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে দরিদ্র ও দুর্বলের অবিরাম সংগ্রামের আহ্বান।'

Bibliography

La hojarasca
Bogotá : Ed. S. L. B., 1955.

Leaf Storm, and Other Stories. Translated by G. Rabassa.
London : Cape, 1972; New York: Harper & Row, 1972, 1979;
Pan Books, 1979.
Harper Collins ; ISBN 006-090-6995, Paperback, (July 1979).

El coronel no tiene quien le escriba
Medellin: Auguirre Ed., 1961.

No One Writes to the Colonel. Translated by. S. Bernstein.
London : Cape, 1971; New York: Harper & Row, 1979.
Harper Collins, ISBN 006-090-7002, Paperback, 176 pages (July 1979).

La mala hora
Madrid : Talleres de Gráficas "Luis Pérez", 1962.
(ed. desautorizada por el autor); 2nd edition: Mexico: Ed. Era, 1966.

An Evil Hour. Translated by G. Rabassa.
New York : Harper & Row, 1979.
Harper Perennial of Harper Collins, ISBN 0-06-091964-7, Paperback, (1991).

Los funerales de la Mamá Grande
Xalapa 1962.
Grijalbo Mondadori, S.A; ISBN 8439704518, Paperback (2001).
Editorial Diana, ISBN 9681317092, 157 pages, 1999

Big Mama's Funeral (English translation is a collection of eight short stories). Translated by. S. Bernstein.
London: Cape, 1971; New York: Harper & Row, 1979.

Cien años de soledad
Buenos Aires : Ed. Sudamericana, 1967.

One Hundred Years of Solitude. Translated by Gregory Rabassa.
Harper Collins, 1970, ISBN 0-06-011-418-5; Hardcover.
Knopf "Everyman's Library" Edition, 1995, ISBN 0-679-44-465-3; Hardcover.
Harper Perennial of Harper Collins, 1998, ISBN 0-06-092-979-0; Paperback.

La novela en América Latina: Diálogo
Lima: Carlos Milla Batres, 1968.
A dialogue on the boom with Mario Vargas Llosa.

Relato de un náufrago
Barcelona : Tusquets Ed., 1970, Paperback.
Spanish edition (January 1984) Aims Intl Books; ISBN 847-223-0082

The Story of a Shipwrecked Sailor : Who Drifted on a Life Raft for Ten Days Without Food or Water, Was Proclaimed a National Hero, Kissed by Beauty Q. Translated by Randolph Hogan and edited by Erroll McDonald.
Vintage International, 1989, ISBN 0-679-72205-X; Paperback.
Originally appeared as 14 consecutive articles in the newspaper *El Espectador* in 1955.

Ojos de perro azul
Barcelona: Plaza y Janés, 1974.
[Spanish edition, 1984, Aims International Books; ISBN 847-223-0082].
French & European Publications; ISBN 0785951768 Paperback, 136 pages (October 1, 1987).

***Collected Stories.** Translated by Gregory Rabassa and J. S. Bernstein.
Harper Perennial of Harper Collins, 1999, ISBN 0-06-093-268-6; Paperback.
It contains the English translations of all the short stories found in the Spanish volume - *Ojos de perro azul* (Eyes of a Blue Dog).

***Collected Stories** - This volume contains the following Short Stories *(English Translations) The Handsomest Drowned Man in the World (1971), Blacaman the Good, Vendor of Miracles (1972), The Last Voyage of the Ghost Ship (1972), Death Constant Beyond Love (1973), The Incredible and Sad Tale of Innocent Erendira and Her Heartless Grandmother (1973), The Sea of Lost Time (1974), Eyes of a Blue Dog (1978), The Night of the Curlews (1978), Someone Has Been Disarranging These Roses (1978), The Woman Who Came at Six O'Clock (1978), Artificial Roses (1984), Balthazar's Marvelous Afternoon (1984), Big Mama's Funeral (1984), Bitterness for Three Sleepwalkers (1984), Dialogue with the Mirror (1984), Eva is Inside Her Cat (1984), Monologue of Isabel Watching It Rain in Macondo (1984), Montiel's Widow (1984), Nabo: The Black Man Who Made the Angels Wai (1984), One Day After Saturday (1984), One of These Days (1984), The Other Side of Death (1984), There Are No Thieves in This Town (1984), The Third Resignation (1984), Tuesday Siesta (1984), A Very Old Man with Enormous Wings (1984), The Saint (1992) and Caribe Mágico (1996).*

La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada
Barcelona: Barral Ed., 1972.

Innocent Eréndira, and Other Stories. Translated by G. Rabassa.
New York : Harper & Row, 1978, 1979; Pan Books, 1981.
***Collected Stories.** Translated by Gregory Rabassa and J. S. Bernstein.
Harper Perennial of Harper Collins, 1999, ISBN 0-06-093-268-6;
Paperback.

* It contains the English translations of all the short stories found in the Spanish volume - *La incréible y triste historia da la candida Eréndira y de su abuela desalmada.*

Chile, el golpe y los gringos
1974.

Cuando era feliz e indocumentado
Barcelona : Esplugas de Llobregat, Plaza y Janés, 1974.
ISBN 8401441226.

El otono del patriarca
Barcelona : Plazà y Janés, 1975.

The Autumn of the Patriarch. Translated by Gregory Rabassa.
New York : Harper & Row, 1976; Pan Books, 1978.
Harper Perennial of Harper Collins, ISBN 0-06-093-267-8 ; Paperback, 1999.

Todos los cuentos
Barcelona : Ed. Bruguera, 1975.

The English translation of the stories of *Todos los cuentos* are available in **Innocent Erendira and Other Stories** and **Collected Stories** (translated by Gregory Rabassa and J. S. Bernstein).

Obra periodística. Vol. 1: Textos costenos
Barcelona : Ed. Bruguera, 1981.

Crónica de una muerte anunciada
Barcelona : Ed. Bruguera, 1981.

Chronicle of a Death Foretold. Translated by Gregory Rabassa.
London: Cape, 1982
Knopf, 1983, ISBN 039-453-0748 ; Hardcover.
Ballantine, 1984, ISBN 0-345-31-002-0; Paperback.
Harper Perennial of Harper Collins, 1990, ISBN 0-06-092-128-5;
Paperback.

El rastro de tu sangre en la nieve : el verano feliz de la senora Forbes
Bogotá : W. Dampier Editores, 1982.

Viva Sandino
Managua : Nueva Nicaragua, 1982.

El secuestro
Salamanca : Lóquez, (a *screenplay*), 1982.

El asalto : el operativo con el FSLN se lanzo al mundo
Nueva Nicaragua,1983.

Erendira
N.P., Les Films du Triangle, (a *screenplay* from his own novella), 1983.

El amor en los tiempos de cólera
Bogotá : Oveja Negra, 1985.

Love in the Time of Cholera. Translated by E. Grossman.
Alfred A. Knopf, New York, London & Cape 1988, ISBN 0-394-56-161-9;
Hardcover.
Penguin, 1994, ISBN 0-14-011-990-6; Paperback.
Random House "Everyman's Library" Edition, 1997, ISBN 037-540-0699;
Hardcover.
Penguin *Great Books of the 20th Century* Edition, 1999, ISBN 0-14-028164-9; Paperback.

El general en su laberinto
Bogotá : Oveja Negra, 1989.

The General in his Labyrinth. Translated by Edith Grossman.
Arthur A. Knopf, New York, 1990, ISBN 0-394-58-258-6; Hardcover.
Penguin, 1990, ISBN 0-14-014-859-0; Paperback.

Doce cuentos peregrinos
Bogotá : Oveja Negra, 1992.

Strange Pilgrims. Translated by Edith Grossman.
Penguin, 1994, ISBN 0-14-023-940-5; Paperback.

Published in 1992 as ***Doce cuentos peregrinos*** (Bogota, Oveja Negra, 1992), is a collection of twelve stories *(buen viaje senor presidente, la santa, el avion de la bella durmiente, me alquilo para sonar, solo vine a hablar por telefono, espantos de agosto, maria dos prazeres, decisiete ingleses envenenados, tramontana, el verano feliz de la senora forbes, la luz es como el agua, el rastro de tu sangre en la nieve)* that revolve *around* a similar theme.

Del amor y otros demonios
Ediciones Penguin, New York, 1994

Love and Other Demons. Translated by Edith Grossman.
Arthur A. Knopf, New York, 1995, ISBN 0-679-43-853-X; Hardcover.
Random House "Large Print" edition, 1995, ISBN 0-679-76-284-1; Paperback.
Penguin, 1996, ISBN 0-14-025-636-9; Paperback.

Diatriba de amor contra un hombre sentado
Grijalbo Mondadori, 1995, ISBN 842-532-7571; Paperback.

El Olor De La Guayaba Conversaciones Con Plinio Apuleyo Mendoza
Gabriel Garcia Marquez, Plinio Apuleyo Mendoza (Contributor) (an interview)
Editorial Diana S. A.; ISBN 968132546X ; Paperback - 166 pages (1995).

Fragrance of Guava. translated by Ann Wright , 1983,
Faber and Faber Ltd. ISBN 0571193269 ; Paperback, Pages: 126, 1998.

Noticia de un secuestro
Ediciones Penguin, New York, 1996

News of a Kidnapping. Translated by Edith Grossman.
Arthur A. Knopf, New York, 1997, ISBN 037-540-0516; Hardcover.
Penguin, 1998, ISBN 0-14-026-944-4; Paperback.

Clave diccionario de uso del Espanol actual
Edited by Gabriel García Márquez.
The Co-editors are,- Concepcion Maldonado Gonzalez, Humberto Hernandez Hernandez and Nieves Almarza Acedo.
IBD Ltd. , ISBN 843-485-1938 ; Hardcover, 1996.

La aventura de Miguel Littín clandestino en Chile
El Pais, 1986, ISBN 848-645-9095 ; Hardcover.

Clandestine in Chile : The Adventures of Miguel Littin.
Translated by Asa Zatz.
Granta Books, ISBN 1862071160, Paperback, 105 Pages, 1998.

La Bendita Manía de Contar
Plaza & Janés Editores ; ISBN 8478950990, Paperback - 183 pages (A Play) (October 2000).

An Encounter With Fidel : An Interview by Gianni Mina
Gianni Mina, Mary Todd (Translator) & Gabriel Garcia Marquez (Introduction).
Ocean Press ; ISBN 1875284214 ; Paperback - 273 pages (April 1996).

El Circulo de la Vida
Serres Ediciones SI ; ISBN 848806103X Hardcover (Spanish edition).

El Ahogado Mas Hermoso Del Mundo
Lectorum Pubns (Adult) ISBN 9580211191, Hardcover (February 1998).

The Handsomest Drowned Man in the World : A Tale for Children
Translated by Hernan Diaz.

El Comentario De Textos, 2
ASIN 8470391763.

Textos costeños. Obra periodística 1 (1948-1952)
Grijalbo Mondadori, S.A ; ISBN 8439704402 ; Paperback - 725 pages (1981).

Entre cachacos. Obra periodística 2 (1954-1955)
Grijalbo Mondadori, S.A ; ISBN 8439704410 ; Paperback - 829 pages (1982).

De Europa y América. Obra periodística 3 (1955-1960)
Grijalbo Mondadori, S.A ; ISBN 8439704429 ; Paperback - 741 pages (1983).

Por la libre. Obra periodística 4 (1974-1995)
Grijalbo Mondadori, S.A ; ISBN 8439701888 ; Paperback - 336 pages (1974).

Notas de prensa. Obra periodística 5 (1961-1984)
Grijalbo Mondadori, S.A ; ISBN 8439704313 ; Paperback - 634 pages (1991).

Notas de Prensa
Norma S A Editorial ; ISBN 9580429405 ; Hardcover (January 1, 1995).

The Circle of Life : Rituals from the Human Family Album
Edited by David Cohen & Art Davidson & Gabriel Garcia Marquez (introduction)
ASIN 0582214033.

Cuentos Increibles
Pere Calders, Ricardo Domenech, dan Sueiro & Gabriel Garcia Marquez.
Editorial Popular, S.A.; ISBN 8478840141 ; Paperback (December 1998).

Cubano 100%
Reynaldo Gonzales, Gianfranco Gorgoni (Photographer), Reynaldo

Gonzalez and Gabriel Garcia Marquez .
Charta ; ISBN 8881581337 ; Paperback - 168 pages (February 1998).

For the Sake of a Country Within Reach of the Children
Villegas Editores ; ISBN 9589393284 ; Hardcover - 148 pages (998).

Por la libre
Grupo Editorial Norma ; ISBN 9580455651 ; Paperback - 344 pages (1999).

El verano feliz de la señora Forbes
Grupo Editorial Norma ; ISBN 9580455694 , Hardcover - 28 pages, (1999).

Un señor muy viejo con unas alas enormes
Grupo Editorial Norma ; ISBN 9580455708 Hardcover - 28 pages (1999).

La luz es como el agua
Grupo Editorial Norma ; ISBN 9580455716 Hardcover - 28 pages (1999).

María dos Prazeres
Grupo Editorial Norma ; ISBN 9580455724 Hardcover - 28 pages (1999).

El último viaje del buque fantasma
Grupo Editorial Norma ; ISBN 9580455732 Hardcover - 28 pages (1999).

La siesta del martes
Grupo Editorial Norma ; ISBN 9580455740 Hardcover . - 28 pages (1999).

Cuentos 1947 - 1992
Grupo Editorial Norma ; ISBN 9580455619, Paperback - 512 pages (1999).

Selected Reviews of Gabriel García Márquez's Fictional Works

The Autumn of the Patriarch
Michael Wood, *NY Review of Books*, 1976

Chronicle of a Death Foretold
Robert M. Adams, *NY Review of Books*, 1983
Christopher Lehmann-Haupt, *NY Times*, 1983
Leonard Michaels, *NY Times*, 1983

Clandestine in Chile: The Adventures of Miguel Littin
Michael Wood, *NY Times*, 1987

The General in His Labyrinth
Mark Webster, *The Tech*, MIT, 1990
Margaret Atwood, *NY Times*, 1990
Michiko Kakutani, *NY Times*, 1990
Innocent Erendira and Other Stories
Michael Wood, *NY Review of Books*, 1978

In the Evil Hour
Robert Coover, *NY Times*, 1979

Leaf Storm and Other Stories
Michael Wood, *NY Review of Books*, 1972

Love in the Time of Cholera
Thomas Pynchon, *NY Times*, 1988
Michiko Kakutani, *NY Times*, 1988
Julie Bowerman, *Rambles: A Cultural Arts Magazine*

One Hundred Years of Solitude
Jack Richardson, *NY Review of Books*, 1970
New York Times, 1970

A Story of a Shipwrecked Sailor
Michiko Kakutani, *NY Times*, 1986
Piers Paul Read, *NY Times*, 1986

News of a Kidnapping
Alastair Reed, *NY Review of Books*, 1997
Michiko Kakutani, *NY Times*, 1997 (Latinolink)
Michiko Kakutani, *NY Times*, 1997 (New York Times Site)
Robert Stone, *NY Times*, 1997

Reviews and Commentary for "News of a Kidnapping", Breen's *Marquez*
Page John Tarleton, 1998
Paul Berman, *Slate*, 1997
Michiko Kakutani, *Houston Chronicle*, 1997

Of Love and Other Demons
Rosemary Dinnage, *NY Review of Books*, 1996
Asiaweek, 1995
A.S. Byatt, *NY Times*, 1995

Strange Pilgrims: Twelve Stories
John Bayley, *NY Review of Books*, 1994
William Boyd, *NY Times*, 1993
Michiko Kakutani, *NY Times*, 1993

Filmography of Gabriel García Márquez

1. **Autumn of the Patriarch** (2000) (USA) [novel]
2. **El Coronel no tiene quien le escriba** (1999) (novel)
   ... aka No One Writes to the Colonel (1999) (International: English title)
   ... aka **Pas de lettre pour le colonel** (1999) (France)
3. **Edipo alcalde** (1996) ... aka Oedipus Mayor (1996)
4. **Eyes of a Blue Dog** (1994) (story)
5. **Mkholod sikvdili modis autsileblad** (1992) (novel) (Georgian / Russian)
   ...aka *Tolko smert prikhodit obyaznatelno*
   ... aka Only Death Is Bound to Come (1992) (English title: informal literal title)
6. **Saturday Night Thief** (1992) (TV)
7. **Contigo en la distancia** (1991) ... aka Far Apart (1991)
8. **La Mujer que llegaba a las seis** (1991) (story)
   ...aka The Woman Who Arrived at Six O'clock
9. **The Two Way Mirror** (1990) (TV)
   ... aka Don't Fool with Love : The Two Way Mirror (1990) (TV)
10. **Cartas del parque** (1988) (story) (Spain)
    ... aka Letters From the Park (1988)
11. **Un Domingo feliz** (1988) (TV) ... aka A Happy Sunday (1988) (TV)
12. **Fábula de la Bella Palomera** (1988)
    ... aka **A Bela Palomera** (1988) (Brazil)

... aka Fable of the Beautiful Pigeon Fancier (1988)

13. **Milagro en Roma** (1988) ... aka Miracle in Rome (1988)
14. **Un Señor muy viejo con unas alas enormes** (1988) (story)
    ... aka A Very Old Man with Enormous Wings (1988)
15. **El Verano de la señora Forbes** (1988) (TV) (story)
    ... aka **The Summer of Miss Forbes** (1988) (TV)
16. **Yo soy el que tú buscas** (1988) (TV) (story)
    ... aka **I'm the One Who You Are Looking for** (1988) (TV)
17. **Cronaca di una morte annunciata** (1987) (novel)
    ... aka Chronicle of a Death Foretold (1987)
    ... aka **Chronique d'une mort annoncée** (1987) (France)
    ... aka **Crónica de una muerte anunciada** (1987) (Colombia)
18. **Tiempo de morir** (1985) ... aka A Time to Die (1985)
19. **Eréndira** (1983) (novel)
20. **El Año de la peste** (1979) (screenplay)
21. **María de mi corazón** (1979) (story) ... aka Mary My Dearest (1979)
22. **Presagio** (1974)
23. **Patsy, mi amor** (1968) (story)
    ... aka Patsy, My Love (1968) (International: English : informal literal title)
24. Juego peligroso (1966) (segment "HO") ... aka **Jôgo Perigoso** (1966) (Brazil)
    ...aka Dangerous Game (English title: informal literal title)
25. **Tiempo de morir** (1965) ... aka **Time to Die** (1965) (USA)
26. **En este pueblo no hay ladrones** (1965) (Mexico) (story)
    ...aka There Are No Thieves in This Village (International: English : informal literal title)

Cinemas : (based on Gabriel **García Márquez's** fictional short stories & novels)

Documentaries on Gabriel García Márquez

La Magia de lo Real (Films for the Humanities)

Gabriel Garcia Marquez (video recording) : producer, Harol Mantell; director, Ana Christiana Navarro -- Princeton, NJ: Films for the Humanities, c 1982. 1 video cassette (60 min.) : sd., col., with b&w sequences ; 1/2 in. In Spanish. P. E. Woodford. Camera, Fernanco Velez ; executive producer, Harold Mantell ; editor, Arshes Anasal. "FFH 176" Intended audience: adult. Issued also as U-Matic 3/4 in. or Beta 1/2 in. Issued also in English under same title. Isssued also as motion picture. Applause Video for $149.95 (1-800-277-5287; 85 Fernwood Lane, Roslyn, NY 11576-1431; Catalog #FHS176E for English; #FHS176S for Spanish.)

García Márquez : Tales Beyond Solitude (Profile of a Writer)

Applause Video for $29.95 (1-800-277-5287; 85 Fernwood Lane, Roslyn, NY 11576-1431; Catalog #HVMAR220.

Enredando sombras (1998)

Director : Edmundo Aray & Fernando Birri

Cast *(as themselves)* : Michael Chanan, Costa-Gavras, Pilar Miró, Robert Redford and Gabriel García Márquez

Film and Theatre Scripts by Gabriel García Márquez

Viva Sandino (1982)

El secuestro (1984)

Diatriba de amor contra un hombre sentado (dramatic monologue, 1994)

Selected Essays & Books on the Writings of Gabriel García Márquez

Presence of Faulkner in the Writings of García Márquez (Texas Tech University Graduate Studies, No 22)
Harley D. Obehelman.
Texas Tech University Press, 1980, ISBN 0896720802

Gabriel García Márquez: A Study of the Short Fiction (Twayne's Studies in Short Fiction Series, No 24)
Harley D. Oberhelman.
Twayne Publishing, 1984, ISBN 0805783334.

The Presence of Hemingway in the Short Fiction of Gabriel Garcia Marquez
Harley D. Oberhelman.
York Press, 1994, ISBN 091996690X.

From Dante to Garcia Marquez: Studies in Romance Literatures and Linguistics
Edited by Gene H. Bell-Villada, Antonio Gimenez, & George Pistorius.
Williams College, 1987, ISBN 0915081024.

Painting Literature: Dostoevsky, Kafka, Pirandello, and Marquez in Living Color
Constance A. Pedoto .
University Press of America, 1993, ISBN 1-7910-1243-3.

Circularity and Visions of the New World in William Faulkner, Gabriel García Márquez & Osman Lins
Rosa Simas.
Edwin Mellen Press, 1993, ISBN 0773492496.

Home As Creation : The Influence of Early Childhood Experience in the Literary Creation of Gabriel García Márquez, Agustin Yañez and Juan Rolfo
William Else Detjens.
Peter Lang Publishing, 1994, ISBN 0-82042-055-7.

The Influence of Franz Kafka on Three Novels by Gabriel García Márquez (Comparative Cultures and Literatures, Vol 4)
Hannalore Hahn.
Peter Lang Publishing, 1994, ISBN 0-82042-270-3.

Modern Critical Views: Gabriel García Márquez (Modern Critical Views)
Edited by Harold Bloom.
Chelsea House Publishers, 1989, ISBN 1-55546-297-9.

Editor's Note & Introduction (Harold Bloom)

García Márquez: From Aracataca to Macondo (Mario Vargas Llosa)

José Arcadio Buendia's Scientific Paradigms: Man in Search of Himself (Floyd Merrel)

The Faulkner Relation (William Plummer)

The Myth of Apocalypse and Human Temporality in García Márquez's *Cien años de soledad and El otoño del patriarca* (Lois Parkinson Zamora)

The Development of Faulkner's Influence in the Work of García Márquez (Harley D. Oberhelman)

The Logic of Wings: García Márquez, Todorov, and the Endless Resources of Fantasy (John Gerlach)

Beware of Gift-Bearing Tales: Reading García Márquez According to Mauss (Eduardo Gonzáles)

Cien años de soledad : The Novel as Myth and Archive (Roberto Gonzáles Echevarría)

Liberals, Conservatives, and Bananas: Colombian Politics in the Fictions of Gabriel García Márquez (Regina Janes)

The Autumn of the Patriarch (Raymond Williams)

The Logic of Wings: Gabriel García Márquez and Afro-American Literature (Vera M. Kutzinski)

The First Voyage around the World: From Pigafetta to García Márquez (Humberto E. Robles)

The Autumn of the Signifier: The Deconstructionist Moment of García Márquez (Patricia Tobin)

From Mystery to Parody: (Re)Readings of García Márquez's *Crónica de una muerte anunciada* (Isabel Alvarez-Borland)

From Realism to Magic Realism: The Meticulous Modernist Fictions of García Márquez (Morton P. Levitt)

Prisms of Consciousness: The "New Worlds" of Columbus and García Márquez (Michael Palencia-Roth)

Writing and Ritual in *Chronicle of a Death Foretold* (Carlos J. Alonso)

Translation and the Novel: *One Hundred Years of Solitude* (Anibal Gonzáles)

Chronology, Contributors, Bibliography, Acknowledgments and Index

Gabriel García Márquez: Solitude & Solidarity
Michael Bell.
Saint Martin's Press, 1993, ISBN 031-2099886.

The Modern Epic: The World-System from Goethe to García Márquez
Franco Moretti. Translated by Quintin Hoare.
Verso Books, 1996, ISBN 1-85984-934-2. & 1-85984-069-8.

Myth and the Modern Novel: García Márquez, Mann, and Joyce (Harvard Dissertations in Comparative Literature)
Michael Palencia-Roth.
ISBN 0824084322.

Gabriel García Márquez (Twayne's World Authors, No. 749)
Raymond L. Williams
Twayne Publishing, 1984, ISBN 0-8057-6597-2.

1. Introduction and Biography
2. The Early Fiction (1948-55)
3. The Middle Years (1956-62)
4. *One Hundred Years of Solitude* (1967)
5. *The Incredible Sad Tale of Innocent Eréndira & her Heartless Grandmother* (1972)
6. *The Autumn of the Patriarch* (1975)
7. *Chronicle of a Death Foretold* and Journalism (1981)
8. Conclusion

García Márquez: The Man and his Work
Gene H. Bell-Villada.
University of North Carolina Press, 1990, ISBN 0-807-84264-8.

PART ONE : BACKGROUNDS : The Novel, The Country, The Writer's Life, The Man and His Politics and The Readings

PART TWO : WORKS : The History of Macondo, The Master of Short Forms, Juvenilia and Apprenticeship (A Brief Interlude), The Anatomy of Tyranny, The Novelist of Love and The Legacy.

Hispanics of Achievement: Gabriel García Márquez (Hispanics of Achievement)
Sean Dolan.
Chelsea House Publishers, 1994, ISBN 1-7910-1243-3.

Evolution of Myth in García Márquez from La Hojarasca to Cien Anos De Soledad
Robert L. Sims.
Ediciones Universal, 1982, ISBN 0897292952.

The First García Márquez : A Study of His Journalistic Writing from 1948-1955
Robert L. Sims.
University Press of America, 1992, ISBN 0819185779 & 0819185787.

Bibliographic Guide to Gabriel García Márquez (Bibliographies and Indexes in World Literature, No 7)
Margaret Eustella Fau & Nelly Sfeir De Gonzalez
1.Greenwood Publishing Group, 1980, ISBN 0-3132-2224-X, 1947-1979.
2.Greenwood Publishing Group, 1986, ISBN 0-3132-5248-3, 1979-1985.
3.Greenwood Publishing Group, 1994, ISBN 0-3132-8832-1, 1986-1992.

Gabriel García Márquez
G. R. McMurray.
Ungar, New York: 1977, ISBN 0804426201.

Gabriel García Márquez: Life, Work, and Criticism
G. R. McMurray.
York Press, 1987, ISBN 0919966586.

Critical Essays on Gabriel García Márquez (Critical Essays on World Literature)
George R. McMurray.
ISBN 0816188343.

Defamiliarization in the Work of Gabriel García Márquez from 1947-1967 (Studies in Hispanic Literature, Vol 1)
K. E. A. Mose.
Edwin Mellen Press, 1989, ISBN 0889463875.

Intertextuality in García Márquez
Arnold M. Penuel.
Spanish Literature Publications, 1994, ISBN 0938972200.

García Márquez (Modern Literatures in Perspective)
Edited by Robin W. Fiddian..
Pearson UK, 1995, ISBN 058221405X.

Gabriel García Márquez: Writer of Colombia
Stephen Minta.
Jonathan Cape, London: 1978, ISBN 0064357554.

Special Issue Gabriel García Márquez (Latin American Literary Review, Vol. 8, No. 25, January-June, 1985).
Yvette E. Miller.
ISBN 0317265202.

Gabriel García Márquez: New Readings
Edited by Bernard McGuirk & Richard Cardwell
Cambridge University Press, 1987, ISBN 0521328365.

Critical Perspectives on Gabriel García Márquez
Edited by Bradley A. Shaw & Nora Vera-Godwin.
ISBN 0892950315.

One Hundred Years of Solitude: Modes of Reading (Twayne's Masterworks Studies, No. 70)
Regina Janes.
Twayne Publishing, 1991, ISBN 0805779892.

Gabriel García Márquez: Revolutions in Wonderland
Regina Janes.
ISBN 082620337X.

Gabriel García Márquez and the Invention of America
Carlos Fuentes.
ISBN 0853231966.

Gabriel García Márquez and Latin America
Alok Bhalla.
ISBN 0938719084.

Gabriel García Márquez & the Powers of Fiction (Texas Pan American Series)
Edited by Julio Ortega.
ISBN 0521328365.

Gabriel García Márquez
Peter G. Earle
ISBN 8430621296.

García Márquez: El Coronel No Tiene Quien Le Escriba (Critical Guides to Spanish Texts, 38)
J. B. H. Box.
Books Britain, 1984, ISBN 0729301745.

Approaches to Teaching García Márquez's *One Hundred Years of Solitude*
Edited by María Elena de Valdés & Mario J. Valdés.
Modern Language Association, 1990, ISBN 0873525353 & 0873525361.

Materials (María Elena de Valdés)
Editions and Translations, The Novel and its Author, Historical Background, Critical studies : Literary Contents, Mythic Contents, Interpretation & Analysis, Women and the Novel, Pedagogical Studies, Audiovisual Materials, Related Criticism & Bibliographies.

Approaches
Introduction (Mario J. Valdés)
One Hundred Years of Solitude in Humanities Courses (Hanna Geldrich Leffman)

One Hundred Years of Solitude in Comparative Literature Courses (Lois Parkinson Zamora)
One Hundred Years of Solitude in History, Politics, and Civilization Courses (Chester S. Halka)
One Hundred Years of Solitude in Women's Studies Courses (María Elena de Valdés)
One Hundred Years of Solitude in Interdisciplinary Courses (Sandra M Boschetto)
One Hundred Years of Solitude in Latin American Literature Courses (Walter D. Mignolo)

Interpretive Approaches in the Classroom
An Approach Using Ideology and History (Gabriela Moar)
An Approach Using History, Myth, and Metafiction (Isabel Alvarez Borland)
Archetypal Approaches (Robert L. Sims)
An Approach from Analytical Psychology (Gary Eddy)
Hermeneutics: A Phenomenological Approach (Mario J. Valdés)
A Narratological Approach (Amaryll Chanady)

Landmarks of World Literature: Gabriel García Márquez, *One Hundred Years of Solitude*
Michael Wood.
Cambridge University Press, 1990, ISBN 0-521-31692-8.

Literary Masters : Gabriel Garcia Marquez
Joan Mellen.
Gale Group, 2000, ISBN 0787639702.

Literary Masterpieces : One Hundred Years of Solitude (Volume -5)
Joan Mellen.
Gale Group, 2000, ISBN 0787639710.

A Synergy of Styles : Art and Artefact in Gabriel Garcia Marquez
Gloria Jeanne Bodtorf Clark.
University Press of America, 1999, ISBN 0761814086.

La Ficcion De Gabriel Garcia Marquez : Repeticion e Intertextualidad (American University Studies Series II, Romance Languages and Literature, Vol 19)
Edward Waters Hood.
Peter Lang Publishing, 1993, ISBN 082041879X.

Gabriel Garcia Marquez Modern Critical Views
Chelsea House Publications (Library), 1989, ISBN 1555462978.

Haunting Demons : Critical Essays on the Works of Garcia Marquez (Coleccion Interamer, No.64)
Isabel Rodriguez-Vergara.
Columbus Memorial Library, 1998, ISBN 0827038526.

Utopia Paraiso E Historia : Inscripciones Del Mito En Garcia Marquez, Rulfo Y Cortazar (Purdue University Monographs in Romance Languages, Vol 19)
Lida Aronne-Amestoy.
John Benjamins Publishing Co, 1986, ISBN 0915027682.

Gabriel Garcia Marquez Coetaneo De La Eternidad. (Biblioteca Hispanoamericana y Espanola de Amsterdam 5)
Jacques Joset.
Rodopi Bv Editions, 1984, ISBN 9062038360.

García Márquez for Beginners
Mariana Solanet, Hector Bergandi (Illustrator).
Writers & Readers, 1999, ISBN 0863162894.

Gabriel Garcia Marquez : New Readings (Cambridge Iberian and Latin American Studies)
Bernard McGuirk, Richard Cardwell (Editor).
ASIN 0521328365.

Understanding Gabriel Garcia Marquez : (Understanding Contemporary European and Latin American Literature)
Kathleen McNerney
ASIN 0872495639.

El Mundo De MacOndo En La Obra De Gabriel Garcia Marquez
Olga Carreras Gonzalez
Ediciones Universal, 1984, ISBN 0897292529.

Gabriel Garcia Marquez (Obra Periodistica Vol 1)
Jacques Gilard
ASIN 9997194136.

Gabriel Garcia Marquez : A Critical Companion (Critical Companions to Popular Contemporary Writers)
Ruben Pelayo
Greenwood Publishing Group, 2001, ISBN 0313312605.

A Study Guide to Gabriel Garcia Marquez' One Hundred Years of Solitude
F. Murray Abraham (Narrator)

Time Warner Audio Books, ISBN 1570421129, Cassettes & Booklet edition (1994).

Of Love and Other Demons (audio)
Gabriel Garcia Marquez, Vanessa Redgrave(Reader).
ASIN 067944324X.

One Hundred Years of Solitude: A Study Guide
Brenda K. Marshall
Read by F. Murray Abraham; A+ Audio of Time Warner Audio.
Cassette (67 minutes), ISBN 1-57042-112-9.

Introduction to Magical Realism, Detailed Narrative Guide, Dramatic Readings from the Text, Critical Analysis, Music from Ravel's "Rapsodie Espagnole" and "Estrada de Sol".

The booklet has the following sections : Character List, Scene by Scene Synopsis Glossary of Terms, Sample Test and Relevant Questions, Study reference for Books, Music, and Film.

Love and Other Demons
Read by Natasha Richardson
Random House Audio, 4 Cassettes (5 Hours), ISBN 0-679-44324-X.

Gabriel Garcia Marquez
Houghton Mifflin College, 2000, ISBN 0618048251.

ঘনিষ্ঠ উত্তাপ

কার্তিক লাহিড়ী

ঋষির বেশ অসময় চলছে

অসময়, কারণ সে লিখতে পারছে না, যে কাজে হাত দিচ্ছে সব কেঁচে যাচ্ছে, অফিসেও একটা ঝামেলা পাকিয়ে ফেলেছে—ছোট্ট, কিন্তু ঝামেলা তো বটেই, কী দরকার ছিল আশুবাবুকে ওসব কথা বলার, মেয়ের যদি ওই বজ্জাত ছেলেটার সঙ্গে বিয়ে হয় তাতে কী এসে যায় কার

আশুবাবুকে সাবধান করতে গিয়েই তো সেটা হচ্ছে, অফিসে তাঁর সঙ্গেই হৃদ্যতা ছিল একটু, এখন তা তলানিতে এসে ঠেকেছে, আশুবাবু ব্যাপারটাকে অন্যভাবে নিয়ে ফেললেন, সে বুঝতে পারে না — এখনও কেন আশুবাবু এত ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন তার সম্বন্ধে

নাহ্, করার কিছু নেই

এগুলো মোটেই আসল ব্যাপার নয়, সমস্যাটা একেবারে তার নিজস্ব, কারোর সঙ্গে শলাপরামর্শ করে সুরাহা হবার নয়, নিজের থেকে ভিতরে ভিতরে আস্তে আস্তেই উষ্ণ হতে থাকে, টের পায় একটা কিছু হতে চলেছে, কিন্তু ধরতে পারে না

তুষের আগুনের মতো ধিকি ধিকি জ্বলে, ক্রমে লাল হতে থাকে কোন হাওয়ায়, আরও তপ্ত হয়, ক্রমে শিখা উঠছে, হিল্ হিল্ করছে শিখা

ঋষি বুঝছে যেন কিছু কিছু

অবশ্য টের পায় তার উপস্থিতি প্রথম সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নিশ্চুপে খুব

বক্তারা একে একে যেসব কথা বলছেন তা তার কানের পাশ দিয়ে মাথার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে, মাইকের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা শব্দগুলো কোলাহল সৃষ্টি করছে কেবল; সব কথা কোনো মানে বহন করে আনছে না, কথা কেবল কথা, বলার জন্য বলা, কেউই বিশ্বাস করে না যা দৃপ্তভাবে বলছে শ্রোতাদের সামনে

বিশ্বাস যত কমছে গলার স্বর তত চড়ছে, হাত উঠছে-নামছে, পুরো হলঘর মাঠ হয়ে গেছে তখন

শরীরের কোথা থেকে একটা হাসির দমক বেরিয়ে আসতে চাইছে দ্রুত, ঋষি পারবে না ওই দমককে আটকাতে, সে-হাসি হয়ে উঠবে অট্টহাসি, দম-ফাটা হাসি

সভার মধ্যমণি সে, সকলের চোখ বেশির ভাগ সময় তার উপর নিবদ্ধ, কারো চোখে বিস্ময় বা শ্রদ্ধা, কারো ভালোবাসা, তবু দু-একটি চোখে কি ঈর্ষার নীল আলো নেই, থাকলেও এখন তো সুপ্তই থাকবে, যেমন এখন সে-হাসির দমককে কিছুতেই অনুমতি দেবে না উঠে আসার, তাহলে কী করে রোধ করবে অন্তঃসারশূন্য বিশ্বাসহীন বক্তব্য সকলকে, পরিহাস করার ইচ্ছা, সেই গল্পের মতো হাসিকে কি কান্নায় পরিণত করে কেঁদে উঠবে?

তা-ও এক নাটুকেপনা হয়ে যায়

তাতে দোষ কী, সে তো নাট্যকার — নাটক লেখে, নাটকে নাটুকেপনা থাকবে না এ কি হয়?

নিশ্চয় হয় না, তা বলে যিনি নাট্যকার স্রষ্টা...

এই মুহূর্তে ঋষি থমকে যায়, বোধ হয় সেই শুরু —

নাট্যকার কি স্রষ্টা? বাকাটা পুরো হবার আগেই বুক শুকিয়ে যায়, সে একজন নাট্যকার, কত নাটক লিখেছে, এই কিছুদিন আগে অব্দি লিখেছে সাড়া-জাগানো নাটক, তো সেই মানুষ কি..

সংশয় মাথা চাড়া দিতে থাকে, ধাপে ধাপে তা উত্তুঙ্গ হতে চায়

যে লেখে গল্প কবিতা উপন্যাস ইত্যাদি, সে লেখক; লেখক স্রষ্টা কারণ সে এক অন্য ভুবন নির্মাণ করে, তার কাজ অপূর্ব নির্মাণ যা আগে ছিল না, এইমাত্র সে নির্মাণ করছে

নাট্যকার নাটক লেখেন অতএব তিনি লেখক — স্রষ্টা, কিন্তু তাঁর সৃষ্টি অন্যনির্ভর, নাটক পাঠের জন্য লেখা হয় না, প্রদর্শনের জন্য, মঞ্চস্থ হওয়ার জন্য তৈরি হয়

তাই নাটকের জন্য রঙ্গমঞ্চ দরকার

পরিচালক কুশীলব কলাকুশলী আলো শব্দ সংগীত কত কিছু, এবং দর্শক

সবমিলিয়ে তবে নাটক, তাহলে —?

নাট্যকারের স্থান কোথায় এতে? বিজ্ঞাপনের এক লাইনে? ঋষি ঘাবড়ে যেতে থাকে, সত্যিই তো! ঘাম ঝরতে থাকে থাকে বিহ্বল উদ্‌বেগে, এতদিন তাহলে ভূতের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছি? মঞ্চস্থ নাটকের স্রষ্টা কে তবে?

ঋষির চোখ ঘুরতে থাকে

নাট্যকার স্ক্রিপ্ট লিখছেন পড়ছেন সামনে বসে শুনছেন প্রোডিউসার পরিচালক কিছু বাদ দিতে হচ্ছে কোথাও জুড়তে হচ্ছে, পছন্দ হলে এবার মহলায় পড়ছে নাটক, পাত্র পাত্রীরা আসছেন, পার্ট মুখস্থ হচ্ছে চরিত্র অনুযায়ী লোক বদল হচ্ছে মহলা এগুচ্ছে ঢিমে তালে প্রথমে, পরে দ্রুত আসছে সংগীত পরিচালক মঞ্চ নির্মাতা আলোক সম্পাতকারী আরও কত কত জন

তখন নাট্যকার হারিয়ে গেছেন কোথায়...

বুক কাঁপতে থাকে, এই তবে তার অবস্থান, থেকেও নেই থাকলেও না থাকার মতো, এ যেন বীর্যবান হয়েও রেতঃ অক্রিয় অক্ষম

ঋষি চমকে ওঠে এ-রকম সাদৃশ্যে, সংসার জীবনে তার সেই অবস্থা, সে সন্তানহীন, কত কী চিকিৎসা হয়েছে, স্ত্রী দুর্গাবতী পুজো পাঠ ছাড়াও হেন সাধু ফকির নেই যার দরজায় দরজায় যায়নি সে, কত মাদুলি মানত কত কী করে দুর্গা; ঋষি অবশ্য সেই দুঃখ ভোলে লেখায় মগ্ন হয়ে যেতে যেতে, দুর্গার দুঃখ, ব্যথা যে অপরিমেয় অসহ তা খেয়ালই করতে পারে না, ডাক্তার দুর্গাবতীর শারীরিক অসামর্থ্যের চিহ্ন পাননি কোনো, ঋষির বীর্যেরই সৃষ্টির ক্ষমতা নেই, সেই অক্ষমতা বার বার পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়

তবে কি ওই শারীরিক অক্ষমতাই তাকে বেছে নিতে বাধ্য করেছিল শিল্প-সাহিত্যের এমন এক মাধ্যম, যার সৃজনশীলতার কেন্দ্রে থাকে না কেউই — লেখক-পরিচালক-অভিনেতা-অভিনেত্রী-সংগীত পরিচালক-যান্ত্রিক কলাকুশলী — কে, কে?

না কি দর্শক? না কি সৃজনশীলই নয় নাটক?

উত্তর খুঁজে পায় না ঋষি, কাউকে জিজ্ঞেস করতে হয়, নাটক সম্বন্ধে তার ধারণা ঠিক না বেঠিক, নিজের ভুলও হতে পারে, হয়তো কোনো কারণে কোনো পরিচালক বা নাট্যদলের উপর চটে আছে, হয়তো তাদের মধ্যে কেউ ফুট কেটেছে — ভারি তো নাট্যকার, তার আবার কথা, আমরা না থাকলে তুই কে রে? কে পুছত যদি জমিয়ে না দিতাম নাটক...

কিংবা,

ঋষি বুঝতে পারছে — এসব কিছু-ই নয়, নাটকের পুরো ব্যাপার সম্পর্কে সংশয় গভীর হয়ে পড়েছে, কারো কোনো মন্তব্য, পত্রিকার সমালোচনা, নাট্যদলের তুচ্ছতাচ্ছিল্য — না, না-এসব কিছুই নয়, সে নিজেকে ভাবত একজন স্রষ্টা, সেই গর্ব অহংকার নিজেকে অনন্য ভাবার, সাধারণ থেকে উঁচু আলাদা মনে করা ইত্যাদির কলসিটার তলা ফুটো হয়ে গেছে নিজেরই আঘাতে একসময়

শরীর ও মন বিধ্বস্ত, আগে কোনটা বিগড়োয় তা জানার আগ্রহ নেই আর

ছিল কি কখনো? দুর্গা কি ধরতে পারছে তার এই অবস্থা? এতদিন যা ভেবে, যা নিয়ে বুক ফুলিয়ে হাঁটত , আজ তা সব চুপসে আমশি হয়ে গেছে, শরীর মন কোনোদিকে সৃজনশীলতার চিহ্নমাত্র নেই, সে একটা পোড়ো বাড়ি, চিনির বলদ আহম্মক ভুঁইফোড় ইত্যাদি কত কী

অথচ এখনই তার লেখার চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে হাজার হাজার গুণ, জোর তাগিদ

একটা জম্পেশ নাটক দিন

মানে আমরা চাইছি এমন একটা নাটক....প্রযোজক পরিচালকের মুখ চোখ অঙ্গভঙ্গি দেখে বুঝে নিতে হবে তাঁরা কী চাইছেন, এবং...

ঋষিও চোখ মুখের রেখা দিয়ে বোঝাতে পারছে না যে সে ওদের সবকিছু বুঝছে কেবল

ঋষি তো নাটক লিখবে না আর, বললেও ওরা বুঝবে না, কিংবা হেসে উঠবে — এ আর বেশি কথা কী, কাগজ-কলম নিয়ে বসুন এক সময়, দেখবেন — তরতরিয়ে লেখা হচ্ছে

কাগজ-কলম টানতে যাবে কেন — যা সৃষ্টিশীল নয় তাকে ভজনা করা কেন, ওরা ভাববে দর বাড়াচ্ছে ঋষি

কী করে বুঝবে

ব্যাপারটা আর্থিক নয়, বিষয়টা আত্মিক

ঋষি চুপ করে শুনে যাবে তাদের কথা, বলবে না একটিও, তারা চলে গেলে সে ভাবতে থাকবে আবার, হয়তো আনমনে ডাকবে দুর্গাকে, তার পর যথারীতি ভাসতে থাকবে ভাবনার সমুদ্রে...

তবে কি ক্ষোভ? এতদিন পর সংবর্ধনা দেয়া হচ্ছে! অথচ যারা পরে লিখতে এসেছে তাদের অনেকেই সংবর্ধনা তো বটেই, পুরস্কারও পেয়ে গেছে, ওদের পাওয়া এবং নিজের না-পাওয়ায় কি সে নিজেকে অপমানিত বোধ করেছে? ক্ষোভ জমেছে তাই, সেই ক্ষোভের কথা অন্যকে বলতে গেলেই সেই অন্যেরা দেখতে পাবে তার লোভী চেহারা, সংবর্ধনা ও পুরস্কার পাবার আকাঙ্ক্ষায় সেই হ্যাংলামি, হয়তো তার নাম সুপারিশ করার জন্য আকুতিময় মুখ, শেষে সকলের কৃপাপ্রার্থী হয়ে যাবে সে

ঋষি নিজের মধ্যে তল্লাশি চালায় — নাহ্, সে এসবের জন্য লালায়িত নয়, তার মনেও জাগেনি পাওয়ার কথা, যত ভাবছে তত টের পাচ্ছে

মন তার উঠে গেছে নাটক থেকে একেবারে, উপোস করে মরবে তবু ঝাঁপ দেবে না বন্ধ্যা মাধ্যমে

এসব বুঝবে কে তবে, কাকে বোঝাবে যন্ত্রণাটা কোথায়? কুরে কুরে খাচ্ছে সমস্ত অস্তিত্ব

দুর্গাকে কি জিজ্ঞেস করবে — এমন জীবনযাপন করতে রাজি আছে কি না তার সঙ্গে সে? উপোসের জীবন?

দুর্গা তাকাবে তার দিকে, প্রথমে কিছু বলবে না, তার পর দীর্ঘশ্বাস পড়বে, নাটক না লিখে থাকতে পারবে তুমি?

ঋষি দৃষ্টি তুলবে শুধু, বুঝতে পারবে সে, তার সংকটের গভীরতা দূরে থাক, সংকটটা কী, তাই বোঝাতে পারেনি তাকে

নাটক না লিখলে আস্তে আস্তে তোমার নাম ভুলে যেতে থাকবে মানুষ, তারপর —

দুর্গার অসমাপ্ত কথা আছড়ে পড়ে বুকের উপর, আমূল নড়ে ওঠে, তাই তো তাই তো...

ইতস্তত করেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ে যেন দুর্গার উপর এবার, তার মানে তুমি খাওয়াপরার চিন্তাকেই সব মনে কর?

দুর্গা কিছু বলে না, আর সেই না-বলা তার বুকের দোলন বাড়িয়ে দেয়

তাই তো, সেটাও তো একটা ব্যাপার বটে, তাহলে?

আস্তে আস্তে হুঁশ ফিরে পায় যেন, সৃজনশীলতা যেমন একটা ব্যাপার, খাওয়া-পরাও ফেলে দেবার মতো নয়, তবে কি ফিরে যাবে নাটক লেখায়, যা তাকে শুধু খাওয়াপরার হাত থেকে উদ্ধার করছে তা-ই নয়, সম্মান এনে দিচ্ছে, কিন্তু —

দীর্ঘশ্বাস পড়ে, মন কিছুতে চাইছে না অথচ...

বাজারে এখন তার নাটকের চাহিদা দারুণ, দু-হাতে লিখেও তা পূরণ করতে পারবে না, মওকা বুঝে প্রচুর টাকা দাবি করতে পারে, একটু গাঁইগুঁই করলেও নাটক হাতছাড়া হয়ে যাবার ভয়ে ঋষির চাওয়া মিটিয়ে দেবে তারা অথচ...

লিখতেই চাইছে না নাটক, কী হবে লিখে?

পয়সা? সে তো নানাভাবে আয় করা যায়, চুরি ডাকাতি যে কোনোভাবে

একবার বীরেশকে জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়? সে কি হাল করতে পারবে তার সমস্যার?

ঋষি বুঝতে পারছে, গভীর গাড্ডায় পড়ে যাচ্ছে কেবল, যত তলাচ্ছে তত আলোর স্তর পেরিয়ে পেরিয়ে অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে তবু...

মঞ্চে যবনিকা ওঠার আগে নিভে যাচ্ছে একের পর এক আলো, দর্শকদের বসার জায়গা রঙ্গমণ্ডপ এতক্ষণ দর্শকদের নড়াচড়া, বসা, কথাবার্তায় ব্যস্ত ছিল খুব, এখন স্থির হয়ে যাচ্ছে সবকিছু, তাদের দৃষ্টি এখন নিবদ্ধ হচ্ছে রঙ্গভূমির (স্টেজের) উপর, স্তব্ধতা সেখানে, এখানেও

কারণ যবনিকা উঠছে পরতে পরতে অন্ধকার প্রগাঢ় করে, শূন্য মঞ্চ ফলে অন্ধকার নৈঃশব্দ্যের ভারে আরও গভীর হয়ে যাচ্ছে

ওখানে কিছু ঘটতে চলেছে

দর্শকের কৌতূহল অদম্য হয়ে উঠছে, শুরু হয়ে যাবে হয়তো এক্ষুনি, নেপথ্যে বেজে উঠবে বাদ্যযন্ত্র তবু আলোড়ন নেই মঞ্চে বা নেপথ্যে

নিঃসাড় চারধার, নিশ্বাসও নিঃশব্দ হয়ে গেছে এখন

প্রেক্ষাগৃহে পূর্ণ, তিল ধারনের ঠাঁই নেই আর, তবু সেখানেও নিশ্চুপতা অটুট

রঙ্গভূমি ও রঙ্গমণ্ডপ একাকার হয়ে গেছে অন্ধকারের অন্তরে, একাকার হলেও একটা অদৃশ্য রেখা আলাদা করে রেখেছে যেন মঞ্চ ও দর্শকস্থান, মঞ্চের অন্ধকার গাঢ় অনেক, স্তব্ধতাও অসীম এবং...

সময়ও থমকে গেছে অথচ...

কলায় কলায় অনুপল, অনুপল অনুপলে বিপল, বিপলে বিপলে পল, পলে পলে দণ্ড

সময়ের চলার শব্দ শোনা যাচ্ছে এবার

দর্শকও নড়েচড়ে উঠছেন হয়তো, তাদের নড়াচড়ার আকুঞ্চনের ঘর্ষণের শব্দ হয় মৃদু, অন্ধকার তেমন থাকে, — অনড়, অথচ মানুষের ধৈর্যের সীমা অনন্ত নয়, অন্ধকারে তাদের মুখ দৃশ্য হলে দেখা যেত বিরক্তির, ক্লান্তির রেখা টান টান হয়ে যাচ্ছে সেখানে, অন্ধকারের ভার অসহ্য ঠেকছে তবু

গুঞ্জন শুরু হচ্ছে, প্রেক্ষাগৃহের এধার-সেধার থেকে

গুঞ্জন উঠছে, আর কতক্ষণ বসে থাকব আমরা?

বের হবার দরজা কোথায়? কোথায় লেখা সেই একজিট লাল আলোয়, বেরুবার রাস্তা নেই আর

তাতে আরও উত্তেজিত হতে থাকে দর্শক

কতক্ষণ, কতক্ষণ

শুরু করুন, জেনারেটর চালু করুন

চালু করুন, চালু করুন

মঞ্চ তেমন নিস্তব্ধ, সেখানে অন্ধকার নিকষ

কারো কাছে দেশলাই বা লাইটার নেই এবং টর্চলাইট কিংবা অন্ধকার দীর্ণ করার বস্তু কোনো?

নিজের চুল ছেঁড়া ছাড়া করার কী থাকতে পারে তবে? তা বলে মাথার চুল ছেঁড়া?

শুরু করুন শুরু করুন, ধ্বনি উঠছে সব দিক থেকে

ফেরত দিন ফেরত দিন, নইলে আমরা লণ্ডভণ্ড করে দেব

এপাশ-ওপাশ থেকে কানের পাশ দিয়ে মাথার উপর ছুটে যাচ্ছে বুলেটের বেগে জুতো, ব্যাগ, ভাঙা চেয়ার

মঞ্চের অন্ধকার এইসব পতনের শব্দে কেঁপে কেঁপে উঠছে

আরও আরও পতন হচ্ছে

দর্শক উত্তেজিত, কথা বলতে বলতে ধ্বনি তুলতে তুলতে একজন আরেকজনের গলা ক্যাঁক করে ধরে, কেউ-বা চুলের মুঠি ধরে তুলে কেউ-বা...ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে মঞ্চে, মঞ্চের গভীরে

দারুণ শব্দ হচ্ছে, শরীর স্খলনের সেখানে

চেয়ার ভাঙছে আর বসার পাটাতন হাতে উঠে এসে উড়ন্ত পিরিচ হয়ে যাচ্ছে, বোঁ বোঁ করে ঘুরতে ঘুরতে মঞ্চের অন্ধকার স্তব্ধতা তছনছ করে দিচ্ছে

জড়, প্রাণী, সমস্ত বস্তুর আক্রোশ কেন্দ্রিত হয়েছে মঞ্চে, যেন মঞ্চ হচ্ছে প্রধান শত্রু সকলের

মঞ্চ সজীব প্রাণী হলে এতক্ষণে দর্শকদের আক্রমণে ইহলীলা সংবরণ করত, মঞ্চ তবু আগের মতো নেই আর, তার শরীর থেকে অন্ধকার পিছলে পিছলে মঞ্চের বাইরে ছড়িয়ে পড়ছে

সেই পিচ্ছিল অন্ধকার দর্শকদের শরীরে লেগে লেগে আরও উত্তেজিত করে দিতে থাকে, এবং তাদের মুখ দিয়ে অশ্রাব্য কথা সব বেরিয়ে বেরিয়ে মঞ্চের অন্ধকার তরল করে দেয়, তাদের কথার ঘায়ে মঞ্চ শিউরে শিউরে উঠছে তখন

উত্তাপের চরম শীর্ষে দর্শককুল
আর রঙ্গভূমি জনশূন্য নির্জন শান্ত শীতল যেন অসহায় দর্শক
হঠাৎ সব ঝিম্ মেরে যায়, রঙ্গমঞ্চ রঙ্গমণ্ডপ দর্শকগণ অন্ধকার
এবং ভোঁতা লাল আলো জ্বলে ওঠে — 'একজিট' লেখা দেখা যায়
তার পর জ্বলে সব আলো, ততক্ষণে যবনিকা পতন হয়েছে, আর অট্টহাসিতে ভরে যাচ্ছে চরাচর
কেমন দেখলেন, এরকমই একটি কথা টুপটাপ ঝরে পড়ে সব চুপচাপ হয়ে যায়।
কেউ কোথাও নেই, ইজিচেয়ারের গভীরে সে...
ঋষি আলো সইয়ে সইয়ে চোখ খুলছে এতক্ষণে...
বুঝতে পারছে, হাজার না চাইলেও তাকে ফিরে যেতে হবে সেই আবাদে যেখানে ঢোকামাত্র নিমিত্ত মাত্র হয়ে যাবে পলকে
ভাবতেই স্নায়ু বিবশ হয়ে থাকে — মনও
নাহ্, করার কিছুই নেই
দীর্ঘশ্বাস পড়ার মুহূর্তে হঠাৎই ঋষি লাফিয়ে ওঠে, এইতো কিছুক্ষণ আগে রঙ্গভূমিকে দর্শক করে তুলেছিলাম আমি, কে করেছে এমন কাজ আগে? উত্তেজনার মাথায় ঋষি কাগজ-কলম টেনে নেয় সঙ্গে সঙ্গে তখন...

অল্প একটু দুঃখ

বিজনকুমার ঘোষ

দেখতে দেখতে চোদ্দো বছর এ-পাড়ায়। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকের পরে সুপ্রকাশ কলেজের বুড়ি ছুঁয়ে বি.এসসি ডিগ্রিও পেয়ে গেল। প্রথম শ্রেণীর অনার্স। দু-একজন সহৃদয় পরামর্শদাতার বক্তব্য এইরকম-ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, চান্স না পেলে যাদবপুর, কিংবা কল্যাণী — এম.এসসি-টা চাই, বুঝলে? পেরে যাবে। তুমি ভালো ছেলে। যত ওপরে উঠবে তত কম্পিটিশন।

প্রত্যেক জায়গায় সুবোধ বালকের মতো ঘাড় নেড়েছে সুপ্রকাশ। 'আজ্ঞে, আপনার উপদেশই শিরোধার্য!' কিন্তু সুপ্রকাশ জানে, আমি মোটেই ভালো ছেলে নই। ভালো ছেলের মস্তিষ্কই আলাদা। গর্ভাবস্থায় মায়ের ভালো খাওয়া-দাওয়া চাই। ভূমিষ্ঠ হওয়ার তিন মাস পরে দরকার প্রথম শ্রেণীর অ্যানিম্যাল প্রোটিন। আবার এক পুরুষের ব্যাপার হলেও চলবে না। প্রয়োজন ভালো হেরিডিটি, অন্তত কয়েক পুরুষের। সেদিক থেকেও দারুণ ঘাটতি সুপ্রকাশের। মার কাছে শুনেছে ঠাকুরদাদা ছিলেন ওপার বাংলার ছোটো এক জমিদারের নায়েব মশাই। তাঁর কাজই ছিল প্রজা ঠেঙিয়ে খাজনা আদায় করা। এসব কাজে লেখাপড়া বিশেষ লাগে না। দাগ, পরচা, খতিয়ান, দলিল, জমাওয়াশিল ইত্যাদি টার্মগুলির সঙ্গে ভালোরকম পরিচয় থাকা চাই। এখানে দয়া-মায়া ইত্যাদি হৃদয়ঘটিত ব্যাপারগুলি রীতিমতো ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। বাবা তাঁর একমাত্র ছেলে। সেকালে এশিয়াটিক কলেরার খুব নামডাক। একদিনেই শেষ। সুপ্রকাশের বাবার বয়েস যখন বাইশ তখন তাঁর মা এই কাল রোগে মারা যান।

বাড়ি একেবারে ছন্নছাড়া। সবই ঠাকুর-চাকর ভরসা। তারা খেতে দিলে খাওয়া জোটে, নচেৎ নয়। বড়োলোকদের মোসাহেব থাকে। ঘরবাড়ির হাল দেখে তাদের চোখ ফেটে জল আসে। বলল, ছেলের বিয়ে দাও রাসবিহারী। লক্ষ্মীশ্রী ফিরুক। আমরাও চোখ জুড়োই।

উত্তম প্রস্তাব। নায়েব মশাই মহালে যান আর প্রজা ঠ্যাঙানোর পাশাপাশি খোঁজখবর রাখেন, কার ঘরে ভালো মেয়ে আছে। পালটি ঘর, কুষ্ঠি-ঠিকুজির মিল, — এসব দিকেও তাঁর কড়া নজর। হবেই তো, সেকেলে লোকউনি। কলকাতা শহরে ঘোড়ায়-টানা ট্রাম দেখেছেন।

তা দেখাদেখি করতে করতে একটি মেয়ে পছন্দ হয়ে গেল। এই পছন্দের মেয়েটিকে মনের মধ্যে দোলাতে দোলাতে কীরকম একটা অনুভূতির সঞ্চার হয়। ক্রমে ক্রমে অনুভূতি ভূমিকম্পের আকার ধারণ করে। রাতে ঘুম হয় না। চোখের কোণে কালি ইত্যাদি।

অগতির গতি মোসায়েববৃন্দ। যারা উপযুক্ত ছেলের বিয়ের পরামর্শ দেয়, তারাই এবার রাজনৈতিক নেতাদের মতো পালটি খেয়ে বলেন, তোমার বয়েসটা কী হে, পঞ্চাশও পেরোয়নি। ছেলেকে মামাবাড়ি পাঠিয়ে দাও। মাত্র তিন মাস। এরমধ্যেই আমরা কাজ সেরে ফেলব।

একজন বলল, আহা, বাপের দুঃখটা ছেলে বুঝবে না, তা-ও কী হয়!

আর একজন, ওর তো বিয়ের বয়েস পড়ে আছে, বাবারই নেই।

রাসবিহারী ছেলেকে খুব ভালোবাসতেন। সেজন্যই দুঃখটা কুরে কুরে খায়। যদিও ঠ্যাঙাড়ে মানুষের মায়া মমতা বিষতুল্য, কিন্তু সে তো প্রজাদের বেলায়। তাই বলে একমাত্র ছেলের

ক্ষেত্রে একই দাওয়াই? এটা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না। বিবেক এখানে এসে একটু দম নেয়।

সুপ্রকাশ এসব বৃত্তান্ত মার মুখ থেকে শুনেছে। শত হলেও নিজের শ্বশুরমশাই! ছেলেরও তখন যথেষ্ট বয়েস। পার্ট টু দেবে। তাই একটু লজ্জা লজ্জা করছিল। পরে অবশ্য কেটে যায়।

প্রবল ভূমিকম্পে শক্তপোক্ত কংক্রিটের বাড়ি নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে যায়, সেখানে বিবেক কোন ছার! সেই যুগে ঠাকুরদা ছেলেকে কিনে দিলেন ক্যামেরা, ঘড়ি, সাইকেল। আজকের দিনেও ইলেকট্রিক ট্রামে-চড়া কোন বাবাই-বা পারেন এক লপ্তে এতগুলি জিনিস কিনে দিতে? মামাবাড়ি ফরিদপুরে, স্বপ্নের মতো একটি খালের পাশে। বিশাল বাগানবাড়ি। অনেকগুলি মামাতো ভাই-বোন। মাছ ধরা, নারকেল গাছে চড়ে ডাব খাওয়া, সাঁতরে এপার-ওপার করা — এসব করতেই তিনটি মাস কাবার।

ঠাকুরদার মতো ছেলেরও লেখাপড়া বিশেষ এগোয়নি। ক্লাস সেভেনে পড়ার সময় একদিন স্কুলের ছেলেরা হইহই করে সুপ্রকাশের বাবাকে ঘাড়ে করে বাড়ি নিয়ে এল। কী ব্যাপার, না ক্লাসে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যায়। সাত মাসে এরকম ঘটনা ঘটল তিন বার। সেকেলে রাশভারি বাবার স্টাইলে রাসবিহারী গলা খাঁকারি দিয়ে হুকুম দিলেন, যথেষ্ট হয়েছে, আর পড়াশুনার দরকার নেই।

সেকাল-একাল বলে কোনো কথা নেই। সব কালেই ক্লাস সেভেনে পড়া, যার ক্যামেরা ঘড়ি সাইকেল আছে, পকেট-ভরতি কাঁচা টাকাও, এমন ছেলের কাছে তো এই আদেশ শিরোধার্য। অতএব ছেলে লম্ফঝম্প শুরু করে দিল।

সুপ্রকাশের খুব হাসি পায়। সত্যভামা ইস্কুলে পড়ার সময় পরীক্ষায় একটা রচনা এসেছিল। যে ঘুমাইয়া রয় তাহার ভাগ্যও ঘুমাইয়া রয়। এটা যেমন সত্যি তেমনি এও সত্যি, যে লম্ফঝম্প করিয়া সময় কাটায় সে কদাপি থিতু হইতে পারে না। বাবারও হল তা-ই। কখনো প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক-কাম-কেরানি, কখনো দলিল লেখক, উকিলের সহকারী, হিসাবরক্ষক, জমিদার-বাড়ির বাজার সরকার—ইত্যাদি। সেকালে পূর্ববঙ্গে অর্ধশিক্ষিতদের জন্য এসব ছাড়া আর কী-ই বা মিলত! পয়সাও তেমন নেই। অসততার সঙ্গে বাক্‌চাতুরি মিশেল দিলে বাড়তি কিছু রোজগার সম্ভব। ও দুটোতেই তিনি ভয়ানক কাবু। হাত পা কাঁপতে থাকে ঠক ঠক করে। ফলত গোটা ছেলেবেলাটা সুপ্রকাশের অ্যানিম্যাল প্রোটিন বিশেষ জোটেনি। মায়ের হাতের রান্না খেয়েছে কেবল। পাতলা মুসুরির ডাল, কচুর শাক, ঝিঙের ঝোল। কালেভদ্রে ডিম খেলেও পুরো নয়, ডিমের অর্ধাংশ। সেই সময় আইকিউ একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছিল। সোজা অঙ্ক বুঝতেও এত সময় লেগেছে যে ক্লাসে নিলডাউন হতে হতে হাঁটুতে কড়া পড়ে গিয়েছিল সুপ্রকাশের। মাস্টারমশাইরা আদর করে নিলু বলে ডাকতেন। তার জের আজও টানতে হচ্ছে। কেউ দুমদাম কথা বলে ফেললে চমকে মুখের দিকে তাকায়। সেই কথাটাই বোঝে একটু লেটে। সিনেমা হলে সবাই যখন হাসে, তার তিন মিনিট বাদে সুপ্রকাশ হাসে। তাই সবাই যখন উপদেশ দেয়, এম.এসসি-টা পড়, তুই পারবি, মাথা আছে, সুপ্রকাশের তখন হাসি পায়। ও ভাবে, শুধু ভাবে নয়, বিশ্বাস করে, প্রথম শ্রেণীর অনার্স নিয়ে সে যে বি.এসসি পাশ করল, সেটা নেহাত ফাঁকতালে। সেই যে জল-ভরা কলসি রাখতে রাখতে পাথরের সিঁড়িতে গোলাকার দাগ পড়ে যায়, এও অনেকটা সেইরকম। তবে বার বার ঘুঘু ধান খেতে পারে না। এম.এসসি দিতে গিয়ে সকলের সামনে ফাঁদে পড়ে যাবে। কী দরকার লোক হাসিয়ে।

তার চেয়ে একটা তাজা বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত ঠুকে দিয়েছিল সুপ্রকাশ। খবরের কাগজে

কিছু সাংবাদিক নেবে। নতুন ধরনের চাকরি বটে। কুড়ি দিন পর জবাব এল।

পরীক্ষার হলে মাথা গুণে দেখল বাইশটি। এক ঘণ্টার প্রশ্নপত্র। তিন চার লাইনের উত্তর। ক্রেমলিন, দশ নং ডাউনিং স্ট্রিট, হোয়াইট হাউস। কলকাতার যানবাহন নিয়ে কুড়ি লাইনের রচনা। বাংলা থেকে ইংরেজিতে খানিকটা অনুবাদ। আবার ইংরেজি থেকে বাংলা। আইকিউ খুব একটা হোঁচট খেল না। এমনকী শিস দিয়ে একটা গানও তুলে ফেলল, মন যে খুশি খুশি আজ —।

মুশকিল হয়েছে এই বাইশটি মাথার মধ্যে উঠতি বয়েসে কে কতটা অ্যানিম্যাল প্রোটিন গিলেছে তার ওপরেই সবকিছু নির্ভর করছে। শুধু কী তাই, বাপ-মায়ের পেটে কতটা বিদ্যে? ঠাকুরদা-ঠাকুরমা, ওদিকে মামাবাড়ি, দাদু দিদিমা। চাই উত্তম হেরিডিটি। অন্তত তিন পুরুষের নিক্তি-মাপ যাচাই। হবে না-ই বা কেন? কত বড়ো কাগজ, নামডাক। আজ যা লেখা হবে কাল অন্তত ষাট লক্ষ লেক্ষ হুমড়ি খেয়ে পড়বে। ষাট লক্ষ বিবেকও নিমেষে চাবুক খেয়ে জেগে উঠবে!

ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে সুপ্রকাশ দেখল বাইশটি মাথা কমে দাঁড়িয়েছে দশটিতে। এখন মাথা উঁচু করে বেরোতে পারলে হয়। বাবার ছিল মাছ ধরার শখ। ছেলেবেলায় দেখেছে ছুটির দিনে গোটা তিনেক হুইল ছিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়তে। এই যাওয়া দেখে মা দুপুরেই বাড়তি কিছু মশলা বেটে রাখত। দু-হাত লম্বা লাল টকটকে রুই কিংবা মৃগেল। কুচকুচে কালো কালবোস। সন্ধ্যা বেলায় এসব দৃশ্য সুপ্রকাশের বেশ পরিচিত। সুতরাং পেটে যে কিছুই পড়েনি তা বোধ হয় ঠিক নয়। না হলে এত দূর পর্যন্ত উঠে এল কীভাবে? নিজের ওপর আস্থা বাড়ছে।

যেন যুদ্ধক্ষেত্র! একটা মানুষের ওপর চারদিক ঘিরে জঙ্গি বিমান হানা। কেউ ছুড়ছে স্কাড, কেউ অগ্নি। বাঁ দিক থেকে ঘাউরি এল তো, ডান দিক থেকে ত্রিশূল। যুদ্ধ একটু থিতিয়ে, এলে খুব সুন্দরপানা এক দীর্ঘদেহী ভদ্রলোক হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, সকালের খাবারকে আমরা কী বলি?

— সকালের খাবার। ব্রেকফাস্ট।

— তা তো বুঝলাম। বাংলায় এক কথায় কী?

সর্বনাশ! কূলে এসে তরী ডুবে যাবে? মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল সুপ্রকাশের। কিছুতেই মনে আসছে না। বাঁচাও চলন্তিকা, সংসদ, এ টি দেব —

শেষে ভদ্রলোকই উত্তর দিলেন, আচ্ছা, যদি প্রাতরাশ বলি?

—হ্যাঁ — হ্যাঁ সুপ্রকাশ লাফিয়ে ওঠে।

দিন দশেক পরেই সকালের ডাকে দুর্দান্ত চিঠিখানা এল। ওদের বংশে প্রথম সংবাদপত্র অফিসে চাকরি। ঝকঝকে তকতকে অফিস। সবকিছুই সাজানো-গোছানো। এক সাইজের টেবিল। গদি-আঁটা চেয়ার। টেবিলে টেবিলে ফোন। সারি সারি নিওন আলো। এক ধারে তিন-তিনটে টেলিপ্রিন্টার মুহুর্মুহু দেশ-বিদেশের খবর উগরে চলেছে। এক বেয়ারা সেগুলি কেটে কেটে গোছ করে চিফ সাবের টেবিলে রাখছে। তিনি তার নব্বুই ভাগ ফেলে দিয়ে মাত্র দশ ভাগ রাখছেন। তার পর তা থেকে খান কয়েক করে প্রত্যেককে দিয়ে বলছেন, নিন, খবর করুন। কাগজের ভাষায় এগুলিকে বলে লুচি-তরকারি। এরপর যত রাত হবে তত আনবে বড়ো আর ভালো ভালো খবর। মাংস, কালিয়া, কোর্মা।

সুপ্রকাশ গোটা চারেক খবর পেল। শেষ দশ জনের মধ্যে নেওয়া হয়েছে ছয় জনকে। তিন জন গেছে রিপোর্টিংয়ে, তিন জন ডেস্কে। আবার ওদের এদিকে এনে এদের ওদিকে চালান করা হবে। আগের দিন নেই। এখন সবাইকে সব কাজের উপযোগী করা হয়। চমকে উঠল সুপ্রকাশ। কুইলনে সকালে খেতে বসে তিন জন অদ্ভুতভাবে মারা গেল। সুপ্রকাশ হেডিং করল, 'প্রাতরাশে প্রাণ গেল তিন।' নিজেকেই এবার তারিফ করে। কাগজের অফিসের জল গায়ে পড়েছে। আগে হলে লিখত, সকালের খাবার খেতে গিয়ে তিন যুবকের মৃত্যু। অদ্ভুত যোগাযোগ বটে!

কিছুটা লেখালেখির পরে ট্রেইনি জার্নালিস্টরা বাড়িতে ফোন করে প্রথম অভিজ্ঞতা জানায় খুব চাপা স্বরে। ছয় জনের মধ্যে ছেলে-মেয়ে আধাআধি। সুপ্রকাশদের ফোন নেই। বাবা নেই। বাবার প্রতি দারুণ কৃতজ্ঞ হল। প্রতিটি মানুষেরই কিছু-একটা শখ থাকা দরকার। এই শখের তাড়নায় সে গান গায়, ছবি আঁকে, ফুটবল খেলে। এই শখ দেখেই একটা মানুষকে চেনা যায়। বাবার শখ ছিল মাছ ধরা। অস্বীকার করা যায় না কিছু তো প্রোটিন শরীরে গেছে। তারই জোরে সে আজ ছ-জনের একজন। দরখাস্ত এসেছিল নাকি তিন বস্তা।

ইভনিং ডিউটি। রাত আটটা নাগাদ নিউজ এডিটরের ঘরে ডাক পড়ল। অজয়বাবু প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলে বেশ কিছু জেনে নিলেন। হেডিংয়ের ওপর নজর দিতে বললেন। একটা ম্যাড়মেড়ে খবরও হেডিংয়ের জোরে উতরে যায়। লোকে পড়ে। না হলে খবরটা বৃথা। মাইন্ড দ্যাট, আমাদের কাগজের পাঁচ সি এম জায়গার কিন্তু অনেক দাম। এটা কার?

আরে, এর মধ্যেই কম্পোজ হয়ে চলে এসেছে নিউজ এডিটরের টেবিলে! ধবধবে সিল্কের মতো কাগজে ঝকঝকে ছাপা। অতখানি লেখা কতটুকু হয়ে গেছে। সুপ্রকাশ বলল, আমার।

— ভালো হেডিং। তবে কুইলনের খবর এত বড়ো কেন? — এই বলে অজয়বাবু ডট পেন দিয়ে শেষের দিকটা কেটে দিলেন।

নিজের টেবিলে এসে বসতে না বসতেই চিফসাব বললেন, পয়লা দিনেই প্রশংসা, সবাইকে চা খাওয়াও!

সুপ্রকাশ একটু অবাক হয়। ঘেরা ঘরে অজয়বাবু বললেন, আর এর মধ্যেই চাউর হয়ে গেল।

— হবেই তো। তুমি খবরের মগডালে বসে আছ। — চিফসাবের মুখে মৃদু হাসি। মনে রেখো, খারাপ খবর আরও দ্রুত ছড়ায়। জায়গাটা বড্ড ছোটো।

রাত বারোটা নাগাদ গাড়ি চড়ে বাড়ি ফিরল। সিনিয়র সুধাংশুবাবু বললেন, তোমরা কোম্পানির সুসময়ে এসেছ হে। আগের দিন হলে হরিমটর চিবিয়ে টেবিল জোড়া দিয়ে ফাইল মাথায় শুয়ে থাকতে হত।

তিন মাস পর সুপ্রকাশ গেল রিপোর্টিংয়ে। এখানে আর এক মজা। ঘর আগলানো থেকে বাইরের কাজে। ফুটবলে যেমন ডিফেন্স আর অফেন্স। ক্রমাগত গোল রুখে যাও। কোনও নাম নেই। আর অফেন্সে মারকাটারি একটা গোল দিলেই সাপোর্টাররা মাথায় তুলে নাচবে!

অজয়বাবু তত দিনে 'অজয়দা' হয়েছেন। বললেন, ক্রিকেট সম্পর্কে কোনো আইডিয়া আছে?

— আছে।

— দ্যাটস গুড। ভালো সাংবাদিক হতে হলে কোনো ব্যাপারেই না বলতে নেই। কাল

ইডেনে শুরু হচ্ছে ভারত-অস্ট্রেলিয়া ওয়ান ডে। কলকাতার একটি ছেলে প্রথম খেলছে। ওর দিকে একটু নজর রেখো। হ্যাঁ, আটটা নাগাদ বাড়িতে গাড়ি যাবে। স্মার্ট লেখা না হলে কপি কিন্তু ছুঁড়ে ফেলব।

অজয়দা ভালো কথা বলেন। সবদিকে নজর। কার কোথায় অসুবিধে সেটা যেন আগে থেকেই বুঝতে পারেন। নতুনদের পক্ষে খুব হেল্পফুল। নিশ্চয়ই ছেলেবেলায় এ-গ্রেড অ্যানিম্যাল প্রোটিন খেয়েছেন। তাঁর বাপ-ঠাকুরদাও তাই। উত্তর কলকাতার বনেদি বাড়ি। দুর্দান্ত হেরিডিটি!

জমজমাট ইডেন। ক্লাব হাউসের পাশেই প্রেস বক্স। বিভিন্ন কাগজের সাংবাদিকরা নোটবই নিয়ে রেডি। কলরব মুখর চারদিক। ভারত টসে জিতে ব্যাট করছে। দশ দিন আগে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়ে গেছে। ইডেন তাই আরও সবুজ। শুরুটা ভালো হল না। দুটো উইকেট পর পর পড়ে গেল। টু ডাউনে এল কলকাতার ছেলে আকাশ মিত্র। প্রথম ওভারটা দেখে নিল। দ্বিতীয় ওভারেই পর পর দুটো চার। তেতে উঠল ইডেন। সাধারণত দেখা যায় বাঙালি ছেলেরা কলকাতায় খেলতে নেমে বড্ড টেনশনে ভোগে। কুড়ি বাইশ করেই আউট। নবাগত ফুটফুটে আকাশ অবাক করল। আটটা চার, দুটো ছয় মেরে ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেল তেষট্টিতে। এবার বিশেষজ্ঞদের মতামতে কান ঝালাপালা। কেউ বলছে, ছেলেটা দাঁড়িয়ে যাবে। পাক্কা ওয়ান-ডে টেম্পারামেন্ট। আর একজন বলল, দেখেছেন, ঠিক মুস্তাক আলির স্টাইল। টেস্টেও ঢুকল বলে।

আশিতে পৌঁছে আকাশ মিত্তিরকে আর রোখা গেল না। অস্ট্রেলিয়ানরা চোখে সর্ষেফুল দেখছে। সবুজ প্রান্তর তছনছ। ফাস্ট বোলিং চুরমার করে সেঞ্চুরি। খেলেছে মাত্র নব্বুইটি বল। ইডেন জুড়ে কাঁসরঘণ্টা। চিৎকার। বেলুন। বাইরে বোমার শব্দ। এরমধ্যে হঠাৎ এক কাণ্ড। একটি মেয়ে, অষ্টাদশী, সুন্দরীও বটে, ফেনসিং টপকে ছুটে গিয়ে আকাশ মিত্তিরের গালে চকাং করে এক চুমু। সঙ্গে সঙ্গে হাততালি আর সিটি। পুলিশ তেড়ে গেল।

শোনা গেল বাজি ধরেছিল নাকি বন্ধুদের সঙ্গে। সাহস আছে বটে! ইডেন উপছে পড়া দর্শক। ভারত জিতেও গেল। কলকাতার ছেলেটাই ম্যান অব দি ম্যাচ। পর দিন সব কাগজে ফলাও করে বের হয় মশলা সহযোগে। রসাল করে। এ পর্যন্ত ঠিক আছে। সুপ্রকাশ তার পরেও লিখল, এই ডিসেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার মহিলা ক্রিকেট দল আসছে। ইডেনেও হবে ওয়ানডে। সেখানে শিপ্রা সোমের খুবই চাল। তো শিপ্রা সেঞ্চুরি করলে ক্রিকেটমোদি কোনও তরুণ যদি আপেল গালে চুম্বন এঁকে দেয়, তা হলে কি এরকমই হাততালি পড়বে? না হতভাগ্য তরুণের পিঠে ভাঙবে পুলিশের লাঠি?

হইহই পড়ে গেল অফিসে। কেউ বলল, রসিক আছে ছেলেটা!

চিফ সাব বললেন, কোন দোকানের চাল খাও হে?

সুপ্রকাশ মনে মনে বলে, আজ্ঞে, শুধু চালে নয়, গভীর জলের রুই কাতলা কালবোস। বাবা কোনো দিন মাছ না ধরে বাড়ি ফেরেনি।

অজয়দা পর্যন্ত হেসে ফেললেন, বুঝতে পেরেছি, ডিসেম্বরেও ক্রিকেট কভার করার মতলব। তবে গপ্পো ফাঁদা চলবে না।

কাগজের অফিসটা খুব ভালো লেগে গেল সুপ্রকাশের। প্রায় সবার সঙ্গেই এখন চেনাজানা। বন্ধুত্বও হয়ে গেছে কারও কারও সঙ্গে। কোনো কোনো দিন খুব কাজ। মাথা তোলা যায় না। আবার চাপ না থাকলে আড্ডা। গল্পগাছা। ক্যান্টিনে অনেকেই তখন চা খেতে ডাকে। ওদের

কাগজে ফি সোমবার কলকাতার হালচাল নিয়ে পাতা বেরোয়। সেখানেও সুপ্রকাশ 'রোমান্টিক কাবুলিওয়ালা' লিখে রীতিমতো সাড়া ফেলে দিল। নুর খাঁ বাঙালি মেয়ের প্রেমে যে হাবুডুবু তাই নয়, টাকা ধার দিয়ে সুদ চাইতে ভুলে যায়। বিশ্বের অষ্টম আশ্চর্য, পাহাড়ি সুরে রবীন্দ্রসংগীত পর্যন্ত গায়, 'হে ক্ষণিকের অতিথি, এলে প্রভাতে, কারে চাহিয়া —।'

এই অফিসে একটাই শুধু বিপদ, যখন নিরাপদ সাঁতরার গাড়িতে ওঠে। হাওড়ায় বাড়ি। সারাক্ষণ বকবক করে। দারুণ স্বাস্থ্য। বয়েস কুড়ি-বাইশ। ভয়ংকর জোরে গাড়ি চালানোর বদ অভ্যেস। রাত্রে স্টিয়ারিং ধরে অনেকসময় ঘুমিয়ে পড়ে। চোখেমুখে জল দিতে বললে আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। রীতিমতো ধমক দেয়, চুপ করে বসুন তো। আমার কাজ আমি বুঝব।

এর-ওর কাছে যা শুনি তাতে আমাদের মুখগুলি শুকিয়ে যায়। একদিন ডিভাইডারের ওপর গাড়ি তুলে দিয়েছিল। লাইট পোস্টের সঙ্গে ধাক্কা লাগে লাগে গুরুসদয় দত্ত রোডে। রাত দুটোয় ফাঁকা রেড রোড পর্যন্ত নিরাপদ, আর একটা গাড়ির পেছনে ধাক্কা কষায়। ওই গাড়ি থেকে জনা কয়েক নেমে পড়তেই বীরপুরুষ নিরাপদ দরজা খুলে ভোঁ দৌড়। বোধ হয় যৌবনের মিলখা সিংও অত জোরে ছোটেনি। গাড়িতে ছিল দুই অসহায় সহ সম্পাদক। পকেট ঝেড়ে শ'পাঁচেক টাকার বিনিময়ে কোনো গতিকে তাদের পিঠের চামড়া বাঁচে।

অন্ধকারে কোথাও লুকিয়ে ছিল নিরাপদ। অবস্থা নিরাপদ বুঝে ফিরে এসেই হম্বিতম্বি, পাঁচ-শো টাকা এই বাজারে দিয়ে দিলেন?

— তুমি কোথায় পালিয়েছিলে হে?

— আজ্ঞে না স্যার, লোক ডাকতে গিয়েছিলাম।

— রাত দুটোয় গড়ের মাঠে লোক ডাকতে? ইয়ার্কি মারার জায়গা পাওনি?

নিরাপদ গম্ভীর মুখে হুড খুলে কলকব্জা পরীক্ষা করে। এখন ওর হাতেই তো দু-টি প্রাণ।

মুশকিল হয়েছে নাইট ডিউটি হলেই নিরাপদর গাড়ি সুপ্রকাশের জন্য বরাদ্দ হয়। ক্ষীণ স্বরে প্রতিবাদ করলে ভেহিকলস ইনচার্জ সুধীরবাবু বলেন, বুঝছেন না কেন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে গাড়ি গ্যারাজ করে ও বাড়ি যাবে। অ্যাই নিরাপদ, ভালো করে চালাবি। কমপ্লেন হচ্ছে —।

ঘুম চোখে এসে নিরাপদ স্টিয়ারিং ধরে। সুপ্রকাশ সিঁটিয়ে থাকে। হা কপাল, জলের ঝাপটা দেওয়াটা যেন খুব অপমানের।

মুড এসে গেলে খুব কথা বলতে থাকে। তাতে আরও বিপদ।

সুপ্রকাশদের পাড়ায় বহু পুরোনো একটি পাগল আছে। সে সারাদিন সারারাত ঘুরে বেড়ায়। গায়ের রং কালো। কুকুররা ওর খুব ভক্ত। ও যেদিকে যায় অন্তত গোটা পাঁচেক নেড়ি কুকুর লাইন দিয়ে সেই দিকে যায়। রাতে গাড়ি চড়ে ফিরতে কত বার এই দৃশ্য দেখেছে! কখনো পাগলটা রাস্তার ধারে ঘুমিয়ে থাকে। কুকুরগুলিও তখন কুণ্ডলী পাকানো। আবার বৃষ্টির রাতে অঝোরে ভিজছে। শীতে কুঁইকুঁই করছে ময়লা ছেঁড়া জামা গায়ে। সুপ্রকাশের মনে হয় ওর কি বাড়িঘর নেই? মা-বাবা নেই? তবে কামানো মাথা দেখে বোঝা যায় পাগল হলেও কেউ-না-কেউ আছে। উকুনের জ্বালায় ছটফট করতে দেখলে তিনিই পরামাণিক ডেকে চুল কেটে দেন।

সে-রাতেও কুকুরবাহিনী নিয়ে চলেছে পাগলটা। হঠাৎ খুব শান্ত গলায় নিরাপদ বলে, যদি কিছু না মনে করেন, তা হলে অল্প একটু ধাক্কা দেব।

— কাকে?

— ওই পাগলটাকে।

— কেন?

— গায়ে কিচ্ছু নেই। এক ধাক্কায় ভবলীলা সাঙ্গ।

— তোমাকে এই গুরুদায়িত্ব কে দিল?

— কেউ দেয়নি স্যার। আমি নিজেই নিয়েছি। পাগলদের দুঃখ আমি বুঝি। আমার বাবাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে হত। একদিন ফাঁক পেয়ে পালিয়ে যায়। আমরা তিন ভাই খুঁজে খুঁজে হয়রান।

সুপ্রকাশ প্রমাদ গোনে। চাকরি পাকা হয়ে গেছে। পাঁচ দিনের ছুটিতে কাল ভোরের বাসে মাকে নিয়ে দীঘা যাবে। এদিকে এক উটকো বিপদ এসে হাজির। পাগল আর গাড়ির মাঝখানে বাফারল্যান্ডে পাঁচটা নেড়ি কুকুর। নিরাপদ গতি আস্তে করেছে। হেড লাইট কখনো জ্বলে, কখনো নেভে। নিঝুম পাড়া। ওর মতলব সুবিধের নয়। সুপ্রকাশ চিৎকার করে ওঠে, অ্যাই, কী হচ্ছে?

— ঘাবড়াবেন না স্যার। আমি ওর উপকারই করছি। জানেন, আমার বাবাকে তাক করে পাজি ছেলেরা আধলা ইট ছুঁড়ত। বাবার গা দিয়ে রক্ত ঝরতে দেখলে ওরা দাঁত বার করে হাসত। কোনো ছেলে এসব সহ্য করতে পারে, বলুন?

সুপ্রকাশ কাঁধে হাত রাখে, যাই হোক, আমাদের পাড়ার পাগল, প্রাণে মেরো না!

কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে দেয় নিরাপদ, আপনারা শিক্ষিত মানুষ, এসব হল দুর্বলতা! আমি এ-পর্যন্ত তিনটি পাগলকে মেরেছি। আপনাদের কাগজেই লিখেছিল, গাড়ির ধাক্কায় পাগল হত, ড্রাইভার পলাতক। — অন্ধকারে একটু দাঁতও দেখা গেল।

— তুমি খুনি?

— তা বলতে পারেন। আমার বাবাকেও যদি কেউ মেরে ফেলত আমি খুশি হতাম। জানেন, এক-একসময় চোখ ফেটে জল আসে! চার বছর হয়ে গেল বাবার কোনো খবর নেই!

দরজায় গাড়িটা ব্রেক করতেই লাফ দিয়ে নেমে সুপ্রকাশ মধ্যরাত্রি চিরে চিৎকার করে ওঠে, মা — মা —।

দূর থেকে খুনি গাড়ির হর্ন ভেসে আসে। সেই সঙ্গে রাতপাখির ডাক।

এখন অফ সিজন। নিউ দীঘায় একদম ভিড় নেই। সমুদ্রের দিকে হাঁটতে দেখলে হোটেলওয়ালারা হাত ধরে টানাটানি করে। মার জন্যে হোটেল চলবে না। অফিসের হলিডে হোমটা চমৎকার। সমুদ্রের ধারে গোল পাতার এক চায়ের দোকানে বসল। সকাল দশটার নীল সমুদ্র ঝিকমিক করছে। এখানে ঢেউ নেই, ঢেউয়ের বিস্তারও নেই। ফিসফিস করে কেউ বলছে, ঘোড়ায় চড়বেন? কেউ দা বাগিয়ে ডাবে কোপ মারার ভঙ্গি করে। অফ সিজন যে।

বাবার কথা মনে পড়ে সুপ্রকাশের। সারা জীবন কষ্ট করে গেল শুধু মাছ ধরার মুহূর্তগুলি ছাড়া। বিকেলে পুকুরের পাশে মোড়া পেতে বাবা যেন রাজার মতো তাকিয়ে থাকত ফাতনার

দিকে। সেইসব দিনের কথা সুপ্রকাশের স্পষ্ট মনে আছে।

সাইকেলের ক্রিং ক্রিং আওয়াজে সুপ্রকাশ লোকটিকে কাছে ডাকে। সেদিনের খবরের কাগজটা কেনে। হ্যাঁ, নিজেদের কাগজটাই। এখন মনে হয় না খেয়ে একদিন থাকা যায়, কিন্তু কাগজ ছাড়া এক মুহূর্ত নয়। এমনই নেশা!

হঠাৎ তিনের পাতায় চমকে ওঠে একটি পরিচিত চেহারা দেখে। চোদ্দো পয়েন্টের শোক সংবাদ। তলার নিরাপদ সাঁতরার ফটো। গভীর রাতে বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে লাইট পোস্টে মোটর গাড়ির ধাক্কায় চালকের মৃত্যু। টহলদার পুলিশ লগবুক দেখে যুবকটির পরিচয় পায়। খবরটি পড়ে সুপ্রকাশ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। পরক্ষণে নীল সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে অল্প একটু দুঃখ অনুভব করে। ডেস্কে থাকলে মামুলি হেডিং কেটে লিখত, 'দধীচি'।

মৃদুলার বুধবার

মানব চক্রবর্তী

মাস্থলি ইনকাম স্কিমের পাশ-বইটা খুঁজছিল মৃদুলা। গত মাসে টাকা তুলে আলমারিতে রেখেছিল। পেল না। না পেয়ে সে ফ্রিজের ওপর ঠিক স্টেবিলাইজারটার পাশে জমে-থাকা পুরোনো কাগজপত্রগুলো খুঁটিয়ে দেখল। না, ওখানেও নেই। দেয়ালের তাকে ক-টা বই, তার পাশে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন। পুরোনো। না, পাশবই নেই। আশ্চর্য, যাবে কোথায়! এভাবে খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ তাকের কভারের নীচে সে হঠাৎ খুঁজে পেল দুটো র‍্যাশন কার্ড। একসঙ্গে পিন করা। তার ও সায়নের। তখনই মৃদুলা বুঝতে পারল র‍্যাশন কার্ড মানেই একটা উটকো ঝামেলা। গত ছ-সপ্তাহ র‍্যাশন তোলা হয়নি।

শহরের মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবী মানুষ ক-জন র‍্যাশনের চাল খায়? তবু ওটা বাঁচিয়ে রাখতে হয়। নানা কাজে লাগে। ছয় সপ্তাহ তোলা হয়নি মানে ওটা ল্যাপ্‌স হয়ে যাবে বা ইতিমধ্যে হয়তো গেছেও। মৃদুলা চিন্তায় পড়ল। তার কারণ আরও একটা কাজ বাড়ল। আজকেই এক বার র‍্যাশন কাউন্টারে যেতে হবে।

সকালে এখন কাজের তাড়া। ঘুম থেকে উঠেই সে দুধ আনতে গিয়েছিল। কাছেই। কিন্তু সবাই আজকাল খাটাল থেকে নিজের চোখে দোহনপর্ব দেখে দুধ নিতে চায়। ভিড় ছিল। ফলে বেশ কিছুটা দেরি। ফিরে চা করেছে। নিজে খেয়েছে এবং সায়নও। আটটার মধ্যে সায়ন পড়তে যাবে প্রাইভেট টিউটরের কাছে। ওর টিফিন করে দিতে হবে। তার পর দ্রুত হাতে রান্না সারতে হবে। নিজের জন্য কিছু একটা টিফিনও, যেটা মৃদুলা ইস্কুলে নিয়ে যায়। তার পর চান সেরে ভাত খেয়ে মৃদুলা বেরিয়ে পড়বে ইস্কুলে। সায়নের খাবার ঢাকা দেওয়া থাকবে। ও টিউশানি থেকে বাড়ি ফিরে নিজেই খেয়ে নেবে। ওরও তো ইস্কুল আছে। তবে ওর ইস্কুলটা অন্য। ছেলেদের ইস্কুল। এ-বার মাধ্যমিক দেবে সায়ন।

এতসবের মধ্যে ঘরের কাজকর্মও তো কম নয়। ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা ইত্যাদি। না, কাজের লোক নেই মৃদুলার। নিজেই করে। আসলে অনেক খুঁজেও সে তার পছন্দমতো কাজের লোক পাচ্ছে না। সে চায় সহায়সম্বলহীন বয়স্কা মহিলা। রান্না করবে, ঘরের সব কাজকর্ম এবং সায়নকে খেতে-টেতে দেওয়া ইত্যাদি। কিন্তু তেমন লোক এ-তল্লাটে পাওয়া যায় না। যুবতী কিছু ঝি-গোছের মেয়ে এ-পাড়ায় কাজ করতে আসে। না, ওদের পছন্দ নয় মৃদুলার। সায়ন বড়ো হচ্ছে। একা ঘরে তাকে অনেকটা সময় কাটাতে হয়। মৃদুলা এদিকে খুব সজাগ। তার চেয়ে নিজে কষ্ট করা ভালো।

বাড়িতে তো দুটো প্রাণী। মৃদুলা ও সায়ন। মা ও ছেলে। তবু কাজ কম নয়। এরমধ্যে আবার র‍্যাশন তোলার ঝামেলা।

র‍্যাশন কার্ডদুটো হাতে নিয়ে, সেটা খারিজ হয়ে গেছে কি না বা হবে কি না ভাবতে ভাবতে মৃদুলা ভুলেই গিয়েছিল পাশ বইটার কথা। মনে পড়ল যখন, দুটো চিন্তার যুগপৎ চাপে কীরকম একটা অসহায় অস্থিরতা ঘিরে ধরল।

তখনই সায়ন সামনের ঘর থেকে বলল — 'খেতে দাও, দেরি হলে বিমানস্যার রাগ করেন —'।

চমকে গ্যাসের দিকে তাকাল মৃদুলা। দুধ বসিয়ে সে পাশ বই খুঁজতে এসেছিল, দেখল দুধ উপচে গ্যাস নিভে গেছে। দ্রুতহাতে নব বন্ধ করল মৃদুলা। তার পর বাটিতে গরম দুধ চিনি ঢেলে রাতের দুটো রুটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে তাতে ফেলল। একটা চামচ নিয়ে, আঁচল দু-ভাঁজ করে, ধরে বাটিটা নিয়ে এল — গরম, একটু বেশিই গরম।

'নে, চটপট খেয়ে নে —'।

'দুধ-রুটি! ধুত্ —'! মুখ বেঁকিয়ে অপছন্দ জানান দিল সায়ন, তার পর বলল 'একটু চাউ বা ম্যাগি করে দিতে পারো না? দুটো পরোটার সঙ্গে একটু ঝাল ঝাল আলুর তরকারি!'

মৃদুলা একটু দুঃখ পেল, বলল, 'ওমা, সকালে কাজের কত তাড়া, অত সময় কই?'

'চাউ বা ম্যাগি বানাতে আবার সময় লাগে নাকি! ওটা ফাস্ট ফুড—!'

মৃদুলা এ-বারে আত্মসমর্পণের মতো বলল 'নেই, আজ বিকেলে ফেরার পথে কিনে আনব —'।

ভেবেছিল প্রসঙ্গটা বুঝি শেষ হল। তা নয়। সায়ন দুধ-রুটি খেতে-খেতে সামনে ফিজিক্স বইয়ের খোলা পাতার দিকে চেয়ে বলল — 'তুমি আজকাল শুধু সময়ের দোহাই দাও। শোনো মা, সময় কারো নেই, থাকে না, ওটা বার করে নিতে হয় —', বলেই সে মৃদুলার চোখে চোখ রাখল — 'বার করে নিতে জানতে হয়'।

মৃদুলা ভেতরে ভেতরে চমকে উঠল। একটু ভয়ও হল কি? সায়নের কথাবার্তা ঠিক ওর বাবার মতো। এভাবেই তো দীপেন্দু কথা বলত। চোখে চোখ রেখে। একটা সামান্য ব্যাপারকে খুঁচিয়ে ঘা করে পরোক্ষে মৃদুলাকেই রক্তাক্ত করত।

ধমক দিতে পারত মৃদুলা। দেওয়া উচিত। অন্তত ওর মধ্যে দীপেন্দুর ছবিটা জেঁকে বসার আগেই তা উৎপাটনের চেষ্টাটা থাকা উচিত। কিন্তু তা পারল না। মৃদুলার কাছে সায়ন বড়ো দুর্বল জায়গা। ওকে আজকাল বকতে ধমকাতে ভয় লাগে। ও বড়ো হচ্ছে। বাবা-মা'র বিচ্ছিন্নতার মাঝে বড়ো-হওয়া ছেলের মন-মানসিকতা বড়ো জটিল।

সায়ন এখন ষোলো। ওর বারো বছর বয়েস থেকেই মৃদুলা একা। ডিভোর্সি। ছেলেকে বুকে আগলে সবে চারটে বছর পেরিয়েছে। মাতৃস্নেহ নিংড়ে সায়নকে বাবার অভাব বুঝতে দেয়নি। এ-ভাবেই বারো থেকে ষোলো, ষোলো থেকে ছাব্বিশ, ক্রমশ বড়ো হবে সায়ন। অথচ সে আর একটা মৃদুলা না হয়ে যদি আর একটা দীপেন্দু হয়ে ওঠে? ব্যাপারটা ভাবতেই বুকের মধ্যে মৃদু একটা যন্ত্রণা অনুভব করল মৃদুলা। আজকাল সায়ন মাঝেমধ্যে রেগে গেলে কেমন যেন তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে তাকে। ছেলেটা চাপা স্বভাবের। মুখে ততটা বলে না যতটা চোখ বলে। তবে কি সায়ন ক্রমশ অচেনা হয়ে উঠছে!

সকালটা বিরস মনে হচ্ছিল মৃদুলার। সারাদিনের একটার পর একটা কাজ যাতে বোঝা হয়ে চেপে না বসে তার জন্য মানসিক যে প্রফুল্লতার দরকার, সেটা না থাকায় দারুণ একটা অসহায়তা কুরে খাচ্ছিল।

তখনই ফের মনে পড়ল পাশবইটার কথা। মৃদুলা সরে এল। আলমারির পাল্লা খুলে অল্প খুঁজতেই দেখল একটা ফাইলের নীচে চাপা-দেওয়া গোলাপি রঙের পাশবইটা। ইস, এত কাছে, তবু এত ভোগাল!

সায়ন হাত বাড়িয়ে বলল 'দেখি—'।

মৃদুলা এগিয়ে দিল। সায়ন চোখ বুলিয়েই বলল 'ছেষট্টি হাজার! অনেক টাকা তো—'।

'হ্যাঁ, মাঝে মাঝে সাত-শো পনেরো টাকা দেয়, ছ-বছর পরে পুরো টাকা টেন পার্সেন্ট ডিভিডেন্ড-সহ ফেরত —'।

সায়ন মুখ বাঁকাল — 'হুঁঃ সাত-শো পনেরো! তোমার তো চাকরি আছে, বরং টাকাটা তুলে আমাকে একটা হিরো-হন্ডা মোটরবাইক কিনে দাও। সাইকেল ঠেঙিয়ে টিউশনি যাওয়া যে কী কষ্ট!'

মৃদুলা এবারে কঠিন হল, পাশবইটা হাতে নিয়ে বলল — 'না, এখন মোটরবাইকে চেপে ঘোরার সময় নয় — বড়ো হ, নিজের পায়ে দাঁড়া, তার পর যত ইচ্ছে মোটর বাইক চেপে ঘুরিস —'।

সায়ন খুশি হল না। মৃদুলা এবারে নরম স্বরে বলল — 'তা ছাড়া মানুষ টাকা জমায় তো ভবিষ্যতের কথা ভেবেই —'।

'হুঁঃ ভবিষ্যৎ —', বলেই সায়ন এমনভাবে মৃদুলার দিকে তাকাল যেন কথাটা তার মুখে বড়ো বেমানান।

কিছু বললে না হয় উত্তর দেওয়া যেত, কিন্তু ওই দৃষ্টির উত্তরে কী বলা যাবে ভেবে পেল না মৃদুলা, সে পাশবইটা যথাস্থানে রেখে সশব্দে আলমারি বন্ধ করল। তারপর ঘড়ির দিকে চেয়ে বলল — 'আটটা বাজতে দশ—'।

সায়ন চলে যেতেই মৃদুলা ফোন করল প্রিন্সিপালের বাড়িতে। নিরুপম গুপ্ত। মৃদুলাকে তিনি স্নেহ করেন। হয়তো একটু বেশিই। সবসময় সেটা অবশ্য মৃদুলার ভালো লাগে না। স্নেহ পাওয়ারও তো একটা বয়েস থাকে।

'স্যার, আজ ইস্কুলে আসতে আমার একটু দেরি হবে, র‍্যাশন তুলে ঘরে রেখে আসব, ফার্স্ট পিরিয়ডটা টিফিনের পরে নেব—'।

নিরুপমবাবু হেসে বললেন 'ঠিক আছে, আসবেন কিন্তু —', 'হ্যাঁ হ্যাঁ আসব, আসলে এগারোটায় র‍্যাশন কাউন্টার বন্ধ হয়ে যায় কিনা।'

'ঠিক আছে, তবে কিনা এসব কাজ তো ছেলেকে দিয়েও করাতে পারেন, একা মানুষ আপনি কত দিক সামলাবেন — তা ছাড়া ছেলে যখন বড়ো হয়েছে—'

একটু চুপ করে থেকে মৃদুলা বলল 'দেখতেই বড়ো' তার পরেই হঠাৎ জিভে এসে গিয়েছিল, 'বাবারই চেহারা পেয়েছে তো' কিন্তু অতি কষ্টে তা দমন করে ফের বলল — 'মাধ্যমিক দেবে তো, পড়াশুনার চাপ আছে, আমি ওকে অন্য দিকে ব্যস্ত করতে চাই না —'

কথাটা বলতে পেরে মৃদুলা একপ্রকার সন্তোষ লাভ করল। আনমনে একটু হাসল, তখনই ওপ্রান্ত থেকে সম্ভবত স্নেহাধিক্যেই নিরূপমবাবু বলে উঠলেন, 'মায়ের কাছে ছেলেরা চিরকাল ছোটোই থাকে, তাই না! ঠিক আছে, দেরি হলেও আসবেন, শুনেছি আপনার সিলেবাস অনেকটা বাকি আছে —'।

ফোন ছাড়তে গিয়েও ছাড়ল না মৃদুলা। সে চায়নি সিলেবাসের প্রসঙ্গটা এসে পড়ুক। নিজের ওপর আস্থাটাই নিরূপমবাবুকে জানিয়ে দেওয়ার মতো করে বলল — 'না... না... তেমন কিছু নয়, ঠিকসময়ে শেষ হয়ে যাবে—'।

ফোন ছেড়েই মৃদুলা রান্নাঘরে। ফ্রিজ থেকে কাঁচা মাছ-তরকারি বার করেই বটি নিয়ে

উঠোনে। ঘড়ির দিকে চাইল। সাড়ে আট। চোখ গেল ক্যালেন্ডারে। আজ বুধবার। এই প্রথম তার বুকটা একটু শিরশির করে উঠল। কত কাজ বাকি, কত তাড়াহুড়ো — এক লহমার জন্য সব যেন স্থগিত। মৃদুলা আকাশের দিকে চাইল। গভীর নীলের মাঝে দোপাটি-থোকা সাদা মেঘ। উঠোনে শিশু গাছের তেরছা ছায়া। নীচে, ঘাসের বুকে একটা বাহারি প্রজাপতি। পাতা খুলছে এক বার, জুড়ছে এক বার। বসছে না।

মৃদুলা দীর্ঘশ্বাস ফেলল গোপনে। গোপন? ফাঁকা ঘরের এই গোপনীয়তাটুকু যেন নিজের কাছে নিজেকে কেমন অপরিচিত করে তুলল।

রান্না শেষ। চান সেরে শাড়ি বদলে মৃদুলা ড্রেসিং টেবিলের সামনে। বুকে গলায় পাউডার দিয়ে খোপাটা তুলে বাঁধল। শাড়ির পাড় ও ব্লাউজের রং হালকা গোলাপি। নিজেকে আয়নায় দেখলেই আজকাল কেন যেন মৃদুলার বয়সটা মনে পড়ে যায়। ছত্রিশ। বুক ঠেলে-ওঠা যন্ত্রণাটা মুখে চোখে ছড়িয়ে গিয়ে স্নিগ্ধ জোছ্না-মাখা আলো হয়ে দু-চোখের তারায় ফুটে উঠল। ইতিহাসের মোহরদি প্রায়ই বলেন 'তুই আবার বিয়ে কর মৃদুলা, কিছুই হারায়নি তোর—'।

কথাটা মনে মনে বার দুই আউড়ে মৃদুলা বুঝল ওতে তার যন্ত্রণার উপশম লেখা নেই, উপরন্তু কেন যেন গলার কাছটা ভারী হয়ে এল, সে তখন নিজেকে শোনানোর জন্যই বুঝি স্বগতোক্তির মতো বিড়বিড় করে উঠল — 'বড়ো ভয় করে, সায়নের চোখের ভাষা আমি আজকাল বুঝতে পারি না—'।

সরে বেরুতে যাবে এমন সময় গেটের কাছে একটা স্কুটার থামার শব্দ হল। হিমাদ্রি ঘোষাল। লোকটাকে দেখামাত্র দুঃসহ বিরক্তিতে ছেয়ে গেল মন। দীপেন্দুর একসময়ের বন্ধু। এ-পাড়াতেই থাকে। তবু মুখে যথাসম্ভব হাসি ঝুলিয়ে মৃদুলা বলল 'আসুন, কী ব্যাপার!'

হিমাদ্রি ঘোষাল ঘরে ঢুকেই সোফায় বসল পা ছড়িয়ে। নিজের তাড়া প্রকাশ করতে মৃদুলা কেঠোহাসি হাসল — 'একটু বেরোচ্ছিলাম' —'ও আচ্ছা... তাহলে কাজের কথাটা সেরে নিই। আগামী আঠারো তারিখ, রোববার, আমাদের ক্লাবের বাৎসরিক ফাংশান। আপনাকে কিন্তু উদ্‌বোধনী সংগীত গাইতে হবে—'।

মৃদুলা সঙ্গে সঙ্গে নাকচ করার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল — 'না... না... আমি গান ছেড়ে দিয়েছি, আপনি বরং অন্য কাউকে—'।

হিমাদ্রি ঘোষাল নাছোড়। 'সে বললে হয়! আপনার গান তো আমি শুনেছি, অমন গলা, আহা...গড-গিফটেড, — সে যাই হোক পাড়ার ফাংশান আপনি দয়া করে না করবেন না'।

মৃদুলার চোয়ালে ভাঁজ দেখা দিল, সে শক্ত গলায় বলল 'শুনুন গান গাওয়ার অধ্যায় শেষ — আমি আর গাই না, আপনার অনুরোধ রাখতে না পারায় দুঃখিত।'

কথাটা এভাবে বলতে পারবে নিজেই ভাবেনি মৃদুলা। বলেই মনে হল একই পাড়ায় বাস, তা ছাড়া ক্লাব-টাব করা লোকজনেরা ঠিক সুবিধের নয়। মৃদুলা এবারে হেসে সামান্য প্রলেপ-দেওয়া স্বরে বলল, 'আসলে কী বলব, আমার নিজেরই অনেক সমস্যা'।

ব্যস্, কথা নয়, যেন একটা অস্ত্র তুলে দিল লোকটার হাতে। হিমাদ্রি ঘোষাল পা নাচিয়ে আড্ডার মেজাজে মুখে চুক চুক শব্দ করে বলল, 'আমি জানি, দীপেন্দু একটা স্কাউন্ড্রেল।'

প্রসঙ্গটা এভাবে এসে পড়ায় বিচলিত বোধ করছিল মৃদুলা, তার অস্থিরতা বাড়ছিল, সে

দরজার তালা হাতে নিয়ে এক পা এগোতেই হিমাদ্রি ঘোষাল ফের বলল, 'সেদিন দেখলাম, নতুন বিয়ে করেছে, বউটা নাকি কোন অফিসে চাকরি করে'।

মৃদুলার শরীর গোলাচ্ছিল, তবু সে পেছিয়ে এল। ভাবছিল আগ্রহ প্রকাশ করা ঠিক হবে কি না। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে কর্কশ কাঁপা তেজালো স্বরে বলে উঠল, 'এসব আমাকে বলছেন কেন? আমার জানার কোনো দরকার নেই, ওই লোকটা আমার কাছে এখন মৃত'।

হতচকিত হিমাদ্রি বোকার মতো হেসে, পরক্ষণেই ঘাড় নাড়ল বিজ্ঞের মতো, তারপর তালাচাবি হাতে মৃদুলাকে এগোতে দেখে সোফা ছেড়ে উড়ে দাঁড়াল, মিয়োনো স্বরে ফের বলল, 'আমাদের ফাংশানে —'।

'সরি, গান আমি আর গাই না —' শীতল, কাটা-কাটা কথাটা বলেই সে দরজায় তালা দিল। তার পর গটগট করে হেঁটে গেল।

হিমাদ্রি ঘোষাল চলে যেতে মনে মনে মৃদুলা ভাবছিল কাজটা ঠিক হল কি না! কিন্তু ভাবনাটা থিতু হল না। কারণ দীপেন্দুর বিয়ের খবরটা একটা সূক্ষ্ম কাঁটার মতো বুকে বিঁধে ছিল।

কে না জানে, কাঁটা যত সূক্ষ্ম তার ভেদশক্তি তত বেশি! রিকশায় মৃদুলা। চারপাশে চলমান মানুষজন দেখতে দেখতে তার কেবলই মনে হচ্ছিল সবাই যেন তাকে দেখছে। ছোটো শহর। এখানে সবাই সবাইকে মোটামুটি চেনে। মৃদুলা-দীপেন্দুর ডিভোর্সের ব্যাপারটাও অনেকেরই জানা।

বিচ্ছেদের পরে, প্রথম প্রথম তো মৃদুলা কারো দিকে সরাসরি চোখ তুলে তাকাতে পারত না। চেনা মানুষেরা এমনভাবে তাকে দেখত যেন সে কোনো নষ্ট মেয়ে। পরের দিকে সায়নকে অবলম্বন করেই তার মানসিক জোর ফিরে পাওয়া।

এই চার বছরে মৃদুলার জীবনে একটা স্থিরতা এসেছিল, অন্তত মানসিকতায়। কিন্তু একটু আগে দীপেন্দুর বিয়ের খবরটা পাওয়ার পর থেকেই ভেতরে ভেতরে একটা দুরন্ত ঘূর্ণি। ব্যাপারটা তার কাছে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় হয়েও মৃদুলাকে তীব্রভাবে গ্রাস করছিল। যে লোকটা আজ তার কাছে মৃত, তার ঘটনা নিয়ে সে কেন এত চঞ্চল হবে? কেন মনে হবে সবকিছু দুমড়ে-মুচড়ে ধ্বংস করে দিতে? মৃদুলা এখন নিজেকেই বুঝতে পারছিল না। সেটা আরও বড়ো যন্ত্রণা।

না, র‍্যাশন কার্ড ল্যাপ্‌স হয়নি। একটা অযথা ঝামেলা থেকে বাঁচা গেল।

ঘরে ফিরে খাওয়া সেরেই মৃদুলা ইস্কুলে। ছ-টা ঘণ্টা তবু বেশ কেটে যায় কাজের মধ্যে। এক ফাঁকে অফিসের পিওনকে পাঠিয়ে পোস্ট অফিস থেকে এম আই এসের টাকাটা তুলে আনিয়েছে। রোজকার মতো টিফিন আওয়ার্সে মোহরদি'র সঙ্গে গল্প। অঙ্কের প্রদীপ মিত্র'র সঙ্গে একটু ঠাট্টাইয়ার্কি। ছেলেটা ভালো, তবে কিনা বড্ড কথা বলে।

সময়-সময় বেশি কথা-বলা লোকগুলোও বড়ো বেশি প্রয়োজনীয় মনে হয়। বিশেষত তাদের কাছে, — যাদের সব কথা ফুরিয়ে গেছে।

মোহরদিকে বলব-বলব করেও দীপেন্দুর বিয়ের কথাটা বলা হয়নি। একটা ভয় ছিল

পাছে নিজের ঈর্ষা বা ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটে যায়। মোহরদি মৃদুলার চেয়ে দু-বছরের বড়ো হলেও, সম্পর্কটা গভীর। বন্ধুত্বের। তাকে কথাটা বলাই যেত। বিশেষত বলার জন্য গলাটা খুসখুস করছিল বলেই। কিন্তু না বলে বোধ হয় ভালোই করেছে। মৃতকে মৃতই রাখা গেছে। সত্যিই কি তাই? সত্যি হোক, মিথ্যে হোক, মৃদুলা যে কথাটা তোলেনি এটা তো সত্যি।

ইস্কুল ছুটির পর বাড়ি ফেরার পথে দু-প্যাকেট চাউ কিনে নিয়ে এল মৃদুলা। কাল সকালে সায়নকে করে দেবে।

সন্ধ্যা নামছে।

চা বানিয়ে মৃদুলা সায়নকে এক কাপ দিল। চেয়ারে বসে সে টিভি দেখছিল।

—'কীরে, আজ পড়তে যাবি না?'

— 'যাব', ছোট্ট উত্তর।

—'তুই আজকাল এত চুপচাপ থাকিস কেন রে সারাদিন?' মৃদুলা ছেলের ঘনিষ্ঠ হতে চাইল।

— 'তা কী করব? ফাঁকা ঘরে দেয়ালের সঙ্গে কথা বলব?'

মৃদুলা নড়ে উঠল। মা-ছেলের সম্পর্কের মাঝে এক টুকরো অন্ধকারের মতো কথাটা মৃদুলা ঝিমিয়ে দিল। তবু সে হেসে বলল 'সে কী, আমার সঙ্গে বলবি'—।

— 'তুমি ঘরে থাকো কতক্ষণ?

মৃদুলা স্তম্ভিত। অথচ সে বলতে পারত অনেক কিছু। তার ইস্কুল, উপার্জনের যৌক্তিকতা, একা হাতে সংসারের দাঁড় বইবার অজস্র উদাহরণ। কিন্তু এভাবে তো অন্যলোককে বোঝানো যায়। আত্মজকে বোঝানো সম্ভব? কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে সায়নকে অনিবার্যভাবে গ্রাস করেছে যে নিঃসঙ্গতা তা কি ওইসব যুক্তি দিয়ে দূর করা যায়? যুক্তি থেকে যাবে যুক্তির জায়গায়। তাতে সায়নের নিঃসঙ্গতা কতটা কাটবে?

মৃদুলা ভেঙে-পড়া গলায় বলল, 'জানি, তোর একা লাগে — আমারও কী কম একা লাগে নিজেকে! কিন্তু উপায় নেই।'

কথাটা বলেই মৃদুলার মনে হল সে মিথ্যে বলল। মিথ্যে। একটা দারুণ মিথ্যেকে সহানুভূতির আরকে চুবিয়ে করুণ রসের শিল্পিত কলায় পরিবেশন করল মাত্র।

মা ও ছেলের একাকীত্বের মাঝেও দুস্তর ব্যবধান আছে। সায়ন বইয়ের ব্যাগ গুছিয়ে বেরিয়ে গেল। ফিরবে ন-টায়। মৃদুলা বিছানায় শুয়ে ফোঁপাচ্ছিল।

সন্ধ্যামালতীর গন্ধ জানালা পথে। মৃদুলার আজ খুব ইচ্ছে করছিল একবার হারমোনিয়ামটা নিয়ে বসে। তবু গান কিছু সময়ের জন্য যন্ত্রণা ভুলিয়ে রাখে। কিন্তু তারও যে অন্য বিপদ আছে। ওই গান দিয়েই না সে বাঁধা পড়েছিল দীপেন্দুর কাছে। প্রিয় গানগুলোর সঙ্গে একদা দীপেন্দুর অন্ধ-স্তাবকতা মিশে আজ তা কেবল স্মৃতিকে রক্তাক্ত করবে। হয়তো নতুন করে মনে পড়ে যাবে দীপেন্দুর স্বভাবের কুটিলতা, পুরুষদম্ভের প্রকাশে গায়ে হাত তোলার মতো নোংরা ঘটনাগুলো। না, গান গেয়েও শান্তি নেই। ভুলে যাওয়া অধ্যায়কে সে আর জাগাতে চায় না। দীপেন্দু মৃত, গানও।

গেটে শব্দ হল ঠুক করে।

রক্ত ছলকে উঠল মৃদুলার মুখে। মনে পড়ে গেল আজ বুধবার। একদিকে মন-ভাল-নেইয়ের স্থবিরতা, অন্যদিকে বুকের গহনে রক্তের ছলাৎ — দুই'য়ের মাঝে স্থাণু মৃদুলা বন্ধ দরোজার এপারে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল।

কড়ার শব্দ উঠল গোপনীয় তালে — ঠুকঠুক।

মৃদুলার হাত তবু উঠল না।

এবারে ঘনিষ্ঠতায় জারানো একটা চাপা স্বর ভেসে এল — 'খোলো আমি নীলেশ, খোলো মৃদুলা—'।

মৃদুলা আর পারল না। দরজাটা খুলে দিতেই দমকা বাতাসের মতো নীলেশ ঢুকল। উসকো-খুসকো চুল, দু-দিনের না-কাটা দাড়ি, তবু মুখচোখে প্রবাল রঙের আলো।

নীলেশ ভনিতা জানে না, ঢুকেই বলল 'ওহ্ অতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখতে হয় না কি! কত কষ্ট করে যে এই দিনটাতে সময় বার করি—'

দরজাটা বন্ধ করেই নীলেশ দু-হাত প্রসারিত করে ডাকল — 'এসো, কাছে এসো —'।

মৃদুলা এল না। অদ্ভুত শূন্যতায় তার মুখে ভাষা নেই।

'কী হল, অমন করে কী দেখছ —' বলেই নীলেশ বুকে টেনে নিল মৃদুলাকে। তার পর আদরে আদরে চুরমার করতে করতে একসময় বলল 'এভাবে আর ভালো লাগে না — নিজেকে কেমন যেন চোর মনে হয়—।'

মৃদুলার ছত্রিশ বছরের শরীরটা যত জেগে উঠছিল, তত এক সুপ্ত অপরাধবোধ তাকে গ্রাস করছিল। সে নীলেশের দামাল আদরের মাঝে খড়কুটোর মতো ভেসে যেতে যেতে আধবোঁজা চোখে বলল, 'আমরা মনে হয় ঠিক করছি না নীলেশ, তুমি এবং আমি—'

'আঃ, এতে বেঠিক কোথায়? মানুষ কি শুধুই জল-হাওয়া নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে? তার সঙ্গী চাই। সুখে এবং দুঃখে, তার নাম আলো। অন্ধকারে আলো ছাড়া চলবে কী করে? তুমিও পারো না আমিও না—'।

মৃদুলা নিজেকে মুক্ত করতে ব্যর্থ চেষ্টা করে বলল, 'ছাড়ো, চা করি —'

'উঁঃ ছাড়ছি — এই ছ-টা দিন কত কষ্ট করে কাটাই তা জানো!'

আরও জোরে চেপে ধরল নীলেশ। তার কথাটা এই ঘরের অন্ধকারে বড়ো জাগ্রত সত্য হয়ে ভেসে বেড়াতে লাগল।

মৃদুলাও কি অস্বীকার করতে পারে তার কষ্টটা!

একসময় ক্লান্ত নীলেশ বিছানায় একা শুয়ে। সে ছাদের দিকে চেয়ে সিগারেট টানছিল। মৃদুলা উঠে গেছে। বাথরুমে জলের শব্দ। সন্ধ্যামালতীর গন্ধ এখন সারাঘরে।

অনেকক্ষণ পরে ফিরে এল মৃদুলা। স্নিগ্ধ যুঁই ফুলের মতো। হাতে দু-কাপ চা। দু-জনে মুখোমুখি। শরীরের তৃপ্তি নিয়ে হৃদয়ের কথোপকথন।

চা শেষ হতেই নীলেশ তার কোঁচকানো পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা হজ্‌মির স্ট্রিপ বার করল, বলল —'খাও, খুব টেস্টি, আমাদের এক কলিগ বাড়িতে তৈরি করে —'।

'এ তো বাচ্চাছেলেরা খায়—'

নীলেশ কথাটা আমল দিল না, বলল 'বুড়োরাও'—।

তার ঝুলপিতে রুপো রং চিকমিক করে উঠল।

মৃদুলা বলল 'এভাবে আর ভালো লাগে না—'।

নীলেশের চোখের তারায় উৎসাহ — 'কতদিন ধরেই তো বলছি, চলো বিয়ে করি। কিন্তু তুমি যে কিছুই বলো না—'।

—'সায়ন কী ভাববে'

—'সায়ন আবার কী ভাববে! মানুষ কি একা বাঁচতে পারে? সত্যির মুখোমুখি হয়ে আমাদের মতো সায়নও একদিন বুঝতে পারবে জীবনের বাঁকগুলো।'

মৃদুলা নখ খুঁটতে খুঁটতে জবাব দিল 'ষোলো বছর বয়েসটা কি তার জন্য যথেষ্ট? তার কুফলও তো হতে পারে'।

নীলেশের মুখটা উদাস দেখাচ্ছিল। সে একমাথা কোঁকড়া অবিন্যস্ত চুলে হাত বুলিয়ে ভেজা গলায় বলল, 'আটটা কুড়িতে শেষ বাস, তার পর আবার বুধবার। একদিন আমিও তো বুড়িয়ে যাব মৃদুলা।'

কথাগুলো ফাঁকা মাঠে বাতাসের মতো নিঃস্বতায় উলুঝুলু। মৃদুলা একটা হাত চেপে ধরল নীলেশের, 'তুমি দুঃখ পেলে!'

—'না...না...দুঃখ কীসের', নীলেশ হো হো শব্দে হেসে বলল, 'সায়ন ষোলো, দু-বছর পরে উচ্চমাধ্যমিক, তার পর কলেজ, তার পর চাকরি বা ব্যাবসা, যা কিছু করুক আরও অন্তত দু-তিন বছর'।

হঠাৎ থেমে নীলেশ যেন একটা অন্তহীন মাঠ, আলোহীন, জনমানবহীন ধূ ধূ—দেখতে পাচ্ছিল। মৃদুলা অবাক হয়ে চেয়েছিল তার মুখের দিকে।

—'সাত-আট বছর পরে আমি হব উনপঞ্চাশ তুমি হবে চুয়াল্লিশ, হাঃ হাঃ চুলে যত্ন করে কলপ মেখে দু-জনে যাব ম্যারেজ রেজিস্টারের বাড়ি হাঃ হাঃ — তখন তোমার অমত থাকবে না নিশ্চয়ই —'।

নীলেশ হাসছিল। কত সহজেই ও প্রাণ খুলে হাসতে পারে। মৃদুলা থমথমে। মৃদু মৃদু মাথা নেড়ে মৃদুলা বলল, 'জানি নীলেশ, সেদিন শরীর ফুরোবে কিন্তু মনটা আরও বেশি করে জেগে উঠবে জেনো'।

ঘড়ির দিকে চেয়েই চমকে উঠল নীলেশ। এতক্ষণ পর এই প্রথম সে যন্ত্রণার স্বরে বলল 'তার আগে শুধু বুধবার—।'

নীলেশ চলে গেছে।

মৃদুলা এখন বারান্দার চেয়ারে একা। অন্ধকারে। সামনের পথ দিয়েই তো বাস গেছে। ওই বাসে চেপেই নীলেশ গেছে। সেইসঙ্গে চলে গেছে বুধবার। অন্ধকারে ফাঁকা রাস্তাটা বাকি ছ-টা নিঃসঙ্গ নিরালম্ব দিনের মতোই শুনশান।

ঘাড় ফিরিয়ে ঘড়ি দেখল মৃদুলা। পৌনে ন-টা। একটু পরেই ফিরবে সায়ন। মৃদুলা ধীর পায়ে রান্নাঘরে ঢুকল। দিনের রান্না করা মাছ আছে ফ্রিজে। তা ছাড়াও ক-টা পোস্তর বড়া ভাজবে সে। সঙ্গে আম-ডাল। দুটোই বড়ো ভালোবাসে সায়ন। বড়ো তৃপ্তিতে খায়।

ব্যাঙ্গমির চোখ

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যাঙ্গমি বলল, তারপর?

বটগাছ বড়ো করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সন্ধে হামলে পড়েছে পৃথিবীতে। বটগাছের মাথাটা এই অন্ধকারে ঠিক একটা ভূতের মাথা। হাওয়ার চলকানিতে তার ঝাপসা চুল ওড়ে। তার বিশাল শরীরটার কোটরে এখন বহু জীবের বসবাস। তার আশ্রয়ে লালিত হচ্ছে একই সঙ্গে ব্যাঙ্গমিও। কিন্তু এখন তার ব্যাঙ্গমা আর নেই। গেলবারের ডাল-ভাঙা ঝড়ে, পাতা-লতা চাপা পড়ে ব্যাঙ্গমার চোখ উলটে যাওয়ার পর ব্যাঙ্গমি একেবারে একা। ব্যাঙ্গমি জানে গল্পের বাকিটা শুনতে চাইলেও কেউ আর তাকে বলার নেই। তবু ব্যাঙ্গমি তার ব্যাঙ্গমাকে ভুলতে পারে না বলেই বার-বার জিজ্ঞাসা করতে থাকে, তারপর? তারপর?

গল্প অবশ্য আর শুনতে হয় না ব্যাঙ্গমিকে। বটগাছের কোটর থেকে চোখ বাড়িয়ে দেখতে পায় কত নতুন গল্প। গল্পগুলো দেখে ঝাঁকড়াচুলো বটগাছও। আজ কত বছর ধরে অসংখ্য গল্প দেখতে দেখতে বটগাছের চুলে-দাড়িতে পাক ধরে গেল। মাথায় ভরতি সবুজ চুল, তাতে এই দেড়-শো বছর বয়সেও ভারি নবীন দেখায় তাকে। তেমনই দু-গালে দাড়ির রাশ। খুব অভিজ্ঞ দাড়ি। সেই দাড়ি অসংখ্য ঝুরির রূপ ধরে নেমে এসেছে মাটি পর্যন্ত। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে মাত্র তিনটি দাড়ি কম বটগাছটার। তবু সেও কম বিজ্ঞ হয়ে ওঠেনি এতখানি বয়সের অভিজ্ঞতা মেখে। তার অভিজ্ঞ চুল-দাড়ি নেড়ে ব্যাঙ্গমিকে বলতে চায়, গল্প কি শুধু শোনার! গল্প তো দেখতেও হয়।

ব্যাঙ্গমি অতএব তার বড়ো বড়ো চোখ পেতে দেখতে থাকে ঘটমান জীবনের গল্প। বটগাছের তলা দিয়ে একটা ধুলো-ওঠা চওড়া পথ, তার পুবে একটা লম্বা বিল তো পশ্চিমে মস্ত দ'। বিলটা হদ্দ শুকনো এই ঘোর আঙরা-ছড়ানো বোশেখ মাসে। তার মাজার ওপর দিয়ে মেটে পথ আড়াআড়ি ভেঙে লোকজন আসে সেই দূর পচা গোবিন্দপুর থেকে। বাদলার দিনে কিন্তু এক-কোমর জল। পশ্চিমের দ'য়ে অবশ্য বারোমাস চান করতে পারে দিনে-দুপুরে পথশ্রমে ক্লান্ত পথিক। কিন্তু পারত পক্ষে সন্ধের পর এদিকটা মাড়াতে চায় না কেউ। অন্ধকার ঝুপঝুপ করে নামতে শুরু করলেই অমনি এলাকা শুনশান। তবু কি পুরো শুনশান হয়! কাজের হুতাশে কাউকে-না-কাউকে যাতায়াত করতেই হয় সন্ধের পর। সেভাবেই এসে পৌঁছোয় দু-জন লোক। পা চালাচ্ছে যত দ্রুত সম্ভব। একজন আর একজনকে বলল, কী রে ছোঁড়া, পায়ে কি কুঠ হয়েছে না কি? পা চালা, পা চালা। অন্যজন হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, রোসো, কাকা, সাড়ে চার মাইল পথ কি চাট্টিখানি কথা! গোড়ালিতে খিঁচ ধরে গেল যে! আর একজন বলল, রণ-পা নে এলে হত! জায়গাটা ভালো নয়। অন্যজন বলে, তখন কত করে বললাম পচা গোবিন্দপুরে রাতটা কাটিয়ে যাই। তুমি তো শুনলে না! বাকিজন বলে, দুর ছ্যামড়া, আজ রাতে না গেলে যে অন্য কেউ এসে হাতিয়ে নেবে ওটা।

বলতে বলতে দু-জনে আরও হনহন করে পেরিয়ে গেল বটতলা।

ব্যাঙ্গমি বলে ওঠে, তারপর?

তারপর কী হল তা আর বলার কেউ নেই বটগাছের কোটরে। বটগাছ একটা দীর্ঘশ্বাস

ফেলে। আঁধারের গুঁড়ি গুঁড়ি রেণু ততক্ষণে ভরে যাচ্ছে তার পাতার খাঁজে, তার শরীর আঁকড়ে বেড়ে-ওঠা লতায়, এ-ডালে ও-ডালে। ব্যাঙ্গমি ছটফট করে এদিকে ওদিকে তাকায়। লোকদুটো কী কাজে গেল তা জানতে তার ভেতরে উসকিয়ে ওঠে জিজ্ঞাসা, তারপর?

বটগাছের গুঁড়িতে ততক্ষণে এসে বসেছে দুটো অলপ্পেয়ে লোক। পরনে লুঙি, খালি গা। দু-জনে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে কী যেন ফিসফিস করে। ফিসফিসানিটার রকম ভালো নয়। দু-জনে যড় করছে কিছু একটা অঘটন ঘটানোর মন করে। যড় করতে করতে দু'জনে দু'টো বিড়ি ধরায়। ডাহা অন্ধকারে দুটো আঁচের লাল ফুটকি। গুঁড়ির ওপর ওড়াউড়ি করে। ওঠে নামে, আবার ওঠে, আবার নামে। কথা তোয়ের হতে থাকে। কথায় বোনাবুনি হয়। কিছু একটা আশঙ্কা বিবেচনা করে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যায় দু'জনের। কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। তারপর লাল ফুটকি দু'টো উঠে দাঁড়ায়। অন্ধকারে চলতে শুরু করে। চলতে চলতে ওঠা-নামা করে দুটো লাল ফুটকি।

ব্যাঙ্গমি ছটফট করে উঠে জিজ্ঞাসা করল, তারপর?

—স্‌স্‌স্‌, বটগাছ হিসিয়ে ওঠে বন্ধ করে দিতে চায় ব্যাঙ্গমির মুখ। অলপ্পেয়ে দুটো এখন কোথায় যাবে, কী করবে, কী তাদের মনোবাসনা তা জানার কী দরকার। একটু পরেই লাল ফুটকি দুটো হুমড়ি খেয়ে পড়বে ঘাসের মধ্যে। দুটো শিড়িঙ্গে শরীর কার খিড়কি দরজা ভেঙে সর্বনাশে সামিল হবে সে খোঁজে তোর কী দরকার! তুই চোখ পেতে দ্যাখ ততক্ষণে পরের গল্পটা।

একটা হদ্দ বুড়ো তখন এদিক-ওদিক চোখ ছুঁড়তে ছুঁড়তে এসে দাঁড়িয়েছে বটগাছের নীচে। একটু গলা খাঁকারি দিয়ে দেখল আশেপাশে কেউ অপেক্ষা করে আছে কি না। কেউ সাড়া না করতে বেশ ঝিমিয়ে পড়ল। ইতিউতি তাকিয়ে কাউকে খুঁজতে শুরু করে। না পেয়ে নিজের মনে গুজ গুজ করে, এ আমারে কুথায় টেনে নে এল শালা! এক কোপে গলাটা কেউ নামিয়ে দিলেও কোনো সুমুন্দির পো টের পাবে না।

বলে আরও ভয় পেয়ে গেল তা বোঝা গেল তার চলনের অস্থিরতায়। চারিদিকে তীক্ষ্ণ নজর পেলে ফুঁড়ে ফেলতে লাগল ঝুপসি আঁধার। তাকাতে তাকাতে নিজের চারপাশে ঘুরতে লাগল। কে কোনদিক থেকে এসে হামড়ে পড়বে তার ঘাড়ের ওপর এই আশঙ্কায় কাঁপ ধরে গেল তার ঝুঁকে-পড়া শরীরে। আবার আওড়াতে লাগল নিজের মনে, ও বাবা, ছ্যামড়াটার কথা শুনে এ কুথায় এয়ে পড়লাম। ছ্যামড়া কইল একটু নেরজনে কতা হবে, কর্তা। এসব গুপন কতা গুপনে হওয়াই ভালো। কিন্তুক তা বলে এমুন নেরজন! তাই জন্যি এ -জায়গাটার নাম ডাকাতে বটতলা। সেই কবে এয়েছিলাম এদিকে। মনেও নেই সেসব কথা। ও বাবা, ও পালান—

পালান নামের কোনো লোকের আবির্ভাব না ঘটায় বুড়ো যে-দিক থেকে এসেছিল সে-দিকেই হাঁটা শুরু করল। তার গা টলছে তা তার চলনে বোঝা যাচ্ছে। গতি বাড়াতে চাইছে কিন্তু পা এগোচ্ছে না। একটু বেশিই জোরে হাঁটতে গিয়ে সপাটে পড়ল উলটে। মাটিতে পড়ে গোঁ গোঁ করল কিছুক্ষণ। তারপর সামলে উঠে আবার এগোতে থাকে।

ব্যাঙ্গমি চোখ হাঁ করে বলল, তারপর?

আবার স্‌স্‌স্‌ করে বটগাছ থামাতে চায় তাকে। ব্যাঙ্গমির যেন তর সয় না। বুড়োটা কেন এসেছিল, কার জন্য অপেক্ষা করছিল, সে কেন এল না, কেনই-বা ভয় পেয়ে পালিয়ে

গেল তা বোধগম্য না হওয়ায় তার এত ছটফটানি। কিন্তু কী হবে এত সব গূঢ় আর গোপন কথা জেনে। কত গল্পের ল্যাজা থাকে, মুড়ো থাকে না। কিংবা মুড়ো পাওয়া গেল তো ল্যাজা নিয়ে গেল চিলে। এখন দ্যাখ, আবার কে যেন আসছে অন্ধকার ফুঁড়ে। ততক্ষণে সন্ধে পেরিয়ে রাত চেপে বসছে পৃথিবীর ঘাড়ে। আশেপাশে যেখানে যত ঘাস বন আর আংছট্টির জঙ্গল আছে, সেখানে এ-সময় ঝিঁঝিদের তুমুল উৎসব। ঝিঁঝিরাই জাগিয়ে রাখতে চাইছে পৃথিবীকে। কিন্তু ঝিঁঝিঁদের শব্দ ছাপিয়ে চার জন যুবক ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে এসে পৌঁছোল বটগাছের তলায়। চারজনেই ক্রুদ্ধ, ঘর্মাক্ত। কণ্ঠস্বরে উথলে উঠছে ঘড়ঘড়ানি। অন্ধকারেও চোখ জ্বলছে বিড়ির আঁচের মতো। একজন বলল, হারামির বাচ্চারে ফুঁড়ে ফেললে তবে গায়ের ঝাল মেটে। অন্য আর একজন বলল, হুড়পাড় করিসনি, টপা, এগুতি হবে খুব সাবধানে। জানাজানি হলি সব ভেস্তে যাবে। তৃতীয়জন বলল, কাজটা কিন্তু খুব ভালো হবে না। লোকে জেনে ফেলবে ঠিক। আগেরজন বলে ওঠে, কী করে জানবে? তুই না বলে দিলে! প্রথমজন বলে, তুই শালা এক নম্বর হারামি, তোকেই আগে—

অন্ধকারে চার জোড়া আঁচ লাফাচ্ছে লাট্টুর মতো। তেমনই গলার স্বর ঘুরপাক খাচ্ছে ঘোরালো বাতাসে। কী একটা তুমুল ঘটে যাবে এমন মনে হয়। কী এক রুদ্ধশ্বাস তর্কবিতর্ক চলে চার মূর্তির অস্পষ্ট চেঁচানিতে। কারো স্বর অতি উঁচুতে ওঠে। কেউ হিসহিস করে থামাতে চায় সেই উচ্চকিত স্বর। অতর্কিতে একজন আর একজনের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পেড়ে ফেলে সপাটে মাটিতে। ঝিঁঝিরা ভয় পেয়ে থেমে যায় কয়েক লহমা। ধস্তাধস্তি চলতে থাকে তুমুল। তার সঙ্গে হিসহিসিয়ে শাসানি। কিছুক্ষণের মধ্যে কেউ একজন নিজেকে ছাড়িয়ে চোঁচা দৌড় দেয় মিশ-আঁধার চিরে। বাকি ক-জন কিছু মুহূর্ত হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ধুলো-মাখা শরীরে। পরক্ষণে 'শালা সব বলে দেবে নিশ্চয়ই। ধর শালাকে'— শিসিয়ে হুঙ্কার দিয়ে বাকি ক-জনও ছুটল তাকে লক্ষ্য করে। দ'য়ের কাছে গজরানি শোনা যাচ্ছিল তখনো। যাকে লক্ষ্য করে বাকিরা দৌড়োচ্ছিল তাকে ধরে ফেলল কি না বোঝা গেল না।

ব্যাঙ্গমি বলতে যাচ্ছিল, তারপর? কিন্তু বলা হল না, চার যুযুধান যুবক দৌড় শুরু করতেই কোথা থেকে ফুঁড়ে এল আরও দুই যুবক। বেঁটেটা বলল, কোন দিকে গেল বল তো? শালা সমাজবিরোধীদের চাপে আর বাঁচার উপায় নেই।

লম্বাটা বলল, কিন্তু বুড়োটা কোথায়?

—এখেনেই তো থাকার কথা। বলল রাত একটু যুব হয়ে এলেই বটগাছতলায় এসে দাঁড়িয়ে থাকবে। এসে ফিরে গেল কি না কে জানে! তুমিই তো বেরোতে দেরি করলে!

— কোথায় দেরি! সারাক্ষণ ঘড়ির ওপর দিয়ে হাঁটতে পারা যায় নাকি? ওই ব্যাটা ফচকেটা দু-পাত্তর নিয়ে এসে বসে গেল, অমনি—

বেঁটেটা জিবে চুকচুক শব্দ করে বলে, বুড়োটা মহা খিঁচল আছে। শুধু বলে তোমাদের কোনো বদ মতলব নেই তো! বুড়ো তো জানে না ওর কুকীর্তি সব জেনে ফেলেছি। ডুবে ডুবে শরবত খাচ্ছে, আর মুখে বলছে, দেশসেবা করছি, এবার পেছনে দেব হুড়কো ঢুকিয়ে—

—কিন্তু মাল কোথায়? চিড়িয়া ফুড়ুৎ।

— কোথায় যাবে। ঘেঁটি ধরে নিয়ে আসব ফের। বুড়ো বয়সে যমের দুয়ারে যাব-যাব করছে, এখনও মেয়ে নিয়ে ফস্টিনষ্টি চালাচ্ছে! দিয়েছি একটু আভাস, তাতেই বলে ঠিক আছে, কী চাস বল? এখন না দিয়ে সটকে পড়লে হবে? হিড় হিড় করে টেনে এনে বলব,

নগদা মাল ছাড়ো, নইলে—

—নইলে পচাং, কী বলিস, চটকা?

—হ্যাঁ, ওই কাজটা কিন্তু তোমাকে করতে হবে, বিশুদা। আমার কিন্তু হাত কাঁপে।

—তুই শালা হিজড়ে। হাত কাঁপে। হুঁ! এ-লাইন ছেড়ে দে, চটকা। কিন্তু মাল কোথায়?

—বুড়ো নির্ঘাত এসেছিল, বিশুদা। এসে ওই ফক্কড়গুলোর কাণ্ডকারখানা দেখে ঘাপটি মেরেছে কোথাও। চলো তো দ'য়ের দিকে।

— ধুর এসব কারবার এ-রকম ফাঁকা জায়গা না হলে হয় না। দ'য়ের ওপাশে ক-টা ঝুপড়ি আছে। বুড়ো বেশি ত্যান্ডাইম্যান্ডাই করলে কী অ্যাকশন করতে হবে কে জানে!

বেঁটে ভারি চিন্তিত মুখে দ'য়ের দিকে এগোয়। তার পাশে লম্বা। ব্যাঙ্গমির ভেতর উসিয়ে উঠছিল 'তারপর' শব্দটা, কিন্তু বলবে কি, বটগাছের কোন কোটরে ডেকে উঠল একটা তক্ষক। বেশ শব্দ করে। এমন প্রায়ই ডাকে রাতের নিঃশব্দ প্রহরে। যেন জানান দেয় 'আমি আছি। আছি কিন্তু।' তক্ষক ডাকলে কিছুক্ষণ থমথমা খায় বটগাছতলা। চুপ করে সে-ডাক শোনে ঝিঁঝিরাও। নিশুতি আরও ঘন হয়ে আসে চারপাশে। বটগাছের ডাল থেকে একটা শুকনো পাতা টুপ করে খসে পড়লে সে-শব্দও শোনা যায় স্পষ্ট। দ'য়ের কাছে একটা পাখির ডানা ঝাপটানি। কোথাও শিশুর কান্না শোনা গেল—শিশুর না কি শকুনের!

ব্যাঙ্গমির পেটের ভেতর কথাটা উসখুস করতে থাকে। কিন্তু আচমকা নিশুত ঘন হয়ে যাওয়ায় তার চোখে ঝিমুনি এসে যায়। চোখ বুজে আসে সহসা। কোটরের মধ্যে ঝিমোতে থাকে একা। কোনো গহন স্বপ্নের ভেতর নড়াচড়া করতে থাকে তার ঘুমে জুড়িয়ে আসা চোখ। ঝিঁঝিরা দু-দণ্ড থমকে গিয়ে কান পেতে শুনছিল পৃথিবীর কাণ্ডকারখানা। হঠাৎ তারা তুমুল স্বরে চিৎকার শুরু করতেই চোখের আকুলি ভাবটা কেটে যায়।

ব্যাঙ্গমি চোখ মেলে দেখে আরে, কী অবাক কাণ্ড! গোটা পৃথিবীটা ভরে গিয়েছে ঝিরঝিরে আলোয়। আকাশে উঁকি দিচ্ছে তৃতীয়ার চাঁদ। চরাচর এতক্ষণ আঁধারের চাদরে মুড়িঝুড়ি দিয়ে ঝিমোচ্ছিল, হঠাৎ চাঁদের একফুট্টুস আলো চরাচরে ঝরে পড়তেই ঘন কালো চাদর একটুকুন সরিয়ে দেখছে কোন কোন অপোগণ্ড রাতে না ঘুমিয়ে বেঘোরে আজেবাজে করে বেড়াচ্ছে এখানে-ওখানে। ঝিঁঝির ডাক হঠাৎ পুরো উদ্যমে শুরু হয়। উথলে-ওঠা প্রশ্নটা গিলে ফেলে ব্যাঙ্গমি চোখ পেতে দেখে তৃতীয়ার মরা আলোয় কেমন বদলে যাচ্ছে পৃথিবীর রং। এ-রকম ঝিমঝিমে আলোয় কেমন মন খারাপ লাগে তার। কীরকম একা একা লাগে। চুঁইয়ে-ঝরা এমন আলোয় চোখের পাতায় ঘুম আসতে চায় না। চুপচাপ কান বাড়িয়ে শোনে বট গাছটাও দীর্ঘশ্বাস ফেলছে কখনো। কেন এত বড়ো বটগাছও মন খারাপ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তা ব্যাঙ্গমি বুঝতে পারে না। বটগাছ কত উঁচু। তার ঝাঁকড়া মাথা উঁচিয়ে চরাচরে কতদূর পর্যন্ত দেখতে পায়। এক-একটা গল্প দৌড়োতে দৌড়োতে কোথায় কত দূরে চলে যাচ্ছে তা ডিঙি না মেরেও দিব্যি জানতে পারে বটগাছ। গল্পগুলো তোয়ের হয়ে আবার ভেঙে যাচ্ছে তা নিয়েই তো যত আপশোস ব্যাঙ্গমির।

এমন ফিচকে আপশোসের মধ্যেই হঠাৎ কোত্থেকে হুড়িয়ে এল জনা ছয়েকের একটা দল। বেশ গরম খেয়ে এসেছে তা বোঝা যাচ্ছে তাদের গলায় তুঙ্গে ওঠা চেল্লানি দেখে। খ্যানখেনে গলায় একজন বলল, শিবদাসবাবুকে নাকি এইদিকেই আসতে দেখেছে বলল।

—কিন্তু শিবদাসদা এত রাতে এদিকে আসবেন কেন? জায়গাটা খারাপ তা তো সবাই

জানে।

—কিন্তু ঝুপড়ির লোকগুলো তো তা-ই বলল। পরনে চেক-কাটা লুঙির ওপর সাদা পাঞ্জাবি।

—লুঙি পরে শিবদাসদা কখনো এতদূরে আসেন না।

—বাড়ির লোকজন বলল এই পোশাকেই বেরিয়েছিলেন উনি। আলাভোলা লোক তো! হয়তো চলে এসেছিলেন কিছু উন্নয়নের কথা ভাবতে ভাবতে। উন্নয়নের কথা ছাড়া আর কিছু তো ভাবতেন না ইদানীং। তারপর হঠাৎ কারো পাল্লায় পড়েছে।

—কিন্তু এখন কী করা যায়?

—উহ্ কী নির্জন জায়গা। আমরা এতগুলো লোক তাতেই কী ভয় করছে! আর উনি একা কী করতে এদিকে এসেছিলেন কে জানে!

—নিশ্চয়ই কোনো অ্যান্টি-সোস্যালদের পাল্লায় পড়েছেন। সেদিন বলছিলেন কারা যেন হুমকি দিয়ে গেছে।

— এ-রকম ভালো লোককেও হুমকি! দেশটা একেবারে গোল্লায় গেল, পীযূষদা। পলিটিকস যা নোংরা হয়ে গেল!

—কিন্তু কী কারণে হঠাৎ ডাকাতে বটতলায় এলেন তাই ভাবছি।

— কোনো ব্যাপারে ফেঁসে যাননি তো। কেউ ব্ল্যাকমেল করতে আনেনি তো।

অপরপক্ষ সহসা চুপচাপ। কী যেন ভাবছেন তাঁদের নেতা শিবদাস মল্লিকের অন্তর্ধান বিষয়ে। হঠাৎ বললেন, কিছু কিছু মানুষ হঠাৎ কী কারণে যেন ভারি দুর্জ্ঞেয় হয়ে ওঠে। আটাত্তর বছর বয়সে শিবদাস মল্লিক কেন এত রাতে ডাকাতে বটতলায় এলেন তা বলা খুব কঠিন।

— কী করা যায় তা হলে?

—তাই তো ভাবছি।

ভাবতে ভাবতে ছ-জন মানুষ দ'য়ের দিকে ফিরে গেল পুনর্বার। তৃতীয়ার চাঁদ তখন আকাশে গুঁড়ি গুঁড়ি পায়ে হাঁটছে। কোথায় একখণ্ড শাদা মেঘ ছিল তার জালে কিছুক্ষণ আটকে যায় চাঁদটা। অন্ধকার ঘন হয় চুপিচুপি। ছ-টা ছায়ামূর্তি ক্রমশ ছায়া হয়ে গেল। মিলিয়েও গেল একসময়। ব্যাঙ্গমি রুদ্ধশ্বাসে বলে ওঠে, তারপর।

বটগাছ দুলে ওঠে ঝিমোনো হাওয়ায়। ভূতের মাথাটা দুলতে থাকে বেঘোরে। ভূতের আঙুলগুলো কাঁপতে থাকে আনমনা। ভূতের শরীর কী এক অচিন ব্যথায় ঘন ঘন শ্বাস ফেলে। ব্যাঙ্গমি, ও ব্যাঙ্গমি, সব গল্পের কি আর শেষ থাকে! কিছু কিছু কাহিনী মাঝখানে ছিঁড়ে যায়। কোথায় পড়ে থাকে তার লাটাই আর সুতোর ছেঁড়া অংশ। তার ঘুড়িটা গল্পের খেই হারিয়ে উড়তে উড়তে এসে আটকে যায় ভূতের ডালপালায়। এই ভূতটার ডালে, পাতার ফাঁকফোঁকরে, এ-ঝুরিতে, ও-ঝুরিতে সেঁটে আছে এমন কত কত গল্পের একটা অংশ। বাকি অংশ কোথায়, কোন বালকের হাতে পড়ে আছে তা আমার উঁচু মাথা আরও উঁচিয়েও দেখতে পাইনে। কোনো গল্পের আধখানা, কোনো গল্পের সিকিখানা বয়ে বেড়াচ্ছি আজ কতকাল ধরে। কখনো গল্পগুলো রোদে শুকিয়ে বা বৃষ্টিতে একশা হয়ে উধাও হয়ে যায় আমার শরীর থেকে। তা নিয়ে মাথাও ঘামাইনি কোনোদিন। গল্প তো সারাক্ষণ তোয়ের হতে থাকে। গল্প গড়তে গড়তে আবার ভেঙে যায়। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে যায় বাতাসে। কখনো

জোড়া লাগে, কখনো লাগে না। জোড়া লাগলেও সে-গল্পও আর কতটুকু! পৃথিবীর অনন্ত বহমান ঘটনার অতি সামান্য অংশ।

তৃতীয়ার আলো তখন তেরচা হয়ে ঝরছে আকাশের এক দূরূহ কোণ থেকে। ঝিরঝির করছে বটগাছের ঝাপসা শরীর। হাওয়ার লাবণ্যে জুড়িয়ে যেতে চায় ব্যাঙ্গমির চোখ। ব্যাঙ্গমি তবু টেনে খুলে রাখে চোখের পাতা। কে যেন আসছে তৃতীয়ার আলো দু-হাতে সরাতে সরাতে। কে ওটা! কোনো মেয়েলোক মনে হয়! কী কাণ্ড, এত রাতে এমন ভয়ংকর ডাকাতে বটতলায় হঠাৎ একটা মেয়েলোক কী কাজে এসেছে!

ব্যাঙ্গমি চোখ টানটান করে খুলে রাখে । ঘটনার গতিক বোঝার চেষ্টা করে। দৃশ্যটার রংঢং মোটেই ভালো নয়।

মেয়েলোকটার চাউনি বড়ো গোলমেলে। কী চাস রে তুই, ও মেয়ে! তোর কাপড়ের ভাঁজে ওটা কী! তোর হাত দুটোই-বা অত কাঁপছে কেন! কেন শুকিয়ে আসছে তোর ঠোঁট! কেন ফুঁপিয়ে কান্না আসছে তোর ভেতর জুড়ে!

মেয়েলোকটার চোখ তখন এদিক- ওদিক ছুঁড়ে কী যেন খুঁজছে বটগাছটার দিকে। তার শরীর ভরে হু-হু কাঁপ। দু-হাত বাড়িয়ে দিল ঝুরি লক্ষ্য করে। কিছু যেন বলতে চাইছে ও। কী বলতে চাইছে! কাকেই বা বলবে এই জনহীন প্রান্তরে! ব্যাঙ্গমি চোখ টানটান করে থম হয়ে আছে কী এক রুদ্ধশ্বাস আশঙ্কায়। দেখছে মেয়েলোকটা আরও এগিয়ে আসছে বটগাছের ঝুরিগুলোর দিকে। একটা মোটা ঝুরি বেছে নিয়ে তাতে পেঁচিয়ে বাঁধে আঁচলের আড়ালে রাখা একটা দড়ি। তারপর—

ব্যাঙ্গমি ছটফট করে বলতে যাচ্ছিল, তারপর? কিন্তু কথাটা কোঁৎ করে গিলে ফেলে হাঁ করে দেখল কাণ্ডটা। হাঁ হাঁ করে মানা করতে চাইল, ও মেয়ে, ও কী করস , থাম, থাম, এ-কাজটা ভালো নয়। থাম—

মেয়েলোকটা তার কথায় কান দেয়নি। সে ততক্ষণে একটা গল্পের আধখানা ব্যাঙ্গমির চোখে ধরিয়ে দিয়ে ঝুলে পড়েছে ঝুরিতে। ছেঁড়া সুতো আর লাটাইটা হাতে নিয়ে বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছে বটগাছ। তার শরীরে ধারণ করে আছে গল্পের শেষটা। কিন্তু গল্পের শুরুতে কী ছিল! ও মেয়ে—

মেয়েলোকটার তখন ব্যাঙ্গমির কথা শোনার অবকাশ নেই। ব্যাঙ্গমি কেন, পৃথিবীর কারো কথা শোনার আর দরকার নেই তার। সেও তখন বটগাছটার আর একটা ঝুরি।

ব্যাঙ্গমি ছটফট করতে থাকে। ডানা ঝাপটে নড়েচড়ে বসে কোটরের ভেতর। এ তুই কী করলি, মেয়ে! কেন এ-রকমটা করলি, ও মেয়ে! কী এত দুঃখ ছিল তোর বুকে! ডানা ঝাপটে ছটফট করে উঠে নতুন ঝুরিটা তন্নতন্ন দেখতে থাকে ব্যাঙ্গমি। আর মনে মনে আওড়াতে থাকে, তার আগে? তার আগে?

গিরিশ দর্শন

সুব্রত মুখোপাধ্যায়

— আমি গিরিশ ঘোষ। বুড়ো মিনসে, কলকাতার বদমাশ গুণ্ডার সর্দার। থিয়েটারে ভাঁড়ামো করি, কত বদখেয়াল করি। কলকাতার ভেতরে বদমাইশিতে সকলের টেক্কা — এই বলে দিলুম হক কথা। এইবারে তুই শ্যালা বুঝে নে ঈশ্‌নে, তোর বাবুটি কোন থাকের মানুষ, হুঁ।

ঈশ্‌নে যার বাবুর তরফে আদুরি মুখসই নাম, আদপে সে তো ঈশান। কেউ তাকে নাম জিজ্ঞেস করলে সে যৎপরোনাস্তি বোষ্টুমি বিনয়ে গলে গিয়ে বলে, ঈশেন, আজ্ঞে ছিরি ঈশেন আমার ধম্মো নাম। কুমোর ঘরের ছেলে আমি। জলচল জাতি। তা আমার বাবুটি বলেন — মালচল । সে কতা শুনে আমি ফাঁকফুক্‌রে গিয়ে আল্লাদে যোলোখানা হয়ে বাবুর নেকা বিল্বমঙ্গল ঠাকুর পালার একখানি গান গাই।

সারা রাতই সিদ্ধি বাঁটি, ভূতে খায় মা বাটি বাটি
বোল্‌বো কী বল্ বোঝে না মা
তার ওপর মিছে রাগা
কাছে এসে ছাই মেখে বসে
মরি গো মা ফণীর তরাসে
ক্যামোন করে ঘর করি মা, নিয়ে এই ন্যাংটা নাগা।

দোতালার এই বসবার ঘরের এক কানাচে প্রথম দফায় চায়ের বাটি, গরম জল আর দু-নম্বরে ব্রান্ডি সোডার বোতলের সঙ্গে পেয়ালা পিরিচের বেসামাল ঠোনাঠুনি নিয়ে তটস্থ ঈশান। বাবু কখন যে কোন বস্তুটির ফরমায়েশ দিয়ে বসবেন, তা কে জানে। এমনিতে আজ থিয়েটার বন্ধের দিনে কর্তা ভাতঘুম দিয়ে উঠে তক্কো রঙে রয়েছেন। কয়েক পাত্তর চড়াবার পর থেকে মুখে খই ফুটছে। খত্তালের পানা চোখ জোড়া ঘুরঘুটে পাক দিচ্ছে। কে জানে কখন আবার এরই মধ্যে চায়ের হুকুম হয়।

— আমি গিরিশ ঘোষ, হুঁ। সাধারণী কাগজের এডিটর অক্ষয় সরকার আমায় বঙ্গের গ্যারিক বলে পাঁচ-ছ রকম কথা বলেছে। কিন্তু সরকারের পো জানে না — এ-শালা কাগজের এডিটর মানেই গুয়োর ব্যাটা। নাটক একটুসখানি কেতরে পড়লেই অমনি বলে বসবে, এমনতরো মাথামুণ্ড বিরহিত নাট্য আমরা কখনো দেখি নাই। লেখকের কল্পনা লাগাম খুলিয়া একেবারে উনপঞ্চাশ বায়ুর ঘোড়দৌড় করাইয়া ক্ষান্ত দিয়াছে। গিরিশবাবুর রচনায় আমরা এতাদৃশ কল্পনার অরাজকতা আশা করি নাই। থু থু থু।

কর্তার এই এক বদ রোগ। একে তো মুখ-ভরতি পান। এটি ওঁর বচনে — পানের সঙ্গে অনুপান। সেইসঙ্গে অমন ঘড়ি ঘড়ি থু থু। আর এক জনারও এমনি বিটকেল অব্যেশ আছে। সিমলের দত্ত কায়েতদের ছেলে। নাম নরেন্দ্র। চাঁদপানা মুখ। আর মুখ ছাপিয়ে যেন চোখ জোড়া। অমন দর্শনধারী ছোঁড়ারও ওই এক বদ অব্যেস। ঘড়ি ঘড়ি নস্যি নেয়। হইহই করে কথা কয়। থইথই করে হাসে। আর থাকে থাকে থু থু থু। কথায় বলে — নাক ডুবু ডুবু চোখ ভাসা, তবে জানবে ছেলে খাসা। মাঝেমধ্যে কর্তার কথায় তানপুরার কান মুচড়ে চক্ষু মুদে যখন গলা ছাড়ে, তখন যেন এই বাগবাজারে সাক্ষাৎ কৈলেস নেমে আসে।

— আমি নাট্যাচার্য গিরিশ ঘোষ, আমি শ্যালা ওই কালী বেদান্তীর — মানে ওই সন্নিসি-হবো-হবো কালীর বাপ রসিকচন্দরের ছাত্তর ছিলুম সেই গৌর আঢ্যির ইশকুলে। তা একদিন তাতে বললুম, দ্যাখ্ কেলো, তোর বাপের মার খেয়ে আমি ইশকুল ছেড়ে দিয়েছি। উফ্, কী মার, কী মাররে শ্যালা। সেই রসিক মাস্টার একদিন দমদমার মাস্টারকে রাস্তায় ডেকে বললে, কী হে, তোমাদের কালী এখন কী কচ্ছে? হুঁ, আমি ব্যাটা কী ধার্মিক। আবার এক ব্যাটা হল সন্নিসি, আর একটিকে এবার মুসলমান বা কেরেস্তান করে দোবো।

মাস্টারের কথা থাক দেখেছিস্ ঈশ্‌নে। নিজে কী হবেন সেটি বললেন না। হুঁ হুঁ বাপ, আমি কেমন মাস্টারের ছাত্তর সেটি দেখতে হবে তো।

বাবু এখনও চা ফরমায়েশ করলেন না। তার মানে আমায় আর একবার জল আঁচে বসাতে হবে। তার পর বেলা পড়লে ক-জনা ইয়ারদোসত্ এসে পড়বেন কে জানে। তাই জলের মাপটা একটু বেশি করেই নিতে হবে। সেইসঙ্গে যদি নরেন্দ্র এসে জোটেন, তবে তো তামুক সাজতে সাজতে আলা হয়ে পড়বার জো হবে। কী কড়া ধাত গো ছেলের। এই হুঁকো নামছে তো ওই উঠছে। থাকে থাকে মুখে তামাক পাতার খইনি ঠুসছে।

কিন্তু আমার কি ফয়জত একটি? কর্তা গেলাস চুক চুক করছেন, বক বক করছেন, আবার ভোম্ মেরে ঝিম ঝিম চাইছেন — এ অবদি না হয় হল। কিন্তু যেই না বেরুব বলে উঠে দাঁড়ান, তখন হয় মহা গেরো। প্রথম কথা কাছাকোঁচা সাব্যস্ত করা। দু-নম্বরে, পেছু পেছু তফাতে থেকে তাঁকে পাহারা দিয়ে যাওয়া — খানায় পড়েন, না ঘোড়ার গাড়ির ঠোনা খান। বাবু কোন বাগে যান, কোথায় গিয়ে পড়েন এসব তো নজরদারি করতে হয় আমায়। বিশেষ করে বাবু যখন প্রচণ্ড মাতাল ভাবে থাকেন তখন যেন নড়েভোলা শিশুটি। সবসময়ে আগলে আগলে রাখতে হয়। নজর যেন তুলোর যত্ন-আত্তি। ভারী পলকা।

ঈশানের মনে হল বাবু বুঝি এইবার উঠে দাঁড়াবেন। মনে হওয়ামাত্রই সে প্রথমে তটস্থ হল তার পর মনে মনে তোয়ের হল। বাবু তাঁর ভুঁড়ি-ভারী শরীরটি ডাইনে-বাঁয়ে, বাঁয়ে-ডাইনে দোলাতে লাগলেন মৃদু মৃদু। দু-হেঁটোতে পুরু হাতের থাবায় থাপ্পড় কষিয়ে হেঁড়ে সুরে বলতে লাগলেন, রাধা বই আর নাইকো আমার রাধা বোলে বাজাই বাঁশি, মানের দায়ে সেজে যোগী মেখেছি গায়ে ভস্মরাশি।

ঈশান মনে মনে হামাগুড়ি দিল। বাবু মাটিতে দু-হাতে ভেরে এবার আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াবার কায়দা করতে লাগলেন। কিন্তু যেই না তেরছাচোখে ধরা পড়ল ঈশানও এবার উঠবে বলে ভাঁজ কষছে অমনি তাঁর ঢুলু-ঢুলু শিবনেত্তর বিলকুল বদলে গেল। বাবু এমন বিরূপাক্ষ নেত্রে চাইলেন যে মনে হল তাঁর একচোখে জগাই অন্যচোখে মাধাই। ঈশানের বুক হিম হয়ে গেল। বাবু মাথা দোলাতে দোলাতে একাধারে গম্ভীর আর আহ্লাদি আহ্লাদি গলায় বলতে লাগলেন, কী গো, তুমি আবার কোন প্যাঁচ কষছ অ্যাঁ! বলি এমন মাগির দালাল মাগির দালাল চোখে চাইছো কেন কালাচাঁদ!

ঈশান — আজ্ঞে কিছু নয়, আজ্ঞে কিছু নয়কো বলে যতই সরে দাঁড়ায়, কর্তা ততই খত্তাল চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে তার দিকে গুটি গুটি এগিয়ে আসতে থাকেন।

— উহুঁ, কিছু নয়কো বললেই ছাড়ব কেন চাঁদ! হাম কেয়া বয়েল হ্যায় না বেল্লিক বাজারের দোকড়ি সেন!

ঈশান অমনি প্রাণে বাঁচবার জন্যে জলে-ভাসা কুটোটি আঁকড়ে ধরল, বাবু, আমি বলে

কত ফয়জত করে আপনার জন্যে ছাঁচি পান সাজলুম। তা আপনি যে নিলেন না বড়ো!

ঈশান এক বান্ডিল সাজা পান অমনি সামনে মেলে ধরল।

ত্রিপুণ্ড বিরূপাক্ষ অমনি ধাতস্থ হলেন। জগা-মাধা চোখ জোড়া ঘূর্ণি ছেড়ে সাব্যস্ত হল খানিক। কর্তা আনন্দে টুঁবু-টুবু অবস্থায় বলে উঠলেন, দে বাপ দে, তাড়াতাড়ি দে। হুঁ, তাই বলি, শ্যালা একখানা পাঁট মেরে দিয়েও কী যেন নেই, কী যেন নেই। পানের সঙ্গে পানের ধারা অনুপ্রাস আর কি আছে এ জগতে!

ঈশান পানের বান্ডিল এগিয়ে দিতে দিতে ভাবে — বাবুর বুঝি অন্নপ্রাশনের বদলে পানপ্রাশন হয়েছে বলে মনে দুঃখু।

ডান হাতের খাবলা ভরে চাড্ডি পান নিয়ে বাবু ডান দিক বরাবর কোঁচায় বেশ করে বাঁধলেন। তার পর পানসুদ্ধ কাপড়ের গেটখানি ট্যাঁকের কষিতে গুঁজে ফেললেন। কিন্তু ভুলেও একটি পান মুখে দিলেন না। বাবু থপথপ টলমল চলতে আরম্ভ করলেন। ঈশান কিঞ্চিৎ তফাত রেখে পেছু পেছু তাঁকে অনুসরণ করে চলল।

...মার সোহাগে বাপের আদর, এ-দৃষ্টান্ত যথাতথা, যে-বাপ বিমাতাকে শিরে ধরে — এমন বাপের ভরসা বৃথা —

যে ভিখিরি মানুষটি এই গানটি খঞ্জনি বাজিয়ে গাইতে গাইতে ওদিক থেকে আসছিল বাবু তাকে প্রথমে দু-হাত তুলে নমস্কার করলেন। লোকটি তো ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে গান-টান বন্ধ করবার উজ্জুগ করলে। অমনি বাবু দু-হাত তুলে বলে উঠলেন, থামিসনি বাপ থামিসনি। তুই গাইতে গাইতে চলে যা। আমি শুনতে শুনতে চলে যাই।

ভিখিরি ভয়ে ভয়ে আবার ধরলে, তুমি না করিলে কৃপা, যাব কি বিমাতা যথা, যদি বিমাতা আমায় করেন কোলে, দেখা নাই আর হেথা-সেথা —

এইবার কর্তা কবি আলগা করে একসঙ্গে একজোড়া পান গালে দিলেন। বার কতক থু থু করলেন জর্দার ধক্ সামলাতে। কিন্তু পানের গায়ে পান-জর্দা পড়তেই ইঁক্ ইঁক্ ইঁক্। — হুঁ হুঁ বাবা, এর নাম ইঁক্ ইঁক্ — রামপেসাদি — উঁকক্‌ক্। এইসব পদ এমন টন্‌কো যে মনের আঁকবাঁক একেবারে সিদে চোস্ত্ করে দেয়। হুঁ, মাইরি বলছি, চোস্ত্ করে দেয়। কিন্তু এখন কেন মনে হচ্ছে আমি নিজেই একজনা খোশামুদে রামপেসাদে। ওই শ্যালা ঈশ্‌নে নিগ্‌ঘাত মালের সঙ্গে বেশি করে জল পাইল করেছে। চোখে কেবল পান্‌সে দেখছি।

ঈশান তফাতে হাঁটতে হাঁটতে নিচু গলায় বলে, সারা রাতই সিদ্ধি বাঁটি, ভূতে খায় মা বাটি বাটি...

গিরিশবাবু বাগবাজারের সদর ছেড়ে এবার বাঁয়ে কাম্নিক নিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি ছবি-তোলা যন্তর হয়ে গেলেন।

ব্যাপারখানা কীরকম — না, যেমন করে তিনি পাড়াপড়শিদের বিপৎকালে হোমোপাথি ওষুধ দেন। তার মানে হল সর্বকাজের জন্যে তাঁর চোখের সুমুখে একটি জ্যান্ত ছবি চাই। তা না হলে বাবুর গতিক ঠিক হয় না। কাঠের খোপ-কাটা বাক্‌সো খুলে বাবু হাজার বার রুগি বা ওষুধ নিতে আসা লোকটিকে জেরা করবেন। ব্যথা হলে ব্যথার হদ্দমুদ্দ চচ্চড়ি। শীত ভালো না গরমি ভালো, টক খাই না মিষ্টি খাই, পরিবারের দিকে পাশ ফিরে শুই না ওপাশ ফিরে, ধক্ করে মাথা চড়ে না বাপ তুললেও রাধেকেষ্ট — এমনি কত কী। রুগি নয় তার ব্যামোটিকে

যেন চোখের সুমুখে দর্শন করছেন। সে যেন তাঁর সঙ্গে কথা কইছে। চলতে চলতে গিরিশবাবু এইমাত্তর একটি চৌখুপ্পি ছবি-তোলা কালো বাক্সো হয়ে গেলেন।

হুঁ, ওখানে ওই গঙ্গামুখো ঘরের উঠোনে দাঁড়িয়ে এইমাত্তর চান করে-আসা ভটচায্যি কেমন করে খড়ম পায়ে দিয়ে তুলসী গাছে জল দিচ্ছে ছিড়িক্ ছিড়িক্। তুলসী দেবতা, মার্জনা করবেন আজ্ঞে, ঠিক যেন এক ঠ্যাং-তোলা অনামুখো জীবটির পানা। শুধু যা ব্রাহ্মির কৃপায় ভটচায্যির হাতখানা দিব্য কুকুরের ঠ্যাং হয়ে গেছে।

জল দেওয়া হল। এবার বুড়ো বামুন খটমট করে খড়ম দাবড়িয়ে ওই দিকের ঘরের সুমুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে ঘরের ভেতরকার পরিবারকে বকতে আরম্ভ করল। বকার কী ছব্বা। চোখ ঘোরাচ্ছে, মুখ ভেঙচাচ্ছে, কত কিসিমের অঙ্গভঙ্গি করছে। আবার ফিরে এসে ঘটি তুলে তুলসী গাছে ছিড়িক্ ছিড়িক্। ওধারে গঙ্গার জলে পড়তি দুপুরের বয়া ভাসছে। শুশুকের দল জলে ডিগবাজি খাচ্ছে। দু-টি নিঝুম মেছো ডিঙি আঠাকাঠি হয়ে জলে থমকে আছে।

গঙ্গার জলে দুপুরের বয়া ভাসছে। ওদিকের মুদিখানায় মোটা থ্যাসথেসে মুদিটি ধামায়-রাখা চালগুলো দু-হাতে করে উছলে উছলে কেমন চুড়োপানা করছে। তারপর দাঁড়িপাল্লাটি ঝাড়ছে। একটি পাল্লাকে আর একটির ওপর পেতে দিয়ে কেমন করে ঘুরিয়ে পাটার ওপর ডান্ডিটা কাত করে রাখছে। এবার দোকানের জিনিসপত্তর একখানার পর আর একখানা গোছ করে সাজিয়ে রাখছে। ভেতর দরজার আধখোলা পাল্লা দিয়ে একখানি মোটা রুলি-পরা হাত — বেলা হল, বেলা হল — হাত ছানি দিচ্ছে।

এধারে ফুলুরির দোকানি ভাজাভুজির পাট তুলে মস্ত ডাবরমুখো কড়ার ওপর ঝুরি খুন্তিগুলোকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। ঠাণ্ডা পুরু তেলে মাছি মরে আছে। কড়ার কানায় বেসনের পোড়া চাঁছি গাদ দিয়ে আছে। দোকানি আর তার ইয়ারদোস্ত মিলে মেঝেতে মাদুর পেতে থেবড়ে বসে একটি পিঁড়ে বার করে তাতে পাশা চালছে। দান পড়বার সময় এক একজনা এক-একরকম মুখভঙ্গি করছে। কারুর গাই বিইয়েছে। কারুর গো মড়ক লেগেছে।

গঙ্গার জলে মেছো ডিঙিজোড়া আড়কাঠি হয়ে আছে। একজন বেঁটে বক্কেশ্বর চাকামুখো আর ভীম গুঁপো লোক থেলো হুঁকো টানতে টানতে এদিক পানে আসছে। একজনা কচুয়ান তার হাড়জিরজিরে ঘোড়াটির গা ডলছে। একটি ভয়ংকর মোটা আর ঠিকরে-কালো মেছুনি মাথায় ঝুড়ি আর আঁশবটি চড়িয়ে পান চিবুতে চিবুতে আসছে। সে সুমুখে কর্তাকে দেখে কিঞ্চিৎ জিভ কাটলে। তারপর হাতের রুলি আর খোঁপার কাঁটায় রোদ ঝামটে মাজা দুলিয়ে চলে গেল। যাবার কালে মাথার চুবড়িতে একটি কাক ঠুকরে উড়ে গেল। মেছুনি বাবুর দিকে পেছু ফিরে এক চক্ষু টিপে আধবুড়ি মদনবাণ হেনে বলে গেল, ওমা কী লজ্জা গো।

গিরিশবাবু গঙ্গার ধার বরাবর চলতে চলতে হঠাৎ দক্ষিণেশ্বরের দিকে চেয়ে আবার বিরূপাক্ষ নেত্র হলেন। পর পর মুখে ঘিনঘিনে কাঁচা নর্দমা বইয়ে পরমহংস মশাইয়ের গুষ্টির তুষ্টি করতে লাগলেন। মুখের আঁট বলতে আর কিছু রইল না। কিন্তু হল কী, এই সুমুন্দি বলেন তো এই মাটিতে ঢিপ ঢিপ করে গড় করেন। তারপর একসময় সিধে সটান বলে যেতে লাগলেন, বেটা বাঙাল সুরেন মুখুজ্যে, কেষ্টধন দত্ত আর আমি — এই তিনজনাতে মিলে একদিন থিয়েটারের পরে স্টার থিয়েটারের স্টেজে বসে খুব করে মাল টানলুম। তারপর আমাদের তিন মাতালেরই এক রা হল কী—না দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস মশাইকে দেখতে

যাব। তো সেই মাঝরাত্তিরে একখানা গাড়ি ভাড়া করে প্রায় দেড়টা-দুটোর সময়ে এসে দারোয়ানকে এক টাকা বখশিস দিয়ে কালীবাড়ির ফটক খোলালুম। ব্যাস্, আর পায় কে। তার পরে তো পরমহংস মশাইয়ের ঘরের দরজায় তিনজনাতে মিলে এই কিল মার — ওই চাপড় মার। পরমহংস তো তড়িঘড়ি দোর খুলে দিলেন। বুঝলুম তাঁর ঘুম ভারি পল্‌কা। ব্যাস্ — ভেতরে ঢুকে মশাইকে মধ্যিখানে দাঁড় করিয়ে আমরা দানাই নেত্য শুরু করে দিলুম। সে কী নেত্য রে শ্যালা। কিন্তু ওই শ্যালা কেষ্টধনটা, এমনি মাতাল আর এমনি বেরসিক যে গান ধরলে, রাধে গোবিন্দ বলো। জয় গৌর নেতাই বলো। আরে মুখ্যু, রক্তখাগী কালীর ঠ্যায়ে কিনা নিরিমিষ্যি রাধে-কেষ্ট। শ্যালা মাতাল জাতের বদনাম করে দিলো র‍্যা। যা হোক্ গে, এইরকম নাচনকোঁদন আর কেত্তন করে একেবারে রাত পুইয়ে দিলুম আমরা। তবে ফিরতি পথে কেষ্টধন বললে, দক্ষিণেশ্বরের ওই বামুনটির মতো প্রাণের ইয়ার আর দুটি দেখিনি। ও খুব উঁচুদরের ইয়ার।

গিরিশবাবুর বাড়ির পশ্চিমধারের দোতলার ছাতে মাদুর পড়েছে। বাড়ির পশ্চিমে খানিকটা ফাঁকা জায়গায়, পুকুরধারের বাঁধানো ঘাটে আর গাছগাছালির ডালে-পাতায় সন্ধেমুখো বাতাস ছেড়েছে। মাদুরে এসে জুটেছেন থিয়েটারের ভুনিবাবু — মানে অমৃতলাল বোস, ঈশেন ডেপুটি, ধর্মদাস সুর — আরও কত সব বাবু পঞ্চজন। নরেন্দ্র আসবে বলে তানপুরাটি পেতে রাখা হয়েছে। বাবুরা খোশগল্পো করছেন।

গিরিশবাবু একটু আগে মাদুরের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে বেড়ালের ঝগড়া অ্যাকটো করে দেখাচ্ছিলেন। বাবুর ধারাই অমনি। যা দেখেন সেটিই হুবহু ফটোক তুলে নেন। তা মাদুরে উপুড় হয়ে শুয়ে গিরিশবাবু মুখটা ওপর দিকে বেঁকিয়ে ডান হাত দিয়ে নুলো মারতে লাগলেন থেকে থেকে নানারকম বিদিকিচ্ছিরি শব্দ করে ম্যাঁউ ম্যাঁউ করতে লাগলেন। সেই না দেখে বাবুদের কী আমোদ। রসরাজ ভুনিবাবু তো গড়াগড়ি। গড়াতে গড়াতে তিনি কেবলই বলতে লাগলেন, একেই বলে গিরিশ দর্শন — গিরিশ দর্শন। সাধে কি আর আমি ওঁয়াকে গুরুদেব বলি। যেমনটি দেখবেন, তেমনটি করবেন। ঠিক যেন যমজ সন্তানটি। বলিহারি-বলিহারি।

ঠিক এমনি সময় নরেন্দ্র এসে উপস্থিত। সবাই হইহই করে উঠলে, গান বলো নরেন, গান বলো।

নরেন্দ্র জেব থেকে দোক্তা বার করে মুখে দিয়ে একটি মেয়েলি ঢং করে বললে, আমি গান জানিনি, মান জানিনি, খাই একপাত দোক্তা, হেঁসেল ঘরে পড়ে থাকি, বড়ো একখানা তক্তা।

গিরিশবাবু উঠে মাদুরের একপাশে বেশ জুত করে জেবড়ে বসলেন। চোখ দু-খানি চাকা চাকা।

নরেন্দ্র আবার বললে, বলি ভাবের তো অভাব নেই সংসারে। সব ছেড়েছুড়ে শেষকালে কি না বেড়ালের কোঁদল!

গিরিশবাবু চাকাপানা চোখ সরিয়ে এবার আধপোয়া শিবনেত্তর। ছাই উড়িয়ে আমি যে অমূল্য রতন খুঁজি ভাই। কোনটি যে মাথার কাঁটা, আর কোনটি পায়ের কাঁটা তা তো আমি বুঝিনি। হুঁ ধত্তে পারিনি যে।

নরেন্দ্র হুংকার পাড়লে, ঈশেনদাদা — বলি অ ঈশেন দাদা।

এক কোণ থেকে ঈশান সাড়া দেয়, আজ্ঞে দাদাবাবু।

নরেন্দ্র চোখ বড়ো বড়ো করে বললে, আমার মুখ থেকে গান নামা মাত্তর যেন তামুক ওঠে। এই বলে দিলুম, হুঁ।

আমি — এই ঈশেন — কুমোরের পো গিরিশবাবুর পান, জলপান, তামাক আর তাবত ভালোমন্দ কথার সাক্ষী। তা সেই আমি কি না ছোকরার এই মধুর ফরমায়েশের দিকে হাঁ করে চেয়ে চেয়ে ভাবতে লাগলুম দেখি এবার আমার বাবুটি কী করেন। মুদি, দোকানি, ফুলুরি-ওয়ালা, বেড়াল ডাক এইসব অনাছিস্টি ছেড়ে কর্তা এবার নরেন্দ্রর গানের ছবিখানি কেমন কায়দায় এঁকে নেন নিজ দেহে। তবে বুঝব তিনি কেমনধারা ফটো তুলিয়ে। বোঝা যাবে নাট্যাচার্যের এলেমের জোর কতখানি।

হুঁ, আমি নিতান্ত চাকর হয়েও বলছি এ-কথা।

তানপুরোর কান মুচড়ে বাঁধা হল। ভুনিবাবুই বাঁয়া-তবলা বাগিয়ে বসলেন। কানের পাশে তানপুরো চেপে নরেন্দ্র চোখ মুছল। টানা টানা অথচ খত্তালের মতন চক্ষু জোড়া আস্তে আস্তে ঝাঁপ ফেলল। নরেন্দ্র গাইতে লাগল।

গিরিশচন্দ্র দু-চোখ দিয়ে হাঁ করে নিজের রচিত সেই গানের ছবিখানা গিলতে লাগলেন। মুখের ভাব বলতে লাগল — এমন করেও তাহলে গান রচনা করা সম্ভব! এমন সুরেও কি গান গাওয়া সম্ভব! এমন গান তো বাপের জন্মে শুনিনি। বাঃ নরেন্দ্র বাঃ —

...অধীর অধীর যেমতি সমীর
অবিরাম গতি নিয়ত ধাই...
জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই
কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই...

আখ্যান সমাপ্ত

পাদটীকা : আখ্যান রচনায় ঋণ স্বীকারের চল নেই। তবু বলা দরকার, এখানে এই লেখক নরেন্দ্রনাথ দত্তের অনুজ মহেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে কিঞ্চিৎ ঋণগ্রস্ত।

আরব্য রজনী

কিন্নর রায়

সে শালার যেমন খব্বিশ জেন, তেমনি তার কড়া মাওলানা সায়েব। এটুকু বলে জুম্মান আলি সর্দার আকাশের দিকে তাকাল।

শেষ শ্রাবণে, কী আশ্চর্য — এতটুকু মেঘ নেই আকাশে। কড়া মাড় দিয়ে ইস্ত্রি-করা ঝকঝকে নীল আকাশ দেখলে মনে হবে বর্ষা আর নেই। রোদের দিকে তাকানো যায় না, এমন তার ঝাঁঝ। আকাশের দিকে তাকাতে তাকাতে জুম্মান দেখতে পেল ইলেকট্রিকের রুপোলি তারে গোটা তিনেক ডানা ছড়ানো লাল ফড়িং। তাদের পাখনায় শেষ শ্রাবণের চড়া রোদ।

সে তুমি যাই বলো, এ তোমার দোস্তুকে দিয়ে হত না। বলে ইমান শেখ জুম্মানের দিকে তাকাল। কাছাকাছি বয়েস দু-জনের। তা হবে ষাট পেরিয়ে পঁয়ষট্টি-ছেষট্টির কাছাকাছি। জুম্মান বেশ রোগা পাতলা। মাথা-ভরতি কাঁচা-পাকা চুল। পরনে ডোরাদার রঙিন লুঙি, টেরিকটের ছাই রং পাঞ্জাবি। সেই পাঞ্জাবির হাত গুটোনো।

আমার দোস্ত্ মানে? ইমান তার গালের ধূসর দাড়ি চুলকে নিয়ে জানতে চাইল। তা প্রায় ইঞ্চি দুয়েক লম্বা সেই দাড়ি। ট্রাম কোম্পানির চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর ইমান দাড়ি রাখছে।

নিজের বাঁ হাতের কবজিতে বাঁধা হাতঘড়িতে সময় দেখল জুম্মান। সবে সাতটা। এখনও আসবে সবজির খদ্দের। অ ভাই, চা বলবে! বলেই জুম্মান দাঁত কিট কিট করে উঠল।

ইমান বলল, তা বলে দিচ্ছি।

হ্যাঁ গো, ভিণ্ডি কত করে?

চল্লিশ টাকা পাল্লা কিনেছি। তোমার ঝন্যি পঁয়তিরিশ। নাও। নে ঝাও। বলে আবারও দাঁতে দাঁত ঘষে কিট কিট কিট কিট শব্দ তুলল জুম্মান।

যে-বউটি ঠ্যাড়শ দর করছে, তার বয়েস বছর আঠাশ-তিরিশ বড়োজোর। কপালে বড়ো করে সিঁদুর টিপ। দু-হাতে শাঁখা। চুড়ি।

আর পটোল?

নে যাও। চল্লিশ টাকা পাল্লা। সেও খালি তোমার ঝন্যি।

বউটি খানিকটা চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে ঝুড়িতে-রাখা চালতার দর জানতে চায়।

কুড়িটা নেবে। ঝদি কুড়িটা নাও তা-লে পনেরো টাকা।

বারো টাকা হলি নিতি পারি।

নাও। নাও। বেলা বাড়ছে। বলে জুম্মান তাড়াতাড়ি নীচু হয়ে বড়ো ঝুড়ি থেকে তুলে চালতা গুছোতে থাকে। চালতা গুছোতে গুছোতে দাঁতে দাঁত ঘষে কিট কিট কিট কিট করে।

ইমান শেখের কানে শব্দটা গেলে ইমানের মনে হয় এ-শালার এক ব্যায়রাম জুম্মানের। কিচুতেই ওষুদ পালা করবেনা। কী যে শালা দাঁতে দাঁতে ঘষাঘষি করে! খালি কিট কিট কিট কিট।

বউটি এক পাল্লা পটোল নেয়। কুড়িটা চালতা। তার পর জানতে চায়, ও মেসো, তুরুল কত করে!

নাও কুড়ি টাকাই নাও এক পাল্লা।

দাও — তা-লে এক পাল্লা। বউটি তার আঁচলে গেরো দিয়ে রাখা টাকা বের করে গুনতে থাকে। নিজের সামনে রাখা লম্বাটে বড়ো খাতায় শুধু রিফিল দিয়ে কেনা-বেচার হিসেব লেখে জুম্মান।

সবজি বিক্রির ফাঁকে খব্বিশ জেন আর দক্ষিণ বারাসতের কড়া মাওলানা সায়েবের কিস্যাটি কিছুক্ষণের জন্যে চাপা পড়ে।

জুম্মান আলি সর্দারের মেজো ছেলে সালমান আলি সর্দারের বউ নুরিকে খব্বিশ জেন ধরে।

সে বলব্ কী তোমারে, বউমার তো খালি বুকি ব্যাতা। শুয়েই থাকে দিনরাত। মেয়েটারেও কাছে ঘেঁষতি দ্যায় না। তা সে বছর সাতের নাতনি আমার, সেও ভয়ে যায় না মায়ের কাচে। তার মা ঝ্যান কেমন কেমন। সোংসারে মন নি। রাত-বিরেতে ঘর থেকি বাইরি ঝেতি চায়। তোমারে বল্‌ব কী! শ্বশুর আমি, শরম লাগে — সালমানের সঙ্গে তার সোয়ামি-স্ত্রীর সম্পর্ক নি। এক বিচানায় শুতি পর্যন্ত চায় না। বলে আমার শরীল খারাপ। আমি আলাদা শোব।

এতো সেই খব্বিশ জেনের কল ভাই। তোমারতো বলেই ছিলাম। দক্ষিণ বারাসতে বড়ো মাওলানা সায়েবের কাচে নে ঝাও। এ আমার দোস্তর কম্ম নয়।

তোমার দোস্ত মানে তো জবেদ আলি! দুর! দুর! সে খালি বড়ো বড়ো কত কয়। ফুঁক দিতি বললি দ্যায়, কিন্তু কোনো কাজে লাগে না। আবার বলে সে পরী আনতি পারে। একখানা নতুন গামচা, একখান নতুন লুঙি আর পঞ্চাশ টাকা, তাহলেই সে পরী আনবে।

হ্যাঁ! পরী আনা অত সোজা! কি করে ওই জাবেদ আলি। জুম্মার দিন মসজিদির সামনি বসে। হাত পাতে। দু-চার পয়সা ঝা পায়। ছয় ছেলে বুড়োর। ছেলেরা সব কাবিল। কেউ কাটের মিস্তিরি, কেউ ভ্যান চালায়। বুড়ো বুড়িরে কেউ দ্যাকে না। পেট চালাতি হয় তো।

সেই তো। কাজকাম কিচু নি। ফুঁকফাঁক দি দু-চার পয়সা, একখানা গামচা ঝদি হয়। সেই বুড়ো আবার গপ্পো বলে, তার নাকি ছিয়াশি বছর উমর। সে ঝখন তিরিশ, তার বিবি সাত — তকন নাকি শাদি হয়েচিল। গাল ভরা পাকা দাড়ি, নাটাখোটা মানুষ। কিন্তু অত বয়েস, সে দেকে বিশ্বাস হয় না।

না, না। অত বয়েস নয়। মিত্যে কতা — বলতে বলতে জুম্মান আলি সর্দার তার সামনে দাঁড়ানো বউটির কাছ থেকে হাত বাড়িয়ে পয়সা নেয়। এখনও বেশ কয়েকটা চালতা রয়ে গেল। আর কিছু কাঁচা বেল। সবজির এই এক সমস্যা বেলা বাড়লেই দর পড়ে যায়। ভাবতে ভাবতে জুম্মান তার গপ্পে ফেরে।

এনসানের দোকান থেকে দুটো কাচের গেলাসে চা দিয়ে গেছে। সেই গরম চায়ে ঠোঁট ছোঁয়াতে ছোঁয়াতে জুম্মানের মনে হয় মেজো ছেলের বউটা ঝ্যানো ক্যামন ক্যামন ছিল গত তিন-চার মাস। এই ইমানের পরী নামানো দোস্ত জবেদ আলি খাঁ-কে বাড়ি নিয়ে গিয়ে পানিপড়া-তেলপড়া, ফুঁকফাঁক করিয়েও কিছু হয়নি। ইমান নিজেও কিছু জানে। সে গিয়ে আমার বাড়িতে ভালো করে কথা বলার সুযোগই পায়নি বউমার সঙ্গে। কথা বলবে কী, জেন তারে আটকাচ্ছে। ওরা তো সব বুঝতে পারে আগে আগে। তো পরদিন ইমান আমাদের সবজি ঠেকে বললে হায় আল্লা, তোমারে বলব কী ভাই, আমি তো মনে মনে ঠিক করিচি তোমার বাড়ি গে দোয়া-দরুদ পড়ব, তো সে বলব কী ভাই, খব্বিশ জেন আমারে পড়তি দিলি তো! সে তো আমারে

ঘর থেকে তেড়িয়ে নে গেল। আর বলব কী ভাই তোমারে, রাতে তো চোকিতে একলা শুই। বিবিটা মরে গেল — ছ-মাসের অত চেষ্টা, ডাক্তার-হাকিম গুলে খাইয়ে, ওষুদ পালা করি, হাসপাতাল — কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ, কিচুতেই কিচু হল না। সেই মরেই গেল। আমারেও মেরে গেল। ব্যাটাবেটিরা সব সেয়ানা সেয়ানি, তাদের শাদি বালবাচ্চা সোমসার, আমার দিকে নজর দেয়ার সময় কই! তা না দিক সে।

চোকির ওপর আমি তো একা শুয়ে। অনেক রাত। হঠাৎ ঘুম ভাঙতে ঘরের মদ্যি মোষের গোন্দ। কী গ্যাস বাবা। কী গ্যাস! গা পাক দে বমি আসে। বুঝলুম ঘরের ভিতরি সে এয়েচে। এসে পাক মারতেচে মুশুরির চারদিকে। কিন্তু আমিও তো দোয়া-দরুদ পড়ি, বিছানা বন্ধন করি শুইচি। সে খব্বিশ আসবে কী করি আমার কাচাকাচি। কিন্তু পাক মারতেচে মুশুরির চারপাশে। আগুন দে তৈরি জেন। সারা শরীল আগুনের। মাতায় শিঙ। এদেরই বউ পরীরা। ঝখনতখন যেমন খুশি চেহারা ধরতি পারে। সাপ হতি পারে, কুকুর, পাকি, মোশা, মাচি। এই যে মিষ্টির দোকানে অ্যাত মাচি! সব তো জেন। মাচি হয়ি মিষ্টি খায়। কেউ ধরতি পারে না। মাদ্রাসায় তালিম নেয় জেনের ছেলেরা। সকলের নামাজ হয়ে যাওয়ার পর মসজিদে নামাজ পড়তে আসে। কিন্তু সব আয়াত তারা পড়ে না। বাদ দে দে পড়ে। সবটা পড়লি তো খতম। আল্লা পাকের নাম নিলি তারা ধ্বংস হয়ে ঝাবে। ওই জন্যি কোরান শরিফের সব পারা পড়ে না। মাদ্রাসায় পড়া জেনের ছেলেরা সাপ হয়ি খেলা করে। জোড়া সাপ। ঝোপের ভিতরি সাপ দেকে ঝদি ঢিল ছোঁড়ে কোনো বাচ্চা, ব্যস, তার তো হয়ি গেল। তারে পাকি করে খেজুর গাচের উপরি রেখে দেলে তিন দিন তিন রাত। ছেলে গায়েব। ছেলে গায়েব। খোঁজ খোঁজ খোঁজ।

শেষ অবদি দক্ষিণ বারাসতের মসজিদের সেই বড়ো মাওলানা সায়েবের খপর দেয়া হল। যারে তারে খপর দিলি তো হবে না। এ এঁদিপেঁদি এনসানের কাম নয়। মাওলানা সায়েব এলেন। সবই বুঝলেন। বন্ধন করলেন। দোয়া-দরুদ পড়ে, ফুঁক দে সেই খেজুর গাচ থিকি নামিয়ে আনলেন পাকিরে। তার পর সে পাকি ছেলে হল। জেনেদের — যারা সাপ হয়ি খেলছিল ঝোপ-জঙ্গলের ভিতরি, তাদের ডেকে তিনি ধমক মারলেন। জেনেরা তাদের গোনাহ্ কবুল করলে।

এমন সব কিস্যা ডালে পাতায় হাত-পা মেলতে মেলতে ব্রহ্মপুরের বাতাসে ছড়ায়। ব্রহ্মপুর বটতলায় জিনেদের গল্প, হুর পরিদের কিস্যা সকাল-বিকেল পাখনা মেলে। আল্লাতালা মাটিদে ইনসান বানালেন। আর আগুন দে জেনেরে। সেই জিন হাসিল করতে পারলে অনেক ক্ষমতা। কত কত টাকা পয়সা জিনেদের কাচে। আর আচে অনেক ধনরত্ন। ইচ্ছে হলে বন্দ সিন্দুক, বাক্স প্যাঁটরা থেকে টাকা-পয়সা, সোনাদানা সরাতে পারে জিনেরা। বাইরে তালা ঝ্যামন কে ত্যামন। ভিতরি মাল নেই। তাদের ছেলেরা মাদ্রাসা-মকতবে পড়ার সময় শুয়ে শুয়ে মাটিতে হাত বাড়িয়ে পেড়ে আনতে পারে অনেক উঁচুতে থাকা কেতাব। মাদ্রাসায়-পড়া অন্য পড়ুয়াদের কেউ সেই ব্যাপারটা দেখলে মাওলানা সায়েবরে জানালি তিনি বলেন, চুপ চুপ। এসব নিয়ে বেশি কতা বলা উচিত নয়। যা দেকেচ দেকেচ — চেপে ঝাও। পাঁচকান করার দরকার নি!

এসব ভাবতে ভাবতে জুম্মান আলি সর্দার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল সেখানে রোদ মুছে গিয়ে শ্রাবণ মেঘ ফিরে আসছে।

তারপর কী হলো ভাই? ইমান জানতে চায়।

কী আবার হবে! অটোয় তুলি বউমারে তো নে ঝাওয়া হল দক্ষিণ বারাসত। সেই মাওলানা সায়েবের ঝেকানে খুব নাম। দূর দূর থেকে লোক আসে। তেল-পড়া, পানি-পড়া নিতি। সব হসপিটাল ফেল কেস তার কাচে। ঝেকানে হসপিটাল ফেল, সেকানে মাওলানা সায়েব আচে। একজনের ব্যাটার মুকির বোল ফুটিয়ে দেলে। সেকেনে সব ডাক্তাররা ফেল মেরে গেচে আগে। মাওলানা সায়েব বোবার কতা ফোটালেন। তো তখন সেই ছেলের বাপ একতলা পাকা বাড়ি করে দিলে মাওলানা সায়েবের একে জেন হাসিল-করা এনসান, তার ওপর মাস্টার। আবার কবিরাজও। অষুদ পালা দ্যায় — গাচ-গাচড়া, জড়ি-বুটি, শুদু তেলজল মাটি পড়া আর ফুঁক নয়। তিনটে জেন পোষা আচে তার। তা দিয়ে নানান কাজ হয়।

তাহলে তো সে ভারি গুণী লোক গো ভাই। বলে ইমান বড়ো ঝুড়িতে রাখা সবুজ সবুজ চালতাদের দেখে। আর ক-দিন পর পেকে উঠবে। তখন তার রং, স্বাদ, গন্ধ — সবই আলাদা। বউটা পাকা চালতার অম্বল বড়ো ভালোবাসত। আজ ছ-মাস হল সে কব্বরে। রাতে চৌকিতে একা একা শুয়ে এপাশ-ওপাশ করি। ঘুম আসে না। মশারির বাইরে জেন পাক খায়। খব্বিশ জেন। তার গায়ে মোষের গোন্দ। সে আমার কাচে ঝানতি চায়, কেন আমি সালামানের বউ নুরিরে জেন কাটানোর দোয়া-কলমা শোনাতে গেলাম! রীতিমতো কৈফিয়ত। ভাবতে ভাবতে ইমান দেখতে পায় সামনের রাস্তা দিয়ে সোবরাতের বড়ো মেয়ে তহমিন যাচ্ছে। ও বাবা, মেয়ের আবার চোকি চশমা। বাবুদের মেয়েদের মতো ঘুরিয়ে শাড়ি পরা। তহমিনা সম্পর্কে নাতবউ হয়। জব্বারের ছেলের বউ।

অ নাতবউ! কোতায় যাচ্ছিস! ইনাম হাঁক দেয়।

তহমিনা উত্তর দেয় না।

ওঃ ঠমক কত! পাছা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চলেচে। ভাবতে ভাবতে ইমান আবার ডাক দেয়, অ নাতবউ!

কী বলো। বলেই তহমিনা ঘুরে দাঁড়ায়।

চললি কোতায়।

দোকান যাব।

ঝাও। তবে তার আগে একটু আমার কাচ থেকি ঘুরে ঝেও।

একন সময় নি। বলো, ডাকলে কেন?

এমনি। ঝাও ঝাও।

ঢ্যামন। মনে মনে বলে তহমিনা। বুড়ো বয়েসে বউ মরলি যা হয়। তার পর হাঁটতে থাকে সামনের দিকে।

এর ওপরের নাতবউটা — সুরাইয়া বেশ ভালো। রস করা যায় তার সঙ্গে। এই তো ক-দিন আগে বাজারে তারে ধরি ফিসফিসোয়ে বললাম, অ নাতবউ, তোর পেট ফুলচে কেন? নাতিতো বাইরে, চাগরি করে!

তা সেই কতা শুনি মুকি আঁচল দে সুরাইয়ার কী হাসি! তার পর বললে, ঢ্যামন বুড়ো, তোমারে আমি আজ — বলেই আমার পিঠে দুটো কিল। আহা, কী মিষ্টিই যে লাগল মার।

আর এসব ভাবনা কথাবার্তার ফাঁকেই জুম্মান আলি সর্দার দেখতে পেল আকাশের মেঘলা ছায়া গায়ে মেখে জবেদ আলি খাঁ দাঁড়িয়ে।

এই যে এসে গেচে দোস্ত্। জুম্মান জবেদ আলি খাঁ-র দিকে আঙুল দেখাল।

ইমান বলল, এসো দোস্ত্। বোসো তা আমার দোস্তানির খবর কী?

সে ভালোই আচে।

তুমি।

আচি একরকম।

একরকম কেন! তোমার গা দিয়ে ঝে নুরানি বেরুচ্চে তাতে মনে হয় কাল রাতে দোস্তানির সঙ্গে বেশ পেয়ার-মহব্বত —

আরে না, না — ওসব এখন আর কোতায়! ছিয়াশি হল। তা ছাড়া সময় কই! হুর-পরীরা আচে না। তারা থাকতি নিজের বিবি!

তোমার ছিয়াশি হয়নি। জুম্মান বলে উঠল।

হয়েছে ভাই। জবেদ আলি গলা অনেকটা নামিয়ে বলল।

ছি ছি ছি দোস্ত্। হুর-পরি নে খেল আর ঝাই কর, নিজের বিবিরে মনে রাকবে না?

ইমানের একথায় জবেদ আলি কোনো জবাব দিল না।

না, না, তুমি বাড়াচ্চ। তুমি আমাদের বয়েসি হবে।

ইমান জবেদ আলি খাঁ-র দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল নীল আর সবুজে চেকদার আধময়লা লুঙির ওপর সবুজ ফুলহাতা পাঞ্জাবি। তার পিঠ, ঘাড়ের কাছে মইশের কালচে ছোপ। সাদা দাড়ি বেশ লম্বা। মাথার সাদা টুপিতে মইশের কালো কালো অজস্র ফোঁটা। গায়ের রং বেশ কালো।

খচমচ খচমচ করে পান চিবোতে চিবোতে জবেদ আলি খাঁ জুম্মানের পাশে চটের বস্তার ওপর থেবড়ে বসল। তার পুরু কালো ঠোঁট পানের রসে বেশ লাল। অনেকখানি লম্বা নাক জবেদের। কিন্তু নাকের মাথাটি ভোঁতা। তেমন লম্বা নয়, বরং তাকে বেঁটেই বলা যেতে পারে। তবু বেশ খানিকটা সামনে ঝুঁকে, হাতের সরু বাঁকা বাঁশের লাঠির ওপর ভর দিয়ে জবেদ আলি যখন দাঁড়ায়, তখন মনে হয় তার বয়েস অনেক।

পায়ের কালো রবারের ক্ষয়া চপ্পল নর্দমা-ঢাকা ঢালাই ঢাকনার গায়ে রাস্তার ওপর নামিয়ে চটের বস্তার ওপর দু-পা তুলে আবার উবু হয়ে বসল জবেদ আলি খাঁ।

তারপর দোস্ত্, দোস্তানির খবর বল। আবারও জানতে চাইল ইমান।

সে আচে ভালোই। রাতে আমি একলা চোকিতে শুই। তোমার দোস্তানি ছোটো নাতিরে নে নীচে, মেঝের উপরি বিছানা পেতে। একা না থাকলি জেন পরী আসবে কেন আমার কাচে? আমিই বা তাদের কাচে যার কীভাবে?

সে কী দোস্ত! নিজে চোকিতে শুয়ে বিবিকে নীচে শোয়াও! আমি তো বিবিরে ছাড়া একদিনও — বলতে বলতে চোখে জল এসে গেল ইমানের।

আরে, একলা না শুলি হয়! গহিন রাতে পরী আসে যে। রাত বারোটার পর। আমারে নে পরীরা জিন-পরীদের মুলুক মোদা কাব্বেরে নে ঝায়। সে এক আজব দেশ দোস্ত।

পরীদের মুলুকে তুমি গেচ। মিত্যে কতা। জুম্মান আলি সর্দার বেশ ঝাঁঝিয়েই বলে উঠল। তার পর নিজের দু-পাটি দাঁত ঘষে শব্দ তুলল — কিট কিট কিট কিট।

গেচি। গেচি ভাই।

ফের মিত্যে কতা!

সত্যি ভাই। কত বার গেলাম মোদা কাব্বেরে। এই উঠলাম। এই গেলাম। পাঁচ মিনিটও লাগে না। সব ধু ধু করতেচে চারপাশে। গাচপালা — কিচু নি। শুধু ফাঁকা ময়দান। এই হল গে মোদা কাব্বের — পরীদের রাজ্য।

থামবে তুমি! জুম্মান আবারও ধমক মারল জবেদ আলিকে।

পান রসে টুকটুকে কালচে ঠোঁট। সুপুরি খয়ের চুনে ক্ষয়ে গেছে দাঁতের পাটি। হাঁ করলে সেই ক্ষয়া কালচে পাটি দেখলে গা-হাত শিরশির করে। সরু সরু দু-হাতে অজস্র শিরা জেগে আছে। সেই হাত নাড়িয়ে জবেদ আলি খাঁ বলল, সেবার এক শাঁকিনির পাল্লায় পড়েছিলুম।

গল্পের গন্ধ পেয়ে ইমান বলল, কদ্দিন আগে দোস্ত্?

তা হবে, গেল বচরই হবে। সেই যে জ্বরে পড়লুম না — গেল বার শীতে।

কী করে পড়লে?

সে এক শাঁকিনি রাস্তায় পেচু ধরে নিলে আমার।

কেন, তোমার পেচু ধরলে কেন?

দক্ষিণ বারাসত থেকে ওজাগিরি করে ফিরচি। হায় আল্লা! পেচনে সেই শাঁকিনি লেগে গেল।

দিনের বেলা, না রাতের বেলা?

পটোল কত?

খরিদ্দারের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে জুম্মান বলল, চল্লিশ টাকা পাল্লা।

দু-পাল্লা নিলি?

ওর চে কম হবে না বাপু।

মেয়েটি সামান্য নিচু হয়ে পটোল বাছতে বাছতে বলল, দাও। দু-পাল্লা দাও।

পয়সা কিন্তু নগদ দিতে হবে।

তাই দেব রে বাপু। আগে মাল দাও তো।

হ্যাঁ, তা কী হল দোস্ত্ — তার পর? বড়ো পাল্লায় পটোল গুছোতে গুছোতে জানতে চাইল ইমান শেখ।

দাঁতে কিট কিট কিট কিট শব্দ করতে করতে জুম্মান বলল, নাও, ভালো করে মাল মাপো তো আগে।

পাল্লায়, সাজানো পটোল। মেয়েটি গাছকোমর বেঁধে দাঁড়িয়ে। আড়চোখে সেদিকে তাকিয়ে ইমান বলল, নাও গো বৌদি। তোমার পটোল।

মেয়েটির শ্যামলা মুখে, নাকের পাটায় ঘামের টলটলে দানা। নাক তেমন চোখা নয়, কিন্তু একটি নাকফুলে বেশ ঢলঢলে হয় উঠেছে মুখখানি। আঁচলে মুখ মুছে মেয়েটি বলল, আরও দুটো লাগবে।

ঠিক করে ওজন করে দাও। বলতে বলতে জুম্মান আবারও শব্দ করে দাঁত বাজাল।

মুখ বাড়িয়ে নর্দমার ধারে পানের পিক ফেলল জবেদ আলি। একটা শালিখ অনেকক্ষণ ধরে এইসব ব্যাপার লক্ষ রাখতে রাখতে হঠাৎই একটি ছোটো উড়ানে একটু দূরে গিয়ে বসল।

পটোল মাপা শেষ করে মেয়েটির সঙ্গের ভ্যান রিকশায় তুলে দিয়ে ইমান বলল, বলো দোস্ত্। তারপর?

কী যেন বলছিলুম?

শাঁকিনি। দক্ষিণ বারাসত থেকে ফিরছ তুমি।

হ্যাঁ। সে রাত হয়ে গেচে বেশ। শালি শাঁকিনি আমার পেচুন নেচে। কিচুতেই পেচু ছাড়ে না। শেষে আমি বললুম, আমি তোর মামা। তকন সে পেচু ছাড়লে। হলে হবে কী! শাঁকিনির হাওয়া-বাতাসে ধরে নিল আমায়। জ্বর বলে জ্বর। এক-দিন, দু-দিন নয়, আঠেরো দিনের জ্বর। সে একেবারে কাহিল করে ছাড়ল আমায়। বলতে বলতে শিরা বের-করা কালচে হাত তুলে পাঞ্জাবির নেমে আসা হাতা টেনে গুটিয়ে ওপরে তুলল জবেদ।

এবার মাল তুলে দেব। পানি আসবে।

জুম্মানের সে-কথায় তেমন করে কান না দিয়ে ইমান বলল, তুমি ঝে বলেচ আমায় একটা পরী দেবে! সত্যি তো, নাকি — হ্যাঁ, দেব তো।

আল্লার কিরে?

আল্লার কিরে।

কসম খাচ্ছ?

খেলাম তো। বলছি তো বেশি কিচু লাগবে না। একটা নতুন গামচা, নতুন লুঙি একখানা। আর পঞ্চাশটা টাকা।

এ কিচু পারবে না। খালি মিত্যে কতা কয়। নইলে কতবার আমার মেজো বউমা, সালমানের বউরে ফুঁক মারলে। পানি-পড়া দেলে। কিচু হল কী! সেই মেজো বউমার বুকি ব্যাতা। ব্যাটার কাচে ঝায় না। নাতনি আসে না বউমার কাচে।

তারপর তো তুমি তারে নে গেলে দক্ষিণ বারাসতে মাওলানা সায়েবের কাচে?

হ্যাঁ নে গেলাম তো। মাওলানা সায়েব মাটির নতুন কলসি নে ঝেতে বলেছিল। সঙ্গে নতুন গামচা। বউমা তো কিচুতেই ঝেতি চায় না। জোর করতি হল। বউমারে দেখিই মাওলানা বললে, কাল রাতে তো একেবারে ঘুমুতি পারনি মা। বড্ড পেরেশানি গেচে। খুব জ্বালাতন করেচে। সব ঠিক হয়ে ঝাবে মা। বউমা তো কিচু বলে না। সে একটু সরে বসল। এসব কী করে ঝানাল মাওলানা সায়েব! কে ঝানাল তাকে? বলো ভাই!

এই তো কতা ভাই। কে তাকে ঝানাল এসব! সবই আল্লাতালার মেহেরবানি। তার মেহেরবানিতে সব হয়। চোখ বুজলে কিছুই থাকবে না ভাই। ঝাবেও না কিচু সঙ্গে। ঝাবে ঝা, তা হল আমোল আর ইমান। কি বল ভাই! বলতে বলতে ইমান আলি তার দাড়িতে হালকা করে আঙুল ছোঁয়াল। তার পর বলল, দক্ষিণ বারাসতের মাওলানা সায়েবের জেন হাসিল করা আচে না।

একটা নয়, তিনটে। তার মধ্যে একটা আবার জেনের বাদশা। সে আবার সব জেনেদের বিচার করে। শাস্তি দেয়। জেনের বাদশার হুকুমে চলে সব জেনেরা।

তো সেই মাওলানা সায়েব পানি-ভরা মাটির নতুন কলসি ঘরের ভিতরি আনিয়ে রাকালে। টালি ছাওয়া বেড়ার ঘর। বউমা তো ঘরের এককোণে বসা। চুপচাপ একটা শাদা কাগজে পেন দে সে একটা মানুষের মতো কী আঁকলে। হ্যাঁ, তার চেহারা এনসানের মতোই বটে। বলতে বলতে দাঁত বাজাল জুম্মান। তার পর সেই ছবির চারপাশে আরবি না উর্দুতে কী কী সব দোয়া-কলমা লিখলে মাওলানা সায়েব। তারপর সবাইকে দেকিয়ে সেটা কলসির পানিতে ডুবিয়ে দিলে। এরপর ঘরের সবাইকে জিজ্ঞেস করলে, ভালো করে দ্যাকো সবাই, চোকে

কিচু পড়চে? সবাই ঘাড় নাড়ল। — না, দেকচি না তো। কিচুই দেকচি না। তখন মাওলানা সায়েব কলসির পানির ভেতর তার হাত ডোবাল। তার পর পানি ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে সুরা পড়তে পড়তে বলতে লাগল, সে শালার জেন বড়ো খব্বিশ জেন। কিচুতেই আসতে চাইচে না। কিন্তু শালারে আমিও ছাড়ব না। বলতে বলতে মাওলানা পানিতে ফুঁক মারে আর সুরা পড়ে। পড়তে পড়তে পড়তে হঠাৎ মাওলানা সায়েব থামল। তারপর বলল, এবার দ্যাকো তো সবাই, কিচু দেখতে পাও কি না পানিতে। মাওলানা সায়েব এ-কতা বলতে না বলতেই টালির চালের ওপর ধুপুর ধাপুর শব্দ। ধুপ ধাপ ধুপ। কে যেন নাচতেছে টালির ওপর।

তার পরই সব চুপ।

আমরা কলসির পানিতে চোক রেকি দেকলুম একটা বড়ো পোকার মতো কী একটা যেন চলতেচে। পানির ভেতর ঘুরতেচে। এসব করার আগেই মাওলানা সায়েব সালমানের হাতে একটা আতরের শিশি দেচিল। পোকার মতো কী একটা ঝ্যান নড়তেচে দেকে মাওলানা সায়েব চিৎকার করে বললে, পানিতে আতর ঢালো। আতর ঢালো।

বলার সঙ্গে সঙ্গে সালমান শিশি উপুড় করে দিলে কলসির পানিতে। ব্যস, আর যায় কোতা!

আগুন জ্বলে উঠল তো! জবেদ আলি খাঁ জানতে চাইল।

তোমার দোস্ত্ সব ব্যাপারে কতা বলে। একটু চুপ করে থাকতে বলো তো ওকে।

দোস্ত্, একটু পরে কও। শেষ করতে দাও জুম্মান ভাইরে। বলে ইমান তার দাড়িতে আবারও আঙুল ছোঁয়াল।

হ্যাঁ, জ্বলে উঠল আগুন পানির ভেতর। কলসির পানির ভিতরি আগুন। আর তার সঙ্গে কী বদ গোন্দ। গ্যাস। মনে হতেচে শ্মশানের গোন্দ। মড়া পোড়া গোন্দ। মানুষ পোড়া গ্যাস। ঝ্যামন শ্মশান ড্যাঙার পাশ দে গেলি পাওয়া ঝায়। ধোঁয়া ধোঁয়া। ঘর ভরতি ধোঁয়া।

বাইরে ঝারা ছিল, তার পরে জিজ্ঞাসা করেচে, হ্যাঁ ভাই, ঘরে আগুন লেগেচিল?

সে যাই হোক গে ভাই, তার পর কী হল?

তার পর আর কী! আগুন ঝেই দপ করে লাপ দে উটল কলসির ভেতর থেকে মাওলানা সায়েব সঙ্গে সঙ্গে তার মুক বেঁদি দেলেন নতুন গামচা দে। বললেন জেন বাবাজি এবার ধরা পড়েচে এর ভিতরি। পুড়ে মরল। তার পর গামচায় মুখ বাঁদা মাটির কলসি নে মাওলানা সায়েব হাঁটা দিল কব্বরস্তানের দিকে। সেখানে কব্বর দিয়ে দেবে খব্বিশ জেনের। ব্যস, জেন খতম।

তোমার বউমা?

ভালো আচে। তিন সপ্তাহ ওষুধ দেচে। মাওলানা সায়েবের নিজির জড়ি-বুটির ওষুদ।

হ্যাঁ ভাই, তা খরচা-পাতি ক্যামন হল?

সে তুমি এক টাকাও দিতে পারো। আবার এক-হাজার টাকাও। খুশি হয়ে ঝা দেবে। দিলে ঝা চায়।

তুমি কত দিলে?

বেশি না। দু-শো টাকা। বলেই আবারও দাঁতে দাঁত ঘষে শব্দ করল জুম্মান। তার পর বলল, নাও ভাই, হাতে হাতে মাল তুলে দাও। শালার পানি আসতেচে ঝেঁপে।

জুম্মানের কথা শুনে সবজির ঝুড়ি তোলায় মন দিল ইমান।

নিজের ঝোঁকা শরীর সরু বাঁশের লাঠিতে ভর দিয়ে তুলে ধরতে ধরতে জবেদ আলি মিন মিন করে বলল, আমাকে কেউ পয়সাই দ্যায় না। ফুঁক দাও, ঝাড়াও, তেলপড়া, পানিপড়া — সব বিনি পয়সায়। এক-কাপ চা-ও কেউ আদর করে খাওয়ায় না। তা হলি জেন ঝাবে কী ভাবে! নিজের মনেই এসব বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল জবেদ আলি খাঁ। আর তখনই ঝমঝম ঝমঝম করে বৃষ্টি এল।

সেদিন সন্ধ্যায় ঝমঝম ঝমঝম করে কয়েক পশলা হয়ে যাওয়ার পর আকাশের গা একেবারে ঝকঝকে তকতকে। তার পর একখানা গোল চাঁদ উঠে এলে মনে হল রুপো রঙের বিন্দির টিপ পরে হাসছে আকাশ। জলে-ভেজা কামিনী ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে মাঝে মাঝেই দমকা হাওয়ার টানে।

ঘরে শুয়ে মশারির ভেতর কিছুতেই ঘুম আসছে না ইমান শেখের।

ঘুম অনেকদিনই একটু একটু করে কমেছে। তার পর শেষ অবদি বউ মারা যাওয়ার পর একেবারে উবে গলে যেন। কিছুতেই আসতে চায় না। শুয়ে শুয়ে খালি এপাশ-ওপাশ। ওপাশ আর এপাশ।

তখনই মশারির বাইরে কার যেন ছায়া নড়ে উঠতে দেখল ইমান শেখ।

কে — খুব আস্তে আস্তে চাইল ইমান।

দোস্ত্ — আমি। চাপা গলায় ফিসিফিসিয়ে বললে কে যেন।

গলা শুনে পরিষ্কার বুঝতে পারল ইমান তার ঘরের ভেতর জবেদ আলি খাঁ।

দোস্ত্! তুমি! কথাটা বলেও ইমানের ঠিক মতো বিশ্বাস হল না। জবেদ আলি খাঁ এখানে! তার ঘরের ভেতর।

দোস্ত্! সত্যিই তুমি? খোয়াব দেখছি না তো। বলতে বলতে মশারির ভেতর উঠে বসল ইমান।

না দোস্ত। খোয়াব নয়, সত্যিই আমি! জবেদ আলি যেমন বলে, তেমনই নিচু গলায় বলল।

তুমি এলে কী করে? এ-ঘরের দরজা তো ভেতর থিকি বন্দো।

জেন হাসিল করলি হয়। জাদুকর জেনের পিটে চড়ি সেঁদোলাম তোমার ঘরে।

তবে যে জুম্মান ভাই বলে, সব তোমার বুজরুকি। জেনফেন কিচুই তোমার পোষা নি। পয়সা কামাবার জন্যে, ভিখ্ করার ফিকিরে এসব তুমি করো।

পান-খাওয়া কালচে, লাল ঠোঁটে হাসল জবেদ আলি। তার পর সামনে আরও খানিকটা ঝুঁকে বলল, জুম্মান ঠিক জানে না।

এত রাতে কেন এলে তুমি? একটু যেন অস্বস্তি-মাখা সুরেই বলে উঠল ইমান।

সামনে ঝুঁকে বাঁশের সরু লাঠিতে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল জবেদ আলি। তারপর ফিস ফিস করে বলল, তোমারে জ্যান্ত পরী দেব দোস্ত। জ্যান্ত পরী। আমার নতুন লুঙি, গামচা, পঞ্চাশ টাকা — কিচুই লাগবে না।

সত্যি সত্যি পরী দেবে তুমি দোস্ত্? বলতে বলতে বিছানার ওপর বাবু হয়ে বসা ইমান উত্তেজনায় কোলের ভেতর মাথার বালিশ টেনে নিল।

সত্যি। সত্যি পরি দেব দোস্ত্ তোমায়। তুমি আমার দোস্ত্। বিবি কব্বরে চলে গেচে তোমার। বড্ড কষ্ট ওহো, বড়োই তকলিফ। এই বয়েসে বিবি চলে ঝাওয়া।

বাইরে চাঁদের আলোয় থই থই চরাচর। বাতাসে মিশে আছে কামিনী ফুলের বাস। ইমানের হাত ধরে জবেদ আলি দরজার খিল না খুলেই ইমান শেখের উঠোনে এসে দাঁড়াল।

বড় একখানা চ্যাপটা রাজভোগ হয়ে চাঁদ ভেসে আছে আকাশে। সেদিকে তাকিয়ে বড়ো করে শ্বাস পড়ল ইমান শেখের। তখনই কামিনী ফুলের গন্ধের সঙ্গে কোথা থেকে যেন উড়ে আসা যুঁই ফুলের ঘ্রাণও মিশে গেল।

মাথার ভেতর কেমন যেন একটা সুখের ঝিমঝিমে ভাব ইমানের।

একটু দূরে নিমগাছতলায় ঝুপসি মতো আলো আঁধারিতে কে যেন দাঁড়িয়ে।

ও কে দোস্ত? ইমান জানতে চাইল।

হাতেমতাই। খুব সহজ করে জবাব দিল জবেদ আলি।

হাতেমতাই মানে কেতাবের —

হ্যাঁ, দোস্ত। হাতেমতাইও ঝাবে মোদা কাব্বেরে। তুমিও ঝাবে। বলতে বলতে শিরা-জাগা কালো কালো হাতে শক্ত করে ইনামের হাত ধরে ফেলল জবেদ আলি খাঁ।

কোন বাড়ি কার দেশ

কল্যাণ মজুমদার

এই উপন্যাসের প্রথম পর্ব গত বছর (১৪০৭) বিশেষ শরৎকালীন সংখ্যা 'বিভাব'-এ প্রকাশিত হয়েছিল। এবারে দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশ পাচ্ছে। এবারেও উপন্যাসটি সম্পূর্ণ হল না। 'বিভাব' সম্পাদক উদার প্রশ্রয় দেখালে শেষ পর্ব আগামী কোনো সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। প্রসঙ্গত নিবেদন করি, আমি নিছক একটি উপন্যাস রচনার চেষ্টা করেছি। কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্রের উপস্থাপনা প্রাসঙ্গিক সময়কালের জন্য অনিবার্য ছিল। অন্য সব চরিত্র ও ঘটনা সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

কোন বাড়ি কার দেশ

(দ্বিতীয় পর্ব)

কল্যাণ মজুমদার

বিকেল হলেই এ-সময়ে বাতাসের গায়ে হিম-ছোঁয়া লাগে। রোদের মেলা ফুরোবার আগে আকাশে যে রং ছেয়ে যায় তার ঢেউ আশেপাশের চোখে ধরা পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় যেন আগুন জ্বেলে দেয়। সেদিকে তাকালেই এক অস্ফুট আতঙ্ক বুকের মধ্যে দাপাদাপি করে। মনে হয় যেন বহ্নিমান দিগন্ত থেকে উড়ে আসবে আগ্রাসী উল্লাস আর হন্যমান প্রাণের আর্তনাদ। মাথার মধ্যে ঝনঝন করে কয়েদি স্মৃতি। স্মৃতি? নাকি শুরুর আগেই সাঙ্গ-হওয়া অষ্টাদশী যৌবনস্বপ্নের কঙ্কাল?

মাঝে মাঝে এখানে রাতে পাহাড়ে আগুন জ্বলে। জঙ্গল পুড়িয়ে চাষের জমি সৃষ্টির প্রথাগত প্রয়াস। এই নিরীহ তথ্যটি জানার আগে কী ভয়ই না পেয়েছিল! যমুনা তো প্রথমবার অজ্ঞানই হয়ে গিয়েছিল। এখন গত দু-বছরে দেখে দেখে প্রায় ধাতস্থ হলেও হঠাৎ করে আগুন জ্বলে উঠলে স্মৃতির পরিধি জুড়ে বিজলি চমকায়। কানে বাজতে থাকে কানাইয়ের বিহ্বল উচ্চারণ — কী আগুন! কী আগুন! দাউ দাউ জ্বলতেছে —

সময় মানুষকে পরিণত করে, অভিজ্ঞ করে। স্মৃতির ওপরে বিছিয়ে দেয় খড়কুটো, পলিমাটি। নিভিয়ে আনে শোকের দাহ। জ্বলন্ত অঙ্গার ধীরে ধীরে হয় ছাই। গতিশীল পৃথিবীতে জীবনকেও সময়ের উজানে বয়ে যেতে হয়। কেন? জীবনের বহমানতা থামিয়ে দেবার মন্ত্র কারো জানা নেই। তবে কি জীবন, কিছু দিন, মাস, বছরের যোগফল শুধু? স্থিরনিশ্চিত অন্তিম শূন্যতার লক্ষ্যে অনিবার্য যাত্রাই কি জীবন? আজকাল অহরহ এইসব প্রশ্ন মাথার মধ্যে ঘাই মারে। প্রশ্নগুলোর মুখোমুখি হয়ে টুনু বিস্মিত বোধ করে। কখনো কখনো বিচলিতও। দেড়-দু'বছর আগে চিন্তাও করতে পারত না যে এমন মৌলিক চিন্তা ওর মাথায় আসবে কোনোদিন। যেমন ভাবেনি কখনো চোখ খুললেই দেখবে পাহাড়, দেখবে না সবুজ মখমলে-মোড়া আদিগন্ত শস্যক্ষেত্র। দেখবে না বাবার মুখও। কোনো দুঃস্বপ্নেও তো ছিল না যে মাত্রই আটদিনের পরমায়ু নিয়ে আসবে জীবনের পরমপুরুষ!

বিগত দুটো বছর মা আর ওর যাত্রা এক, অভিজ্ঞতাও প্রায় একই। প্রায়; অবিকল নয়। টুনুর মাত্র আটদিনের বিবাহিত জীবন। যমুনার কুড়ি বছরের। টুনুর ছিল জীবন গড়ার স্বপ্ন। যমুনার ছিল গড়া জীবন ধরে রাখার আকাঙ্ক্ষা। দু-জনের স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা বিধ্বস্ত। অথচ দু-জনের বুকে কাটা হয় ভিন্নতর খাঁড়ি।

তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বেলে রোজকার মতো আজও টুনু বলে নিজেকে, তোমাকে শক্ত হতে হবে আরও। পায়ের পেশিতে আনতে হবে জোর। মেরুদণ্ডে আরও ঋজুতা।

শাঁখ বাজিয়ে প্রণাম সারে টুনু। ঘরে ঢুকে দেখে কানাই হ্যারিকেন জ্বালিয়ে দিয়েছে। ওর মুখে এক চিলতে হাসি ছলকায়। আজ আর কানাইকে বকতে হবে না এই সামান্য কাজটা করার জন্য। ও কেবলই ভুলে যায়। কতদিন বলার পর আজ ঠিক মনে রেখে করেছে।

— কানাই, টুনু ডাকে।

মা যমুনা সাড়া দেন — ওরে একটু দোকানে পাঠাইছি। এখনই আইসা পড়ব।

— হ্যারিকেন জ্বালাল কে?

দোকানটা একটু দূরেই। যাতায়াতে মিনিট কুড়ি লাগতে বাধ্য।

যমুনা ইতস্তত করে বলেন, সেই জ্বালাইতে গেছিল। দোকানে পাঠাইয়া আমিই জ্বালছি।

— মা, তুমি একেবারে কথা শোনো না। কতবার কইছি, এইসব ছোটো ছোটো কাজগুলা কানাইরে করতে দাও। তুমি একটু আরাম করো।

— আরামেই তো আছিরে মা! জমিজিরেত নাই, গোরু-ছাগল নাই, পুকুর-বিল নাই। আমটা বেলটা কলাটার জন্য চিন্তা নাই। তুই রাঁধস আর আমি খাই। আর কত আরাম লাগে?

— মা!

— নে, দাদুভাইরে নে। আমি এট্টু ঠাকুরঘরে যাই।

এতক্ষণ খেয়াল করেনি টুনু, নাতিকে পাতলা চাদরে জড়িয়ে বুকে গুঁজে রেখেছেন যমুনা।

— ওর কি শীত করছে, না ঘুমিয়ে পড়েছে?

—বাতাসে হিম হিম ভাব তো। তাই। হঠাৎ কইরা ঠাণ্ডা লাগলে — এখন সময়টা তো ভালো না।

সময়ের ভালো রূপ কবে দেখেছিল টুনু? বিয়ের আগে? নাকি দ্বিরাগমনে যেদিন পিত্রালয়ে ফিরে এসেছিল?

— এক মিনিট বসো। আমি কাপড়টা ছেড়ে আসি।

— এখন আবার কাপড় ছাড়বি ক্যান?

— মাস্টারমশাই আসতে পারেন আজ।

সারাদিন পরে-থাকা মলিন শাড়ি ছেড়ে একটা কাচা শাড়ি পরে টুনু। শেমিজ আর ছাড়ল না। শাড়ি অবশ্য শাদা থান, কালো পাড় দেওয়া। যমুনা অবশ্য তাও পরে না। পাড়হীন থান। শুধু। মা ও মেয়ের একইসঙ্গে থান পরা শুরু। বর্ডার পেরিয়ে এসে স্বাধীন ত্রিপুরায় পা রেখে স্বস্তির সন্ধান করার বদলে জীবনের নির্মম সত্যটা অনুধাবন করতেই মনে হয়েছিল জীবনীশক্তি আর কিছুমাত্রও অবশিষ্ট নেই। শোকের ও শূন্যতার গভীরতা আপন অনুভবে সঠিক নিরুপণের আগেই অন্যের হাতের নিষ্প্রাণ পুতুল হয়ে গিয়েছিল। সুরেনের দিদি ডলি, না কি অন্য কোনো অচেনা মহিলা, দায়িত্ব নিয়ে ভেঙে দিয়েছিল মা-মেয়ের হাতের শাঁখা, মুছে দিয়েছিল সিঁথির সিঁদুর। কানাইকে সঙ্গে নিয়ে ডলির স্বামী নীরদ গিয়েছিল থান কিনতে। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট যখন সারা দেশে উৎসবের রোশনাই, স্বদেশ-ভাঙা নেতাদের গলায় পুষ্পমাল্যের প্লাবন, তখন সশঙ্ক শূন্যদৃষ্টি, বোধবুদ্ধিরহিত দুই নারী, মা ও মেয়ে, আগরতলা শহরের এক কোণে শরীর আবৃত করেছিল অবিস্মরণীয় ক্ষণের অপরিবর্তনীয় উপহার শাদা থানে — যা হবে তাদের সারাজীবনের ইউনিফর্ম। তখন নিঃশব্দেও ঝরার মতো জলের আর সঞ্চয় ছিল না ওদের চোখে।

সেদিনের সেই অবিশ্বাস্য ঘটনার ঝাপসা ছবি মাঝে মাঝেই চোখের পর্দায় ভেসে উঠেই মিলিয়ে যায়। স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছে অনেক বিবরণ। নিজেও সচেতনভাবে ঝাঁকিয়ে, ফেলে দিতে চায় আড়ালে-আবডালে জমে-থাকা যন্ত্রণার নিদর্শন। কিন্তু পারে না। মুছেও মোছে না। যেন দুরন্ত পাখি তাড়া খেয়ে উড়ে যায় দূরের পাহাড়ে, আবার ফিরে ফিরে আসে ঠোঁটে খড়কুটো নিয়ে।

মার কাছ থেকে ছেলেকে কোলে নিয়ে টুনু বলল, পূজা সাইরা আসো। বেশি দেরি কইরো না।

দেরি না করতে বললেও টুনু জানে অন্তত এক ঘণ্টা এখন যমুনা ঠাকুরঘরে আবদ্ধ থাকবে। কী যে করে এত সময় নিয়ে, ভেবে পায় না টুনু। আগে গান গাইত — 'ভবসাগর তারণ' কিংবা 'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে'। আজকাল আর গায় না। কিংবা আপনমনে, নিরুচ্চারে গায়। এক-একদিন একটু গুনগুন শোনা গেলেও গানের কথা বোঝা যায় না। যমুনার কণ্ঠ খুবই মধুর ছিল। বাড়িতে মানুষজন এলে, মূলত আত্মীয়স্বজনই, চেপে ধরত ওকে। না-না করেও শেষ পর্যন্ত গাইতেই হত। মার গলাতেই প্রথম শুনেছিল, 'আমি বনফুল গো'। কানন দেবীর রেকর্ড শুনেছে তার অনেক পরে।

টুনু নিজে কোনোদিন গান শেখেনি। তবু মার কণ্ঠ শুনে শুনে কয়েকটা গান তুলে নিয়েছিল নিজের আনন্দেই। ওর গলাটা মার মতো সুরেলা না বলেই টুনুর ধারণা। সেজন্য কারো সামনে ও গান গায় না। এমনকী বিয়ের সময় বাসরে বা পরে যে ক'দিন শ্বশুরবাড়িতে ছিল শাশুড়ি-ঠাকুমার স্নেহময় অনুরোধেও গান গাইতে রাজি হয়নি।

এখন অবশ্য ছেলেকে ঘুম পাড়াবার জন্য গুনগুন করে নানা চেনা সুর। সুরগুলো আপনা থেকেই, প্রায় নিজের অজান্তেই গলায় খেলে বেড়ায়। অনেকসময় নানা ছড়া, যা শৈশবে শিখেছিল, কেমন করে যেন সুর পেয়ে যায়। না কি শৈশবের কোনো সুরের স্মরণের নিভৃত খাজানা থেকে হঠাৎ হঠাৎ নিঃসরণ ঘটে!

ছেলেকে বুকে নিয়ে কপালে হাত রাখতেই টুনুর চমক লাগে। গা-টা যেন গরম। জ্বর-টর হয়নি তো? গলায় বুকে হাত বুলিয়ে মনে হয়, না। ঠিকই আছে। ওর খোলা হাতে শিশুদেহের উষ্ণতা হঠাৎ ছ্যাঁকার মতো মনে হয়েছিল। ছেলেকে বুকে ধরলেই টুনুর বুকের মধ্যে, আদিগন্ত অনুভূতি জুড়ে এক বিচিত্র বিভাব সঞ্চারিত হয়। তীব্র অনুভবী আবেগ অপ্রতিরোধ্যভাবে শরীরের কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়ে। মনে হয় যেন, বিনোদের অদম্য আশ্লেষে নিপিষ্ট হচ্ছে। বুবাইয়ের স্তন্যপানের সময় কখনো কখনো এমন শিহরন জাগত যে অবধারিতভাবে সেই কখনো-না-ভুলতে-পারা বিস্রস্ত সকালের স্মৃতি অনুপুঙ্খ রূপরেখা নিয়ে চোখে নেচে উঠত। ছেলেও ঠিক বাপকা ব্যাটা। এক স্তনে মুখ তো অন্য স্তনে শিশুমুঠি। স্তন্যপান, কিছুদিন হল বন্ধ করিয়েছে। তবু কোলে উঠলে বা পাশে শুলেই দু-হাতে খামচে রাখে স্তন। সেই সন্ধ্যায় বেরিয়ে যাবার সময় বিনোদ বলেছিল — থাক, সেসব। বুবাইকে তো দিয়ে গেছে। এর চেয়ে বড়ো আশীর্বাদ আর কিছু কি চাইতে পারত!

যেদিন প্রথম জেনেছিল বিনোদ ওর দেহের গোপন-কুঠুরিতে নিষিক্ত ঔরসে নিষুপ্ত রেখে গেছে আপন অস্তিত্বের অংশ, তনুদ্ভব, সেদিন যে অবিশ্বাসের বিস্ময়, আত্মার উল্লাস আর আতঙ্কের হিমবাহ অনুভবে যুগপৎ আলোড়ন তুলেছিল, এখনও ভাবলে টুনুর কেবলই মনে হয়, সেদিন ও যথেষ্ট কাঁদতে পারেনি। তখনও জানা হয়নি, ঘরের ছাউনিতে অলক্ষ ছিদ্রের শূন্যতাও অনন্তবর্ষী।

বাইরের গেট খোলার শব্দে মুখ বাড়িয়ে টুনু দেখে কানাই ঢুকছে। দু-হাতে দুটি ঠোঙা। হঠাৎই চোখে পড়ল কানাই বেশ লম্বা হয়েছে। বড়ো হয়ে গেল নাকি? মনে মনে হিসেব করে যখন দেশ ছেড়েছিল বছর দশ-এগারোর ছিল। এখন তাহলে তেরো তো বটেই। কাছে আসতে দেখল গেঞ্জিটা ডান বগলের কাছে অনেকটা ছেঁড়া। ভালো গেঞ্জি কি নেই? বাবা দেখলে

তুলকালাম করতেন। তিনি আর কখনোই দেখবেন না। কেন দেখবেন না? বুকের ভিতরে উদ্‌গত কষ্ট-শ্বাস গিলে ফেলে টুনু।

— কী আনলি রে?

— কাপড়-কাচা সাবান আর খই।

— খই! ক্যান?

— মাঠাকরুন কইলেন, রাইতে খই খাইবেন।

মার কি শরীর খারাপ হল? জ্বর না কি অম্বলের ব্যথা? সহজে কিছুতেই মুখ খুলবে না।

— হাত খালি করে গায়ে জামা দে।

বুবাই এতক্ষণ মার বুকে চুপচাপ ছিল। কানাইয়ের গলা শুনে ও হাত বাড়ায়। কানাইয়ের হাতের জিনিস ওর চাই। কানাই না দিয়ে ভিতরে চলে যেতেই বুবাই ফোঁপাতে শুরু করে। টুনু শান্ত করার চেষ্টা করে ছড়া বলে, হ্যারিকেনের আলো দেখিয়ে। বুবাই কাঁদে — কাম্মা — কাম্মা বলে।

কানাই মামাকে বুবাই নিজেই হ্রস্ব করে নিয়েছে।

ছেলেকে চুপ করাতে না পেরে টুনু বাধ্য হয়ে ডাকে — কানাই — বুবাইকে একটু ধর —

বুবাইকে কানাইয়ের হাতে তুলে দিয়ে টুনু নিজের চুল ও শাড়ি ঠিক করে। তখনই গেটের কাছ থেকে ডাক আসে — প্রণতি — তোমার মা কোথায়? খবরটা শুনেছ তোমরা?

— আসেন মাস্টারমশাই। মা পূজার ঘরে। আপনি ভিতরে আসেন।

উদয়ন সরকার বারান্দায় উঠে ডান দিকের ঘরে ঢোকে। এ-ঘরেই প্রণতির পড়াশোনা, লোকজনের বসা। চেনা ঘরে টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে উদয়ন বলে, আজ একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিন। আনন্দের দিনও বলতে পারো। আজ কত তারিখ জানো?

টুনু ত্বরিত জবাব দেয়, ১৫ অক্টোবর ১৯৪৯।

— রাইট। আজ থেকে ত্রিপুরা ভারত ইউনিয়নে ফর্মালি অন্তর্ভুক্ত হল।

— তাতে কি কোনো সুবিধা হবে?

— আশা করি হবে। রাজতন্ত্রের অবসান হল। সকল ত্রিপুরাবাসী এখন থেকে স্বাধীন ভারতের নাগরিক।

একটু থেমে উদয়ন বলে, তুমি মুক্তি পরিষদের কথা জানো কিছু?

— তেমন কিছু না। শুনেছি ট্রাইবালরা নানা অঞ্চলে আন্দোলন করছে বাঙালিদের তাড়াবার জন্যে।

— না, না। কথাটা ঠিক নয়। বাঙালিদের তাড়াবার জন্যে আন্দোলন করছে না। আন্দোলন করছে মহাজনি শোষণ আর 'তিতুন' প্রথা — মানে বেগার শ্রমের বিরুদ্ধে। আশা করি এবার সেটারও সুষ্ঠ কোনো মীমাংসা হয়ে যাবে।

পরমুহূর্তেই উঠে দাঁড়িয়ে উদয়ন বলল, আজ আর পড়াব না। কয়েকটা জায়গায় যেতে হবে। কাল আসব। আর এবারেই তোমাকে ম্যাট্রিকে বসতে হবে। আর গড়িমসি নয়।

সকলেরই জানা আছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে ত্রিপুরা ছিল একটি স্বাধীন দেশীয় রাজ্য। কিংবদন্তি অনুযায়ী চন্দ্রবংশের যষ্ঠ উত্তরপুরুষ যযাতির নির্বাসিত পুত্র দ্রুহ্যকেই ত্রিপুরা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রূপে মান্য করা হয়। তবে ঐতিহাসিক কালপঞ্জি অনুযায়ী

গৌড়ের রাজা রুকনউদ্দিন বারবক শাহর সমসাময়িক রাজা রত্নমাণিক্যই ত্রিপুরার সর্বপ্রাচীন রাজা, যাঁর মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। গৌড়ের রাজাই ত্রিপুরারাজকে 'মাণিক্য' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। বংশ পরম্পরায় ত্রিপুরার রাজা তাদের নামের শেষে 'মাণিক্য' উপাধি ব্যবহার করেন। ত্রিপুরার শেষতম রাজা বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য, পৌরাণিক রাজা দ্রুহ্য থেকে হিসেব কষে যাঁকে, ১৭৬-তম রাজা রূপে চিহ্নিত করা হয়, তাঁর অকালমৃত্যুর পূর্বেই স্থির করেন যে ত্রিপুরা, স্বাধীন ভারতের অঙ্গীভূত হবে। ১৯৪৭-এর ১৭মে তাঁর প্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গেই ত্রিপুরার রাজবংশের অবসান ঘটে। মহারানি কাঞ্চনপ্রভাদেবীর সভাপতিত্বে কাউন্সিল অব রিজেন্সি গঠিত হয়। ১৩ আগস্ট, ১৯৪৭ কাঞ্চনপ্রভা ইনস্ট্রুমেন্ট অব অ্যাকসেশনে স্বাক্ষর করে ত্রিপুরার ভারত ইউনিয়নে যোগদান সুনিশ্চিত করেন। অবশ্য ত্রিপুরার ভারতে অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে সম্মতিপত্র—এগ্রিমেন্ট অব মার্জারে স্বাক্ষর করেন ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ তারিখে। ত্রিপুরার চূড়ান্ত ভারতভুক্তি ঘটে ১৫ অক্টোবর ১৯৪৯।

রাজন্য-শাসিত ত্রিপুরা ছিল প্রধানত উপজাতি অধ্যুষিত। অনেকগুলি উপজাতি গোষ্ঠী থাকলেও গরিষ্ঠসংখ্যক ছিল রিয়াং, জামাতিয়া, ত্রিপুরি, চাকমা, নোয়াতিয়া, মগ ইত্যাদি। রাজপরিবারও ছিল উপজাতি বংশোদ্ভূত। বহুকাল ধরেই পূর্ববঙ্গ থেকে, বিশেষত নোয়াখালি, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামের বাঙালিরা ত্রিপুরায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। শিক্ষিত বাঙালিরা বিভিন্ন রাজকার্যে নিযুক্ত হতেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও তাদের আধিক্য ছিল লক্ষণীয়। কৃষি ও ব্যাবসাবাণিজ্যেও বাঙালি প্রভাব ছিল উল্লেখযোগ্য। এর ফলে ক্রমশই বাঙালি জনসংখ্যা বাড়তে থাকলেও ত্রিপুরার জনসংখ্যাগত গরিষ্ঠতা ছিল উপজাতিদেরই।

কিন্তু ১৫ আগস্ট ১৯৪৭, দেশ বিভাজনে হাজার হাজার বাস্তুচ্যুত মানুষ আশ্রয়ের সন্ধানে, বা সঠিক বলা চলে, জীবনরক্ষার তাড়নায়, ত্রিপুরায় উপস্থিত হয়। 'বিলোনিয়া', সাব্রুম, এবং আগরতলায় স্বজনহারা, হৃতসর্বস্ব, আর্ত অসহায় মানুষের প্লাবন ঘটে। সেই সময় রাজকোষ থেকে অকাতরে এইসব দুঃস্থ বিধ্বস্ত মানুষকে সাহায্য করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়। সীমিত পরিকাঠামোর সঙ্গতি সত্ত্বেও ত্রিপুরার রাজসরকার সীমান্ত পেরিয়ে-আসা মানুষদের সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্য যে উদ্যোগ নিয়েছিল তা অভাবনীয়।

এই উদ্‌বাস্তু সমাগমের জন্য উপজাতিরা ক্রমশই ত্রিপুরায় সংখ্যালঘু হয়ে পড়তে থাকে।

ত্রিপুরার জনসাধারণের ছিল মোহাবিষ্ট রাজভক্তি। সে-কারণে এই রাজ্যে স্বদেশি আন্দোলনের কোনো উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়েনি। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সারা পৃথিবীর পট পরিবর্তনের সঙ্গে ভারতীয় উপমহাদেশেরও রাজনৈতিক পরিস্থিতির বদল হতে থাকে। ক্রমে তার প্রকাশ ত্রিপুরাতেও ঘটে। কংগ্রেসের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি সহ অন্যান্য সর্বভারতীয় পার্টিগুলিও ত্রিপুরায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার সংকল্পে ব্রতী হয়। উপজাতিদের মধ্যে ১৯৪৮ সালে ত্রিপুরা রাজ্য মুক্তি পরিষদ নামে একটি সংগঠন তৈরি হয়। পরে তার নাম হয় গণমুক্তি পরিষদ। এই পরিষদ মহাজনি শোষণ ও 'জিতুন প্রথা'র বিরুদ্ধে আন্দোলন শক্তিশালী করে তোলায় উপজাতিদের মধ্যে এদের আন্দোলনকে সমূলে উৎপাটন করার উদ্দেশ্যে দমনপীড়নের প্রচণ্ড প্রয়াস চালায়। সরকারি পীড়ন যত তীব্র হয়, উপজাতি মানবগোষ্ঠীর প্রতিরোধ প্রচেষ্টা তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। ১৯৪৯ সালে সূত্রপাত ঘটে সশস্ত্র সংগ্রামের। এই সংগ্রাম যদিও বাস্তবিক অর্থে ছিল কৃষক সংগ্রাম, তবে তার মধ্যে উপজাতিদের জাতিসত্তা বিকাশের আবেগ আকাঙ্ক্ষাও যুক্ত হয়। এই সংগ্রাম প্রায় দু-বছর কাল স্থায়ী হওয়ার সময় মুক্তি সংগ্রামের

নেতা-কর্মীরা বিপ্লবী চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়।

উদয়ন সরকার, ১৯৪২-এর আন্দোলনের সময় কারারুদ্ধ হয়েছিল। তিন বছর পর রাজবন্দি হিসেবে জেল থেকে মুক্ত হয়ে কুমিল্লায় নজরবন্দি থাকা কালে ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরের শেষে জানতে পারে দশরথ দেব ও সুধন্বা দেববর্মার নেতৃত্বে গঠিত ত্রিপুরা রাজ্য জনশিক্ষা সমিতি উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও কুসংস্কার দূরীকরণের জন্য আন্দোলন সংগঠিত করছে। এই সমিতির উদ্যোগে গ্রামীণ ও পার্বত্য এলাকায় একে একে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হতে থাকে। উদয়ন কুমিল্লা থেকে পালিয়ে ত্রিপুরায় এসে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রথমে একটি পার্বত্য এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করে। পরে একাধিক স্থান ও বিদ্যালয় বদলের পর আগরতলার উপকণ্ঠে এক মাধ্যমিক স্কুলে ইংরেজির শিক্ষক নিযুক্ত হয়।

ভারতের স্বাধীনতা তথা দেশভাগের পর স্বজন সন্ধানে নিজেদের গ্রামে গিয়ে উদয়ন কারুকে খুঁজে পায়নি। ওদের বাড়ি দখল হয়ে গেছে। ওর বাবার মৃত্যু হয়েছিল ১৯৪৪ সালে, যখন ও কারাবন্দি। মা ও ভাই-বোনেরা কোথায় গেছে কেউ সঠিক বলতে পারল না। কেউ বলল কলকাতায় গেছে। কেউ বলল, শুনেছিলাম আসামে গেছে।

ছোটোবোন মিমির মুখটা খুবই মনে পড়ে উদয়নের। শেষ যখন দেখেছিল, বছর ছয়েকের ছিল। কালো চোখ বাঁকিয়ে মায়াময় হাসত।

আর কি কখনো দেখবে না ওকে?

দুই

প্রথমে ছিল বিষাদ। পরে আসে উদ্‌বেগ—মেয়ের জন্য, তার ভাবী সন্তানের জন্য। এখন শুধু ভয়। যমুনা সারাক্ষণ ভয়ে কণ্টকিত। নানারকম ভয় মাথায় উঁকি-ঝুঁকি দেয়। আগুনের ভয়, কোলাহলের ভয়, আক্রমণের ভয়। এখন তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অভাবের ভয়, অনটনের ভয়। বাপের বাড়িতে আজন্ম সচ্ছলতা দেখেছেন। স্বামীগৃহে এসে কখনো দৈন্য শব্দের সঙ্গে পরিচয়ও ঘটেনি। ফেলে ছড়িয়ে বিলিয়ে উজ্জ্বল আনন্দের মধ্যেই ছিলেন। জানা ছিলই, প্রয়োজন হলেই স্বামী টাকা জোগাবেন। অথচ তখন টাকার প্রয়োজন অনেক কম ছিল। চাল ডাল মাছ তরকারি কিনতে হত না। বা অতি সামান্যই কেনা হত। ঘরভাড়া কাকে বলে জানতেন না। দুধের জন্য ছিল গৌরী আর কাঞ্চন। এখানে প্রতিটি বস্তুই অর্থ দাবি করে। ঘর, দুধ, চাল-ডাল, সবজি, মাছ — সবকিছুই নগদ মূল্যে পেতে হয়। স্রোতের মতো খরচ। আমদানি নেই এক ফুটো পয়সাও। এই পরিস্থিতিটাই সম্পূর্ণ অচেনা, অজানা যমুনার। সঙ্গে যা কিছু আনতে পেরেছিলেন তাই সম্বল করে এতদিন নিশ্চয় চলে যেত না। সুরেন বার কয়েক এসে কিছু কিছু দিয়ে গেছে। এভাবে কতদিন চলবে? সুরেন কি বার বার টাকা নিয়ে আসতে পারবে? শোনা যাচ্ছে বর্ডারে নানা কড়াকড়ি, ধরপাকর। চাষবাস না হলে সুরেনই-বা টাকা পাবে কোথায়! আগেরবার এসে বলে গেছে, জায়গাজমি দখল হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। বিক্রি করার জন্য চাপ আসছে, কিন্তু যথার্থ মূল্য দিতে প্রস্তুত নয় স্থানীয় ক্রেতা।

বুকের মধ্যে এক তুমুল ভয় যমুনার — হাতের টাকা শেষ হয়ে গেলে কী করবেন! টুনু — বাবাই-এর কী হবে? একেক সময় নিজের বিছানায় শুয়ে নীরবে কাঁদেন যমুনা। হরিশ থাকলে তাঁকে এতসব ভাবতে হত না। আহা, মানুষটা নাতির মুখও দেখতে পায়নি। হরিশ

থাকলে নাতিকে রাজপুত্রের মতো করে তুলত না? অদৃষ্টে যে আরও কী লেখা আছে কে জানে! সেই অজানার ভয়ও তাঁর বুকে থেকে থেকে ছোবল মারে।

টুনু মাকে অহেতুক ভয় পেতে বা উদ্বেগাকুল হতে নিষেধ করে। ভাবনাগুলো স্বাভাবিক তবু বিষয়গুলোর উপর তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। কিছু করারও নেই। সেজন্য ও সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করতে চায়। মোকাবিলা করবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার লক্ষে এগিয়ে চলে।

ত্রিপুরায় আসার পর প্রথম কয়েকটা মাস এমন বোধবুদ্ধি-উপলব্ধিশূন্য সাড়হীন অবস্থায় কেটেছে যে পরিচিত ও অভ্যস্থ পরিমণ্ডলের বাইরের নির্দয় পৃথিবীর নখর হিংস্রতার স্বরূপ অনুমানও করতে পারেনি। একটু একটু করে যেই অন্ধ স্তব্ধ চৈতন্যে আলোকসম্পাতের সূচনা হয়, নিজের অজান্তেই টুনু পরিবর্তিত হতে থাকে। অবয়বে ও অনুভবে। গর্ভের অঙ্কুর আর মানসভূমিতে রূঢ় আঁকিবুকি। আঁকিবুকির অধিকাংশই ভুলে যেতে চায়। ভুলে থাকতে চায়। কেবল নিজের অভিজ্ঞতার শিক্ষা নিবিষ্ট পড়ুয়ার মতো স্মৃতিধৃত করে রাখে।

ক-দিন ধরে যমুনার ভয় আরও বেড়েছে। হাতের টাকা ফুরিয়ে আসছে। সেইসঙ্গে বাড়ছে জিনিসপত্রের দাম। অনেক কিছুই পাওয়া যায় না। বেবিফুড, কেরোসিন। কালোবাজার শব্দটিও এখানে এসেই শিখলেন। যমুনার কাছে এর অর্থ, অন্যান্য অতিরিক্ত অনন্যোপায় খরচ। মাঝেমাঝেই মা-মেয়ের মধ্যে খরচ নিয়ে মতান্তর ঘটে।

গতরাতেই টুনু বলেছিল, অত দাম দিয়ে বেবিফুড কেনার কোনো দরকার নেই মা।

— দাদুসোনা তবে খাইব কী?

— ডাল-ভাত খাবে। আর দুধ তো রাখছই। আমাকে কি বেবিফুড খাইয়েছিলে?

— তোরে যা খাওয়াইছি তাই যদি দিতে পারতাম তবে এত প্যাকাল লাগত না। পোলা মানুষ করা কি আমারে তর কাছে শিখতে অইব?

— মা, আমাদের সংগতির কথাটা তো মনে রাখবে। কোনো রোজগার নাই, আর প্রতিদিন জলের মতো খরচ।

— তোর যদি অত চিন্তা, আমার লাইগ্যা, কাইল থেইকা আর দুপুরে ভাত করিস না।

এরপর আর তর্ক সমীচীন হয় না। টুনু চুপ করে গিয়েছিল। সকালে যমুনা বলেন, হ্যাঁরে সুরেন তো অনেক দিন আইতেছে না। ওরে একটা চিঠি দে না।

— কেন? গেলবার বলে গেল যে চিঠিতে না লিখতে টাকাপয়সা বা বিষয়সম্পত্তির কথা।

— কেমন আছে — মা বাপ কেমন আছে হেই খবরটা তো লিখতে পারে। কবে আইব জানলে এট্টু শান্তি পাইতাম। হামিদটারও খবর নাই। হামিদরে লেখ না একবার আইতে এইখানে।

— তোমার কি মাথা খারাপ হচ্ছে? হামিদরা এখানে আসবে কেন?

— কেন, এখানে কি মুসলমান নাই?

— আছে। অনেকই আছে। নতুন করে এখন আর কোনো মুসলমান এখানে আসবে না। পাকিস্তান ছেড়ে আসবেই বা কেন।

— আমি কি থাইকতে আইতে বলছি। এমনে আমাগোরে দেইখা যাইত। আমার বড়ো সাধ হয় ওরে দেখতে। ওর পোলাটা ইদ্রিশ কি কষ্ট না করছিল আমাগোরে ট্রেনে তুইলতে!

টুনু নিঃশব্দে কিছুটা সময় বয়ে যেতে দেয়। যমুনা স্মৃতির আঙিনায় উঁকিঝুঁকি দেওয়া শেষ করুক।

একটু পরে টুনু বলল, মা, ওপারের দিকে তাকিয়ে এপারে আমাদের জীবন কাটবে না। আমাদের নিজেদেরই কিছু করার উদ্যোগ নিতে হবে।

চমকিত যমুনা বলেন, কী কস তুই? আমরা ফিরা যামু না আর? এই যে সেদিন মুকুলরা কইল শ্রীঅরবিন্দর বাণী — আর কয়েকমাসের মধ্যেই পাকিস্তান হিন্দুস্থান এক হইয়া যাইব।

কথাটা টুনুও শুনেছে। তবে বিশ্বাস হয়নি। কেন হয়নি বিশদ বলতে পারবে না। উদয়নকে জিজ্ঞেস করেছিল নিজের সংশয় নিরসনের জন্য। উদয়ন বলেছিল, ছেলেবেলায় নিশ্চয় পড়েছিলে — ঋষিমশাই বসেন পূজায়/৯-কার যেন ডিগবাজি খায়। এ-দেশের দুর্ভাগ্য আমরা ঋষিভক্ত হয়ে ওই অসহায় ৯-কারের মতো খালি ডিগবাজি খেতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

টুনুর জিজ্ঞাসু চোখ দেখে উদয়ন যোগ করে, মানসিক ডিগবাজি, বুঝলে? শোনো এসব ওঁছা কথা কানে নেবে না। দুটো স্বাধীন রাষ্ট্র, যারা প্রথমদিন থেকেই পরস্পরের যুযুধান শত্রু, তারা কখনো কারো প্রলাপে এক হয় না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সামান্যতম জ্ঞান থাকলেও কেউ অন্যথা বলতে পারে না।

— আমরা তাহলে কী করব? আমাদের তো এখানে কিছুই নেই।

— এখন এই স্বাধীন ভারতই তোমাদের দেশ। এখানেই তোমাদের থাকতে হবে। গড়তে হবে ঘরবাড়ি। নতুন করে শুরু করতে হবে জীবন। সম্পূর্ণ নতুন জীবন। কাজটা সোজা নয়। খুব কঠিন। তুমি মেয়ে বলে হয়তো আরও কঠিন হবে। কিন্তু লড়ে যাওয়া ছাড়া বিকল্প কিছু নেই।

— আমাদের বাড়ি, অত জায়গাজমি —

— পারলে বেচে দাও। অথবা বদল করতে পারো কি না দ্যাখো। শেষপর্যন্ত ওসবের স্মৃতি তোমাদের দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গী হবে।

— আপনি — আপনি কী করবেন?

— জানি না। আমাদের জায়গাজমি বিশেষ কিছু ছিল না। যা ছিল তার জন্যও আমার মধ্যে তীব্র কোনো আবেগ নেই। কিন্তু আমি তো আমার পরিবারই হারিয়ে ফেলেছি।

— খুঁজবেন না?

— কোথায় খুঁজব? তবু দেখছি — চেষ্টা করছি।

মাকে এতসব বলা বৃথা। শ্রীঅরবিন্দর কথার উপর তাঁর প্রবল বিশ্বাস। ওপার থেকে ছিন্নমূল সব মানুষই এমন বিশ্বাসের সুতো ধরে অধুনার অকূলপাথারে পারাপারের স্বপ্ন দেখে। বিশ্বাস করতে ভালো লাগে। মনে শক্তি আসে। আশা জাগে।

এ কি শুধু জমির মায়া? সম্পত্তির টান? বিষয়ের ক্ষোভ? না কি আপন অধিকারের অহংকার? প্রশ্নগুলো শুনে উদয়ন সপ্রশংসচোখে টুনুর দিকে তাকিয়েছিল। এই মেয়েটির মধ্যে এমন মৌলিক জিজ্ঞাসা নিহিত আছে! বলেছিল, সবগুলো প্রশ্নেরই উত্তর — হ্যাঁ। কিন্তু ওতেই শেষ নয়। ওর সঙ্গে আছে জীবিকা, জীবনযাপন। বাস্তুহারাদের অনেকেরই এখন কোনো জীবিকা নেই। যে-জীবিকায় অভ্যস্ত ছিল, সে-জীবিকা এখানে লভ্য নাও হতে পারে। কী করবে তারা? আর সবচেয়ে বড়ো কথা — উৎপাটিত মানুষরা এখানে পরিচয়হীনতায় অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে। দেশের গ্রামে প্রতিটি মানুষের নিজস্ব পরিধিতে সম্মানিত পরিচয় ছিল। দরিদ্রতম মানুষটি — এমনকী অচ্ছ্যুৎ মানুষটিও অজ্ঞাতকুলশীল ছিল না। এপারে

স্রোতে ভাসা মানুষ সব একাকার। সবাই অজ্ঞাতপরিচয়। উত্তমর্ণ, অধমর্ণ, উচ্চবর্ণ, নিম্নবর্ণ, সবাই এক লাইনে দাঁড়িয়ে সরকারি করুণা ভিক্ষা করছে। এই আত্মিক অবমাননার শোকদাহ মানুষের ইতিহাসে বারংবার ঘটেছে। রাজনৈতিক যূপকাষ্ঠের প্রথম ও প্রধান বলি মানবতা। নেহরু ও জিন্নাহ্‌র স্বপ্ন সিংহাসনের নীচে মানবতার যে রক্তাক্ত বিবস্ত্র লাশ প্রোথিত আছে তার কটু গন্ধ ও চাপা আর্তি কি কোনোদিন পুনরুত্থানের আহ্বান জানাবে না?

উদয়ন যখন বলে টুনু মুগ্ধ হয়ে শোনে। অনেক কিছুই ও বুঝতে পারে না। কেবল মনে হয় কত জানার আছে, কত শেখার আছে। এত বছর যা দেখেছে বুঝেছে, সেসবই বড়ো অকিঞ্চিৎকর ও খণ্ডবোধের ছিল। মানুষের আড়ালে যে কত অচেনা মানুষ থাকে তাও তো জানত না।

যেন যমুনার মনে স্বস্তির জোগান দিতেই কয়েক দিন পর আচমকা সুরেন এসে উপস্থিত। ওর আসা মানেই ঝিম-ধরা করুণ গৃহে উজ্জ্বল আলো আর দমকা বাতাসের ছোটাছুটি। টুনুর ভিতরে বিশ্বাস জাগে, এই পৃথিবীতে ওরা একেবারেই নিঃসহায় নির্বান্ধব নয়। অনিবার্যভাবে বিনোদের কথা মনে পড়ে। স্মৃতির আঁচড়ে বিক্ষত হয়। তবু ভালো লাগে। দাদাকে দেখে আরও বেশি করে মনে হয়, জীবনে একজন পুরুষের স্থিতি কতখানি নির্ভরতা ও আশ্বাসের।

যমুনা সুরেনকে পাশে বসিয়ে বার বার ওর গায়ে-পিঠে হাত বোলান — তোর বড়ো ঝঞ্ঝাটরে সুরো — কত রোগা হইছস! খালি টো টো কইরলে কি শরীর থাকে।

সুরেনের আপত্তি কানেও তোলেন না যমুনা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গ্রামের সকলের কথা জিজ্ঞাসা করেন। গরু, গাছ, পুকুর কিছুই বাদ যায় না। গৌরীর নতুন বাছুর হয়েছে শুনে খুশিতে যমুনার প্রাণ হইহই করে। আবার হামিদের নাতির আঁতুড়েই মৃত্যুর খবরে বুক কঁকিয়ে ওঠে।

— কুতুবপুরের খবর কী রে? — যমুনা জানতে চান। ওখানে সুরেনের পিত্রালয়।

— খবর কোথাও ভালো না। আবার নতুন করে দাঙ্গা লাগতেছে নানান জায়গায়। বাবা আমাদের বাড়ি বেইচ্যা দিছে। শিগ্‌গিরি-ই যাইব গিয়া।

— কই যাইব?

— আমার এক পিসে আছে হুগলিতে। বাবা সেখানেই বাড়ি করব ভাবতেছে।

— তুই কী করবি?

— আমি যামু না কইয়া দিছি।

— তাইলে তুই এইখানে আইস্যা থাক। আমাগো লগে।

— না, মামি। আমি দ্যাশেই থাকুম। সুজাপুরে। ক্রমে সুরেন জানায় যতটা সম্ভব জায়গাজমি বেচে এবারে প্রায় বিশ হাজার টাকা এনেছে। আর কিছু ভবিষ্যতে সম্ভব হবে কি না বলা কঠিন। টাকা সঙ্গে আনা যায় না। হুন্ডিতে পাঠাতে হয়। হুন্ডিও বাট্টা দিতেই বহু টাকা চলে যায়। সুজাপুরের বাড়ির একটা অংশে হামিদের ছেলে ইদ্রিশ থাকে সপরিবারে। অন্য অংশে থাকে সুরেন। পুকুরের মাছ আর পুকুর-ঘেরা আম-কাঁঠাল-নারকেল-সুপারির গাছ থেকে কিছু রোজগার হয়। ইদ্রিশই দেখাশোনা করে। চাষের জমি হামিদের তত্ত্বাবধানে আছে। ধান, আনাজ যা হয় কিছু অংশ সুরেনকে দেয়। যতদিন হামিদ আছে, আশা করা যায়, এভাবেই চলবে। কিন্তু হামিদও যেন হঠাৎই বুড়িয়ে গেছে। ওর শরীর ভালো থাকছে না। ওর দেহান্ত হলে যে কী হবে সে বিষয়ে সুরেন নিশ্চিত নয়।

টুনু বলল, তুমি চলে এসো। আমরাও ভরসা পাই। তোমারও দেখভাল করতে পারব আমরা।

সুরেন বলে — না রে আমার আসা সম্ভব না। সুজাপুরের বাড়ি ছাইড়তে পারুম না। আর দ্যাখ, দ্যাশে থাইকলেই কেবল কিছু টাকা মাঝেমধ্যে পাঠাইতে পারুম। নইলে চলব কেমনে?

বুবাইকে কোলে নিয়ে সুরেন বলে, এই ডেভিড কপারফিল্ডের লাইগ্যাও তো কিছু করন লাগব।

যমুনা বলেন, এইডা কী কইলি তুই?

সুরেন বলে কিরে টুনু তুই পড়ছিলি তো ডেভিড কপারফিল্ড?

— কিছুটা পড়েছিলাম। তবে মনে নাই কিছু।

— ডেভিড ওয়াজ এ পসথিউমাস চাইল্ড — এইরকম একটা লাইন ছিল না? এইজন্যই কইলাম। তবে আমাদের রাজাবাবু ডেভিডের মতো হইব না। ওরে বাপ-দাদার চাইতেও বড়ো হইতে হইব।

বুবাই কৌতূহলী চোখে নতুন-চেনা মামার মুখের দিকে তাকিয়ে এমন স্বর্গীয় হাসি ছড়ায় যা কেবল দু-বছরের শিশুরাই পারে। সুরেন ওর গালে চকাস চুমু খেয়ে বলে — একদম বাপকা বেটা!

সুরেন মস্করার ঢঙে বললেও 'পসথিউমাস শব্দটা টুনুর মগজের অভ্যন্তরে শব্দহীন বিস্ফোরণ ঘটায়। বিনোদের ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ছবিটা চোখে ভেসে ওঠে। চকিতে চুমু খাওয়ার শব্দটাও যেন কানে বাজে। 'আমার ফলার যেন রেডি থাকে,' বলেছিল যাবার আগে। টুনুর বুক জুড়ে এক গভীর আতঙ্ক দিগন্তঢাকা কালবৈশাখীর মেঘের মতো আচ্ছন্ন করে। বলে, সুরোদা, আবার কাটাকাটি হচ্ছে কেন? আমার খুব ভয় করছে, তুমি চলে এসো আমাদের কাছে।

টুনুর মাথার চুল ঝাঁকিয়ে সুরেন বলে, দূর পাগল, ভয়ের কী আছে! আমারে কেউ কিছু কইব না। সুজাপুরের লোকজনের সঙ্গে আমার খুব ভাব। মামা আর জামাইয়ের ব্যাপারটা হঠাৎ হইয়া গেছিল। বদরু শেখ আর মজিদ আলির উস্কানিতে। তারপর থেইকা আমাদের অঞ্চলে বড়ো কিছু আর হয় নাই।

সুরেন ভুল বলেনি। ১৯৪৭-এ ভারত ভাগের পর বাংলাদেশে বড়ো রকমের গোলমাল বিশেষ হয়নি। যেমন হয়েছিল ১৯৪৬-এ। এবং ১৯৪৭-এ পাঞ্জাবে। সেজন্য ১৯৪৮ সালের জানুয়ারির মধ্যেই দুই পাঞ্জাবের লোক বিনিময় সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়। বাংলায় লোক বিনিময় না-হওয়ায় পাকিস্তান হবার পরও পূর্ববাংলায় নিম্নবর্ণ ও দরিদ্র হিন্দুদের সঙ্গে বহু সম্পন্ন হিন্দুও থেকে যায় সম্পত্তির মায়ায় ও সরকারি আশ্বাসে। কিন্তু ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০-এ আবার 'নৃশংস হিন্দুহত্যা শুরু হয় পূর্ববাংলার নানা অংশে। ওই ফেব্রুয়ারি ১৯৫০, ভৈরব ব্রিজের উপর প্রতিটি ট্রেন থামিয়ে সকল হিন্দু যাত্রীকে হত্যা করে নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল। ব্যাপকভাবে ঘটেছিল হিন্দুগৃহে অগ্নিসংযোগ, নারীলুণ্ঠন ও ধর্ষণ। লক্ষ লক্ষ বাস্তুচ্যুত উদ্‌ভ্রান্ত মানুষ তখন যে দিক দিয়ে সম্ভব, সীমানা পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করে। সমস্ত রেলস্টেশন ভরে যায় ছিন্নমূল মানুষের ভিড়ে। মূল চাপ পশ্চিম বাংলা তথা কলকাতার উপর পড়লেও ত্রিপুরাতেও লক্ষ মানুষের আশ্রয় অন্বেষণ ঘটে।

ঐতিহাসিক সত্যতার জন্য স্মরণ করা সমীচীন যে, ১৯৫০-এর ২৩ ফেব্রুয়ারি লোকসভায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রী নেহেরুকে প্রশ্ন করেন, পূর্ববঙ্গে সংগঠিত হিন্দু গণহত্যা

— যা হিটলারের ইহুদি হত্যার সমতুল্য — যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে তার জন্য পাঞ্জাবের মতো বাংলাতেও লোক বিনিময়ের কথা ভারত সরকার বিবেচনা করবে কি না। নেহেরুর জবাব ছিল বিস্ময়করভাবে অবিবেচক ও অমানবিক। তিনি বলেন, শ্যামাপ্রসাদের প্রস্তাব — লোক বিনিময় — সর্বতোভাবে ভারতীয় ধ্যানধারণা বিরোধী। এর সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গের একটা প্রশ্নও যুক্ত আছে। শ্যামাপ্রসাদ বলেছিলেন, পাঞ্জাবে লোক বিনিময়ের সময় পণ্ডিত নেহেরু সম্ভবত ওই বিশ্বাসভঙ্গের কথা হিমঘরে জমা রেখেছিলেন। তিনি অনুরোধ করেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী যেন প্রাজ্ঞ রাষ্ট্রনেতার মতো মানবিকবোধের দ্বারা চালিত হন। ইতিহাস সাক্ষী দিয়ে যাবে অনন্তকাল—বাঙালি হিন্দুর হত্যা, দুর্দশা, উচ্ছেদ, ধর্ষণ, লাঞ্ছনা কিছুই নেহেরুর সাদা টুপিতে সামান্য কুটো চিহ্নও দাগতে পারেনি, বুকে গোঁজা গোলাপের পাপড়িতে লাগেনি কোনো বিচলিত দীর্ঘশ্বাসের স্পন্দন।

টুনু জিজ্ঞাসা করে, সুরোদা, নবাবপুরের কোনো খবর জানো? নবাবপুরে ওর শ্বশুরবাড়ি। পাঁচটি দিনের অমল স্মৃতি এখনও তার বিরল বৈভব।

— নতুন কিছু নাই। বিনোদের ঠাকুমা তো তোরা এখানে আসার এক মাসের মধ্যেই মারা গেছেন। সে তো জানিসই। চৌধুরিবাবু, মানে তাঐ-মশাই মামলা করতে ঢাকা গেছিলেন। তারপর আর খোঁজ নাই। তাওতো দুই বছর হইল। আমি আর যাই নাই।

স্মৃতিজর্জরিত টুনুর বুকে কান্না ঘুলিয়ে ওঠে। ও নিজের ঘরে ঢুকে গিয়ে বিছানায় মুখ ডোবায়।

যমুনা সুরেনকে কাছে ডেকে মৃদু গলায় বলেন, সুরো, এবার গিয়ে একবার নবাবপুরে যাস। ওদের জমি-টমি বেশি না থাইকলেও ঘরবাড়ি -বিষয়াদি তো আছিল। শুনছি টাকাও ছিল ভালো। দাদুসোনাটাইতো একমাত্র ওয়ারিশ। যদি কিছু পাওয়া যায়। এমনেও বারোভূতে লুইট্যা খাইব।

— কার কাছে যামু মামি? চৌধুরিমশাই ছাড়া আর কারুরে চিনিও না।

— যাইয়া দেখ না। বাড়িতে কেউ তো থাইকব। জামাইয়ের কাকা আছিল একজন। দুই বোনও তো ছিল।

— বিয়ের সময় দেখেছিলাম। কিন্তু দুই জনেরই তো বিয়ে হয়ে গেছিল। কোথায় থাকে মনে নাই।

— ওদের অন্তত দাদুসোনার খবরটা দিস। ওই তো বংশের বাতি।

— ঠিক আছে। যামু একবার।

মামির চেয়ে টুনু দুঃখ পাবে বেশি ভেবে একটা সত্য গোপন করল সুরেন। বুবাইয়ের জন্মের পর সুরেন খবর দিতে চৌধুরি বাড়িতে গিয়েছিল। তার আগেই অবশ্য বিধুশেখর নিরুদ্দেশ হয়েছেন। সেদিন বাড়িতে ছিল বিধুশেখরের ভাই সূর্যশেখর আর বিনোদের বিধবা দিদি কল্পনা। বুবাইয়ের খবর শুনে কল্পনা বলেছিল, দ্বিরাগমনে গিয়ে বিনোদ আর ফিরল না, আর আপনি তার ছেলে হবার খবর দিতে এসেছেন। বলছেন শুনলাম, কিন্তু মানতে পারলাম না। ভাগ্যিস বাবা নেই — থাকলে যে কী হত! ওই ঘৃণ্যকথা আর আমাদের শোনাতে আসবেন না।

সুরেন বুকের মধ্যে দীর্ঘশ্বাস গোপন রাখে। ঘরের ছাউনিতে অলক্ষ ছিদ্রের শূন্যতাও অনন্তবর্ষী।

তিন

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের মধ্যদিনে টুনু ও কানাইকে নিয়ে আখাউড়া স্টেশনে যখন নেমেছিলেন যমুনা, তখনও তাঁর পরনে রঙিন দামি শাড়ি, গায়ে গহনা। তাঁর জানা ছিল না যে স্টেশন থেকে আর অবাধ যাত্রা নেই আগরতলার দিকে। সীমানা পেরোবার আগে আছে তল্লাশি। জুন মাসের তিন তারিখেই ঘোষণা করা হয়েছিল যে এই দিনের জন্য দুই ভাবী রাষ্ট্র, সরকারি সম্পত্তি, কর্মচারি, সেনাবাহিনী-সহ সবকিছুর বন্দোবস্ত ও বিধিনিয়ম অনুসরণের ব্যবস্থা করে নেবে, মধ্যবর্তী সময়ে। যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ও অভিজ্ঞতার অভাবে বর্ডারে ছিল এক বিচিত্র নৈরাজ্য। আনসার-বাহিনী নামক বাহিনীর খেয়ালখুশিতে তল্লাশির নামে যথেচ্ছ লুঠপাট হয় অসহায় মানুষের সঙ্গে থাকা শেষ সম্বলের। উদ্‌ভ্রান্ত মানুষের আইনজ্ঞান থাকার কথা নয়। লাঠি-ওঠানো আনসার-বাহিনীর মুখের উচ্চারণই আইন। যে-দ্রব্যই ওদের পছন্দ তাই নিয়ে যাওয়া বেআইনি। বাজেয়াপ্ত দ্রব্যের জন্য কোনো রসিদ নেই। দাবির উত্তর লাঠি।

কিশোর কানাই সেদিন প্রত্যুৎপন্নমতির যে পরিচয় দেখিয়েছিল তার সামান্য সূচনা নিজেও কখনো ভাবতে পারত না। সীমান্তে উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষু মানুষের মর্মন্তুদ অবস্থা দেখে ও হঠাৎই আনসার-বাহিনীর এক বয়স্ক মানুষের কাছে গিয়ে হাউ মাউ কাঁদতে থাকে। শুভ্র শ্মশ্রু-গুম্ফমণ্ডিত মানুষটি ওর কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে ও অদূরে দাঁড়ানো যমুনা ও টুনুকে দেখিয়ে বলে, আমার মা আর দিদি, দু-জনেই কাইল রাতে — ও হাপুস কাঁদে।

— কাইল রাতে কী ? কও — ভয় পাইও না।

— কাইল রাতে আমার বাবু আর জামাইবাবু দুইজনেরই মাইরা ফালাইছে।

— কোথায় ?

— সুজাপুরে। এক সপ্তাহ আগে দিদির বিয়া হইছিল।

সম্ভবত শেষ লাইনটি এই প্রবীণ মানুষটির হৃদয়ে বিঁধেছিল। দ্রুতপায়ে যমুনা ও টুনুর সামনে এসে সন্ধানী চোখে তাকায়। টুনুর ভাষাহারা চোখ কপালে থ্যাবড়া সিঁদুরের ভগ্নাবশেষ তার হতভাগ্য জীবনের কোন ভাষা প্রকট করে তা অনুমেয়। তল্লাশির নিয়ম, রক্ষা করেই মানুষটি ওদের সীমান্ত পারের অনুমতি দিয়ে প্রমাণ করেছিল, চারদিকের অবর্ণনীয় দুর্দৈব সত্ত্বেও মানবতা অবিনশ্বর।

কীভাবে খুঁজে খুঁজে ডলি-নীরদদের বাড়িতে এসে পৌঁছেছিল সে এখন প্রায় রোমহর্ষক গল্প। ডলির প্রাথমিক উচ্ছ্বাস মুহূর্তেই আর্তনাদে রূপান্তরিত হয়েছিল। অমন প্রাণোচ্ছল মামা নেই? বিশ্বাস হয় না। টুলু দ্বিরাগমনে এসেই বিধবা! জীবন কি এত নিষ্ঠুর হতে পারে? মাকে কাঁদতে দেখে ডলির তিনকন্যাও কান্নার কোরাসে যোগ দেয়। বড়ো নীতা বার বার জানতে চায়, কী হয়েছে মা—কী হয়েছে—

এইসব সময়ে প্রতিবেশী মহিলারা সাহসী তৎপরতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। তাঁদেরই উদ্যোগে রীতি-সংস্কারের অনুশাসন পালন সম্ভব হয়। প্রায় সাড়হীন শব্দহীনতায় কেটে যায় কয়েকটা দিন। অন্তর্গত চেতনা অবোধ হলেও চোখ খুঁটে নেয় জীবন পাঁচালির কথকতা। কান খুঁজে নেয় সুরভঙ্গের স্বর।

নীরদের বাড়িটা ছোটো। দু-টি মাত্র শোবার ঘর। একটা লম্বা বারান্দা থাকায় শোয়া-বসা কোনোরকমে চলে যাচ্ছিল। তবু স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ও ব্যবহারিক অসুবিধাগুলো যথেষ্টই উচ্চকিত।

যমুনা বোঝেন এখানে দীর্ঘদিন থাকা সম্ভব না। উচিতও নয়। নীরদ সামান্যই চাকরি করে। তিনটি মানুষের অতিরিক্ত বোঝা বহন করা ওর পক্ষে দুঃসাধ্য। তৃতীয় দিনেই যমুনা ওর হাতে কিছু টাকা দিয়ে বলেন, আমাদের জন্য একটা বাসা দেইখ্যা দাও।

টাকা কেন, বাসা কেন, করতেই যদি হয় এখনই কেন — এমত লৌকিক ভদ্রতাসম্ভ্রমজাত কথার ব্যয় ঘটে পর্যাপ্ত। ইতিমধ্যে যমুনার বোন পদ্মা ও ভগ্নিপতি জগদীশ বিশ্বাস দুঃসংবাদ পেয়ে হাজির হয়। জগদীশ আগরতলা শহরের উত্তর পশ্চিমে প্রায় আশি মাইল দূরে কাঞ্চনগড়ে থাকে। সেখানে তার নানা ব্যাবসা। বাড়িও বড়ো। ওরা জেদ ধরায় যমুনা ওদের সঙ্গেই চলে আসে কাঞ্চনগড়। টুনু তখনও কোনো মতামত দেবার অবস্থায় নেই।

পদ্মা যমুনার থেকে দু-বছরের ছোটো। তার দু-টি ছেলে, দু-টি মেয়ে। বড়ো মেয়ে কমলা টুনুর চেয়ে এক বছরের ছোটো। যমুনার মনে হল ভাইবোনদের সঙ্গ পেয়ে টুনু ধীরে ধীরে শোকের আবহ থেকে মুক্ত হতে পারবে।

জগদীশের বাড়িটা বেশ বড়ো। একটা গোটা ঘরই যমুনাদের জন্য ছেড়ে দিল। কানাইয়েরও আলাদা ব্যবস্থা হল। সম্পন্ন ব্যবসায়ীর গৃহিণী পদ্মার অবয়বে আহ্লাদি ভাবের সঙ্গে সাচ্ছল্যের পিচ্ছিল আভাও খেলে বেড়ায়। শরীরে স্বর্ণালঙ্কারের ঝঙ্কারের তাল রাখে মুখের ক্ষান্তিহীন তাম্বুলচর্বণ। পদ্মার প্রধান ব্যসন খাওয়া এবং খাওয়ানো। যারা সারাদিন কাজের লোকেদের ফরমাশ করে আর ছেলেমেয়েদের ডাকাডাকি করে খাওয়ার জন্য। ওর ধারণা ছেলেমেয়েরা যথেষ্ট খেতে পায় না। ওরা পড়ালেখা করল কি না তা নিয়ে পদ্মার কোনো উদ্‌বেগ নেই।

জগদীশ সারাদিন ব্যাবসা নিয়ে ব্যস্ত। ওর অবশ্য প্রধান কাজ স্ত্রীর হুকুমমতো টাকার জোগান দেওয়া। দিনান্তে পান-প্রমোদের পর সাংসারিক অন্য বিষয়ে মন দেওয়া বা ছেলেমেয়ের শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে মাথা ঘামানোর পণ্ডশ্রম করা ওর ধাতে নেই। বস্তুত অর্থকরী ও প্রমোদবিহারী বিষয় ব্যতিরেকে অন্য কিছুতেই ওর আগ্রহ নেই। ও বিশেষ খুশি কানাইকে পেয়ে। চটপটে অথচ বিনয়ী এবং সদা-অনুগত কানাইকে ব্যক্তিগত আরদালি হিসেবে ব্যবহার করে। মাইনে দিতে হয় না। রাতে পা পিছলে গেলেও যত্ন করে ধরে বাড়ি নিয়ে আসে। টাকা-পয়সায় হাতই দেয় না ছোকরা।

কাঞ্চনগড়ে এসে ভালোই লাগে যমুনা ও টুনুর। ধূ ধূ মাঠ-ঘেরা ছিটোনো পাহাড়ের মাথায় নীল আকাশ মমতাময়। ডানায় বাতাস ঝাঁকিয়ে পাখিরা ওড়ে। দিনান্তের গরুর ডাকে এক অসামান্য মুখর বিষাদ ছেয়ে আসে। স্মৃতির আল বেয়ে হেঁটে যায় মন। রাতে পাশাপাশি শুয়ে মা-মেয়ের ভবিষ্যতের রূপকথা সৃষ্টির অন্তহীন চেষ্টা চলে। রূপকথার কুঁড়েঘরেও ছাউনি থাকে, মাটি থাকে। থাকে আত্মবোধের তথা স্বাধিকারের গরিমা। বোনের বাড়ি কখনোই নিজের বাড়ি নয়। পরাশ্রয়ে দীর্ঘনিবাস আত্ম-অগোচরেই অন্তর্গত অনুভবে হীনমন্যতার উন্মেষ ঘটায়।

যমুনা জগদীশকে বলেন, তোমাদের কাছাকাছি এখানেই একটা ছোটোখাটো বাড়ি দেখে দাও।

জগদীশ সবিনয়ে বলে কেন দিদি, আপনাদের কি কোনো অসুবিধে হচ্ছে এখানে?

— না। কিন্তু কদ্দিন আর তোমাদের গলগ্রহ হয়ে থাকব! নিজেদের ব্যবস্থা তো করতে হবেই।

পদ্মা অভিমানী স্বরে বলল, তোকে আমরা গলগ্রহ ভাবছি, দিদি।

— ভুল বুঝিস না বোন। তোরা যা করেছিস তার ঋণ তো কোনোদিনই শোধ দিতে পারুম না। কিন্তু দ্যাখ, টুনুর সামনে লম্বা জীবন পইড়্যা রইছে। ওর তো একটা কিছু করনে লাগব।

যমুনার কথার যৌক্তিকতা যে জীবনের কুসীদ-হিসেব থেকেই উৎসারিত তা অমান্য করা অসম্ভব। তবু মমতার অর্চনায় অভিমান ঝঙ্কৃত হয়, লৌকিক বিবেচনার অনুজ্ঞা থাকে। এমন আলোচনা চলে বারবার। জগদীশ অগত্যা নিরুপায়হীনতায় বলে, চটজলদি বাড়ি পাওয়া কঠিন। তবু দেখছি। জমি পেলে না হয় ঘর তুলে নেওয়া যাবে।

টুনুর এখানে আর ভালো লাগছিল না। সম্পূর্ণ কর্মহীন কতদিন কাটানো যায়। সবগুলো দিন একইরকম। অঢেল খাওয়া, যখন খুশি যতখুশি ঘুম, বিকেলে কয়েকজনে মিলে হাঁটতে হাটতে পাহাড়ের আড়ালে সূর্যাস্ত দেখে সন্ধের আগেই ঘরে ফেরা। তার পরে অন্ধকারে মাসতুতো বোন কমলা-রমার সঙ্গে মুখোমুখি বসে অর্থহীন কথা বলা। কমলা বড়ো বেশি শরীরমনস্ক। শাড়ি, সাজগোজ, পুরুষ এবং বিবাহিত সম্পর্ক ওর প্রিয় বিষয়। খালি জানতে চায় বিনোদের ভালোবাসার প্রকার কেমন ছিল। বিরক্তি সত্ত্বেও টুনু রূঢ় হতে পারে না— পরাশ্রয়ের অব্যক্ত অনুশাসনবশত। মাকে তাড়া দেয় — চলো, ঘর ভাড়া নিয়ে থাকি। এখানে বাড়িভাড়া পাওয়া যায় না শহরের মতো। তা ছাড়া জগদীশের সম্মতি ছাড়া এখান থেকে চলে যাওয়া কোনো বিচারেই সমীচীন মনে করেন না যমুনা। তিনি আশা করেন শীঘ্রই বাড়ির ব্যবস্থা হবে।

কমলা ক্লাস নাইনে দু-বার ফেল করে আর স্কুলে যাচ্ছে না। ওর দাদা পুলক গত বছর ম্যাট্রিকে ফেল করে বাবার সঙ্গে ব্যাবসা দেখছে। রমা পড়ছে এইটে। ওরও পড়ার বিশেষ মন নেই। সকলের ছোটো তিলক পড়ে সেভেনে। পড়াশোনায় আগ্রহী। পরীক্ষায় ভালো ফল করে। জগদীশের আশা এই ছেলে শিক্ষায় বংশের গৌরব বৃদ্ধি করবে। সেজন্য গৃহশিক্ষকও রেখেছে।

টুনু সুজাপুরে ক্লাস এইট পাশ করেছিল। গ্রামে তার বেশি পড়ার জন্য মেয়েদের স্কুল ছিল না। ওর শহরে গিয়ে পড়ার আবদারে হরিশ কর্ণপাত না করে বিয়ের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এখানে অলস সময়ে কমলা আর পুলকের উপেক্ষিত বইপত্র গোছাতে গিয়ে টুনুর স্কুলের কথা মনে পড়ে। মাস্টারমশাইদের স্নেহময় শিক্ষাদানের স্মৃতি ফিরে ফিরে আসে। মাঝে মাঝে সময় কাটানোর জন্যই দু-একটা বইয়ের পাতা ওল্টায়। স্কুলে থাকলে এসব বইগুলোই কি ওকে পড়তে হত? এ-বাড়িতে গল্পের বই নেই। কাছাকাছি লাইব্রেরিও নেই। টুনুর পড়তে ভালো লাগে। বইয়ের পাতায় চোখ রাখলে কীভাবে যে সময় ফুরিয়ে যায় বোঝাও যায় না। তিলককে বলল, তোদের স্কুলের লাইব্রেরি থেকে বই আনতে দেয় না?

তিলক জবাব দেয় — দেয়। অ্যাডভেঞ্চার আর ডিটেকটিভ বই-ই বেশি। তুমি 'যখের ধন' পড়েছ?

টুনু মাথা নাড়ে।

— আমি নিয়ে আসব।

— 'যখের ধন'-এর পর 'আবার যখের ধন' পড়তেই হয়। পরিচয় হয় 'কালোভ্রমরের' সঙ্গে। অনুবাদে পড়ে 'থ্রি মাস্কেটিয়ার্স', 'রবিনসন ক্রুশো', 'আজব দেশে এলিস'। 'বুড়ো আংলা' আর 'চাঁদের পাহাড়' পড়ে কেবলি মনে হয় এসব বই কত আগেই পড়া উচিত ছিল।

কেউ বলেওনি পড়তে। সুজাপুরে লুকিয়ে শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' আর দত্তা পড়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের বাঁধানো বই ছিল বাড়িতে। হাত দেবার অনুমতি ছিল না। তিলক একদিন নিয়ে এল দু-টি ইংরেজি বই 'অলিভার টুইস্ট' ও 'অ্যারাউন্ড দ্যা ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেজ'। পড়তে গিয়ে টুনু অনুভব করে এমন লেখা অনুধাবনের জন্য উন্নততর ইংরেজি জ্ঞান প্রয়োজন। মা-মাসিমা দু-জনেই ওকে অনেকটা সময় ঠাকুরঘরে পুজো-আর্চায় ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করে। টুনু, নিজের ভিতরে কোনো নিম্বন অনুভব করে না। যে ঈশ্বর সিঁথিতে সিঁদুরের চিহ্ন স্থায়ী হতে পারার আগেই চিরতরে পরিত্যাজ্য আবর্জনার মতো নিষ্কাশন করেছে, তাঁর কাছে কোনো প্রার্থনা নিবেদন নিতান্তই অর্থহীন। তবু আবাল্যের সংস্কার ও শোকবিধুরতায় নিঃশব্দে গুরুজনের নির্দেশ পালন করে যায়। প্রকৃতপক্ষে সারাদিনে টুনুর কথা বলার হিসেব রাখতে হাতের আঙুলও ব্যবহার করতে হবে না। দু-চারটে কথা তিলকের সঙ্গে বলে। কানাইয়ের খোঁজ নেয়। রাতে মার পাশে শুয়ে জীবনের ছিন্ন পুঁথির হৃত পৃষ্ঠার সন্ধানে যা কিছু অস্ফুট উচ্চারণ।

তেমন উচ্চারনেই বলল, মা একটা কথা ভাবছিলাম।

মেয়ের মাথায় হাত রেখে যমুনা বলেন — বল।

— বলছিলাম আমি যদি আবার লেখাপড়া করি, এখানে মেয়েদের হাইস্কুল আছে। যদি ভরতি করে — তুমি মেসোকে একবার বলবে?

— বিধবা মেয়ে, স্কুলে যাবি?

— তাতে কী। মেয়েদেরই তো স্কুল। মেয়েরাই তো বিধবা হয়। স্কুলে না গিয়ে কোথায় যাবে তারা?

— আগে তো কোনোদিন শুনি নাই —

— কখনো ভেবেছিলে এভাবে ঘরবাড়ি ছাড়তে হবে? শুনেছিলে কোনোদিন মা-মেয়ে একদিনে বিধবা হয়?

ডুকরে ওঠেন যমুনা। টুনু মাকে জড়িয়ে রাখে বুকের উষ্ণতায়। একটু পরে বলে, আমি কী করব — কিছু একটা তো করতে হবে। এখন আমি পড়তে চাই।

পরদিন সকালে অতীব সংকোচের সঙ্গে যমুনা মেয়ের অভিলাষের কথা জানান জগদীশকে।

কোনো জবাব না দিয়ে জগদীশ চুপ করে থাকেন কিছুক্ষণ। যমুনার মনে হয় প্রস্তাবটা সম্ভবত ওর মনঃপূত হয়নি। আবারও বলেন — বলছে যখন, দেখ না খবর নিয়ে স্কুলে ভরতি কইরবে কিনা। ও আট ক্লাস পাশ করছিল। বিধবা মেয়ে যদি পড়াশোনায় মন দিয়ে থাকতে পারে —

জগদীশ বলল, কথাটা তো ভালোই। আমি খোঁজ নেব। পাশ-টাশ করতে পারলে বাড়িতে টিউশনি করেও কিছু রোজগার করতে পারবে।

যমুনা তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, রোজগারের দরকার নাই। পড়তে চাইছে যখন — পড়ায় ওর মাথা ভালোই।

— চিন্তা করবেন না। দেখব কী করা যায়।

ঠিক তখনই কানাই এসে বলল, একজন বাবু মেসোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

লুঙির ওপর শার্ট চাপিয়ে জগদীশ বাইরে এসে দেখে উঠোনে দাঁড়িয়ে রয়েছে তিলকের মাস্টারমশাই উদয়ন সরকার। জগদীশ ব্যস্ত হয়ে বলে, একী আপনি এখানে দাঁড়িয়ে কেন —

তিলক — তিলু —

উদয়ন বলে — না, না। তিলককে ডাকার দরকার নেই। আমি আপনার কাছে এসেছি।

— ঠিক আছে। আসুন — আসুন — ঘরে এসে বসুন।

উদয়নকে নিয়ে বসার ঘরে ঢোকে জগদীশ। বাঁশ আর বেত দিয়ে বানানো আসবাবে ঘরটা ভরতি। অন্তত পাঁচটা চেয়ার কম থাকলে ঘরটায় অনেক আরামে শ্বাস ফেলতে পারত। উদয়ন আগেও এসেছে এ-ঘরে। তাই চেনা ভঙ্গিতে একটা চেয়ারে বসে বলল, আমি আরও কদিন ছুটি চাইতে এসেছি।

জগদীশ বলল, আপনি ফিরেছেন কবে?

— গতকাল। স্কুলে তো ছুটি চলছে। তারপর যা সব ঘটছে। লেখাপড়ার পরিস্থিতি ঠিক নেই। দেশে মানে পাকিস্তানের অমানুষিক কাণ্ড ইতিহাস কখনো কল্পনাও করতে পারেনি।

— আপনি যে গেলেন কীরকম দেখলেন? আপনার আত্মীয়স্বজনের খবর পেলেন?

উদয়ন যেভাবে একদা চুপিসাড়ে পূর্ববাংলা থেকে পালিয়ে ত্রিপুরায় আশ্রয় নিয়েছিল, ঠিক অনুরূপভাবেই স্বাধীনতার পর আবার সেখানে স্বজনসন্ধানে গিয়েছিল। আপনজনের খোঁজ না পেয়ে বাড়ির ধ্বংসস্মৃতি মাথায় কুড়িয়ে ফিরে এসেছে।

বলল, অবস্থা খুবই খারাপ। হিন্দুদের ওখানে থাকা সম্ভব হবে না। নেহরু-লিয়াকত যাই বলুন। শুনলাম আপনার এখানেও ওখান থেকে লোকজন —

— হ্যাঁ। সে বড়ো মর্মান্তিক ব্যাপার।

জগদীশ সংক্ষেপে টুনু-যমুনার প্রাণ বাঁচানোর অভিযানের কথা বলে। — দিদি এখন এখানেই বাড়ি কিনে থাকতে চাইছেন। টুনু বলছে স্কুলে ভরতি হবে। মাস্টারমশাই, টুনুকে স্কুলে নেবে?

গভীর অভিনিবেশে উদয়ন জগদীশের কথা শুনছিল। প্রথমে মনে হয়েছিল যেন কোনো কল্পকথা শুনছে। এডগার এলেন পো-ও এমন গল্প লিখতে পারতেন না — এমনই অবিশ্বাস্য লেগেছে। তবে যদি সদ্য ওপার ঘুরে না আসত তাহলে নিশ্চয় ভাবত জগদীশের কাল রাত্তিরে ঘোর এখনও যায়নি। যেটুকু দেখেছে তাতে জগদীশের উদ্ভাবন-শক্তি সম্পর্কে ওর কোনো ভ্রান্ত মোহ নেই।

বলল, আপনার কথা শুনে ওঁদের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা হচ্ছে। এমন সাহসিনী মহিলা প্রণম্য। আর মেয়েটির পড়তে চাওয়া — এর কোনো তুলনা হয় না। এভাবেই পৃথিবীর মানুষের প্রগতি ঘটে। জীবন হয় অমৃতময়। স্কুল ভরতি করুক বা না করুক পড়তে চাইলে পড়া ওঁর হবেই।

জগদীশের মুখে খুশির আলো জ্বলে। — আপনি একটু বসুন। আমি দিদিকে বলে আসি।

জগদীশ ভিতরে গেলে কানাই চা-বিস্কুট নিয়ে ঢোকে। উদয়নের সামনে টেবিলে রেখে কানাই সম্ভ্রমপূর্ণ দূরত্বে দাঁড়ায়।

— তোমার নাম কী? উদয়ন জানতে চায়।

— কানাই।

— তোমার বাড়ি কোথায়?

— বাড়ি নাই। যেখানে আছিলাম — সুজাপুর — সেইটা নাকি আমাগো দ্যাশ না। এইটা যে কার দ্যাশ তাও বুঝি না। মা ঠাকরুন বইলছে, এইবার আমাগো বাড়ি হইব।

— মা ঠাকরুন কে?

— মা ঠাকরুন, আর কী বলবে ভেবে না পেয়ে কানাই বলে, মা ঠাকরুন। টুনু দিদির মা।

উদয়নের সামান্য পরিচয় দিয়ে জগদীশ যমুনাকে বলে, মাস্টারমশাই যখন বলেছেন, আর চিন্তা করবেন না দিদি। তবু চলেন একবার কথা বলে নেবেন। টুনুও চলো।

দ্বিধার সঙ্গে যমুনা বলেন, ও যাবে?

— কেন যাবে না? মাস্টার স্বদেশি করা মানুষ। শুধু পণ্ডিত না সজ্জনও। চলেন — কোনো ভয় নাই।

পদ্মা বলল, চলো দিদি। চোখে দেখলে একটু চাড় থাকবে।

টুনু কমলাকে বলল, তিলু কোথায় রে? ওকেও ডাক।

জগদীশের পেছনে পেছনে আসে যমুনা। সঙ্গে পদ্মা। তার পিছনে টুনু ঘোমটা ঢাকা। কমলাকে ধরে রেখেছে। তিলু ছুটে এসে মাস্টারমশাইয়ের সামনে বসে বলল — এতদিন আসেননি কেন?

ওদের দেখে উদয়ন উঠে দাঁড়ায়। যমুনা ধুতি-পাঞ্জাবি পরা মানুষটিকে দেখে অবাক হয়। এ তো সুরেনের বয়েসী। জগদীশের কথা শুনে মনে হয়েছিল অন্তত মাঝবয়েসী হবে। অকালেই টাকের আভাস কপালটাকে চওড়া করেছে। শুকনো বট পাতার মতো গায়ের রং। সাধারণ মাপের চেহারা। এই চেহারা নিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়েছিল।

পরিচয় পর্বের পর সবাই বসলে উদয়ন বলল, একটা কথা বলছি, অপরাধ নেবেন না। আপনাদের সান্ত্বনা দেবার কোনো চেষ্টা করব না। আপনারা যে দুঃখ শোকযন্ত্রণা সম্বলহীনতার মধ্য দিয়ে এসেছেন তার কোনো সান্ত্বনা হয় না। হয় শুধু সংগ্রাম। বিরামহীন সংগ্রাম। আপনারা তা করছেনও। কিন্তু — টুনুকে দেখিয়ে বলে — এ কী করছেন! ওঁকে এই পোশাকে কেন রেখেছেন?

যমুনা আর্তস্বরে বলেন, কী বলছেন আপনি, হিন্দু ঘরের বিধবা — এ ছাড়া কী পরবে?

পদ্মা বলে, তাইতো!

জগদীশ বলে, কী বলতে চান মাস্টারমশাই?

হাত জোড় করে উদয়ন বলল, মার্জনা করবেন আমাকে। হয়তো অনধিকারচর্চা করছি। তবু শুনলাম উনি পড়তে চান। তার মানেই হল জীবনের কাছে, দুর্দৈবের কাছে হার না মানার সংকল্প করছেন। একেই আমি সংগ্রাম বলছি। সত্যিকারের জীবনযুদ্ধ। এই পোশাকে যুদ্ধটা করা যাবে না। এই পোশাক জীবনবিমুখী। সারাক্ষণ ওঁকে হীনম্মন্যতায় ভোগাবে। ওঁকে স্বাভাবিক হতে দিন। আত্মবিশ্বাসী হতে সাহায্য করুন। সবিনয়ে আরেকটা কথা বলি, শোকটা — বিশেষত এমন শোক — অতি ব্যক্তিগত। ওটা বিজ্ঞাপিত করার কোনো গৌরব নেই।

উদয়ন চুপ করার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে নীরবতা থমথম করে। সবাই পরস্পরের দিকে তাকায়। কারুর মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বেরোয় না। জগদীশ অসহায় বোধ করে। বুঝে উঠতে পারে না। ঠিক কী বলা উচিত হবে। ভিতরে প্রতিবাদ গর্জন করে। আবার মনে হয় মাস্টারের কথার মধ্যে কোথাও যেন নির্মম সত্য নিহিত আছে।

উদয়ন আবার উচ্চারণ করে —

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম

আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি;
শান্তং শিবমদ্বৈতম্।

অর্থাৎ যিনি আমাদের জীবনদেবতা, তিনি সত্যময়, জ্ঞানময়, আনন্দময় পরম ব্রহ্ম। তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশমান। তিনি শান্ত, শুভ ও অদ্বিতীয়। তিনিই আমাদের আত্মার নির্বাণ।

একটু থেমে পুনর্বার বলে, আমি আবারও ক্ষমা চাইছি। আপনাদের কারুকে দুঃখ দেওয়া আমার ইচ্ছে নয়।

টুনুকে উদ্দেশ্য করে বলে, রমা আর কমলার বইগুলো দেখুন। আমি ক-দিন পর এসে দেখব আপনার প্রোগ্রেস।

তিলক বলল, ফুলদির বাংলা ইংরেজি পড়া হয়ে গেছে, মাস্টারমশাই।

সপ্রশংস চোখে উদয়ন তাকায় টুনুর ঘোমটাঢাকা মুখের দিকে। ওর মুখে মৃদু হাসি খেলে। বলে — খুব ভালো। অঙ্ক ভূগোল ইতিহাসও পড়তে হবে। আমি কয়েকটা বই পাঠিয়ে দেব? পড়ে রাখবেন।

উঠে দাঁড়িয়ে বলে, ফিরে এসে যেন দেখি আপনি সাদা পার্সেলের বদলে স্বাভাবিক মানুষ হয়ে উঠেছেন।

তিলক বলল, আবার কবে আসবেন মাস্টারমশাই?

— দিন পনেরো পর। তোমার স্কুল খোলার আগেই আসব। আজ চলি।

উদয়ন যে বীজ ছড়িয়ে গেল তার মধ্যে যা বারুদ ছিল তাতে এক প্রবল বিস্ফোরণ ঘটবে এমন অনুমান করা অন্যায় নয়। যমুনার কেবলই মনে হয় ভুল শুনেছেন। কিংবা উদয়নের কথা বুঝতে পারেননি। পদ্মা বলে, কী অন্যায় কথা। এভাবে কেউ বলে! এমন হলে ওঁর আর এ-বাড়িতে আসার দরকার নেই। তিলুর জন্য অন্য মাস্টার দ্যাখো। জগদীশ কথা বলে না। মাথার মধ্যে নানা জিজ্ঞাসা নিয়ে ছোটাছুটি করে। বাড়িতে না জানিয়ে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে উদয়নের কথা নিয়ে আলোচনা করে। মতামত চায়। এত বিভিন্ন মত লাভ হয় যে জগদীশের বিভ্রম আরও বৃদ্ধি পায়। স্ত্রীর কথায় বিরক্তি ক্রমে উষ্মা হয়ে ওঠে।

দিন কয়েক পরে এমন ঘটনা ঘটে যা সকলের সব বিভ্রম বা জিজ্ঞাসাকে নস্যাৎ করে দিয়ে ভিন্নতর ঢের কঠিন ও নিষ্ঠুর সত্যের মুখোমুখি উপস্থিত হতে বাধ্য করে।

নিজে করার কথা নয়। এসব কাজের জন্য লোক আছে। তবু টুনু নিজেই কুয়ো থেকে জল তুলছিল। কুয়োটা খুব গভীর। তৃতীয় বালতি জল তুলতে গিয়ে হঠাৎই টুনুর চোখে, দুপুর রৌদ্রে, ঘন অন্ধকার ছেয়ে যায়। জল-ভরা বালতি নেমে যায় কুয়োর মধ্যে। ও হাত বাড়িয়ে কুয়োর বাঁধানো পাড় ধরবার চেষ্টা করেও নাগাল পায় না। হাত ও কুয়োর মধ্যে দূরত্ব যে এমন অসীম কে জানত! ওর মাটিতে পড়ে যাওয়া দেখে কানাই। কানাই অল্প দূরেই মাটি কোপাচ্ছিল। কোদাল ফেলে ছুটতে ছুটতে ও ডাকে — মা ঠাকরুন — দিদির কী হইছে দ্যাখেন — মাঠাকরুন —

যমুনা রান্নাঘরের সামনে বসে আনাজ কুটছিলেন। কমলাকে দেখাচ্ছিলেন রান্নার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কীভাবে সবজি কুটতে হয়।

কানাইয়ের চিৎকারে ছুটে যান যমুনা। কমলাও সঙ্গী হয়। ভূলুণ্ঠিত টুনুর পাশে ঝুঁকে বসে কানাই ভেবে পায় না কী করা উচিত। যমুনা টুনুর মাথা কোলে নিয়ে দেখেন কোথাও আঘাত

লেগেছে কি না। লক্ষ করেন মাথাটা এক বিঘত ডান দিকে পড়লেই কুয়োর চাতালে ওঠার ভাঙা সিঁড়িতে লেগে বড়ো রকমের দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। কয়েকবার নাম ধরে ডেকেও সাড়া না পেয়ে যমুনা বলেন, কানাই জল দে —

চোখেমুখে জল ছিটিয়েও টুনু সাড়া দেয় না। যমুনা বিচলিত বোধ করেন। জগদীশ বা পুলক কেউ বাড়িতে নেই। পদ্মা এসে বলে, দিদি ওকে দু-জনে ধরে ঘরে নিয়ে যাও। কমলা তুই পায়ের দিকটা ধর।

যমুনা আর কমলা দু-দিকে ধরলে পদ্মাও হাত বাড়ায়। ধরাধরি করে ওকে নিজের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে যমুনা ও পদ্মা পালা করে নাম ধরে ডাকে — টুনু — টুনু; টুনুমা —

রমা বলল — দিদি, জুতো শোঁকালে হয় না?

কানাই ত্বরিতে টুনুরই একটা চটি কমলার হাতে ধরিয়ে দেয়। কমলা চটিটা টুনুর নাকের সামনে ধরে খানিক সময়। কোনো লক্ষণীয় ফল হয় না।

যমুনা বলেন, যদি একটা ডাক্তার —

পদ্মা বলল, সামান্য ভিরমি খেয়েছে। শুধু শুধু ডাক্তার ডেকে কী হবে! শুয়ে থাক কিছুক্ষণ। আপনা থেকেই ঠিক হয়ে যাবে।

ব্যবস্থা মনঃপূত না হলেও যমুনা চুপ করে ব্যাকুল হাতে মেয়ের কপালে গালে হাত বোলান।

— মা ঠাকরুন, আমি ডাক্তারখানা চিনি। এক ছুটে যাব আসব। যাই?

যমুনা পদ্মার দিকে তাকান। পদ্মা কানাইয়ের ওপর চোখ ফেলে কমলাকেও লক্ষ করে। কমলা মার চোখের নির্দেশ পড়ার চেষ্টা করে।

রমা বলে ওঠে, কানাই, যা —শিবু ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আয়। বাবার নাম করে বলবি এক্ষুনি আসতে।

রমার কথা শেষ হবার আগেই কানাই ছুট লাগায়।

যমুনা নিঃশব্দে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে। আরও কত কাঁদাবে ঠাকুর?

চার

ভেবেছিল বইগুলো কারুকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবে। অনেক ভেবে বইগুলো নিজের এলোমেলো সংগ্রহ থেকে খুঁজে গুছিয়ে রেখেছিল। 'গল্পগুচ্ছ', 'চার অধ্যায়', বাংলা অনুবাদে গোর্কির 'মা', আর ইংরেজিতে রেমার্কের, 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট'। গুছিয়ে রাখলেও বইগুলো পাঠানো হয়নি। নানা কাজের চাপে জগদীশ বিশ্বাসের বাড়ির দিকে যাওয়া হয়নি। কিন্তু কয়েক দিনের জন্য উদয়নকে আগরতলা যেতে হবে। সেখান থেকে কলকাতা যাওয়ারও ইচ্ছে আছে। সকলের আগে দশরথ দেবের সঙ্গে দেখা করা দরকার। যিনি বারবার খবর পাঠিয়েছেন। কেন পাঠিয়েছেন জানা দরকার।

আগরতলা যাবার পথে বইগুলো দিয়ে যাবে ভেবে উদয়ন বিশ্বাস বাড়ির সামনে এসে অনুভব করে, ভিতরে কোনো অস্থির চঞ্চলতার কারণ ঘটেছে। ওকে দেখেও রমা কিছু না বলে দ্রুতপায়ে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে ছুটে গেল। একটা ঘরের সামনে বাড়ির কাজের মেয়েদের জটলা। রমার মা-মাসি কারুকেই দেখা যাচ্ছে না। কমলাই-বা কোথায়? কী করবে, কাকে ডাকবে নাকি চলে যাবে এই দোদুল্যমানতার মধ্যে হঠাৎ ভিতর থেকে বেরিয়ে এল

কানাই। হাতে একটা কাগজ। দৌড় শুরু করার আগে উদয়নকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে বলে — মাস্টারমশাই, দিদির খুব অসুখ। আমি অষুধ আইনতে যাই।

আর কিছু না বলে কানাই উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় শুরু করে। উদয়ন ইতস্তত করে বারান্দার বাইরে থেকে ডাকে, রমা —। দিদি বলতে কার কথা বলেছে কানাই, কমলা না প্রণতি? রমার অসুখ নয়, কেন না একটু আগেই ওকে দ্রুতপায়ে যেতে দেখেছে।

ওর ডাক শুনে রমার বদলে কমলা বেরিয়ে আসে। কিছু বলতে পারার আগেই উদয়ন বলে, কানাই বলল দিদির অসুখ। কী হয়েছে?

কমলা বলে, টুনুদি জল তুলতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। শিবু ডাক্তার এসেছেন।

— সিরিয়াস কিছু?

— ডাক্তারবাবু তো বললেন, ভয় নেই। কানাইকে ওষুধ আনতে দিয়েছেন। ওষুধ পড়লেই ঠিক হয়ে যাবে।

আরও অতিরিক্ত কৌতূহল দেখানো আদৌ উচিত হবে না, উদয়ন বুঝতে পারে। গুরুতর কিছু যখন নয়, বেশি উৎকণ্ঠা দেখানো অর্থহীন। বলল, আশা করি শীঘ্রই ভাল হয়ে উঠবেন, তোমাদের দিদি। শোনো এই বইগুলো এনেছিলাম। ওঁকে বোলো, সুস্থ হয়ে ধীরে ধীরে যেন পড়েন। আমি আজ চলি।

কমলার হাতে বইগুলো দিয়ে উদয়ন আর বিন্দুমাত্রও বিলম্ব না করে বেরিয়ে যায়।

বাসের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে উদয়ন মনে করার চেষ্টা করে ও কী প্রণতির মুখ দেখেছিল? সাদা ঘোমটা-পরা একটা নারীমূর্তির আভাস ছাড়া আর কিছুই মনে পড়ে না। কণ্ঠস্বরও কি শুনেছিল? না, বোধ হয়। সেই প্রগলভ হয়ে সাততাড়াতাড়ি অতসব কথা বলে ফেলেছিল। ওঁরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন কি না তা-ও জানা নেই। জানলেও বা কী করা যেত? নিজের বিশ্বাসের কথা উদয়ন বলবেই। নতুন সমাজ গড়ার অভীষ্ট পূরণে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের অচলায়তন নির্মূল করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

আগরতলায় পৌঁছে উদয়ন সোজা চলে যায় বন্ধু শৈলেশ নাথের বাড়ি। একসঙ্গে কলেজে পড়ত। উদয়ন রাজনীতি করে জেলে যায় আর শৈলেশ এম.এ পাশ করে অধ্যাপনার চাকরি নিয়ে ত্রিপুরা চলে আসে। রাজনীতি থেকে যোজন দূরে থাকলেও শৈলেশ বন্ধু উদয়নকে ভালোবাসে। শৈলেশের বাড়িই আগরতলায় উদয়নের ঠিকানা। সেজন্য শৈলেশ পছন্দ করুক বা না করুক রাজনৈতিক লোকজন মাঝেমাঝেই উদয়নের খোঁজে ওর বাড়িতে এসে হাজির হয়। শৈলেশের স্ত্রী পূরবীও উদয়নকে কেবল পছন্দ করে না, যথেষ্ট প্রশ্রয়ও দিয়ে থাকে। তার একটা কারণ, পূরবীর দাদা অংশু রাহাও উদয়নের মতো রাজবন্দী ছিল। ১৯৪৬-এর দাঙ্গার পর তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

সন্ধ্যার অন্ধকার কাঁধের ঝোলায় ভরে উদয়ন যখন পৌঁছায় তার অনেক আগেই শৈলেশ কলেজ থেকে ফিরেছে। ওকে দেখেই বলল, আমি কি তোর পি.এ, না পোস্ট অফিস?

— দুটোই। কেন কী হয়েছে?

— কী আবার হবে, সকাল-বিকাল লোক এসে খোঁজ নিচ্ছে কবে আসবি। জানতে চাইছে, কেন কাঞ্চনগড় ছেড়ে চলে গেছিস, কোথায় গেছিস। তুই যে গেছিস সেটাই তো আমি জানি না। আমার কী অপ্রস্তুত অবস্থা বোঝ!

উচ্চনাদ শুনে শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে আসে পূরবী। — উদয়দা! ওর গলার হাই-হিল

শব্দ শুনেই বুঝেছি আপনি এসেছেন। এ-বারে অনেকদিন বাদে এলেন।

— হ্যাঁ। মাঝখানে একটু দেশে গিয়েছিলাম। মা-বাবার খোঁজ করতে।

— পেলি খোঁজ?

— না। কোথায় গেছেন কেউ বলতে পারল না। ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে সবই লুঠ করে নিয়েছে। ওঁরা বেঁচে আছেন কি না তা-ই বুঝতে পারছি না।

ম্লান হেসে উদয়ন যোগ করে, এইজন্যই ক-দিন ছিলাম না কাঞ্চনগড়ে। আর রটে গেল আমি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছি।

পূরবী বলল, আগে হাতমুখ ধুয়ে আসুন। আমি চা-জলখাবার আনছি।

জামাকাপড় ছাড়তে ছাড়তে উদয়ন জানতে চায়, এখানে অবস্থা কীরকম রে?

— রোজ লোক বাড়ছে। দলে দলে আসছে রিফিউজি। রাজ্য সরকার অবশ্য দরাজ হাতে যথাসাধ্য করছে। তবে এই বিপুল প্লাবন সামলাবার মতো মেশিনারি এবং সরঞ্জামের অভাব। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের খুবই অনটন।

হাতমুখ ধুয়ে এসে উদয়ন বলল, তবু যে ত্রিপুরা শান্ত রয়েছে সেটা এই রাজ্যের মানুষের মহান বদান্যতা। তবে কতদিন এমন থাকবে বলা কঠিন।

— কেন একথা বলছিস?

— বুঝছিস না, এই প্রচণ্ড ইনফ্লাক্সের ফলে এখানে জনসংখ্যার চাপ বাড়বে, বাড়বে ইমব্যালেন্স। ভুলে যাসনে, ত্রিপুরা মূলত ট্রাইবাল অধ্যুষিত রাজ্য। উদ্‌বাস্তুদের চাপে ওদের সংখ্যাধিক্য কমে গেলে কী হবে বা হতে পারে তা নিয়ে রাজনৈতিকভাবে চিন্তাভাবনা করা দরকার।

পূরবী ভিতর থেকে ডাকে — তোমরা এখানে এসো। চা ঢালছি।

খাবার টেবিলে প্লেটে সাজানো লুচি আর বেগুন ভাজা দেখে উদয়ন টের পায়, দারুণ খিদে পেয়েছে। পরপর চারটে লুচি খেয়ে চায়ের কাপ টেনে নেয়।

পূরবী বলে, ও কী! আরো দুটো লুচি খান।

— আর পারব না। চমৎকার খেয়েছি। রাতেও তো খেতে হবে। নাকি খাওয়াবে না?

বিরস গলায় পূরবী বলে, তার তো ঢের দেরি।

শৈলেশ বলল, রেখে দাও। রাতে না হয় উদয়নের অনারে লুচি-মাংস হোক।

— ঠিক আছে। উদয়দা রাজি তো? — পূরবী জানতে চায়।

— পড়েছি মোগলের,— মানে তোমাদের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে। এ-ব্যাপারে আমার অরাজি হবার কিছু নেই। আহুতির বিরুদ্ধে অগ্নি কি প্রতিবাদ করে?

চায়ে চুমুক দিয়ে উদয়নের চোখে চোখ রেখে পূরবী বলল, উদয়দা, মা-বাবাদের যে কোনো খবর পেলেন না আপনার কষ্ট হচ্ছে না? দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা আসছে না?

শৈলেশ বলে, কত মানুষ যে এ-ভাবে স্বজনহীন হয়েছে, কত পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়েছে তার কোনো হদিশ পাওয়া যাবে না কখনো।

উদয়ন চুপ থেকে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে যায়। পূরবী ওর চোখের উদাস ভাষা পড়ে বলে, কী ভাবছেন?

ধীর স্বরে উদয়ন বলে, ভাবছি তোমার কথাগুলো। দেশ থেকে কাঞ্চনগড়ে ফিরে সত্যিই খুব মন খারাপ হয়েছিল। মা-বাবাকে তো ভোলা যায় না। তারপর এই ক-দিন আগে এক

বাড়িতে দু-টি নারীকে দেখি — মা ও মেয়ে। তাদের কথা শুনে আমার সব দুঃখ তুচ্ছ হয়ে যায়।

— কী হয়েছিল ওদের?

উদয়ন সংক্ষেপে যমুনা ও প্রণতির কাহিনী বলে চুপ করতেই পূরবী আর্তস্বরে বলে ওঠে, কী বলছেন উদয়দা! মা-মেয়ে একসঙ্গে বিধবা হয়েছে। একা এপারে এসে নতুন আশ্রয় গড়ে নিতে চাইছে। আমি তো কল্পনাও করতে পারি না। আপনার কথা শুনেই আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

— দ্যাখো, এখানে বাড়ি করতে চাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। সারভাইভালের জন্য অ্যানিম্যাল ইনস্টিংক্ট। কিন্তু আমাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে ওই মেয়েটি — প্রণতির পড়তে চাওয়া — লেখাপড়া শিখে দুঃখদীর্ণ জীবনের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার ঈপ্সা। একবার ভাবো, ওইটুকু মেয়ের কতখানি মনের জোর। বিশেষত যদি মনে রাখো যে মাত্র মাস তিনেকই কেটেছে ওই দুঃস্বপ্নের রাতের পর। অমৃতস্য পুত্রাঃ আর কাকে বলা যায় বলো।

চায়ের টেবিল ছেড়ে বসার ঘরে এসে উদয়ন বলল, কারা আমার খোঁজ করছিল, শৈলেশ?

— সবাইকে আমি চিনিও না। নামও জানি না। তবে তোমার সাগরেদ মানিক সেন কয়েকবার এসেছিল।

মানিক সেন উদয়নের অনেক ছোটো। বছর কুড়ি হবে হয়তো। রাজবন্দী থাকার সময় আলাপ হয়েছিল। কবিরাজের ছেলে। পড়াশোনা বিশেষ করেনি। অবশ্য ম্যাট্রিকটা পাশ করেছিল। কিছুদিন কংগ্রেসিদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে হঠাৎই সুভাস বোসের ভক্ত হয়ে পড়ে। কবে কীভাবে ত্রিপুরায় এসেছে জানে না উদয়ন। গতবার জনশিক্ষা সমিতির অফিসে দেখে অবাকই হয়েছিল। ছেলেটাকে ভালোই লাগত। এক ধরনের সরলতা আছে। একটু আবেগপ্রবণও। উদয়নকে দেখার পরই ওর ন্যাওটা হয়ে পড়ে মানিক। সে-সূত্রেই শৈলেশের বাড়িতে আসা। মানিক চেষ্টা করেছিল এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলার। পূরবীর বিরুদ্ধতার জন্য তা হতে পারেনি। পূরবীর মানিককে একেবারেই পছন্দ নয়। উদয়নকেও বলেছে, ওকে বেশি পাত্তা দেবেন না উদয়দা।

কারণ জানতে চাইলে পূরবী বলে, কারণ কিছু বলতে পারব না। আমার মনে হয় ছেলেটা সুবিধের নয়। ওর চোখের দৃষ্টি আমার ভালো লাগে না। সারাক্ষণ যেন কোনো মতলব আঁটছে।

— কী যে বলো! বাচ্চা ছেলে। রাজনীতি করতে চাইছে, কী আর মতলব আঁটতে পারে!

— অতশত বুঝি না। যা মনে হল, বললাম। বছর কয়েক পরে উদয়ন স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল, পূরবীর সেই অনুভব ছিল নির্ভুল। ও নারীবোধ দিয়ে মানিকের ভিতরের মানুষটাকে চিনতে পেরেছিল। ওর মুখের সরলতা ছিল চতুরতার নির্মোক।

পরদিন নির্দিষ্ট সময় ও স্থানে উদয়ন দশরথ দেবের সঙ্গে দেখা করে। জনশিক্ষা সমিতির নেতা হিসেবে দশরথ দেব উপজাতি জনসমাজের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় ও প্রভাবশালী মানুষ। দশরথ ইতিমধ্যেই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে পার্টিসংগঠন গড়ে তোলার কাজে সর্বাংশে নিয়োজিত।

উদয়নকে বললেন, আমাদের সমিতির হয়ে আপনি খুব ভালো কাজ করেছেন। আপনার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত উদ্যোগ দেখে সবাই খুব উদ্বুদ্ধ। আমরা চাই আপনি আরও দায়িত্ব নিন।

— কী করতে বলেন আমাকে?

— শিক্ষকদের একটা সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

সর্বস্তরের শিক্ষকদের সংঘবদ্ধ করাটা আপনার প্রাথমিক কাজ। আর এই যে হাজার হাজার রিফিউজি আসছে — এইসব ছিন্নমূল মানুষ — ওদের মধ্যে কাজ করতে হবে। রিলিফ, পুনর্বাসন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা — একে একে সবদিকেই নজর দিতে হবে। সবচেয়ে জরুরি ওদের সংগঠিত করা।

— আমি কী করব। আমি নিজেই তো রিফিউজি।

সেটাই তো আপনার বিশ্বাসযোগ্যতার পুঁজি। আপনার পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড-ও আইডিয়াল। পার্টিতেআপনার মতো মানুষই দরকার। আমরা আপনাকে সবরকম সাহায্য করব।

উদয়নের মাথায় বিদ্যুৎ চমকায়। এতক্ষণ ভাবছিল উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও কুসংস্কার দূরীকরণের জন্য জনশিক্ষা সমিতি যে কাজ করেছিল দশরথের প্রস্তাবিত কাজগুলো অনুরূপ কোনো লোকহিতকর উদ্যোগই হবে। কিন্তু পার্টি শব্দটা মাথায় যেন স্কুলের পিরিয়ড শেষের ঘণ্টা বাজায়।

— পার্টি? কোন পার্টির কথা বলছেন?

— আমাদের পার্টির — কমিউনিস্ট পার্টি।

— আমি তো পার্টির কেউ নই।

— এখনও নন, কিন্তু হবেন। আমি তো সে-কথাই বলছি। আমাদের সঙ্গে আসুন। এখন অনেক কাজ করার আছে। দেখছেন তো দিকে দিকে সাম্রাজ্যবাদ তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ছে। চীনে মাও সে তুঙের নেতৃত্বে লংমার্চ শেষ লড়াইয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে। দেশ ভাগ, ঘৃণ্য সাম্রাজ্যবাদের অপকীর্তি। তার তল্পিবাহক সামন্তবাদ, স্বৈরাচার ধ্বংস করে নতুন দেশ, নতুন সমাজ গড়তে হবে।

— আপনার মতো পরীক্ষিত বিপ্লবীরা এগিয়ে না এলে কারা বয়ে নিয়ে যাবে সর্বহারা বিপ্লবের মশাল।

দশরথের সঙ্গে আরও দু-জন ছিলেন। তাঁরা দশরথের চেয়েও দীপ্র কণ্ঠে নভেম্বর বিপ্লবের কথা, টিটো, জুকভের কথা, মীরাট ষড়যন্ত্রের পশ্চাৎপট, কাকাবাবু, রণদিভে, যোশী ও ডাঙ্গের কথা বলেন যে উদয়নের মনে হয় ওর মগজটা খুলি থেকে খুলে কেউ যেন সমুদ্রের মধ্যে কলাগাছের ভোঙায় ভাসিয়ে দিয়েছে।

দু-ঘণ্টায় ও যা জানল, শিখল, ওর বত্রিশ বছরের শিক্ষা সে-তুলনায় যেন নিতান্তই প্রাথমিক স্তরের ছিল। কাকাবাবু যে মুজফ্‌ফর আহমেদ এই অজ্ঞানতা যে পিতৃপরিচয় না-জানার মতোই ধিক্কারযোগ্য, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না।

দশরথের সঙ্গী ভবানী চৌধুরি বললেন, আপনি জানেন তিনজন বাঙালি ১৯২০ সালে তাসখন্দে প্রথম ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি স্থাপন করেন। তাঁরা হলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আর অবনী মুখোপাধ্যায়। আর ভারতবর্ষে ১৯২৪ সালে কানপুরে সত্যভক্ত নামে একজন বামপন্থী কংগ্রেসি, কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া গঠন করেন। আমরা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সক্রিয় অংশীদার।

ভবানী বললেন, দশরথ, তুমি এঁকে কিছু বইপত্র দাও। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো হিস্ট্রি অফ

সি পি এস ইউ(বি)। লেনিনের কয়েকটা বই। 'হোয়াইট ইজ টু বি ডান' অবশ্যই দেবে।

উদয়ন ঢোঁক গিলে কোনোমতে বলে, আমার দুটো কথা ছিল।

— হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন। — ভবানী উৎসাহিত করেন।

— আমি কয়েকদিন আগে দেশে গিয়েছিলাম। মা-বাবার খোঁজে। কেউ কোনো খোঁজ দিতে পারেনি। আমি জানি না তাঁরা বেঁচে আছেন কি না। আমার ভাইবোনদের যে কী হল তাও জানি না।

উদয়নের কথা শুনে সবাই সমবেদনায় সোচ্চার হন। ও বোঝে, এঁরা শুধুই শব্দ উদ্‌গার করছেন। কোনো আন্তরিকতা নেই।

ভবানী বললেন, আমরা খুবই দুঃখিত। আশা করি কোনো-না-কোনোভাবে ওঁদের খোঁজ পাবেন। সুস্থ থাকার খবর পাবেন। তবে একটা কথা বলি কমরেড, একজন খাঁটি কমিউনিস্ট একজন খাঁটি সৈনিকের মতো। ভাবুন তো সীমান্তে যে সৈনিকরা অতন্দ্র প্রহরায় রয়েছে তাদেরও কারো কারো পরিবারের এমন দুর্বিপাক ঘটেছে হয়তো, বাংলায় বা পাঞ্জাবে। তা বলে কি তারা সীমান্ত ছেড়ে পালাবে? না। কখনোই না। কমরেড, আ কমিউনিস্ট লিভস ফর দ্য কজ, অ্যান্ড ডাই ফর দ্যা কজ। অ্যান্ড দ্যা কজ ইজ — ডিক্‌টেটরশিপ অফ দ্যা প্রলেতারিয়েত।

দশরথ বললেন, আপনি কী ভাবছেন? আমরা কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?

— ভাবছি কলকাতা যাব। সেখানে খোঁজখবর করে দেখি যদি কোনো সন্ধান পাই।

— নিশ্চয়। আপনি যান। কলকাতায় পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আমাদের কমরেডরা আপনাকে যথাসাধ্য হেল্‌প করবে। দশরথ, তুমি ওকে কাকাবাবু আর সোমনাথদার দুটো চিঠি করে দিয়ো।

ঠিকানা ও চিঠি নিয়ে বেরুবার সময় ভবানী বললেন, ফিরে এসেই দশরথের সঙ্গে যোগযোগ করবেন।

শৈলেশের বাড়ির পথে কিছুটা হাঁটার পর পুরসভার সামনে আচমকা দেখা মানিক সেনের সঙ্গে। ওকে দেখে উল্লসিত মানিক বলে, কবে এলেন উদয়নদা? আমি কবে থেকে খুঁজছি আপনাকে।

— হ্যাঁ, শুনলাম। কেন খুঁজছিলে?

— আপনি কি এখন বাড়ি যাচ্ছেন, মানে শৈলেশদার বাড়ি?

— হ্যাঁ।

— চলুন। আমি ওইদিকেই যাব।

কয়েক পা নীরবে চলে মানিক বলে, একটা কথা বলব ভাবছিলাম, কিছু মনে করবেন না যেন।

— বলো।

— শৈলেশদাদের তো কোনো বাচ্চাকাচ্চা নেই। ওঁদের বিয়ে হয়েছে কত বছর জানেন?

— বছর পাঁচেক হবে হয়তো। কেন?

— এমনি। আসলে পূরবী বৌদির মুখে সারাক্ষণ একটা বিষণ্ণতার ছাপ — আপনি লক্ষ করেননি?

— না। তুমি কি এজন্যই আমাকে খুঁজছিলে?

— কী যে বলেন! উদয়নদা, আমাকে যদি একটু সাহায্য করেন — আপনার অনেক

চেনাজানা, অনেকেই মান্য করে — যদি একটু বলে কয়ে দিতেন আমার হয়ে —

— কাকে কী বলব? কী বলছ কিছুই বুঝতে পারছি না। খুলে বলো কী চাই। চাকরি?

— না, চাকরি না। সুখময় সেনগুপ্ত , কি রমেন্দ্রকিশোর দেববর্মন — এঁদের সঙ্গে যদি একটু পরিচয় করিয়ে দেন।

— মানিক, এঁদের কারুকেই চিনি না আমি।

— আপনি ইচ্ছে করলে একটা সোর্স বার করতে পারবেন।

— তা-ও পারব কি না জানি না। কিন্তু তোমার দরকারটা কী?

একটু দোনামনা করে মানিক জানায়, আসলে ওঁরা এখন কংগ্রেসের বড়ো নেতা। জানাশোনা থাকলে পার্টির মধ্যে একটু জায়গা পাওয়া যেত। এই আর কী।

অল্প আগে একটা পার্টি উদয়নকে আহ্বান জানিয়েছে। আর এখন অন্য একটা পার্টিতে প্রবেশের জন্য উমেদারি করছে একজন। জীবনের বিচিত্রতা উদয়নের ঠোঁটে যে-হাসি মুচড়ে ওঠে তা চোখে পড়ে মানিকের।

উদয়ন বলল, তুমি তো, আমার যদ্দূর মনে পড়ে, ফরোয়ার্ড ব্লকে ছিলে।

— হ্যাঁ। আমি সুভাষ বোসের ভক্ত। তাতে কংগ্রেস করায় কোনো বাধা নেই। কংগ্রেস এখন দেশের সরকারি দল। এখন ন্যাশনাল পার্টির সঙ্গে থেকে কাজ করাটাই উচিত হবে।

ঠোঁটের হাসি উদয়নের বুকে কুলকুল করে ফোয়ারার মতো উথলে ওঠে। অনতিদীর্ঘ স্বদেশি-করা জীবনে মানিকের মতো আরও অনেককেই দেখেছে উদয়ন। অপ্রিয় কিছু কঠিন কথা মুখে উজিয়ে এলেও বলল না। ছেলেটার বয়েস কম। অভিজ্ঞতা দিয়ে নিশ্চয় নিজের চারণভূমি খুঁজে পাবে। তখন একজন পরিণত কর্মী-মানুষ হয়ে উঠবে আশা করা যায়।

উদয়ন বলে, আমি কাল কলকাতা যাব। ফিরে এলে একদিন এসো। তখন কথা বলব।

মাথা নেড়ে মানিক উলটো দিকে ঘুরে যায়। ঘরের ছাউনিতে অলক্ষ ছিদ্রের শূন্যতাও অনন্তবর্ষী। ও কি জানে?

পাঁচ

লোকে বলে শিবু ডাক্তার। ডিসপেনসারির বাইরের বোর্ডে লেখা আছে — 'ডা. শিবনাথ চক্রবর্তী, এল.এম.এফ। ৩০ বছরের অভিজ্ঞ।' এই বোর্ড লাগাবার পর কত বছর কেটে গেছে বলা কঠিন। বোর্ডের রং ও অক্ষর চটে গেলেও ৩০ সংখ্যাটা অপরিবর্তিত থেকে গেছে। প্রবীণ ডাক্তারের ঋজু দীর্ঘ সৌম্য চেহারার যেমন সমীহ দাবি করে, তেমনি মমতাময় স্নিগ্ধ কথাবার্তা রোগী ও স্বজনদের পক্ষে অতীব স্বস্তিজনক।

কানাইয়ের আনা ওষুধের প্রয়োগবিধি বুঝিয়ে দিয়ে ডাক্তার বললেন, এখন আর ওকে বিরক্ত করবেন না।

যমুনা বললেন, কী হয়েছে — আমার তো এই এক সম্বল, ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার ইতিমধ্যেই জেনে নিয়েছেন টুনু ও যমুনার দুর্ভাগ্যের কথা। পদ্মাকে বললেন, ছেলেমেয়েদের একটু বাইরে যেতে বলুন।

কানাই দরজার কাছেই দাঁড়িয়েছিল। ডাক্তারের কথা শুনে নিজেই বাইরে চলে যায়। পদ্মার ইঙ্গিতে রমা পা বাড়ালেও কমলা মার মুখের দিকে তাকিয়ে অনিচ্ছা প্রকাশের চেষ্টা করে। ওর ধারণা বড়োদের মধ্যে থাকার মতো যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। পদ্মা বলল, কমলা,

বাইরে যা।

কমলা বেরিয়ে গেলে পদ্মা দরজা বন্ধ করে ডাক্তারদের সামনে দাঁড়িয়ে বলে, এবার বলেন —

যমুনার উদ্বিগ্ন মুখ দেখে ডাক্তার বলেন, ছোটোদের সামনে বললাম না কারণ যা শুনলাম তাতে আপনারা কী ভাববেন জানি না তো। আসলে সুখবরই দেব— আপনার মেয়ে মা হতে চলেছে। আমার তো উচিত ছিল মিষ্টি আনতে বলা।

যমুনা বিস্ফারিত চোখে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বলেন, ঠিক বলছেন — টুনু পোয়াতি!

পদ্মা বলে, অ্যাঁ — বিধবা মাইয়ার গর্ভ?

ডাক্তার যমুনাকে বলেন, আপনাকে কিছু বলেনি মেয়ে?

মাথা নাড়েন যমুনা।

— বলা উচিত ছিল। তিন মাসের বেশিই হবে। এখন একটু সাবধানে রাখবেন। কুয়ো থেকে জল তুলতে দেবেন না। খাওয়া-দাওয়ার দিকে খেয়াল রাখবেন। দেখবেন মনে যেন স্ফূর্তি থাকে। দরকার হলে — আমি তো আছিই।

ডাক্তার চলে যাবার পরও মেয়ের মাথায় হাত রেখে চুপচাপ বসে থাকেন যমুনা। খবরটা খুবই আনন্দের। সবই তাহলে শেষ হয়ে যায়নি। বিনোদ একটা চিহ্ন রেখে গেছে। টুনুও জীবনের অবলম্বন পাবে। শুধু যারা থাকলে সবচেয়ে বেশি খুশি হত সেই হরিশ আর বিনোদের কথা ভেবে চোখ ভেঙে জল নামে।

কিন্তু পদ্মার কথায় যমুনা পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে যান — কী হবে রে দিদি। বিধবা মেয়ে পোয়াতি — লোকে যে ছিঃ ছিঃ করবে। আমার মেয়েরাও বড়ো হয়েছে। তোর ভগ্নীপতি যে কী করবে শুনলে —

পদ্মার কথাগুলো যথাযথ অনুধাবন করতে সময় লাগে যমুনার। পদ্মা এমন বলতে পারে কল্পনায়ও ভাবতে পারতেন না যমুনা। মানুষের বিচার-বিবেচনার অবিশ্বাস্যতার বোধহয় কোনো পরিসীমা হয় না।

নিজেকে সংহত করে যমুনা বলেন, তোর কি মাথা খারাপ হইছে? টুনু বিধবা, অবিবাহিতা তো নয়। এর চাইতে ভালো খবর আর কী হইতে পারত!

তোর জামাইবাবু আর জামাইটা যদি থাইকতো —

— কিন্তু দ্বিরাগমনে এসে যে মেয়ে বিধবা হয় — স্বামীর সঙ্গে আর ক-দিন ছিল — অথচ তিন মাস —

— তিন মাস হিসেবটা তো ঠিকই আছে। পদি, গর্ভ হতে ক-দিন সহবাস করতে হয় তুই জানস না? তুই সন্দেহ করছিস কেন খুইল্যা বল।

— আমি কেন সন্দেহ করব। বিধবা মেয়ে পোয়াতি। লোকজনে কুকথা বলতেই পারে। তাই বললাম।

— বুঝেছি। তোরে আর কিছু কইতে লাগবো না। আমার অনুরোধ এমন অস্বৈরণ কথা আর কইস না।

বিরস মুখে তীব্র দৃষ্টি হেনে পদ্মা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। আর যমুনার চোখ বেয়ে আবারও ঢল নামে। অকরুণ ভাগ্যের নিষ্ঠুরতার জন্য, আজ এমন শুনতে হচ্ছে। দেশের বাড়িতে থাকলে উৎসবের আয়োজন হত। কী দুর্ভাগা এই অনাগত সন্তান। জন্মের আগেই পিতৃ-

হারা। আগামী দিনের কথা ভেবে বিচলিত বোধ করেন যমুনা।

খানিক পরে চোখ খুলে টুনু দেখে উদগ্রীব চোখে ওর দিকে চেয়ে রয়েছে মা। তাড়াতাড়ি উঠতে যাবার উদ্যোগ করতেই যমুনা ওকে শুইয়ে রেখে বলেন, আস্তে, মা আস্তে। এখন থেকে সব সময় সাবধানে চলতে লাগব। কোনো হড়বড় করবা না। এখন কেমন লাগতাছে?

— মাথাটা যেন কেমন —

— ও কিছু না। এট্টু জল খা।

জল খেয়ে ধীরে ধীরে উঠে বসে টুনু।

যমুনা বলল, হ্যাঁরে তুই আমারে কস নাই ক্যান? তিন মাস ধইর‍্যা বন্ধ — তোর চিন্তা হয় নাই? আর এত বড়ো খবর কি লুকাইয়্যা রাখতে হয়!

টুনু বলল, কী বলতেছ মা? কী হইছে আমার?

যমুনা সস্নেহে মেয়ের মাথা কাঁধের কাছে ধরে কানে কানে বলেন এখনও বোঝস নাই? তুই মা হতে চলেছিস — মা —

মার কথাগুলো টুনুর মগজের অভ্যন্তরে তীক্ষ্ণ ধাক্কা দিয়ে সত্তায় অনুভবে তীব্র শোরগোল তোলে। একই সঙ্গে ও বুকের ভিতরে হাজার রং-মশালের জ্বলে-ওঠা টের পায়। পরমুহূর্তেই চোখের উপরে দুলে ওঠে নিকষ কঠিন কৃষ্ণ-যবনিকা। অস্ফুট আর্তনাদ করে মার বুকে মুখ চাপে টুনু। অরুধ্য স্রোতের মতো কান্নার তোড়ে শরীর ফুলে ফুলে ওঠে।

টুনুর কেঁদে ওঠার শব্দ শুনছিল কমলা ও রেবা। দু-জনেই দ্রুতপায়ে ঘরে ঢুকে যমুনার বক্ষলগ্ন টুনুকে দেখে সরল কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করে — ফুলদির কি হয়েছে মাসি?

যমুনা হাসিমুখে ওদের ডাকেন — আয় তোরা ওর পাশে বস। কানাইটা কোথায় গেছে — কানাই —

কানাই এলে যমুনা উঠে ওকে টাকা দিয়ে বললেন, যা, মিষ্টি লইয়্যা আয়। তাড়াতাড়ি আসবি। তোরে লইয়্যা মন্দিরে যামু একবার।

কমলা বলল, ও মাসি ফুলদি কিছু বলছে না। তুমি মিষ্টি আনতে পাঠালে — বলো না কি ব্যাপার—

যমুনা সরস প্রফুল্লতায় বলেন, এতকাল আমি মাসি ছিলাম, এবার তোরা মাসি হবি।

রমা সোল্লাসে বলে, সত্যি ফুলদি? ওঃ কী মজা হবে!

কমলা বলল, তুই সব পেটে পেটে রেখেছিস, ফুলদি। একবারও তো বলিসনি। যতই চেপে থাক, চিরকাল তো পেটে রাখতে পারতিস না। তা হলে?

পরে কী ভেবে কমল বলতে গেল, কিন্তু —। কথা শেষ না করে থেমে গিয়ে তদন্তের চোখে টুনুর দিকে তাকায়।

মন্দিরে যাবার আয়োজনের জন্য যমুনা রমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় বলেন, কমলা টুনুকে স্নানের ঘরে নিয়ে যা। ভালো করে স্নান করিয়ে দিলে শরীরটা ভালো লাগবে।

টুনুকে একা পেয়ে কমলা ওর গলা জড়িয়ে ধরে বলে, জামাইবাবুকে তুই ক-দিন পেয়েছিলিরে? সাত-আটদিন?

চোখ মুছে টুনু বলে, কেন?

— না, ভাবছিলাম। মানুষটা করিতকর্মা ছিল। ওরই মধ্যে গোলা ভরে দিয়ে গেছে।

ইচ্ছার বিরুদ্ধেও হাসি ফোটে টুনুর মুখে। — ধ্যাৎ, অসভ্য কোথাকার! খুব ডেঁপো হয়েছিস তুই। দাঁড়া, মাসিকে বলছি।

— কী বলবি! বল না জামাইবাবুর মতো একটা খাটিয়ে বর এনে দিতে।

হাসি থামিয়ে কমলা বলল, কেমন লাগছেরে তোর?

টুনু অমলিন গলায় বলে, খুশি লাগছে — খুব খুশি লাগছে। কিন্তু ভিতরে একটা অদ্ভুত কষ্ট হচ্ছে। ভীষণ কষ্ট — আমি তোকে বোঝাতে পারব না। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করছে।

কমলা পরম আদরে টুনুর চোখমুখ মুছিয়ে দিয়ে বলল, মাস্টারমশাই এসেছিলেন। তোর জন্য ক-টা বই দিয়ে গেছেন।

মাস্টারমশাই! ক-দিন আগে যে-মানুষটা রীতি-সংস্কার বিরোধী কথা বলে গেছেন? বলার সময় চোখে যেন একটা ভিন্নতর দীপ্তি দেখেছিল। কণ্ঠস্বরেও ছিল ব্যক্তিত্ব ও বিশ্বাসের সমাহার। বলেছিলেন বটে বই পাঠাবেন। অথচ নিজে এসে ফিরে গেলেন। ভুলেও তো যেতে পারতেন। কত মানুষই কথা রাখে না। আর এটা কি তেমন রাখার মতো কথা ছিল?

টুনু নিয়ন্ত্রিত স্বরে বলল, বই দিয়ে গেছেন! চল তো গিয়ে দেখি কী বই।

— বই পরে দেখলেও চলবে। এখন স্নানে চল।

সন্ধেবেলা জগদীশ বাড়ি ফিরলে পদ্মা নিজেদের ঘরে একান্তে টুনুর অবস্থার কথা জানায়। পদ্মাকে অবাক করে দিয়ে জগদীশ বলে এ-তো ভালো খবর। তুমি এত ফিসফাস করছ কেন?

— করব না! বিধবা মেয়ে পোয়াতি — লোকজন শুনলে কী বলবে!

— তোমার কি মাথা খারাপ? টুনু প্রথম মেয়ে নয় যে গর্ভস্থ অবস্থায় বিধবা হয়েছে। সময়ের হিসেবও ঠিক আছে। না, না, তুমি আর অহেতুক প্যাচাল করো না তো! টুনু আছে কেমন এখন?

— বাড়িতে দু-দুটো সোমত্ত মেয়ে, সে-হুঁশ আছে তোমার? ছেলেও বড়ো হয়েছে। ওদের সামনে এইসব —

— কীসব? অ্যাঁ? শোনো, তোমার ছেলেমেয়েরা কীভাবে বাচ্চা হয় তোমার চেয়ে বেশি জানে। তুমি আমাকে আসল কথাটা বলো। তোমার উদ্দেশ্য কী?

জগদীশ কখন যে কী মেজাজে থাকে এত বছরেও বুঝে উঠতে পারেনি পদ্মা। মাস্টারের কথা নিয়ে সেদিন জগদীশ নিজের উষ্মা গোপন রাখেনি।

পদ্মা ভেবেছিল আজও জগদীশকে তাতিয়ে দিতে পারবে। টুনুর খবরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে পদ্মা ভবিষ্যতের ছবিটা যথাসাধ্য ভেবে নেয়। যমুনা-টুনুর সব দায় এখন ওদের উপর বর্তাবে। এই অবস্থায় অসহায় দিদিকে হেলাফেলাও করা যাবে না। প্রসব পর্যন্ত শতেক ঝামেলা ওকেই সামলাতে হবে। বিপুল খরচের দায়িত্ব কে নেবে! আর বাচ্চা নিয়ে যদি এখানেই থেকে যায় তখন কী করবে? দিদির কাছে টাকাও দাবি করা যাবে না। চলে যেতে বলাও কঠিন হবে। সুতরাং যদি এখনই কিছু করা যায় বুদ্ধি খাটিয়ে, যাতে অসুখ সারে অথচ ডাক্তার ডাকতে হয় না, তাই ভাবা দরকার।

পদ্মা বলল, দিদি তো আলাদা বাড়ি করার কথা বলছিল। ভাড়াতেই ঠিক করে দাও একটা। রায়বর্মনদের ছোটো কর্তা বোম্বাই থাকেন। তার হিস্যাটা খালি পড়ে আছে। বলে

দেখো না ভাড়া দেয় কি না।

কোনো মন্তব্য না করে গম্ভীর মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে জগদীশ ডাকে — টুনুমা — দিদি —

যমুনা বেরিয়ে এসে বলেন, কখন এলে ভাই! বোসো একটু! অনেক কথা আছে। শুনেছ তো সব?

— শুনলাম। খুব আনন্দের কথা। আমাকে দুপুরেই একটা খবর পাঠাতে পারতেন। টুনু এখন কেমন?

— ভালো আছে। ডাক্তারবাবু বার বার বলেছেন চিন্তার কিচ্ছু নাই। ও লজ্জায় আসতেছে না।

— ছেলেমানুষ তো — ওর দুঃখটাও বুঝি।

এই সময়ে হরিশদা, জামাইবাবাজি থাকেল — আঃ ভাবলেই বুকটা কাঁকিয়ে ওঠে। যাই হোক, দিদি, টুনুমার যেন কোনো কষ্ট না হয় খেয়াল রাখতে হবে। যা কিছু দরকার হবে আমাকে বলবেন। কোনো দ্বিধা করবেন না।

— তোমারে ছাড়া আর কারে কমু। তোমরাই তো সব করতাছ। কিন্তু ভাই, এবার যে আমাদের একটা থাকার ব্যবস্থা করতেই লাগে। দ্যাখো না একটা বাড়ি, — ভাড়াতেই হইলেও চলবে। তুমি অমত কইরো না। এখনই না করলে পরে খুব অসুবিধা হবে।

— এখানে কি বেজুত লাগছে আপনাদের?

— এসব বলে লজ্জা দাও ক্যান? আমরা তো এখানে ভীষণই আরামে আছি। তুমি বুদ্ধিমান মানুষ, আমি আর কী কই তোমারে। ভবিষ্যতের লাইগ্যা — টুনু, তার বাচ্চার জন্য কিছু ব্যবস্থা তো করতেই লাগব। ঠিক কি না কও।

মাথা নেড়ে জগদীশ বলে, অত করে বলছেন যখন আমি আর কী করে আপত্তি করি। দেখি কত তাড়াতাড়ি কী করা যায়।

জগদীশের বড়ো ছেলে পুলক বাড়িতে চুপচাপ থাকতে পছন্দ করে। অবশ্য বাড়িতে ও থাকেই-বা কতক্ষণ। সকালে জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে ফেরে রাতে। তাও ন-টার আগে নয়। শাড়ির দোকানটা এখন পুলকই দেখাশোনা করে। দোকান বন্ধ করে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে ঘড়ির দিকে বেশি নজর দেওয়া যায় না। সারাদিন দোকানে বসে যত নারী দেখে তেমন দু'-এক জনকে সন্ধ্যায় একান্তে দেখার জন্যও সময় দিতে হয়। পুলক গ্রন্থপ্রেমী হতে পারেনি, কিন্তু গানপ্রেমী। গলায় সুর নেই, তবু রেকর্ড শুনে শুনে গান তোলা এবং সেটা বন্ধুদের মধ্যে বিতরণ করায় ও ক্লান্তিহীন।

বাড়ি ফিরে পুলকও সুখবরটা পায়। হাতমুখ ধুয়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে টুনুর ঘরের সামনে এসে ডাকে — টুনু —

টুনু আর পুলক সমবয়সী। অঙ্কের হিসেবে পুলক মাস দুয়েকের বড়ো। সেই সুবাদে ও দাদাগিরি ফলাতে চায়। টুনু ওকে দাদা বলতে কিছুতেই রাজি হয় না।

পুলকের ডাক শুনে নিজেকে সংবৃত করে টুনু বারান্দায় এসে বলে, বল।

— কী শুনছিরে তুই নাকি মা হচ্ছিস!

— ধ্যাৎ। আর কিছু বলবি?

— না। তোকে খুব দেখতে ইচ্ছে করল। মা হওয়া তো বড়ো ব্যাপার। তুই এত বড়ো হলি

কবে বুঝতেই পারিনি।

— থাক। আর বোঝার দরকার নেই। আমি যাই —

পুলক গান ধরে "এখনই নয় নাই বা গেলে —"

টুনু বলে, থাম - থাম। গাধারা সব ঘুমিয়ে পড়েছে। তোর গান শুনতেও তারা এখন জাগবে না।

— তোর গান ভালো লাগে না টুনু?

— কেন লাগবে না! তা বলে এখন তোর গান শুনতে পারব না।

— তোর কার গান ভালো লাগে?

— কানন দেবী, শচীনকর্তা, পঙ্কজ মল্লিক।

— ধ্যুর। ওরা সব পুরোনো হয়ে গেছে। আমি গ্রামাফোন কিনব। তোকে নতুন নতুন গান শোনাব। তখন বুঝবি গান কাকে বলে।

— আগে তো শুনি।

সেদিন রাতে মার পাশে শুয়ে অতি চাপা স্বরে টুনু বলে, মা, নবাবপুরে একটা খবর দেবে তো!

যমুনা মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, দেয়া তো দরকার। সুরেনকে লিখব কাল।

ছয়

ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রণতি যে ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করবে এতটা উদয়ন আশা করেনি। প্রণতি তো ভয় পাচ্ছিল যদি পাশ করতে না পারে। ওর আগ্রহ আর অধ্যবসায় দেখে উদয়ন নিশ্চিত ছিল যে সাফল্য ও পাবেই। না হলে লজ্জায় মুখ দেখানো কঠিন হত। ওরই কথায় যমুনা কাঞ্চনগড়ের বাড়ি ছেড়ে আগরতলা শহরের উপকণ্ঠে এসে থিতু হয়েছে। সিদ্ধান্ত ওদের হলেও উদয়ন যে প্রভাবিত করেছিল তা অস্বীকার করার উপায় নেই। উদয়ন অবশ্য ওরা আসার আগেই আগরতলায় আসতে বাধ্য হয়েছিল। দশরথ দেবের ব্যক্তিগত অনুরোধ উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। এখনও পার্টিতে সরাসরি যুক্ত হয়নি উদয়ন। তবে পার্টির লোকজনের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ রেখে চলে। শিক্ষক সংগঠনের কাজে অনেকটাই সময় দিতে হয়। বস্তুত সেজন্যই দশরথ দেব ওকে এখানে নিয়ে আসার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

শৈলেশ-পূরবী ওদের সঙ্গেই থাকতে বলেছিল। উদয়ন রাজি হয়নি। তবে ওদের বাড়ির কাছেই রাজবাড়ির এক পুরোনো কর্তার বাড়িতে খাওয়া থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। কর্তার দুই নাতিকে পড়াতে হয় অবশ্য। তারপরও নিজের পড়াশোনার জন্য যথেষ্ট সময় ও নিরিবিলি দায় বলে খুবই স্বস্তিতে আছে। সপ্তাহে অন্তত একদিন শৈলেশের বাড়ি যেতেই হয়।

রেজাল্ট শুনে টুনুর বিশ্বাসই হচ্ছিল না। একবার মনে হয়েছিল উদয়ন মজা করছে বুঝি! কিন্তু যমুনাকে যখন বলল তখন আর অবিশ্বাস করা যায় না।

যমুনা বললেন, সবই তোমার জন্য হল বাবা। তুমি যদি জোর দিয়ে না বলতে ও কি আর বসত পরীক্ষায়! তোমার খাটুনিও সফল হয়েছে।

উদয়ন বলল, এবার কী করবে? ভেবেছ কিছু?

টুনু বলল, আপনি তো সবই জানেন। কোনো প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি পাওয়া কি সম্ভব এখানে?

— সে কী! আর পড়বে না?

— তার আগে রোজগারের একটা ব্যবস্থা যে দরকার।

— মাসিমা, আপনি কী বলেন!

— কী যে কই! দেশ থেকে টাকাপয়সা আর আগের মতো আসতেছে না। দাদুভাইয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে কী যে করব কুলকিনারা পাই না। তুমি কী বলো?

একটু ভেবে উদয়ন বলল, প্রাইমারি স্কুলে কিছু করা যায় কি না দেখছি। খুব সহজ হবে না পাওয়া। টিউশনি করবে? একটা দুটো ছেলেমেয়ে বাড়িতে এসে পড়ে যাবে।

যমুনা বলে ওঠে—দুইটা তো করতেছে।

উদয়ন জিজ্ঞাসু চোখে প্রণতির দিকে তাকায়।

— আপনাকে বলা হয়নি। পরীক্ষার পর ধরেছি। খুবই সামান্য —

— বুঝেছি। যাই হোক অভ্যেস তো হচ্ছে। চালিয়ে যাও। কিন্তু পড়তে হবে। অন্তত গ্র্যাজুয়েট না হলে জীবনে দাঁড়াবে কীভাবে! কলেজে ভরতি হয়ে যাও।

— স্কুলে পড়িয়ে কলেজ করা কি যাবে?

— তুমি ধরেই নিয়েছ স্কুলে চাকরি পাবেই।

— আপনি চেষ্টা করলে নিশ্চয় পাব।

শব্দ করে হেসে ওঠে উদয়ন। — তোমার প্রেসারাইজ করার টেকনিকটা দারুণ! শোনো, আই.এর কিছু বইপত্র পাঠিয়ে দেব। যারা কলেজে ভরতি হবে তাদের মধ্য থেকে দু-একজনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবে। কলেজে কী পড়াচ্ছে, সিলেবাসের কোনো বদল হল কি না বা কোন বই পড়ানো হচ্ছে — সেসব খবর পাওয়া দরকার। তবে আমার মতে ভরতি হয়ে যাওয়াই ঠিক হবে। চাকরি পেলে দেখা যাবে।

উদয়ন যাবার উদ্যোগ করলে প্রণতি বলে — একটু বসুন মাস্টারমশাই।

— কেন? মিষ্টি খাওয়া তো হয়ে গেছে। আর কিছু খেতে পারব না এখন।

মুখে হাসি টেনে প্রণতি টেবিলের উপর থেকে একটা শাদা কাগজে মোড়া প্যাকেট নিয়ে উদয়নকে প্রণাম করে বলে, আপনাকে দেবার মতো আমাদের কিছুই নেই। এই সামান্য নিবেদন আপনাকে নিতেই হবে।

— কী এটা?

— গুরুদক্ষিণা। একটা ধুতি আর পাঞ্জাবি।

যমুনা বলেন, ওজর করো না, বাবা। পারলে তোমাকে মোহরের ডালা দিতাম।

বিব্রত মুখে উদয়ন একবার যমুনাকে দেখে, চোখ রাখে প্রণতির উপর — আমার দক্ষিণা তোমার রেজাল্ট। এটা মাসিমার স্নেহের নিদর্শন হিসেবেই নিচ্ছি।

উদয়ন খাবার পর যমুনা উঠে যান ঠাকুর ঘরে। কানাই বাবাইকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। শুকোতে দেওয়া জামাকাপড় তুলে গোছাতে গোছাতে টুনুর মনে হয়, বিধ্বস্ত জীবনে উদয়ন সরকারের মতো আশীর্বাদ লাভ করার সৌভাগ্য ঘটবে, কখনো কি ভাবতে পেরেছিল?

সেই যে একদিন জগদীশ বিশ্বাসের বাড়িতে ঝড়-তোলা কথা বলে চলে গেল, তারপর দেখা হল কত মাস পরে, এখন ঠিক মনে পড়ে না। শিবু ডাক্তারের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই জীবনটা আচমকাই বদলে গেল। রায়বর্মনদের বাড়িটা ভাড়া নিয়ে মোটামুটি গুছিয়ে তুলতেই কেটে যায় অনেকদিন। কানাই যে খাটিয়ে ও কাজের ছেলে হয়েছে তখনই বোঝা গেল। অবশ্য

নতুন বাড়িতে গিয়ে প্রাথমিক অভিজ্ঞতা আদৌ সুখকর ছিল না। পড়শিদের তির্যক মন্তব্য শুনে কেবলই মনে হত, অকারণেই মানুষ এত নিষ্ঠুর হয় কেন। কতজনকে কতবার বলতে হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবাহিত জীবন ও অনন্ত বৈধব্যের কথা, লিখে রাখলে একটা গ্রন্থাবলী হয়ে যেত। মা স্নেহশীল অনড় বলয়ের মতো ঘিরে ছিল বলেই পায়ের তলার মাটিতে ধ্বস লাগেনি। মা যে এমন সাহসী ও পর্যাপ্ত মানসিক শক্তির অধিকারিণী তার পরিচয়ও ওকে প্রত্যয়ী হতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

কমলার কাছে শুনেছিল, উদয়ন ওর অবস্থার কথা জানার পর পড়াশোনা করার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ দেখায়নি। রমা আর তিলককে পড়াতে এসে ওদের খবরাখবর পেতই। দিয়ে যাওয়া বইগুলোও ফেরত চায়নি। তবু টুনু নিজেই রমাকে ফেরত দেবার কথা বলায় উদয়ন জানিয়েছিল, এখন থাক। দরকার হলে চেয়ে নেব।

অন্তঃসত্ত্বা থাকার সময় সেই বইগুলো বারবার পড়েছিল টুনু। গোর্কির 'মা' পড়ার পর মনে হয়েছিল যেন অন্য গ্রহের জীবন ও সংগ্রামের কথা পড়ল। পাভেল, ওর মা কি এই পৃথিবীর মানুষ? তাহলে ওদের পৃথিবীটা কেমন! তার চেনা পৃথিবীর মতো নয়তো। 'চার অধ্যায়ের' অতীন ও এলা বহুদিন ওর প্রত্যহের সঙ্গী ছিল। মাত্র চারটে বই, ওর চিন্তা অনুভব ও বিশ্বাসের ভুবনে যে বিপুল পরিবর্তনের উন্মেষ ঘটায় তার পরিচয় তখনই না পেলেও পরবর্তী জীবনে তার স্বীকৃতি দিয়েছে বারবার।

মনে আছে, বাবাই হবার মাস দুয়েক পরে রমাকে সঙ্গে নিয়ে উদয়ন হাজির হয়েছিল ওদের বাড়িতে। এসেই বলে, রাজ্যহীন রাজকুমার কোথায় দেখি!

যমুনা বলল, রাজ্যহীন! আপনে আমার প্রাণের কথাই কইলেন।

ছেলে কোলে প্রণতিকে দেখে উদয়ন বলল, মাসিমা, রাজজননীকে তো এই শোক-বাস মানাচ্ছে না। রাজকুমারের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে শোকপর্বের অবসান ঘটা উচিত।

প্রণতিকে বলল, আপনি আমার কথা রাখেননি দেখছি। তা নাই রাখলেন। কিন্তু রাজকুমারের জন্য তো নিজেকে প্রস্তুত করবেন। 'মা' পড়েছেন তো?

নিরুত্তরে মাথা ঝাঁকায় প্রণতি।

— কবে আর্বিভাব হল রাজকুমারের?

— ৫ মে।

— কী আশ্চর্য! জানেন ৫ মে কার জন্মদিন? কার্ল মার্ক্স।

যমুনা জানতে চান — তিনি কে?

— একজন মহান মানুষ। সারা পৃথিবীর শোষিত নিপীড়িত মানুষের মুক্তির উদ্‌গাতা। তাঁর চিন্তাধারাই রাশিয়ার বিপ্লবের উৎস। ১৮১৮ সালে জার্মানিতে জন্মেছিলেন, কী নাম রাখলেন?

প্রণতি উত্তর দেয় — মা তো ওকে কতরকম নামে ডাকছে — বাবু, রাজা, দেবু, সোনা। আমি বাবাই বলে ডাকি।

উদয়ন সহাস্যে বলে, বাংলাদেশে সব ছেলেরই নাম হয় বাবু বা রাজা, খোকা বা বাপ্পা। আমি বলছি ভালো নামের কথা।

— মা বলছেন দেবপ্রিয়, দেবাশিস এইরকম কিছু রাখতে। আমি ভাবছি ওর নাম রাখব, স্বাধীন।

কয়েক মুহূর্ত মুগ্ধ বিস্ময়ে প্রণতির দিকে তাকিয়ে থাকে উদয়ন। মনে মনে উচ্চারণ করে যায় — স্বাধীন — স্বাধীন — স্বাধীন। তারপর বলল, অসামান্য ভেবেছেন আপনি। এর চেয়ে ভালো নাম আর কিছুই হতে পারে না। স্বাধীন!

বিদায় নিয়ে চলে আসার পূর্বমুহূর্তে উদয়ন জানতে চায় — পড়াশোনার ব্যাপারে কিছু ভাবছেন আর?

ছেলেকে দেখিয়ে প্রণতি বলে, একে সামলাতেই তো সারাদিন কেটে যায়। পড়ব কখন?

— ওকে মানুষ করার জন্যই তো আপনার পড়া দরকার। শুরু করে দেখুন। ঠিক সময় পেয়ে যাবেন। ইচ্ছে আর তাগিদ থাকলে সময় কোনো সমস্যাই নয়।

তারপর দু-তিন মাস অন্তর হঠাৎ হঠাৎ হাজির হয়ে উদয়ন পড়াশোনার কথা বলত। বিভিন্ন বইপত্রও এনে দিত। বাবাই বছর দেড়েকের হলে একদিন বলল, এবার পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরি হতে হবে।

আমি এসে পড়া ধরব।

— আপনি - আজ্ঞে করলে আমি পড়ব না।

— ঠিক আছে। আর বলব না। পড়া না পারলে শাস্তি পেতে হবে মনে রেখো।

ভারত ইউনিয়নে ত্রিপুরার অন্তর্ভুক্তির অল্পদিন পরই উদয়ন আগরতলায় স্থানান্তরিত হয়। কাঞ্চনগড় ছাড়ার আগে যমুনাকে বলেছিল, শুনেছিলাম আপনারা এখানেই পাকাপাকিভাবে থেকে যেতে চান। বাড়ি করলে আগরতলা বা তার কাছাকাছি করাই ভালো। শহরে শিক্ষার সুবিধে, কাজকর্মের সুযোগও বেশি। আমি চলে যাচ্ছি বলে বলছি না। স্বাধীনের ভবিষ্যতের কথা মনে রেখেই বলছি।

যমুনা বলেন, এখানে তো ভালোই আছি। জগদীশ রয়েছে। বাবাই তো এখনও শিশু। এখানে হয়েছে, এখানেই মানুষ হবে।

অগত্যা উদয়ন বলে — প্রণতি যেন পরীক্ষার জন্য তৈরি হয় দেখবেন। আমার ঠিকানা দিয়ে গেলাম। কোনো দরকার হলে জানাবেন।

উদয়নের প্রস্থান যে ওদের জীবনে আবার এক দুর্যোগের সূত্রপাত ঘটাবে তার কোনো অগ্রিম আভাস ছিল না। উদয়ন স্বদেশী-করা রাজনীতির ঘনিষ্ঠ মানুষ ও সজ্জন শিক্ষক বলে লোকজন সম্ভ্রমের চোখে দেখত ঠিকই। তবু বিধবা মা-মেয়ের কাছে এই অনাত্মীয় পুরুষের নিয়মিত আনাগোনা অনেকেরই পছন্দ হচ্ছিল না। সামান্য কুকথা কানে এলেও যমুনা উপেক্ষা করছিলেন।

রায়বর্মনদের বড়োকর্তার ছোটোছেলে খগেশ পুলকের বন্ধু হবার সুবাদে সময়ে-অসময়ে যমুনাদের বাড়িতে আসত। যমুনা না বুঝলেও টুনুর সন্দেহ হচ্ছিল যে খগেশ ওর ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করছে। রূঢ় না হয়ে টুনু ওকে এড়িয়ে চলার জন্য যথাসাধ্য ওর মুখোমুখি হতে চায় না। এই না চাওয়া হয়তো খগেশের জেদ বাড়িয়ে থাকতে পারে। একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে আচমকা ওকে জড়িয়ে ধরে চুম্বনের চেষ্টা করে খগেশ। আতঙ্কিত টুনু কোনোমতে নিজেকে ছাড়িয়ে ঘরের নিরাপত্তায় আশ্রয় নেয়। ভিতরের ক্রোধ ও বিবমিষা নিয়ে ভাবতে থাকে কী করবে। কারুকে বলবে? বলে কি কোনো ফল হবে? ঝোঁকের মাথায় করে অনুতপ্ত হয়ে যদি আর কোনো অশ্লীল আচরণ না করে খগেশ, তাহলে কি বিষয়টা উপেক্ষা করা সমীচীন? কিছুই স্থির করতে পারে না টুনু।

এই অস্থিরতার মধ্যেও খগেশের আনাগোনা চলে। নানাভাবে উত্ত্যক্ত করে। বাধ্য হয়ে টুনু পুলকের সাহায্য চাইলে, ওকে অবাক করে দিয়ে পুলক বলে, ওদের চটাস না। ওদের খুব হাই কানেকশন। সম্ভাব রেখে চলাই ভালো। খগেশ তো ভালো ছেলে। তবু আমি বলে দেব। কোনো ভুল বোঝাবুঝি হয়ে থাকলে যেন মিটিয়ে নেয়।

সেদিনই বিকেলে খগেশ ওকে ডেকে বলে, খুব সতীপনা দেখানো হচ্ছে! মাস্টারের সঙ্গে লটরপটর করছ, বিধবা হয়ে পেট বাঁধিয়েছ ভাবছ কেউ কিছু জানে না, বোঝে না। কিছুই করিনি তাতেই কমপ্লেন করছ! যখন করব ওই মুখে কোনো শব্দ জোগাবে না মনে রেখো।

একটু থেমে আবার যোগ করে, তুমি বোধ হয় জানো না জগদীশ বিশ্বাসের বাড়ির জমি আমাদের। দোকানঘর আমাদের। পুলকের ব্যাবসা আমার টাকায়। এত কিছুর বিনিময়ে তোমার একটু ছোঁয়া তো চাইতেই পারি। ফ্রি চাইব না। কী লাগবে বলো, পেয়ে যাবে।

হঠাৎই উদয়নকে জড়িয়ে কুৎসার গুজবে সারা পাড়া সরগরম হয়ে ওঠে। বুঝতে অসুবিধে হয় না যে পরিকল্পিতভাবেই তা করা হচ্ছে। খগেশের উৎপাত আর কুৎসার প্রসার সহনসীমা অতিক্রম করে। নিরুপায় হয়ে টুনু বলল, মা, চলো ক-দিন ডলিদির কাছে থেকে আসি। কিংবা সীমাদির কাছে আসামে যাই।

— মন্দ কস নাই। কিন্তু এই বাড়িঘর, জিনিসপত্র—

— কানাই থাকবে।

মনে কুণ্ঠা নিয়েই আগরতলায় ডলিদের বাড়িতে এসে ওঠেন যমুনা। ডলির মেয়েরা ফুলমাসিকে পেয়ে উৎফুল্ল। বাবাই তো সকলের নয়নমণি। আদর করে করে কারুরই যেন আশ মেটে না। ডলির নিজের একটা ছেলের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল। বাবাইকে কোলে নিয়ে সেই অপূর্ণ সাধের, সামান্য হলেও, কিছুটা মেটাতে পারে।

টুনু ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরি হচ্ছে শুনে খুশি হয় নীরদ। মাসিকে ব'লে পরীক্ষা পর্যন্ত ওঁরা যেন এখানেই থাকেন। একটু হয়তো অসুবিধে হবে। তবে লেখাপড়ায়, কাঞ্চনগড়ের তুলনায় আগরতলা শহরে সুযোগ, সাহায্য নিঃসন্দেহে অনেক বেশি। ভবিষ্যতের কথা ভাবলে তো এখানেই থিতু হওয়া যুক্তিযুক্ত।

ডলি বলল, তোমরা তো কাঞ্চনগড়ে ভাড়া বাড়িতে আছ। এখানেই একটা বাড়ি করো যদি, একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা হয়। দেশে তো আর ফেরা যাবে না।

যমুনা এখনও মানতে ইচ্ছুক নন যে সুজাপুরে আর কোনোদিন ফিরবেন না। তিনি মনে করেন পাকিস্তানের হুজুগ দীর্ঘস্থায়ী হবে না, অচিরেই মিইয়ে যাবে। তখন নিশ্চয় দেশে ফিরতে পারবেন। তবে হ্যাঁ, যতদিন যেতে না পারছেন, নিজেদের থাকার একটা নিরাপদ সুবন্দোবস্ত প্রয়োজন। কারুর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে চান না। কারুর কৃপা বা করুণাও প্রত্যাশা করেন না।

বললেন, দ্যাখো না, এখানে ছোট্ট-খাট্টো একটা বাড়ি পাওয়া যায় কি না। কীরকম দাম হবে যদি আন্দাজ পাওয়া যায় —

নীরদ বলে, খোঁজ নিয়ে দেখছি। এখন হঠাৎই খুব দাম বেড়ে গেছে। এত লোকের চাপ আর চাহিদা!

যমুনা টুনুকে বলেন, একবার মাস্টারকে খবর দিলে হত না — ওর তো অনেক জানাচেনা আছে —

টুনু বলে, এখন না, মা। সব ব্যাপারে ওঁকে না জড়ানোই ঠিক। দেখি না ক-দিন।

উদ্যোগী পুরুষ বলে নীরদের কোনো খ্যাতি নেই। আপন আবর্তের মধ্যে নিরুপদ্রব দিনাতিপাতেই তৃপ্ত থাকে। এমন নিরীহ সজ্জনের বাড়িতে আত্মীয় অতিথির উপস্থিতি প্রতিবেশীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেই। আর সময় এখন এরূপ যে প্রত্যেকের বাড়িতেই প্রায় কোনো-না-কোনো উদ্‌বাস্তু আত্মীয়ের সমাগম ঘটছে প্রতিনিয়ত।

নীরদের সহকর্মী মৃত্যুঞ্জয় হালদার করিতকর্মা মানুষ। যমুনাদের কথা শুনে বলল, তুমি তো ভাগ্যবান নীরদ। তোমার মামিশ্বাশুড়ি বাড়ি করতে চান। আমার বাড়িটা তো রেলস্টেশন। রোজই প্রায় লোক আসছে। কেউ দু-দিন, কেউ চার-দিন থেকে চলে যাচ্ছে। কোত্থেকে আসছে, কোথায় যাবে, তার খোঁজও রাখতে পারছি না। আমার কাজ কেবল হদিশ বাতলানো। কেউ খোয়াই যাবে, কেউ যাবে কৈলাশহর বা শিলচর। ঢালাও বিছানা পাতা আছে, আর খিচুড়ি রান্না হচ্ছে হাঁড়ি হাঁড়ি। বউকে বলেছি, দেখবে কেউ যেন অভুক্ত না যায়। তবে আর ক-দিন পারব জানি না।

কয়েকদিন পর মৃত্যুঞ্জয় একটা বাড়ির খোঁজ আনে। পাঁচ কাঠা জমির উপর টিনের চালের বাড়ি। দেওয়ালগুলো পাকা। সামনে বারান্দা। তিনটে ঘর। বারান্দার বাঁদিকে রান্নাঘর। কল-পায়খানা আছে। বিদ্যুৎ-সংযোগ এখনও নেই। বাড়ির মালিক যতীন দেববর্মা দীর্ঘদিন দিল্লি-প্রবাসী। এখন ওখানেই স্থায়ীভাবে থাকতে চায় বলে এ-বাড়ি বিক্রি করে দেবে।

সকন্যা যমুনা বাড়ি দেখে বিশেষ উল্লসিত হলেন না। তিনি যে-বাড়িতে থেকে অভ্যস্ত এ তো তার সামান্য অংশস্বরূপ। মূল শহর থেকে একটু বাইরেও। বাড়ির পিছনে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা। সবুজ আঁচলের মতো দিগন্তরেখা আর আত্মীয়ের মতো উদার আকাশ টুনুকে আকৃষ্ট করে।

নীরদ বলল, মামি, বাথরুম, রান্নাঘর যা যা দরকার নিজেদের পছন্দমতো করে নেবেন।

ঈষৎ ইতস্ততভাব থাকা সত্ত্বেও যমুনা রাজি হয়ে গেলেন। বাড়ি কেনার পর মোটামুটি গুছিয়ে বসতেই নিজের অগোচরে যমুনার অন্তর্গত অনুভবে এক রূপান্তর ঘটে যায়। আক্ষরিক অর্থেই যেন নিজের পদতলে সুস্থির ভূমি পুনরাধিকার, না কি পুনরাবিষ্কার করেন। জমি বাড়ির মমতার টান তাঁর মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও সাহসের সঞ্চার ঘটায়। টুনু লক্ষ করে, মার কণ্ঠস্বরে আবার পূর্ববৎ কর্তৃত্বের সুর যেন ফুটে উঠছে। যেন উঠছে, আসলে কি উঠছে? একেক সময় যেন মনে হয়, ক্লান্তির মিড় বাজে, লাগে নিঃশব্দ আর্তির নিক্কণ।

নতুন একটা দুশ্চিন্তা মাথায় ঝাপটা মারে। অতগুলো টাকা খরচ হয়ে গেল, নগদ সংগতি কমে গেল অনেকটাই। অর্থাগম নেই, অথচ প্রাত্যহিক প্রয়োজনের ব্যয় রোধ করাও সম্ভব নয়। সুরেন যে আবার কবে কিছু টাকা নিয়ে আসবে তার জন্য দিন গোনা ছাড়া আর কীই-বা করবেন!

কাঞ্চনগড়ের পাট চুকিয়ে আসতে যমুনা একাই গেলেন। জগদীশের সহযোগিতা সত্ত্বেও তার ক্ষোভটা বুঝতে ভুল হল না। যমুনা যাবেনই যদি, ওকে বললে সম্ভবত ভালো বন্দোবস্ত করে দিতে পারত। দিদি কী কারণে অখুশি তা জানার জন্য পদ্মাও কম পীড়াপীড়ি করেনি। দু-বোন কাছে থাকলে পরস্পরের সহায় হত। এখন আর আপন বলতে কে আছে!

যমুনা বারবার টুনু ও বাবাইয়ের লেখাপড়া ও ভবিষ্যৎ জীবনের কথা বলায় জগদীশ বলে, আমাদের ছেলেমেয়েরাও তো এখানে পড়েই মানুষ হচ্ছে। ওদের ভবিষ্যতের খাতা কি

আমাকে ভাবায় না?

— তোমরা তো অনেক করেছ, যমুনা বলেন, কত আর তোমাদের বিরক্ত করব! টুনুরও স্বাধীনভাবে জীবনে দাঁড়াবার শিক্ষা পাওয়া দরকার। বিপদে আপদে তোমরা তো আছই। তোমাদের বাদ দিয়ে কোথায় যাব!

পদ্মাকে সপরিবারে নতুন পাড়ার বাড়িতে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে জগদীশকে বলেন যমুনা, তুমি তো নানা কাজে মাঝেমধ্যেই আগরতলা আসা-যাওয়া করো। এবারে যখন যাবে সোজা আমাদের বাড়িতে উঠবে।

পদ্মা বলল, কমলার বিয়ের কথা হচ্ছে। দিন ঠিক হলে খবর দেব। টুনুকে নিয়ে চলে আসবি কিন্তু।

কাঞ্চনগড় থেকে যমুনা সব জিনিসপত্র নিয়ে ফিরে আসার পর ডলিদের বাড়ি ছেড়ে নিজেদের বাড়িতে উঠে যায় টুনুরা। যাবার আগে নীরদকে উদয়ন সরকারের ঠিকানা দিয়ে বলে টুনু, এঁকে একটু খবর দিয়ে বলবেন, আমরা কোথায় আছি। যেন দেখা করেন।

রবিবার সকালে উদয়নের ঠিকানায় গিয়ে নীরদ দেখে তিন-চারজন যুবক বাইরের ঘরে বসে রাজনৈতিক তর্কে মশগুল। ওকে দেখে একজন বলে, কাকে খুঁজছেন —

— উদয়ন সরকার কি এখানে থাকেন?

— হ্যাঁ। আপনি কোত্থেকে আসছেন?

— আমি এখানেই থাকি। একটু দরকারে এসেছি।

— আমার নাম মানিক সেন। উদয়দা বেরিয়েছেন। ফিরতে একটু দেরি হতে পারে। যদি আমাকে বলতে অসুবিধে না-থাকে —

একে বলা উচিত হবে কি হবে না — এই দ্বিধা মাথায় ঘাই মারলেও পলকে ভেবে নিয়ে নীরদ বলে, না, না, অসুবিধে কীসের। আসলে ওঁর এক ছাত্রী—আমার শ্যালিকা, প্রণতি চৌধুরি এখানে এসেছেন। উনি যদি একটু দেখা করেন।

নীরদের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে মানিক বলল, দাদা এলেই আমি বলব। আপনার নামটা—

— নীরদ কর।

— আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি। কিছু মনে করবেন না, আপনি কী করেন?

— আমি পুরসভায় কাজ করি। অ্যাকাউন্টসে।

— তাই বলুন। আমাকে তো প্রায়ই যেতে হয় পুরসভায়। খুব ভালো হল আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে। এবার গেলে দেখা করব।

ওরা যে আগরতলায় এসে বাড়ি কিনে থিতু হবে এই অল্প সময়ের মধ্যে, এটা উদয়ন ভাবতে পারেনি। ও ভেবেছিল হয়তো কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে এসেছে। বাড়ি দেখেও পছন্দ হয়। এই দু-টি মহিলা জীবনের সঙ্গে সাহসী মোকাবিলা করার উজ্জ্বল উদাহরণ, উদয়ন সারাজীবন সশ্রদ্ধভাবে তা স্মরণ করবে। যমুনাকে প্রচুর প্রশংসা ও সাধুবাদ দিয়েও প্রণতিকে বলল, আমার উপর ভরসা রাখতে পারনি দেখছি।

প্রণতি বলে, তা নয়। আপনি ভুল বুঝবেন না। এসব ব্যাপারে আপনাকে বিরক্তি করতে চাইনি। কিন্তু আমি তো আপনার ভরসাতেই আছি। যত দিন যাচ্ছে আমার ভয় বাড়ছে।

— পরীক্ষার জন্য?

প্রণতির মাথা নাড়া দেখে উদয়ন বলল, ভয়ের কিচ্ছু নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে। রেগুলার মন দিয়ে পড়ো। আমি যখনই পারব দেখিয়ে দিয়ে যাব।

— যখনই পারব মানে — রোজ আসতে হবে। নইলে আমি পরীক্ষা দেব না।

— অবুঝপনা তোমাকে মানায় না প্রণতি। তুমি নিশ্চয় জানো আমার ব্যস্ততার কথা। রোজ হয়ে উঠবে না। তবু দেখো, তোমার প্রিপারেশন ঠিক হবে।

প্রস্তুতি যে ঠিক হয়েছিল, তার প্রমাণ পরীক্ষার অভাবনীয় ফল। উদয়নের প্রতিটি নির্দেশ, পরামর্শ শ্রদ্ধাভাবে পালন ও অনুসরণ করাই ছিল প্রস্তুতির সোপান। আর কিছু কি ছিল না? ছিল। দৃঢ় প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞা।

সাত

১৯৫০ সালে বন্যার মতো যে উদ্বাস্তু সমাগম শুরু হয় তা অপরিবর্তিত থাকে পরের কয়েক বছর। কলকাতার আশেপাশে তখন গড়ে উঠতে থাকে নতুন নতুন জবর দখল করা কলোনি। ভারত সরকার উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য নানা প্রকল্প ঘোষণা করে। তার অন্যতম উদ্বাস্তুদের আন্দামানে স্থানান্তরিত করা। চেষ্টা চলে কলোনি থেকে উদ্বাস্তুদের উচ্ছেদ করারও। বামপন্থীরা তখন উচ্ছেদ বিলের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন সংগঠিত করে। উদ্‌বাস্তুদের আন্দামানে পাঠাবারও করে তীব্র বিরোধিতা। জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি দাবি করে সকল উদ্বাস্তুদের মূল ভূখণ্ডেই পুনর্বাসন দিতে হবে।

এরই মধ্যে পাকিস্তান ক্রিকেট দল প্রথম ভারত সফরে আসে। দিল্লিতে প্রথম টেস্টে ইনিংসে জয়ী হয় ভারত। উদ্‌বাস্তুদের উল্লাসে কোন মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছিল তার কোনো বাস্তব সমীক্ষা সম্ভবত কেউ করেনি। ইতিমধ্যে দুই দেশের মধ্যে যাতায়াতের জন্য পাসপোর্ট-ভিসার প্রচলন হয়েছে। মুক্তি পেয়েছে ঋত্বিক ঘটকের ছায়াছবি 'নাগরিক'। অনুষ্ঠিত হয়েছে ভারতের প্রথম চলচ্চিত্র উৎসব।

এই সমস্ত বিষয়ে উদয়নের নিজস্ব মতামত, আগরতলার রাজনৈতিক মহলে ওকে বিতর্কিত করে তোলে। কংগ্রেসীদের বিরূপতা অনুমেয়, সহজবোধ্য, কিন্তু কমিউনিস্টরাও ওর বিরোধিতা করায় গভীর সংশয়ে ক্লিষ্ট বোধ করে। সরাসরি যোগ দিয়ে এখনও পার্টি সদস্য হয়নি উদয়ন। তবে পার্টির খুব ঘনিষ্ঠ মানুষ হিসেবে কাজ করছে দীর্ঘদিন। আগরতলা পুরসভার প্রথম নির্বাচনে পার্টি ওকে, সমর্থিত নির্দল হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রস্তাব দিয়েছিল। উদয়ন সম্মত হয়নি।

উদয়ন বলেছিল, উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে পার্টি ভুল পথে চলেছে। উচিত ছিল পাঞ্জাবের মতো বাংলাতেও লোক বিনিময়ের দাবি করা এবং পাঞ্জাবিদের জন্য কেন্দ্রীর সরকারের অনুসৃত বিধিব্যবস্থা সার্বিকভাবে বাংলার উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগের জন্য চাপ সৃষ্টি করা। তা না করে বামপন্থীরা নেহেরুর হাতের ছোলা গিলেই উদগার তুলেছে।

ও আরও মনে করে বাঙালি উদ্বাস্তুদের, বিশেষত যারা কৃষিকাজ, ধীবরবৃত্তি ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত ছিল, আন্দামানে যাওয়া অত্যন্ত সঙ্গত হত। প্রায় পরিচিত পরিবেশে, নিজস্ব পেশায় সম্মিলিতভাবে নতুন বাঙালি উপনিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব ছিল। পিতৃপুরুষের ভিটে ছেড়ে আসার পর বাংলার মাটিতে বসতি গড়ার নাছোড় বায়না, পচা সেন্টিমেন্টের ছিঁচকাদুনি ছাড়া আর কিছু নয়। বিহার উড়িষ্যা আসামের মতোই আন্দামানও বাংলা নয় কিন্তু ভারতেরই ভূখণ্ড।

সহসাই উদয়ন বুঝতে পারে পার্টির লোকজন ওকে এড়িয়ে চলছে। বিভিন্ন মিটিংয়ে ওর ডাক আসে না। এ-দেশের রাজনীতিতে সুস্থ স্বচ্ছ চিন্তার মানুষের ক্রম অপ্রিয়মাণতার সূচনা সম্ভবত তখনই ঘটে।

এখন অলস সময় অনেক বেশি। তাই ঘন ঘন শৈলেশের বাড়ি যায়। প্রায় প্রতি বিকেলেই যায় প্রণতিদের বাড়ি। ওর ছেলে বাবাই-এর সঙ্গে গড়ে উঠেছে সংজ্ঞাহীন সখ্য। তবু মাথার মধ্যে একটা যন্ত্রণা নিয়ে ছটফট করে উদয়ন। কখনো নিজের জন্য কিছু চায়নি। এখনও চায় না। এম.এল.এ, এম.পি হবার আগ্রহ নেই। মন্ত্রী হবার স্বপ্নও দেখে না। ওতো পুর কমিশনারও হতে চায়নি। নিজের অনুভবের কথা, বিশ্বাসের কথা যদি সহকর্মীদের সঙ্গেও না বলা যায়, তবে সংঘবদ্ধতা বা দলবদ্ধতা শব্দের মানে কী? পার্টির কর্মী হওয়া মানে দাসত্ব স্বীকার করা নিশ্চয় নয়।

শৈলেশ বোঝানোর জন্য বলে, তোকে অনেকবার বলেছি, ভেবেচিন্তে মুখ খুলিস। ইংরেজের বিদায়ের সঙ্গে শত্রুর নিপাত ঘটেছে। এখন নানা স্বার্থের, বিভিন্ন লক্ষ্যের শত্রুতা। এই নীতিবর্জিত শত্রুতা বাড়তেই থাকবে।

উদয়ন বলে, আমার সঙ্গে শত্রুতা করে কার লাভ! আমি তো পদলোভী ক্ষমতালোভী রাজনীতি করি না। আমার চিন্তানুযায়ী যাতে দেশের মঙ্গল, মানুষের কল্যাণ হবে বলে বিশ্বাস করি, তা-ই বলি।

— তুমি ক্ষমতালোভী নও এটা কেউ বিশ্বাস করে না। করবেও না। আর যদি বা কেউ করে, তুমি একটা পোটেনশিয়াল গ্রেট তার কাছেও।

— দ্যাখ, যুক্তির সিঁড়ি ভেঙে বিশ্বাস গজায় না। কার্যকারণের ব্যাখ্যা পরখ করেও তা অর্জন করা যায় না। বিশ্বাস অঙ্কুরের মতো। অভিজ্ঞতার ইতিহাস ছেঁচে অনুভবের গভীরে জন্মায় বিশ্বাস। গাছের মতো মাটিতে শিকড়, অথচ মাথা গগনমুখী।

শৈলেশের পাশে বসে সোয়েটার বুনতে বুনতে দুই বন্ধুর চাপান-উতোর শুনছিল পূরবী। উদয়নের ভরাট কণ্ঠস্বর। পরিশীলিত মেধাবী কথা শুনতে খুবই পছন্দ করে। উদয়ন যে মাটি-ঘেঁষা শৈলেশের তুলনায় এক ভিন্ন মাত্রার মানুষ এই বোধের জন্যই অতিরিক্ত শ্রদ্ধাশীল হয়। নম্রকণ্ঠে বলল, উদয়দা, আপনাদের এত ভারী ভারী কথা আমি বুঝতে পারছি না। একটু সরল করে বলবেন আপনার সঙ্গে বিরোধ কেন!

পাঞ্জাবের ছিন্নমূল মানুষের সঙ্গে বাংলার সর্বস্বহারা মানুষদের প্রতি সরকারের মনোভাবের ভিন্নতা ব্যাখ্যা করে উদয়ন বলল, আমি এই বৈষম্যের বিরোধিতা করে বলেছিলাম, বাংলার পার্টি যদি বাঙালির হয়ে লড়াই না করে তবে বাংলার মানুষ তাদের কেন সমর্থন করবে।

শৈলেশ বলল, আমি বেশি কিছু জানি না। তবে শুনতে পাই কমিউনিস্ট পার্টি সেকুলারিজম, শ্রেণীহীনতা আর আন্তর্জাতিকতা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত বলে বাঙালি উদ্বাস্তুর মতো সামান্য আঞ্চলিক বিষয় নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার সময় পায় না।

উদয়ন বলল, সেটাই আমার দুঃখ এবং যন্ত্রণা। মার্ক্সবাদে বিশ্বাস করেও আমি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেবার মানসিক সায় পাচ্ছি না। আমার মনে হয় পার্টির চোখে ভুল ঠুলি লাগানো আছে। যেজন্য নেতাজিকে বলেছে কুইন্সলিং। রবীন্দ্রনাথকে করেছে বুর্জোয়া কবি বলে তাচ্ছিল্য। কাণ্ডজ্ঞানহীন উন্মাদের মতো মাঠে ময়দানে দাপিয়ে বেড়িয়েছে 'ইয়ে আজাদি ঝুঁটা হ্যায়' বলে। এখন বলছে, এসবই ওদের ভুল ছিল। কেন ভুল হল? সেই আত্মসমীক্ষা

কোথায়। নিজের পরিবারকে যে ভালোবাসে না সে কি তার প্রতিবেশীকে ভালোবাসতে পারে? যাঁদের জাতীয় চেতনা নেই তাদের কি আন্তর্জাতিকতার ধুয়ো তুলে গৌর-নৃত্য করা সাজে! মাঝে মাঝে মনে হয়, আমাদের নেতাদের ইতিহাস চেতনার বড়োই অভাব।

শৈলেশ যোগ করে, শুধু ইতিহাস চেতনা? আমার তো মনে হয় এরা সবাই মায়োপিক। দূরদৃষ্টি তো দূর কথা দৃষ্টির প্রসারও নেই। শ্যামাপ্রসাদ মারা গেলেন। বাঙালির হয়ে বলার আর কেউ রইলেন না।

পূরবীর এই আলোচনা আর ভালো লাগছিল না। বলল, উদয়দা, আপনি এখনও কবিতা পড়েন?

— নিশ্চয় পড়ি। জীবনানন্দের কবিতা যত পড়ছি আমি তত বিহ্বল হয়ে পড়ছি। কী যে অসামান্য কবিতা লিখেছেন — বাংলা কবিতার চেনা চরিত্র থেকে এক্কেবারে আলাদা।

— সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দের মতো?

— জীবনানন্দ পড়োনি বুঝি? শোনো তবে —

'আমরা যুদ্ধ করি,
সুশাসন করি গণনাবিহীন রক্তনদীর পারে
নকল সূর্যে শুক্ল সুপথে পতিত অন্ধকারে।
জানি না প্রাণের সূর্য কোথায়।'

অন্য একটা কবিতার ক-টা লাইন বলছি —

"—মাথার ভিতরে স্বপ্ন নয় — প্রেম নয় —
কোনো এক বোধ কাজ করে।
আমি সব দেবতারে ছেড়ে
আমার প্রাণের কাছে চলে আসি,
বলি আমি এই হৃদয়েরে :
সে কেন জলের মতো ঘুরে-ঘুরে একা কথা কয়!
অবসাদ নাই তার? নাই তার শান্তির সময়?"

পূরবী বলল, একটা পুরো কবিতা শোনান।

— শোনো একটা শুনলে মনে হবে আরও শুনি। বরং আমি তোমাকে দুটো বই দিয়ে যাব। সময় করে পড়ো।

— সে তো পড়বই, তবু এখন একটা বলুন।

অগত্যা উদয়ন 'আট বছর আগের একদিন' শোনায়। শোনায় 'বনলতা সেন'-ও।

শৈলেশ মন দিয়ে শুনছিল। ইতিহাসের অধ্যাপক হলেও ওর কিঞ্চিৎ সাহিত্য বাতিক আছে। তবে কবিতা বিশেষ পড়ে না। বলল, বুঝলাম আজকাল খালি জীবনানন্দ পড়ছিস।

প্রতিবাদ করে উদয়ন — না। আমি সুকান্তও পড়ি, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়ও পড়ি। সত্যি বলতে কি পড়ার ব্যাপারে আমার কোন বাছ-বিচার বা ছুৎমার্গ নেই। যা দেখেই ভালো লাগে তা-ই পড়ি।

— তোর এই ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারি না। মার্ক্সবাদী রাজনীতি করিস আবার সো-কলড্ বুর্জোয়া সাহিত্যেও তোর বেজায় অনুরাগ — কেমন যেন কনফিউজিং লাগে।

— তুই দেখছি পার্টির সবজান্তা দাদাদের মতো কথা বলছিস। তুর্গেনিভ ভালো লাগলে

টলস্টয় পড়া যাবে না? মায়াকোভস্কি পছন্দ হলে এলিয়টকে তাচ্ছিল্য করতে হবে? আমি এই ধরনের যুক্তিবুদ্ধিহীন অন্ধ গোঁড়ামিতে বিশ্বাস করি না। আমার কাছে 'জাগরী' যেমন প্রিয় তেমনি প্রিয় 'শিলালিপি', 'পথের পাঁচালী'। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আমার প্রিয় লেখক। বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর পড়েও আমি আপ্লুত হই। আমি যেমন 'দেশ' পত্রিকা পড়ি তেমনি 'নতুন সাহিত্য', 'পরিচয়'ও পড়ি। আমি তো এর মধ্যে কোনো বিরোধ দেখি না।

কলেজের টিচার্সরুমে সহ-অধ্যাপকদের মধ্যে এসব নিয়ে যে বিতর্ক চলে, শৈলেশ তারই পরিচয় পেশ করে উদয়নের কাছে। পার্টি-করা বামপন্থীদের মধ্যে তখন চলতি ফ্যাশন কাপড়ের ঝোলা-কাঁধে মলিন জামাকাপড় পরা, সস্তার সিগারেট খেয়ে চলমান রুগ্ন মূর্তি হয়ে তোতা পাখির মতো বুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদ প্রতিক্রিয়াশীল ইত্যাকার কিছু শব্দের চিৎকৃত উদ্‌গিরণ। তাদের কাছে পৃথিবীর রং শুধু লাল, অন্য সব রঙের তারা বিরোধী। শ্রমিক মানেই সাধু মানুষ, মালিকমাত্রই দুর্জন এমন প্রচারে তারা অন্ধবিশ্বাসী। প্রেম করা বা রোম্যান্টিক মানসিকতা নিতান্তই অবৈপ্লবিক। সস্তার সিগারেট বা বিড়ি ছাড়া অন্য সব নেশাই পুঁজিবাদী বিকৃতির প্রমাণ।

উদয়ন বলল, বাঃ তোঁদের মধ্যে এত সব কথাবার্তা হয়! কোনোদিন বলিসনি তো। তা তোর মতামত তো জানা গেল না। সেটা বল।

— ওই যে বললাম আমি কনফিউজড। আমার অভিজ্ঞতার সঙ্গে বাচন-ভাষণের এত গরমিল যে আমি কোনো মতের উপরই আস্থা রাখতে পারছি না।

— যেমন?

— সরকারি যে-অফিসেই যাই দেখি কর্মীরা কাজের চেয়ে গল্প করে বেশি। ঘুষ-চাওয়া হাতগুলোর রঙে কোনো প্রভেদ দেখি না। তবে যে যত কামচোর, ফাঁকিবাজ আর দুর্নীতিগ্রস্ত সে ততবেশি ঝাণ্ডাধারী। সে-ঝাণ্ডার রং যাই হোক না কেন।

— এটা কি তোর এখানকার অভিজ্ঞতা?

— না, না। কলকাতা আগরতলার সঙ্গে দিল্লি বোম্বাইয়েরও, এ-বিষয়ে অন্তত, কোনো তফাত আছে বলে আমি মনে করি না।

পূরবী বলে ওঠে, তোমরা থামবে! আর কিছু নিয়ে কথা বলা যায় না? কতদিন বাদে একটু কবিতা শুনছিলাম, সেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রাজনীতির কচকচি। উদয়দা, আপনার স্পেশাল ছাত্রীর খবর কী?

— কার কথা বলছ, প্রণতি? এ-বার বি.এ. পরীক্ষা দেবে। জানোই তো একটা প্রাইমারি স্কুলে পড়াচ্ছে।

— ওর ছেলে কত বড়ো হল?

— পাঁচ-ছয় হবে বোধ হয়। ছেলেটা বুদ্ধিমান আছে। মনে হয় পড়াশোনায় ভালোই করবে।

— একদিন নিয়ে আসুন না ওদের।

— কী যে বলো। ওরা রাজি হবে কেন! আমিই-বা কী বলব। এমনিতেই আমার শত্রুর অভাব নেই।

শৈলেশ বলল, মা-মিমিদের কোনো খবর পেলি?

— না। ভাবছি একবার কলকাতা যাব। একটা শেষ চেষ্টা করে দেখব।

পূরবী বলল, ধরুন কোনো খোঁজ পেলেন না। তবে কি সারাজীবন এভাবেই কাটাবেন?

— কী বলতে চাইছ?

— এবার একটা বিয়ে করে থিতু হোন, উদয়দা। আপনার মতো মানুষের এমন বাউণ্ডুলে জীবন মানায় না।

— আছে নাকি তোমার মতো কোনো পাত্রী?

— আমার মতো কেন— ঢের ভালো পাত্রী দেখে দেব। আগে বলুন আপনি বিয়ে করবেন।

— রক্ষে করো। স্রেফ রসিকতা করছিলাম। কোনো পাত্রী দেখার দরকার নেই। আমি দিব্বি আছি।

শৈলেশ বলল, তুই কি চিরটাকাল দেববর্মাদের বাড়িতে থাকতে পারবি? বুড়োর নাতিরা তো আর ছোটো নেই। পাশ করে বেরুলেই কলকাতা বা দিল্লি যাবে। তখন কী করবি?

— কিছুই ভাবিনি। ভাবছিও না।

'যদি মরে যাই
ফুল হয়ে যেন ঝরে যাই,
যে ফুলের নেই কোন ফল
যে ফুলের গন্ধই সম্বল;
যে গন্ধের আয়ু একদিন'...

ব্যাস। আর কী চাই!

পূরবী তীব্র আপত্তি করে বলে, উদয়দা, বলবেন না — কক্ষনো আর এসব বলবেন না।

শৈলেশ বলল, এ-লাইনগুলো কোত্থেকে ঝাড়লি?

—এটা ঝাড়া নয় মোটেই। আমি কখনোই পরপদ্যেষু আত্মবৎ ভাবি না। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে কবির কথা বলি। এ লাইনগুলো অরুণকুমার সরকারের।

পূরবীকে বলল, আর এক রাউণ্ড চা হোক। তারপর উঠব।

— কোথায় যাবি এখন? শৈলেশ জানতে চায়।

— লাইব্রেরিতে যাব একবার। পত্র-পত্রিকা ঘেঁটে পড়ি। ছেলেদুটোকে পড়াতে হবে তো!

আট

চিঠির চলাচল ছিল নিয়মিত। তবু দেখা হয়নি বহুকাল। দু-পক্ষই অন্যকে বেড়াতে আসার নিমন্ত্রণ জানিয়েছে অনেকবার। কারুরই যাওয়া-আসা হয়নি। প্রণতির না যেতে পারার কারণ সহজবোধ্য। আগরতলা থেকে বঙ্গাইগাঁও যাওয়াটা কোলের বাচ্চা নিয়ে দু-টি নারীর পক্ষে খুবই দুরূহ। সীমার বর পবিত্র, রেলকর্মী হলেও বারবার ট্রেন বদল, বাসযাত্রা, দীর্ঘসময় ও ধকলের কথা বিবেচনা করে আগরতলা সফরের আয়োজন করা হয়নি। অস্বীকার করে লাভ নেই বছরের ছুটি নিয়ে পবিত্র কলকাতা যেতেই আগ্রহী হয়। সেখানে ওর বাবা যাদবপুরে বাড়ি করেছেন। মা ও অন্য ভাইবোনেরা আছে। আরও অনেক আত্মীয় বন্ধুই কলকাতার আশেপাশে ছড়িয়ে রয়েছে। ছুটি নিয়ে কলকাতায় গিয়ে সকলের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতে দিনগুলো চমৎকার কাটে। পুরোনো সম্পর্কের উজ্জীবন ঘটে।

এবারে সীমা জেদ ধরেছিল। আগরতলা যাবেই। যত কষ্টই হোক। 'দুঃখিনী পিসিকে একবার দেখতেও ইচ্ছে করে না তোদের।' যমুনা লিখেছেন। প্রণতির ছেলেকেও দেখা হয়নি।

প্রথমে প্রবল সংকোচ হত। যেবোনের বিয়েতে গিয়ে অত আনন্দ করে এসেছে তার কয়েক দিনের মধ্যেই অমন সর্বনাশের সংবাদ ছিল বজ্রপাতের চেয়েও মর্মন্তুদ নিষ্ঠুর। কাঞ্চনগড় থেকে লেখা প্রণতির চিঠির কী জবাব দেবে ভাবতেই কেটে গিয়েছিল দিনের পর দিন। সীমার কলম চলছিল না। পবিত্র জোর করে লিখিয়ে চিঠি পাঠায়। বাবাইয়ের জন্মের খবর পেয়ে মনে হয়েছিল, একেবারে নিঃস্ব রিক্ত হয়ে জীবনের দাঁড় বাইতে হবে না প্রণতিকে। খুব ইচ্ছে ছিল তখনই আগরতলা যাওয়ার। যাওয়াটা কর্তব্যও ছিল না কি? পিসির জন্য, টুনুর জন্য কোনো কর্তব্যই করা হয়নি। এই পীড়া বোধ অতীব আন্তরিক। স্বামী-নির্ভর সীমা কী-বা করতে পারত। টুনু ম্যাট্রিক পাশ করে স্কুলে কাজ নিয়েছে শুনে চোখ ভরে উঠেছিল জলে। ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারলে টুনুকে তবে এত কষ্ট স্বীকার করতে হত না। পবিত্র বলেছিল, খুব ভালো করেছে প্রণতি। ওকে বলো আরও পড়তে!

প্রণতি লিখেছে এ-বার, 'বি.এ পরীক্ষা হয়ে গেল। রেজাল্ট বেরোবার সময় যদি না আসিস তবে আর চিঠি লিখব না। সবিতাকে বলিস ওর টুনু মাসি মরে গেছে।'

যে সবিতাকে এক বছরের দেখেছিল টুনু, সে এখন নয় বছরের। সীমা মেয়েকে বলে, টুনুমাসির কাছে যাবি?

— খালি খালি বলো। কোনোবারই তো যাও না।

— এ-বার যাব। তোর বাবাকে বলেছি।

— খুব ভালো হবে। কিন্তু আমি তো টুনুমাসিকে চিনতে পারব না।

— তাতে কী। আমি তো আছি।

— মা, মাসিদের বাড়ি কি খুব বড়ো?

— বড়ো ছিল। দেশে। এখন তো নতুন বাড়ি করেছে। আমাদের কোয়ার্টারের থেকে বড়ো হবে নিশ্চয়। পিসির যা জায়গা-জমির শখ।

বাড়ি দেখে হতাশই হয় সীমা। এই হতাশা স্মৃতিমেদুরতার জন্য। সুজাপুরের স্মৃতি-ধরা ঘরবাড়ির সঙ্গে এখানকার এই ছোট্ট বাড়ির বৈসাদৃশ্য যে অনিবার্য তা অনুভব করেও দুঃখ যায় না। বাড়িটা ছোটো হলেও ছিমছাম। সবকিছুর মধ্যেই পরিমিতির পরিচয় নিহিত।

এত বছরের ব্যবধানে মিলিত হলেও শোকের প্রাথমিক উদ্বেলতা এড়ানো যায় না। যমুনা ও প্রণতির বিধবা বেশ সীমার বুকের মধ্যে, প্রথম দর্শনে এক প্রবল শৈত্যপ্রবাহ সৃষ্টি করে। বাবাইকে কোলে নিতেই ভুবন হয় রৌদ্রকরোজ্জ্বল। অবশ্য সাতবছরের বাবাইকে শিশুর মতো কোলে নেওয়া হয় না। সীমা পারে না। বাবাই আপত্তি করে। তবু সীমা আদরে আদরে ভরিয়ে দেয়। সবিতাও মাসির বুকে এঁটে থেকে স্নেহের উষ্ণতায় বানভাসি হয়। দিদাকে ওর আরও বেশি ভালো লাগে। কলকাতায় গেলে ঠাম্মাও আদর করে ঠিকই, কিন্তু এই দিদার আদরে যেন ভিন্ন কোনো মায়া জড়ানো।

প্রমীলা সম্মেলনে পবিত্র অস্বস্তি বোধ করে। যমুনার সঙ্গে মা-বাবা, দেশ-বাড়ি, আত্মীয়স্বজন নিয়ে আর কত বকা যায়। দুই বোন নিজেদের সুখ-দুঃখ ভাগাভাগিতে এত ব্যস্ত যে পবিত্রের মনে হয় যেন র‍্যাম্পার্টে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে। অগত্যা ও কানাইয়ের সঙ্গে শহরটা ঘুরে দেখে। কানাইকে প্রণতির বিয়ের সময় যা দেখেছিল, এখন তার সঙ্গে তুলনা বৃথা। সেই সরল কিশোর ছেলেটি কুড়ি-একুশ বছরের যুবা। চারবছর ধরে রিকশা চালাচ্ছে। ওর ইচ্ছা গাড়ি চালানো শিখবে। শেখা শুরু করেছে। লাইসেন্সটা পেলেই আর রিকশা চালাবে না।

পবিত্র বলল, লেখাপড়া করেছ কিছু? ড্রাইভারদের তো কিছু কিছু ইংরেজি জানতে হয়।

— অল্পস্বল্প জানি। দিদি শিখিয়েছে। এখন আমি বাবাইয়ের বইগুলো পড়ি।

— বাঃ, খুব ভালো। তাহলে আর রিকশা চালাতে গেলে কেন?

কাঞ্চনগড়ে জগদীশের সঙ্গে থেকে কানাই ভাবার চেষ্টা করছিল নিজে কিছু করবে। চিরদিন দিদির উপর নির্ভর করে থাকা যাবে না — এটা বুঝতে দেরি হয়নি। আগরতলা আসার পর ক্রমশই আর্থিক সমস্যা নিয়ে মা-মেয়ের কথা কানে আসত। দিদির টিউশনি করা দেখে ওর মনে হয় এবার কিছু করতে হবেই। বড়ো হয়ে উঠেছে, পুরুষবোধও জাগ্রত হয় ধীরে ধীরে। কিন্তু কী করবে, কাকে বলবে স্থির করতে পারে না। একদিন সাহস করে উদয়নকে বলল।

— কী করতে চাও? কারো বাড়িতে কাজ করবে?

— না। এ-বাড়ি ছেড়ে তো যাব না। বাড়ির কাজও তো অনেক করলাম। ড্রাইভিং শিখব। তার জন্য টাকা জোগাড় করতে হবে। আপনি দিদিকে একটু যদি বলে দেন।

— কী বলব দিদিকে?

— আমাকে যেন কাজ করতে দেয়।

বাজারের কাছে রিকশা সারাবার একটা দোকানে আড্ডা দিতে দিতে মালিকের সঙ্গে বন্ধুত্ব তৈরি করেছে কানাই। অনেকের মতো গোপাল সাহাকেও বলেছিল কাজের জন্য। গোপাল বলল রিকশা চালালে ও ব্যবস্থা করে দিতে পারে।

— রিকশা পাব কোথায়?

— ব্যবস্থা করে দেব। চালাবি কি না ঠিক কর।

বাড়িতে বলতেই আপত্তি করলেন যমুনা। প্রণতিও মানতে চায় না। যমুনার মনে পড়ে বংশানুক্রমে কানাইয়ের পরিবার দত্ত বাড়িতে কাজ করেছে। অন্যত্র কোনো কাজের কথা ভাবেনি কখনো। অথচ আজ এইটুকু কানাইকে কাজের জন্য ভাবতে হচ্ছে। তাও কি না রিকশা চালানোর কাজ। ও কী করে পারবে?

— না, না। তোর কিছু করতে হবে না। আমাদের যদি দু-মুঠো জোটে, তবে তোরও জুটবে। — যমুনা বলেন।

প্রণতি উদয়নের কথার প্রতিধ্বনি করে বলে, মা, কথাটা দু-মুঠো জোটা বা না-জোটার নয়। ওর সারা জীবনের কথা। পুরোনো দিন আর ফিরে আসবে না। ওকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে দেওয়াই ভালো। কত ছেলেই তো রিকশা চালাচ্ছে। কানাইও চালাক।

মালিককে টাকা বুঝিয়ে দিয়ে যা থাকে তাতে নিজের কোনোমতে চলে যাওয়া উচিত। যেহেতু থাকা-খাওয়ার জন্য খরচ দেবার কথা মুখ ফুটে বলার সাহস নেই, কিছু টাকা জমাতে পারে। সেই টাকা দিয়েই ড্রাইভিং শিখছে। তবে বাবাইকে স্কুলে আনা-নেওয়ার কাজটা ওই করে। দিদিকেও নিয়ে যেতে চেয়েছে। দিদি একদিনও ওর রিকশা চড়তে রাজি হয়নি।

পবিত্র বলল, মাস্টারমশাই এখন আসেন না?

— দিদির পরীক্ষার পর ক-দিন আর আসছেন না। যে-কোনোদিনই এসে যাবেন। অমন মানুষ হয় না জামাইবাবু। নিজে কত কষ্ট করে থাকেন, মুখ দেখে কিচ্ছু বুঝতে পারবেন না। অত মানী মানুষ, কোনো অহংকার নেই। আমার মতো মুর্খের সঙ্গেও আত্মীয়ের মতো কথা বলেন।

মানুষটিকে দেখার জন্য আগ্রহ বোধ করে পবিত্র। তবে প্রণতিকে জিজ্ঞেস না আসতে বলার জন্য করে কানাইকে উদয়নের কাছে পাঠানো সমীচীন হবে না। সীমাও কী বলে জানা দরকার।

কানাইয়ের কথা থেকে প্রণতিদের সংকটযাপনের কথা শুনে পবিত্র বিস্মিত হয়। ওর ধারণা ছিল দেশ থেকে নিয়মিত টাকা আসে। আসার সময়ও প্রভূত অর্থসম্পদ নিয়ে এসেছে। কেন না দেশে দত্তবাড়ির অবস্থা ও নিজেই দেখেছে। এখন যে টাকা আনা অত্যন্ত অনিয়মিত ও সীমিত তা জানা ছিল না। ওর কি কিছু করা উচিত ছিল? কী করতে পারত! সামান্য রেলের চাকরি। মাঝেমধ্যে বাবাকেও কিছু পাঠাতে হয়। না, সেন্টিমেন্টে ভেসে কোনো লাভ নেই। নির্দয় বাস্তবের কুসীদকলায় আবেগের স্থান হয় না।

বি.এ পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুলে বাড়িতে বহু বহু দিন পর উৎসবের আবহ। সেকেন্ড ক্লাস পাবেই কি না, কিছু সংশয় ছিল প্রণতির মনে। রেজাল্ট পেয়ে মনে হল আর একটু চেষ্টা করলে, বেশি খাটলে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া অসম্ভব ছিল না? যমুনার আনন্দের অবধি থাকে না। সীমা-পবিত্র'র সঙ্গে ডলি-নীরদকেও পেয়ে বাড়িটা সরগরম হয়ে ওঠে। জগদীশকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তবু কাঞ্চনগড় থেকে কেউ এল না।

উদয়নকে নিমন্ত্রণ জানাতে হয় না। প্রতিবার রেজাল্ট নিয়ে নিজেই এসেছে। এ-বারে তিনদিনের মধ্যেও না আসায় অবাক লাগে। যতই নানা কাজের ব্যস্ততা থাক, তিনদিনের মধ্যেও না আসার মানুষ ও নয়। প্রণতির মাথার মধ্যে নানা প্রশ্ন। ভাবার চেষ্টা করে কী হতে পারে। আচমকা মনে পড়ে পরীক্ষা শেষ হবার পরদিন চলে যাবার আগে প্রণতি জানতে চেয়েছিল, আবার কবে আসবেন?

হেসে উদয়ন বলেছিল, আর কী আসার দরকার হবে! আর তো আমি পড়াতে পারব না।

— এ-কথা কেন বলছেন!

— এম.এ তো এখানে পড়া যাবে না, আর আমি তো এম.এ পড়িনি। সেজন্যই বললাম, আমি কোনো কাজে লাগব না আর। তবু কোনো দরকার হলে খবর দিয়ো।

— আমাদের জন্য না হোক, বাবাইয়ের জন্য তো আসবেন। ওকে কে পড়াবে?

থমকে গিয়েছিল উদয়ন। বাবাইয়ের কথা কি মুছে গিয়েছিল মন থেকে? তা কি হতে পারে? বাবাই ওকে অসম্ভব ভালোবাসে। সন্দেহ নেই উদয়নের মধ্যেও বাবাইয়ের জন্য অগাধ স্নেহ ও শুভানুধ্যান আছে। কত যে বই এনে দিয়েছে, ছড়া শিখিয়েছে, অজস্র গল্প বলেছে, ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়েছে দুজনে তা কি ভোলা সম্ভব।

উদয়ন বলেছিল, ওতো বড়ো হয়ে উঠেছে। আমাকে আর দরকার হবে না। তুমিই পড়াতে পারবে। এতদিন অভিযোগ করতে, বড়ো বেশি আদর দিচ্ছিলাম। এখন আর অভিযোগ থাকবে না।

বুকের ভিতরে, কান্না ফেনিয়ে ওঠে প্রণতির। উদয়ন এভাবে বলবে কখনো ভাবেনি। ভাবতে পারে না যে ও আর আসবে না, দেখা হবে না। নিজেকে সংহত রেখে সরল স্বরে বলল, কোনো কথা শুনব না। আপনাকে আসতেই হবে।

তারপর থেকে উদয়ন আসেনি ঠিক। ওরাও যে ব্যস্ত হয়ে খোঁজখবর করেছে তাও না। কেন না মনে হয়েছে, যে কোনোদিনই এসে পড়তে পারে। মাঝে মাঝে অদর্শনে যাওয়া উদয়নের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। সোনামুড়া, অমরপুর, রানির বাজার বা খোয়াই কমলপুরে ওর যাওয়া-

আসা থাকেই।

যমুনাই বললেন, টুনু, মাস্টার এল না। ওকে একটা খবর পাঠা। কে জানে কী হয়েছে ছেলেটার!

— নিজে থেকে না এলে শুধু শুধু জোর করা উচিত না, মা।

— কী যা-তা বলছিস। ও কি না আসার মানুষ। নিশ্চয় কিছু হয়েছে। অসুখবিসুখ করল কি না সে খবরটাও তো নিতে হয়।

প্রণতির অনুভবে ছ্যাঁকা লাগে যেন। অসুখের কথা একবারও মনে আসেনি। সর্বক্ষণ নীরোগ থাকবে উদয়ন, এটা যেন স্বতঃসিদ্ধ। তেমন কিছু হলে নিজে থেকে কারুকে জানাবার মানুষ ও নয়। মনে পড়ল গত বছরই বাবাইয়ের অসুখের সময় ওর অবদান। প্রতিদিন দু-বেলা এসে ডাক্তার, ওষুধের ব্যবস্থা করেছে। ডাক্তার, ওষুধের সব টাকা প্রণতি দিতে পেরেছে কি না বলা দুরূহ। কথা তুললেই উদয়ন বলেছে, মা সেবিকার ভূমিকা ছেড়ে অ্যাকাউন্টেন্ট হতে চাইছ কেন! নিশ্চিন্ত থাকো, আমার পাওনা ঠিক বুঝে নেব।

নীরদকে বলল প্রণতি, তুমি তো মাস্টারমশাইর বাড়ি চেনো। কানাইকে বলে দিয়ো তো, ও বিকেলে খোঁজ নিয়ে আসুক।

এইসময় বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে নীরদ এগিয়ে গিয়ে দরজা খোলে। ওকে দেখে আগন্তুক যেমন চমকিত, তেমনি বিস্মিত নীরদও। মাস্টারমশাইকে খবর দিতে গিয়ে আলাপ হয়েছিল মানিক সেনের সঙ্গে। তারপর তিন-চার বার অফিসে এসেছে বিভিন্ন অনুরোধ-নিয়ে। অখুশি হয়েও কাজগুলো করে দিয়েছে নীরদ। মানুষটাকে পছন্দ হয়নি।

নীরদ বলল — আপনি এখানে?

— দাদা — মানে উদয়নদা পাঠালেন, বউদিকে এটা দেবার জন্য। — হাতের প্যাকেট দেখিয়ে বলে মানিক সেন।

— বউদি?

— প্রণতি চৌধুরি — এই বাড়ি তো?

— আপনি ওকে বউদি বলেন?

— কোনোদিন দেখিনি। দাদা পাঠালেন তো — তাই —

মানিককে সঙ্গে করে বসার ঘরে ঢোকে নীরদ। ডাক শুনে প্রণতি বেরিয়ে আসে। প্রণতিকে দেখে অপলক চেয়ে থাকে মানিক। কালো পাড়ের সাদা শাড়ি, সাদা ব্লাউজ, নিরাভরণ হাত, ছিপছিপে চেহারার অনির্বচনীয় তীক্ষ্ণ সৌন্দর্য ওকে তীব্রভাবে মোহিত করে।

নীরদ বলে, ইনিই প্রণতি চৌধুরি। মাস্টারমশাই এঁকে পাঠিয়েছেন। নাম মানিক সেন।

নমস্কার করে মানিক বলল, উদয়নদা আপনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। আপনার পাশের খবরে খুবই উল্লসিত। এই সামান্য উপহার —

প্যাকেটটা হাতে নিয়ে প্রণতি বলল, মাস্টারমশাই এলেন না কেন? কোথায় আছেন?

— আপনারা জানেন না? উদয়নদা তো বহুদিন ধরে অসুস্থ। প্রথমে তো জ্বরে ভুগছিলেন। এখন তো জন্ডিস।

— সে কী! কেমন আছেন এখন — কোথায় —

— বাড়িতেই আছেন। একটু ভালো। তবে চলাফেরা একেবারে বারণ। ডাক্তার বলেছেন, কমপ্লিট রেস্টে থাকতে হবে।

নীরদ বলল, জন্ডিসে সেবাযত্নের খুব দরকার। সে সব কে করছে?

— আমরাই করছি। তবে দাদার বন্ধু শৈলেশদা, পূরবী বউদি রোজই আসেন।

প্রণতির মুখের উপর দৃষ্টি রেখে মানিক বলে, বউদি আমারও অভিনন্দন গ্রহণ করুন। দাদার কাছে আপনাদের কথা অনেক শুনেছি। আপনার ছেলেকে দেখছি না — কোথায়?

— ও বেরিয়েছে একটু। আপনি বসুন।

— না, বউদি। আজ আর বসব না।

নীরদ বলল, শুভদিনে এলেন একটু মিষ্টিমুখ না করেই চলে যাবেন!

— আরেকদিন এসে অনেক খেয়ে যাব। আজ যাই বউদি। মিষ্টি আমার পাওনা রইল।

প্যাকেটটা নিয়ে প্রণতি নিজের ঘরে ঢুকে ইজেলের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। মনের ক্যানভাসে অন্তহীন আঁকিবুকি, নানা রঙের স্রোত, উথাল ছন্দ। এবং ছন্দপতন। খুব রাগ হয়। মানুষটা অসুস্থ। একা থাকে, একটা খবর দিল না। আজ যদি মানিক সেনকে পাঠাতে পারে, আগেও পারত। ইচ্ছে করেই পাঠায়নি। অহংকার! ভীষণ অহংকারী মানুষ উদয়ন সরকার। পরোপকারের অহংকার। নির্লোভ নিষ্কামের অহংকার। ইচ্ছে করে প্যাকেটটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। অন্তর্গত উষ্মায় চোখ জ্বালা করে। উথলে ওঠা বোবা কান্না বাষ্প হয়ে কণ্ঠার মধ্যে ধূমায়িত।

ধীর হাতে প্যাকেটটা খোলে প্রণতি। দু'টি বইয়ের সঙ্গে একটা খামে-ভরা চিঠি। দ্রুতহাতে খামটা খোলে—

কল্যাণীয়াসু,

তোমার সাফল্যে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আরও অনেক সাফল্য অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা যেন অব্যাহত থাকে। সাফল্য গৌরবের সঙ্গে দায়িত্বও বর্ধন করে। তোমার ক্ষেত্রে তা অনন্ত।

নিজে যেতে না পারার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত। এই পরম আনন্দের দিনে আমার অনুভবের অভিব্যক্তি হিসেবে দু'টি বই পাঠালাম। আশা করি ভালো লাগবে।

চির শুভানুধ্যায়ী
উদয়ন সরকার।

দু'টি বইয়ের একটি এলিয়টের 'ওয়েস্টল্যান্ড' অন্যটি তারাশঙ্করের 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা।' কোনোটাই পড়েনি প্রণতি। মমতার সঙ্গে বইয়ের পাতা ওলটায়। নতুন বইয়ের আনকোরা ঘ্রাণে এক অনন্য মাদকতা।

সীমা ডলি কলকল শব্দ করে হাজির হয়ে বলে, মাস্টারমশাই কী পাঠিয়েছে রে?

যমুনা ওদের পিছনেই ছিলেন। বললেন, ওর অসুখ শুনলাম। দ্যাখ, বলেছিলাম কি না। আমার মন কু ডাকছিল। এখন কেমন আছে বলল কিছু?

প্রণতি বলল, ভালোই আছেন। তবে চলাফেরা নিষেধ।

— জন্ডিস রোগটা ভালো না।

হেসে ওঠে সীমা — পিসি, তুমি যে কী বলো! রোগের আবার ভালো-মন্দ কী। সব রোগই খারাপ।

যমুনা বললেন, চলো, বিকেলে একবার দেখে আসি।

— অন্যের বাড়িতে থাকেন। আমাদের যাওয়াটা কি ঠিক হবে?

— তাহলে নীরদকে পাঠাই। ও গিয়ে দেখে আসুক।

পবিত্র বাবাইকে নিয়ে বেরিয়েছিল। ফিরে এসে সব শুনে বলল, আমার আর মাস্টারমশাইকে দেখার ভাগ্য হল না।

ওরা কালই ফিরে যাবে বঙ্গাইগাঁও। সাতটা দিন যে কীভাবে কেটে গেল! অনেকদিন এমন নির্ভেজাল আনন্দময় দিনযাপন হয়নি। প্রণতির গ্র্যাজুয়েট হওয়াটা সকলের অনুভবের মানচিত্রই যেন বদলে দিয়েছে। নিজের নিভৃতিতে প্রণতিও উপলব্ধি করে এক ভিন্নতর ব্যক্তিত্বের দ্যুতি। সে-দ্যুতিতে সুজাপুরের অকালবিধবা টুনু যেন গতজন্মের স্মৃতি। কিংবা স্মরণের কার্ণিশে ঝুলেথাকা এক প্রচ্ছায়া। বাইরের খোলসটাই যা অবিকল আছে। তাও ঠিক নেই। নেই যে তার সন্ধান অন্য কেউ জানে না। নিজে জানে প্রণতি। নিজের সঙ্গে একা হলেই লোককথার মতো তা প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। তখন একটা ভয় আসে। ভয়ের রূপটা ঠিক চেনা নেই। কিন্তু তার সঞ্চয় অনুভবে হিমাদ্র।

পরীক্ষার আগে উদয়ন এক নতুন কবির একটা কবিতা শুনিয়েছিল। তার দু'টো লাইন মাথায় নিত্য রণিত — 'গভীরে গভীরে যাও দু'হাতে ধরো আঁধার
পায়ের নিচে বালি খুঁড়লে অতল পারাবার।'

এই অতল পারাবারের অনুষঙ্গই কি মনে রোমহর্ষক ত্রাসের অভিযান ঘটায়?

বিকেলে কানাইয়ের রিকশায় নীরদ যায় উদয়নের খবর নিতে। বাবাইও জেদ ধরে মাস্টারমামাকে দেখতে যাবে বলে। প্রণতির সম্মতি না থাকলেও যমুনা নাতিকে পাঠান।

দ্বিতীয় দফা চা নিয়ে পবিত্র বলল, তুমি কি প্রাইমারিতেই পড়ে থাকবে?

প্রণতি বলল, সেটাই ভাবছি। এখানে কি সুযোগ পাব বুঝতে পারছি না। এম.এ. করব না বি.টি. পড়ব তাও স্থির করতে হবে।

— চিরকাল মাস্টারি করবে কেন?

— আর কী করব। চাকরি-বাকরির কোনো সুবিধে এখানে নেই। ছেলেরাই চাকরি পাচ্ছে না। আমাকে কে দেবে!

যমুনা বললেন, মেয়েদের মাস্টারি করাই ঠিক। অফিসে একগাদা অজানা অচেনা পুরুষের মধ্যে — যা সব মাঝে মাঝে শুনি—

প্রণতি বলল, রেলের তো অনেক স্কুল আছে। সেখানে কি কিছু সম্ভব?

— স্কুল আছে ঠিকই। তবে সেসব স্কুলে কীভাবে নিয়োগ হয় আমার জানা নেই। ফিরে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানাতে পারি। আরও ভালো হয় তুমি গেলে। তোমরা এবার এসো আমাদের ওখানে।

সীমা বলে, এবার তো আসতেই হবে টুনু। পিসি কবে যাবে বলো।

— চলো বললেই কি আর যাওয়া হয়রে মা। ভাগ্য টানলে নিশ্চয় যাব। কোনোদিন কি ভেবেছিলাম এখানে এসে এইরকম বাড়িতে মেয়ের রোজগারে থাকব!

পবিত্র বলে, ওসব আর এখন ভাববেন না। বাঙালির ভাগ্যসংহার যা হবার হয়ে গেছে। এখন নতুন করে গড়ার কথা ভাবতে হবে। প্রণতি বি.এ. পাশ করল। আরও কিছু করবে। বাবাইও বড়ো হবে।

সসংকোচে আরও বলে, এতদিন আসতে পারিনি বলে লজ্জিত হয়ে আছি। এবার এসে

আপনাদের দেখে বড়ো ভালো লাগল। এখন থেকে কোনো দরকার হলে আমাদের জানাবেন। যখন ইচ্ছে হবে চলে আসবেন।

সীমাকে বলল, পিসিকে কথাটা বলেছ?

সীমা মাথা নাড়ে।

পবিত্র বারে বারে বলছিল, প্রণতির আবার বিয়ে দেওয়া উচিত। মাত্র পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স। দেখতেও সুশ্রী। স্বচ্ছন্দ। গ্র্যাজুয়েটও হল। দীর্ঘ জীবন স্মৃতিধর বিষণ্ণতায় বহন করা অযৌক্তিক, অর্থহীন। বিধবা বিবাহ বেআইনিও নয়, সমাজবিরুদ্ধও নয়। অনেকই ঘটছে।

সীমা বলেছিল, তুমিই প্রস্তাব দাও।

পবিত্র বলেছিল, আমার বলাটা তোমার পিসির নাও পছন্দ হতে পারে। তুমি বুঝিয়ে বলো। অবশ্য তোমার নিজেরই মত আছে কি না জানি না।

— একটু যে কেমন-কেমন লাগে না, তা নয়। তবু তোমার যুক্তি মানতেই হয়। আর আজকাল হচ্ছেও। আমিও চাই টুনু আবার বিয়ে করুক।

পবিত্র সেটাই মনে করিয়ে দেয়। অন্তর্গত দ্বিধা কাটিয়ে সীমা বলল, পিসি একটা কথা বলছি। কিছু মনে করো না যেন। একটা প্রস্তাব — মানে তোমার জামাই বলছিল, এখন তো অহরহ হচ্ছে — টুনুর আবার বিয়ে দিলে ভালো হয়।

চমকিত যমুনা বলে ওঠেন, বাবাইকে নিয়ে আমি কোথায় যাব?

শব্দগুলো নির্গত হবার সঙ্গে সঙ্গে অসাড় স্তব্ধতা ঘরের বাতাসে দোল খায়। কাটা ঘুড়ির সুতো ধরার ক্ষিপ্রতায় যমুনা বলেন, নামানে, বলছিলাম, ছেলেটা তো আর ছোট্টটি নেই, ওকে সুদ্ধু যদি কেউ রাজি থাকে, তাহলে তো ভালোই হয়। আমার জন্য কিছু না — ঠাকুরের আশ্রমে আমার বলাও আছে।

পবিত্র বলল, আপনার অনুমতি থাকলে আমরা খোঁজ করতে পারি। যে বাবাইয়ের দায়িত্ব নেবে, আপনাকেও দেখবে, তেমন মানুষই দেখব।

যমুনার উচ্চারিত 'আমি কোথায় যাব' শব্দত্রয় অশনিফলার মতো প্রণতির মস্তিষ্কের গহনে অনুরণন তোলে। কী করে বললেন? বলতে পারলেন? তবে কি মার মনে ওকে নিয়েও সংশয় আছে! ওর কণ্ঠার কাছে অনুচ্চারিত আর্তনাদ থমকে থাকে — মা।

উঠে দাঁড়িয়ে প্রণতি বলল, সীমাদি, জামাইবাবুকে পণ্ডশ্রম করতে বারণ করে দে। বরং আমাকে একটা ভালো কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন কি না দেখুন।

সুইচ টিপতেই এক ঝাঁক আলো লাফিয়ে পড়ে।

নয়

রোগশয্যা কি মানুষকে দার্শনিক করে তোলে? রোগের সঙ্গে মৃত্যুর যোগ থাকায় তখন কি মনে হয় মৃত্যুর খুব সান্নিধ্য লাভ হচ্ছে? তারজন্যই কি জন্ম নেয় শ্মশানবৈরাগ্য? তাহলে সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য এত আকুলতা কেন? কেন ভাবনা আসে ভবিষ্যৎ কী উপহার নিয়ে অপেক্ষা করছে। উপহার কেন ভাবল? প্রহারও তো হতে পারে। কিছু যে থাকতে হবে তারই বা কি নিশ্চিতি আছে। আর সুস্থ যদি নাই হয় পৃথিবীতে কারুরই কোনো ক্ষতি হবে না। মা-বাবা-ভাই-বোন-পরিজন হয়ে দিব্যি কাটিয়ে দিল তো এতগুলো বছর। এখন তো মিমির কথাও মনে পড়ে না। অথচ আবাল্যের শিক্ষা ছিল এসবই জীবনের নির্ণীত আধার। সত্যিকার

জীবন ওই শিক্ষাকে কী অনায়াস তাচ্ছিল্যে নির্মূল্য প্রমাণ করল। দেশোদ্ধারের অভীপ্সায় তরুণ আবেগে যখন বাধাবন্ধনহীন ছুটে গিয়েছিল তখনও ওই শিক্ষা জীবন-চরণে নিগড় লাগাতে পারেনি। তবে কি ওর শিক্ষাটাই ভুল ছিল? শিকড়ের টানের চাতুর্য বিচলিত করতে পারেনি? ছুটে না গেলেও দেশোদ্ধার থেমে থাকত না। নিজের কৃতি নিয়ে তৃপ্তির মগ্নতাও বোধ করে না। বরং এখনকার দোদুল্যমানতা পীড়াদায়ক। বিশ্বাস আছে, কিন্তু আবেগের অভাববশত কি দশরথ দেব অত আহ্বান করা সত্ত্বেও পার্টিতে যোগ দিতে সম্মত হচ্ছে না? ওকে বাদ দিয়েও পৃথিবীর মতো, পার্টির প্রগতিও বিন্দুমাত্র প্রতিহত হবে না। চুপচাপ — একেবারে নিঃশব্দে মরে গেলে কেমন হয়। খারাপ কিছু হবে না। বরং ভালোই। শরীরের কষ্ট সেবাশুশ্রূষার জন্য অন্যদের কষ্ট, অর্থসংস্থানের কষ্ট — কষ্টের শতাকিয়া থেকে মুক্তি। মৃত্যুর কথা ভাবে না এমন মানুষ বোধ হয় পৃথিবীতে নেই। জীবিতরাই তো মৃত্যুকে নিয়ে ভাববে। অথচ মৃত্যু মানুষের সহজ আয়ত্ত নয়। স্বেচ্ছাবৃত মৃত্যুর জন্য প্রভূত উদ্যম ও উদ্যোগ প্রয়োজন। যদি উদ্যম ও উদ্যোগ নিয়োজিত করতে হয় তবে তা জীবনের জন্যই করা বিধেয়। মৃত্যুর জন্য নয়। মৃত্যু মানে ইতি। দি এন্ড। যবনিকা। জীবন চলমান, বহমান। অজাতকের অভিলাষ।

মানুষের মন শিশুর মতো। খেলার যত্নসজ্জিত সরঞ্জাম থেকে কখন কোনটা উপড়ে নেবে পূর্বমুহূর্তেও কেউ জানে না। উদয়ন শুয়ে শুয়ে এসব ভেবে নিজের মনে হাসে। এত দীর্ঘদিন রোগশয্যায় থাকেনি কখনো। শুয়ে থেকেও যে ক্লান্ত হওয়া সম্ভব, জানা ছিল না। নিজের কাছে স্বীকার করতে বাধ্য, রোগশয্যা ওকে অনেক জীবনচেতনা ও বাস্তব গণিতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। উচ্চারিত শব্দ আর অন্তর্ভূমির মধ্যে মানুষের যে বিপুল অন্তর থাকে এভাবে বোঝেনি আগে। মানুষের উদারতা, মহত্ত্ব, প্রীতিবাৎসল্যের প্রাপ্তিও কিছু কম হল না। শুধু একটাই ধাঁধা। মানিক সেন। ওকে এখনও বুঝে উঠতে পারল না।

দেববর্মাদের বাড়িতে আসার পর থেকেই মানিক প্রায় প্রত্যহ উদয়নের কাছে আসা যাওয়া করে। এখানে সব পার্টিই তাদের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে। কংগ্রেস ছিলই। মুক্তি পরিষদের সদস্যরা অধিকাংশই যোগ দিয়েছে কমিউনিস্ট পার্টিতে। ফরোয়ার্ড ব্লক, বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দল (আর.এস.পি), অন্যরাও বেশ সক্রিয়। মানিক সব দল সম্পর্কেই বিশদ খবর রাখে। নেতাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করে। এখানকার রাজনীতির আবহ বিষয়ে ওকে চলমান গেজেট বলা যায়। কিছুদিন সুখময় সেনগুপ্তর ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেছিল। এখন আবার দশরথ দেবের মিটিংয়ে মিছিলে হাজিরা দেয়। বীরেন দত্তের বাড়িতেও যাতায়াত করে।

রাজনীতির চক্রে ঘোরা ছাড়া ও যে আর কী করে তাও জানা নেই। জিজ্ঞেস করলে এমন হাসে যার নানাবিধ অর্থ হতে পারে। বা, যেন এমন প্রশ্ন করতে নেই। বাড়ির কথা জানতে চাইলে বলে, যা ছেড়ে এসেছি সেসব নিয়ে আর ভাবি না। পিছুটান রেখে আসিনি। মানুষের সঙ্গে আছি। মানুষে সঙ্গে থাকতে পারলেই খুশি।

উদয়ন বুঝতে পারে না মানিক সর্বতোভাবে ওর বিরুদ্ধাচরণ করেও কেন নিয়মিত যাওয়া-আসার স্বাভাবিক সম্পর্ক রাখে। আবোল-তাবোল নানা কথা বিভিন্ন সূত্রে কানে এসেছে। এও শুনেছে ওর নামে কুৎসা রটনার পিছনেও মানিকের ভূমিকা আছে। তবু সরাসরি মানিককে জিজ্ঞাসা করতে পারেনি। পাঁক ঘাঁটলে শুধু দুর্গন্ধই ছড়ায়। নিজেরই আত্মিক কষ্ট।

অন্যদিকে বৃদ্ধ দেববর্মা দিনে অন্তত একবার এসে উদয়নের শরীরের খবর জেনে যান।

ও বলেছিল নাতিদের পড়তে আসার জন্য। বৃদ্ধ রাজি হননি। বলেছেন, সুস্থ হয়ে উঠুন। তখন পড়াবেন।

উদয়ন বলেছিল, ওদের পড়াব বলেই তো এখানে থাকা। আপনারা তো ভাড়াও নেবেন না। আমিও এখন যেতে পারব না।

বৃদ্ধ হেসে বলেন, আপনি একজন শিক্ষক। বন্ডেড লেবার নন। কোনো সংকোচ করবেন না। যা-কিছু দরকার হবে ডেকে বলে দেবেন।

খুব ভালো লেগেছিল নীরদের সঙ্গে বাবাইকে দেখে। ওরা যে আসতে পারে এমন সম্ভাবনাও মাথায় ছিল না। নীরদের সঙ্গে প্রণতিদের বাড়িতে কয়েকবারই দেখা হয়েছিল। খুব বেশি কথাবার্তা হয়নি কখনোই। সেদিন অনেক কথার পর সাদাসিধে মানুষটিকে ভালোই লাগে উদয়নের। যমুনা, প্রণতির না আসতে পারার জন্য অনেকবার দুঃখ প্রকাশ করেছেন। উদয়নের মনে হয়েছে ওসব না বললেও ক্ষতি ছিল না।

বাবাই বলল, তুমি আর কতদিন শুয়ে থাকবে?

— ডাক্তার যতদিন বলেন।

— কতদিন তুমি গল্প শোনাওনি। ভালো হয়ে অনেক গল্প শোনাবে।

তারপরেই হঠাৎ মনে পড়ে গেছে এমনভাবে বাবাই বলল, তুমি জানো সুভাষ বোস বেঁচে আছেন? তবে সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন।

— তোমাকে কেউ বলেছে বুঝি?

— আমাকে না — সবাই বলছে। কাগজে লিখেছে।

— এসব গুজবে কান দিয়ো না, বাবাই। এসবই কিছু ফন্দিবাজের সরল মানুষকে প্রতারণার চেষ্টা।

নীরদ বলে, শৌলমারি নিয়ে এমন হই হই চলছে, অনেকে নাকি চাক্ষুস দেখে এসেছে।

উদয়ন হাসে — আপনি কাউকে দেখেছেন বলতে?

— না।

— দেখবেন সবাই বলে শুনেছে বা পড়েছে। স্কুলে আমাদের অঙ্কের মাস্টারমশাই বলতেন, ছাপার অক্ষর মানেই সত্য নয়।

কথা ঘুরিয়ে উদয়ন বলে, প্রণতিকে এম.এ. পড়ার জন্য বলবেন। স্কুল বদলাবার কথাটাও ভাবতে হবে। আর ইয়ে, আমার জন্য চিন্তা না করতে বলবেন, আমি ভালো আছি। ডাক্তারদের অনুমতি পেলেই বেরিয়ে পড়ব।

ওরা চলে যাবার পর চুপচাপ শুয়ে ভেবেছিল জীবনের বিচিত্রতার কথা। আচমকা পরিচয় প্রণতির সঙ্গে। বিধবা তরুণীর সংগ্রামের ইচ্ছাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সহায়তার হাত প্রসারিত করেছিল। ধীরে ধীরে এক অনুচ্চারিত সম্পর্ক-বন্ধনে জড়িয়ে গেছে। বন্ধন শব্দটা বোধ হয় ঠিক নয়। ওদের সম্পর্কের শৃঙ্খলায় কোনো রকমের শৃঙ্খলই নেই। এখনও পর্যন্ত নেই। তবে আজকাল প্রণতির কথা ভাবলে অনুভবে অচেনা সুরলহরীর ঝংকার পায়। প্রণতির চোখের বাঙ্ময়তা অপঠিতপূর্ব। সেদিন ওদের বাড়িতে যাবার জন্য বারবার দাবির মধ্যে কি ভিন্নতর কোনো অনুজ্ঞা ছিল! হয়তো এসব কিছুই নয়। নিজের অর্বাচীন অসমীচীন কল্পনায় অসম্ভব অভাবনীয়ের মাত্রা যুক্ত করছে। তবু মনটা বারেবারেই প্রণতি নামক খেয়াঘাটে পারাপার করতে চায়। নির্জন বিছানায় শুয়ে থাকাটা অসহনীয় হয়ে ওঠে। সহনীয় করার একমাত্র

উপাদান বই। আগে পড়া থাকলেও আবার পড়ে 'জাগরী', 'আরণ্যক'। পড়ে 'তিতাস একটি নদীর নাম', 'শ্রীমতী কাফে', 'জগদ্দল'। ইংরেজিতে, 'মমের রেজর্স এজ', তুর্গেনিভের 'ভার্জিন সয়েল' আর এডগার স্নো-র 'রেড স্টার ওভার চায়না।'

শৈলেশ কলেজ লাইব্রেরী থেকে বই এনে দেয়। ওর সঙ্গে পূরবীও আসে প্রায় রোজই। পূরবী এক-একদিন তেল-মশলাবিহীন মাছ, সবজি রান্না করে আনে। ফল-মূল তো আছেই। উদয়ন বিব্রত বোধ করে। কিছু বলাও যায় না। দু-এক বার শৈলেশকে বলার চেষ্টা করায় জবাব পেয়েছে, তুই কি আমার গৃহশান্তি নষ্ট করতে চাস? আর তোর আপত্তি কীসের? আমার কিছু খরচ হয়ে যাচ্ছে বলে? শোন, তোর জন্য দুটো মাছ কি ফল কিনলে আমি ফতুর হয়ে যাব না।

দু-তিন দিন পূরবী আসতে পারেনি। শৈলেশ এসে জানিয়েছে ওর শরীরটা ভালো নেই। জ্বর মতো হয়েছে। আজ সস্ত্রীক এসেই শৈলেশ বলল, শুনলাম শীঘ্রই ত্রিপুরা ইউনিয়ন টেরিটোরি হয়ে যাবে। তার পরই আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচন।

— জেনারেল ইলেকশনও তো আসন্ন।

— এখানেও হয়তো একইসঙ্গে হবে। শোন, আমি একটু ঘুরে আসছি। কাছেই যাব। তোর কিছু লাগলে বল।

পূরবী বলল, আকাশের অবস্থা ভালো নয়। নাই-বা গেলে। আমি ঘরটা গুছিয়ে দিয়েই যাব।

উদয়ন বলে, কিছু আনতে হবে না তোর। বোস একটু গল্প করি। প্রণতির ব্যাপারে তোর সঙ্গে কথা আছে।

শৈলেশ বলল, না গেলে হবে নারে। বেশিক্ষণ লাগবে না। আধঘন্টার মধ্যেই এসে যাব।

শৈলেশ বেরিয়ে গেলে পূরবী বলল, এই ক-দিনে ঘরটার কী হাল করেছেন! কদ্দিন বদলানো হয়নি বেডশিট? অসুস্থ মানুষকে তো বেশি করে পরিচ্ছন্ন থাকা উচিত। উঠে একটু চেয়ারে বসুন তো।

উদয়ন বলল, কী দরকার। থাক না। তোমারও তো শরীর ভালো ছিল না, এখন কেমন আছ?

— আজকাল কি মেয়েদের শরীর খারাপের খবর রাখতে শুরু করেছেন?

— মেয়ে আর কোথায়। এক তুমি। তুমি আসোনি। তোমার বর বলল শরীর খারাপ। তাই —

— আর মেয়ে নেই? কেন — প্রণতি—

— সব জেনেও ওর কথা কেন বলছ!

— আচ্ছা প্রণতির কথা বলা যাবে না। ঠিক আছে। বলব না। এখন উঠুন।

ঘরটা তেমন বড়ো না। খাটের পায়ের দিকে একটা ছোটো টেবিল। তিনটি চেয়ার। দু'টো বাঁশের মোড়া। দেয়ালে লাগানো ব্র্যাকেটে জামাকাপড় ঝোলে। এককোণে ডাঁই করা বই, পত্র-পত্রিকা। টেবিলে তো হাত রাখারও জায়গা নেই।

উদয়ন উঠে চেয়ারে বসতে যেতেই পূরবীর সঙ্গে ঘেঁষা লাগে। চেয়ারে বসে টেবিলের উপর থেকে না দেখেই তুলে নেয় একটা বই। 'দুনিয়া কাঁপানো দশদিন'। একটু দেখেই আবার রেখে দেয়।

পূরবী বালিশের ওয়াড়, বিছানার চাদর বদলে ধোয়া চাদর পাতে। টান করে কোণগুলো গুঁজে দেবার জন্য ঝুঁকলে আঁচল সরে যায়। উদয়নের চোখ পলকের জন্য ওর বুকের অনাবৃত ঊর্ধ্বাংশে পড়ে। হলুদ ব্লাউজের নীচে ভরাট বুকের ডৌল, মাতাল আপেলের মতো চঞ্চল। জোর করে চোখ সরিয়ে নেয় উদয়ন।

বিছানা পরিপাটি করে মেঝে ঝাঁট দেয় পূরবী। ময়লা জামাকাপড় ও বিছানার চাদর, ওয়াড় ঘরের এককোণে গুছিয়ে রেখে পূরবী বলল, কাল এগুলো কাচতে দেবেন।

জানলা দিয়ে দমকা বাতাস ঢুকে দরজার পাল্লায় সশব্দ ধাক্কা দেয়। পূরবী দ্রুত পায়ে এগিয়ে জানলা বন্ধ করতে করতে বলে, এই রে, বিশাল ঝড় উঠেছে।

জানলা বন্ধ করে উদয়নের কাঁছে এল পূরবী, বলে, যান, এবার শুয়ে পড়ুন—

উদয়ন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। তখনই আবার ফালা ফালা করে বিদ্যুৎ চমকায়। আদিগন্ত কর্ণরোধ-করা দামামা পিটিয়ে অশনিসম্পাত ঘটতে থাকে পরপর বারবার। এমন চকিত শিহরণ জাগানো বজ্রনাদে আতঙ্কিত পূরবী উদয়নকে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে শব্দ আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। উদয়নের দু'হাত ওর পিঠে আশ্বাসের তাল তোলে। বজ্রের সঙ্গে অঝোরে বৃষ্টি নামে। বজ্রনাদও যেন ক্ষান্তিহীন। পূরবী থরথর কাঁপে উদয়নের বুকের মধ্যে। পূরবীর বুকের চাপ রক্তের মধ্যে ঘুঙুরের ধ্বনির, আভাস আনে উদয়ন পূরবীর কানের কাছে মুখ রেখে বলে, ভয় পেয়ো না, ভয়ের কিছু নেই। আমি তো আছি।

পূরবী আরও শক্ত আশ্লেষে উদয়নের শরীরে গেঁথে থাকে। অঝোর বৃষ্টির শব্দ তবলা লহরী যেন। বজ্রপাতের শব্দে হিংস্র উল্লাস। পূরবী চোখ তুলে উদয়নের মুখের দিকে তাকায়। হলুদ বুকের সুডৌল হাসি উদয়নকে হাতছানি দেয়। ওর চোখের কাছে মুখ নিয়ে উদয়ন বলে, ভয় কী!

এরপর ঠিক কী ঘটে, যা ঘটে তা কীভাবে ঘটে উদয়ন সঠিক মনে করতে পারে না। কয়েক মুহূর্তের অন্ধকার স্মৃতি কিছুতেই উদ্ধার করা যায়নি। মনে আছে হঠাৎই যেন, পরস্পরকে চুম্বন করছে দেখে। ওর অধিকারে পূরবীর হেমবর্ণ বক্ষ ঐশ্বর্য। বজ্রনাদ। আরও চুম্বন। বর্ষণ তীব্রতর হয়। পূরবী নিরাবরণ। অধরে বজ্রপাত। পূরবী উদয়নের বুকের ভিতরে নিষ্পিষ্ট, মথিত।

ঝড় থামে। বজ্রপাত নেই। বৃষ্টি পড়ে। বৃষ্টি পড়ে।

বৃষ্টি পড়ে। বৃষ্টি।

উদয়ন দু'হাতের ভাঁজে মুখ গুঁজে শুয়ে থাকে। মস্তিষ্কের, অনুভবের বালুচরে অজস্র কাঁকড়ার কুটকুটে ছোটাছুটি। কী করে হল। ও কীভাবে করল! কী বলবে পূরবীকে? কীভাবে মুখোমুখি হবে শৈলেশের?

পূরবী বিছানা ছেড়ে নিজেকে গুছিয়ে নেয়। জানালা খুলে হাত বাড়িয়ে কোষভরা বৃষ্টির জল মুখে ছড়িয়ে আঁচল দিয়ে মোছে। উদয়নের দাড়ি কামানোর ছোট্ট আয়নাটা তুলে মুখ দেখে কপালের টিপ, সিঁথির রক্তিমা দেখে নিয়ে বিছানার চাদর হাতের তালু দিয়ে ঘষে নিপাট করে তোলে। উদয়নের পিঠে হাত রেখে বলল, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি? সাড়া না পেয়ে মৃদু ধাক্কা দেয়। — এদিকে ফিরুন।

উদয়ন খুব ধীরে ধীরে চোখের উপর থেকে হাত সরিয়ে পূরবীর মুখে বোবা দৃষ্টি ফেলার

চেষ্টা করে। ভেবেছিল ক্ষিপ্ত ক্রুদ্ধ শাণিত পূরবী ঘৃণায় তাকাবেও না। বিস্মিত উদয়ন দেখে, পূরবীর মুখে যেন বর্ষণশেষের পেলব আভা। ঠোঁটের ভাঁজে তির্যক হাসির কুঁড়ি। উদয়ন কিছু বলার চেষ্টা করতেই পূরবী তর্জনী ওর ঠোঁটের উপর রেখে বলে, কোনো কথা নয়। কিছু বলবেন না।

ভাষাহীন চোখে তাকিয়ে থাকে উদয়ন। পূরবীর কথা শুনলেও যেন বোঝেনি। কাঁপা ঠোঁটের আগল ভেঙে উচ্চারিত হয় — পূরবী — আমি —

ওর চুলে হাত বুলিয়ে পূরবী বলে, বলেছি না কিচ্ছু বলতে হবে না।

উদয়ন তবু বলে — পূরবী —

চোখে ঝিলিক তুলে পূরবী বলল, আপনি কিচ্ছু বোঝেন না। জল খাবেন?

খাটের পাশে রাখা ঘড়া থেকে জল গড়িয়ে গ্লাসটা বাড়িয়ে ধরে পূরবী।

বাঁ কনুইয়ে ভর দিয়ে পুরো গ্লাস শেষ করে উদয়ন বুঝতে পারে ওর কণ্ঠনালি থেকে পাকস্থলী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এক সাহারাখণ্ড। পূরবী জানল কীভাবে?

মুখ বাড়িয়ে বাইরেটা দেখে পূরবী বলল, বৃষ্টি ধরেছে। আপনার বন্ধু এসে পড়বে। আমরা যাওয়ার পর একলা যেন আবোল-তাবোল ভাবতে বসবেন না। আমি কাল আসব।

— তুমি — পূরবী —

বাইরে পায়ের শব্দ শুনে পূরবী ঠোঁটে আঙুল রাখে। চোখের ভ্রূকুটিতে মৃদু তিরস্কার।

শৈলেশ ঢুকে বলল, সরি — যা বৃষ্টি —

পূরবী বলল, তখনই বলেছিলাম যেয়ো না, বৃষ্টি আসবে। শুনলে কথা? ভেজোনি তো — দেখি —

বলে পূরবী শৈলেশের শার্টের উপর হাত বুলিয়ে পরখ করে।

শৈলেশ বলে — ভিজিনি, এই আসার সময় দু-চার ফোঁটা — ও কিছু নয়।

— কিছু নয় বলে তুমি তো খালাস। ইনি এখানে লম্বা হয়ে আছেন, তুমিও জ্বর বাধালে আর দেখতে হবে না।

শৈলেশ উদয়নের পাশে বিছানায় বসে বলল, কীরে অমন ভেজা পাঁপড়ের মতো মুখ করে আছিস কেন? শরীর বেশি খারাপ লাগছে?

উদয়ন মৃদু হাসি ঠোঁটের উপর উজিয়ে বলল, তোর বউ কি কারুকে কথা বলতে দেয়! হেডমিসট্রেসের হাতে ছড়িটাই শুধু নেই।

— যা বলেছিস। — সোল্লাসে বলে শৈলেশ। ওর হাত উদয়নের কোমরের কাছে মৃদু চাপড় দেয়।

অল্প আগে ওখানেই ছিল পূরবীর হাত। শৈলেশের জায়গায় পূরবীর কুণ্ঠিত শরীর। যার আঁচের দহনে দাউ দাউ জ্বলছে বুকের ভিতর ডালপালা, লতাগুল্ম। নাকে লাগছে চামড়া পোড়ার কটু গন্ধ। উদয়ন কি শ্মশানভূমিতে শয়ান?

শৈলেশের দিকে তাকিয়ে পূরবী বলল, দু'দিন না এলেই ঘরের যা ছিরি হচ্ছে! আমি বলি কী, যদ্দিন সুস্থ না হচ্ছেন আমাদের ওখানে থাকলে হয় না?

শৈলেশ বলল, গুড আইডিয়া। ও রাজি হলেই হয়। কীরে যাবি তো, চল।

উদয়ন বলল, রক্ষে করো। সারাক্ষণ হেডমিসট্রেসের ধাতানি সহ্য হবে না। আমি যাওয়া মানেই তো নানা মানুষ এসে বারবার বিরক্ত করা। না রে, এখানেই ঠিক আছি। পূরবী

তোমাকে কষ্ট করে আসতে হবে না। বরটাকেও আটকে রেখো।

শৈলেশের মুখে হাসি উছলায়। পূরবী উদয়নের দিকে তীব্র দৃষ্টি দিয়ে স্বামীকে বলল, এবার চলো।

সে-রাতে সহজে ঘুম আসে না উদয়নের। ধিক্কারে ভর্ৎসনায় নিজেকে বারংবার ব্যবচ্ছেদ করে। মনে হয় জীবনে মৃত্যুই বৃহত্তম ক্ষতি নয়। তার চেয়েও ঢের বেশি ক্ষতি জীবিতকালেই মানুষের অন্তর্গত কুসুমের ক্ষয়।

বিষয়টা যদি বর্ষা-তাণ্ডবের এক চকিত ভ্রান্তি হত তাহলে উদয়নের বুকের উপর চেপে থাকা নির্লজ্জ দ্বিধাবিভক্তি এত যন্ত্রণাময় লাগত না। প্রাচীরে জেগে ওঠা শিকড়ে নিগড় থাকে না। পূরবী এখন স্বামীর সামনেই ওর কপালে মাথায় হাত রাখে। শুশ্রূষার হাত। হাতের স্পর্শ শিরায় অনুভবে প্রত্যাশা জাগায়। আর্তচোখ কবুতরের মতো পূরবীর পীন উরসিজের উড্ডীন-আভাস খুঁজে বেড়ায়। সঙ্গোপনে হাত রাখে কোমরের আধখানা চাঁদে। হঠাৎই কোনোদিন পূরবী সুযোগ বানিয়ে ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন শব্দ অপ্রয়োজনীয়। কথা বলে নব নব আবিষ্কারে উন্মুখ দুই নৃত্যপর উরঙ্গ শরীর। প্রতিবারই পূরবীর চোখে বর্ষাশেষের কোমল আলো ফুটে উঠতে দেখে। রাতে শুয়ে শুয়ে এক হাতে নিজের লোলুপতার ঝাঁপি আর অন্য হাতে অপরাধবোধের অসি নিয়ে এক অন্তহীন আত্মিক সমরে লিপ্ত হয় উদয়ন।

সকাল হলে প্রথমেই মনে হয়, আজ কি পূরবী আসবে? এলেও কি একা পাবে? ডাক্তার যে কবে ওকে চলাফেরা করতে দেবে! নিজেকে তো এখন অতি সুস্থ মনে হয়। সম্পূর্ণ নীরোগ। শিরায় ধমনীতে বহমান রক্তের ছলাতশব্দ শোনা যায়। ডাক্তার তবু বলেন, আরও ক-টা দিন যাক।

একদিন মানিক এসে বলল, এবার তাড়াতাড়ি চলমান হও। অবস্থা খুব ঘোরালো হয়ে উঠছে।

— কেন?

— আঞ্চলিক পরিষদের ইলেকশন আসছে তো। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। শুনছি, তোমাকে এবার আর শিক্ষক সংগঠনে থাকতে দেবে না। তোমার কি কংগ্রেস কমিউনিস্ট দুই দলের সঙ্গেই ঝগড়া হয়েছে?

— দলের সঙ্গে ঝগড়া হয়নি। তবে দু-দলেই দু-একজন মানুষ আছে যাদের আমি পছন্দ করি না। ওরাও আমাকে সহ্য করতে পারে না।

— সবাইকে চটিয়ে টিকবে কী করে? যাকগে, সেরে ওঠো আগে। প্রণতি বৌদি তোমার শরীরের খবর নিচ্ছিলেন।

শরীরের খবর! উদয়ন চমকে ওঠে। ঠাণ্ডা স্বরে বলে, তুমি গিয়েছিলে নাকি?

— হ্যাঁ। আমি প্রায়ই যাই। বাবাইয়ের সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেছে। ও তোমার কথা ভীষণ বলে। তুমি তো ওকে এখনই রাজনীতিতে দীক্ষা দিয়ে ফেলেছ দেখছি।

— কী করে বুঝলে?

— ভগৎ সিং, ক্ষুদিরাম, সুভাষ বোস, লেনিন, মাও সব জানে।

— ওরা সবাই ভালো আছে তো?

— হ্যাঁ। তবে বৌদি বলছিলেন এখানকার স্কুলে পড়াতে আর ভালো লাগছে না। অন্য স্কুলে চেষ্টা করছেন। তখন বললেন— আপনি সুস্থ থাকলে হেল্প করতে পারতেন। আপনার

যা ইনফ্লুয়েন্স।

— ভুল, মানিক। এখন আমার কোনো ইনফ্লুয়েন্সই নেই। ওকে নিজেই খুঁজে নিতে হবে।

সপ্তাহ খানেক পরে উদয়ন চলাফেরার অনুমতি পায়। আরও দু-সপ্তাহ পরে স্কুলে যাওয়া শুরু করে। বুঝতে পারে রাজনীতির বাতাসে উত্তাপ সঞ্চরমাণ। চেনা মানুষের মুখের রেখায়ও যেন অচেনা চিহ্ন।

শৈলেশ বলল, অবস্থা ভালো বুঝছি না। তুই সাবধানে থাকিস। মানে অহেতুক কোনো ঝামেলায় যাস না।

পূরবী বলে, অনেকতো করেছেন। এবার ওসব ছেড়ে নিজের দিকে নজর দিন।

উদয়ন বলল, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'সুখের মতো ব্যথা'। আমি বলি বিষের মতো সুখ। রাজনীতির বিষ একবার শিরায় ঢুকলে আর পরিত্রাণ নেই। টিল ডেথ পারট্‌স!

প্রণতি এখনও পুরোনো স্কুলেই আছে। চেষ্টা চলছে কোনো উচ্চতর স্কুলে সুযোগ পাওয়ার। উদয়নও খোঁজখবর করে। আজকাল পূর্ববৎ ঘন ঘন আসে না। বেশি সময় শৈলেশের বাড়িতেই কাটাতে চায়। তবু আসে। প্রণতির কাছে এলেই মনে হয় যেন কোনো স্নিগ্ধ নদীর তীরে এসেছে। কিন্তু এমন নদী যাতে অবগাহন সম্ভব নয়। ডোঙায় প্রদীপ ভাসানো যায় শুধু।

প্রণতি বলল, ইংরেজি নিয়ে এম.এ পড়তে বলছেন, আমি কি পারব?

প্রতিবারই প্রণতি এই প্রশ্ন করেছে। প্রতিবার সফলও হয়েছে। উদয়নের প্রতীতিতে কোনো ভুল নেই।

ওকে আশ্বস্ত করে বাড়ি ফেরার পথে সন্ধ্যার অন্ধকারে আচমকা কিছু লোক উদয়নকে বেদম প্রহার করে বেহুঁশ ফেলে যায়। কয়েকটা শব্দ কেবল অজ্ঞান হবার আগে খুঁটে নিতে পেরেছিল — শালা মাগিবাজ, নেতা হবে ভেবেছ!

ঘরের ছাউনিতে অলক্ষ্য ছিদ্রের শূন্যতাও অনন্তবর্ষী।

দশ

জীবনকে যদি শাড়ি ভাবা যায় তবে তার পাড় — অনিশ্চয়তা। আঁচল—পরিবর্তনশীলতা। এই অনিশ্চয়তাই জীবনকে মোহময় মধুময় করে। পরিবর্তনই উন্মেষ ঘটায় প্রগতির উত্তরণের। তবু প্রশ্ন জাগে, জীবন যদি এত মনোহর, মহার্ঘ, তবে কেন এত কলুষ, এত কুটিলতা ও হনন-স্বনন! কেন চক্রান্ত ষড়যন্ত্র সুন্দর জীবনকেও ছিঁড়ে কুটে বিনাশ করার? কারো বিরুদ্ধতা বা স্বার্থহানি না ঘটালেও মানুষ কেন শত্রু হয়ে ওঠে? নখর লোলুপতা আক্রমণ করতে চায়?

এইসব প্রশ্নের জবাব পায় না প্রণতি। অথচ প্রতিদিন নতুন নতুন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। একা। এখন আর সদ্যবিধবা তরুণীর অসহায়তার প্রসাধন আশ্রয় করা চলে না। মাকেও বলতে পারে না সবকিছু। অজস্র যন্ত্রণার অগোপন কথা পুঞ্জিত থাকে নিজের মধ্যে। সমস্যা হলে উদয়নের সাহায্য দাবি করাও প্রায় ত্যাগ করেছে। একজন মানুষকে কত আর বিরক্ত করা যায়। আর এমন বিষয়ও থাকে, যা অন্য পুরুষকে বলা চলে না। মানুষ যত বড়ো হয় ততই তার নিঃসঙ্গতা বাড়ে। তখন নিজের ভিতর থেকেই আহরণ করতে হয় যোঝার শক্তি। যে-শক্তি জোগায় সাহস আর আত্মবিশ্বাস। প্রণতির এখন এসব যথেষ্ট। এর সঙ্গে আছে প্রাণের আনন্দ ও জীবন-স্বপ্ন — বাবাই।

ক্লাস সিক্সে পড়ছে বাবাই। পড়াশোনায় ওর গাঢ় আগ্রহ। পরীক্ষার ফলও ভালো করে।

প্রণতি ওকে নিজের কল্পনার পুরুষের মতো গড়ে তুলতে চায়। কিন্তু কল্পনার পুরুষের প্রতিমূর্তি আঁকতে গিয়ে সমস্যায় পড়ে। মূর্তির মধ্যে কিছুটা বাবার আদল আসে। বিনোদের ছাপ বাবাইয়ের শরীরে যা আছে। মনন ও চারিত্র্যে ঢুকে পড়ে উদয়নের প্রভাব। তখনই অনুভবে ঢেউ ভাঙে এক সত্তাবোধ — বিনোদের স্মৃতি ক্রমশই দূরতর ধূসরতর হচ্ছে। বারো বছর পেরিয়ে এসে এখন দুটো-একটা কথা ছাড়া আর যেন কিছুই মনে পড়ে না। শরীর থেকে বৈধব্যের অভিজ্ঞানও প্রায় অবসিত।

বছর চারেক আগে বাবাই টাইফয়েডে ভুগেছিল। দুর্বল বালকের স্বাস্থ্যের জন্য ডাক্তারি নির্দেশ ছিল মাছ মাংস ডিম খাওয়ানোর। তখনো পর্যন্ত বাড়িতে এগুলো নিষিদ্ধ ছিল। ছেলের জন্য অনুশাসন ভাঙতে হয়। কিন্তু মা না খেলে ছেলেও খাবে না। এই জেদের কাছে পরাজয় মেনে প্রণতি ধীরে ধীরে নিজেকে বদলায়। এখন রঙিন পাড়ের হাল্কা রঙের শাড়িও পরে। প্রকৃতপক্ষে শরীরকে শাস্তি দিয়ে স্মৃতি-উপাসনার সার্থকতা খুঁজে পায় না।

গত বছর কানাইয়ের বিয়ের সময় সাজগোজ করা প্রণতিকে দেখে নীরদ বলেছিল, এই রূপ এই সৌন্দর্য এতদিন লুকিয়ে রেখেছিলে। সত্যি একটা সুন্দর শাড়ি আর সামান্য সাজও একজন নারীকে এমন অপরূপা করে আজ তোমাকে না দেখলে জানতেই পারতাম না!

সলাজ গলায় প্রণতি বলেছিল, দুষ্টুমি হচ্ছে! ডলিদিকে বলে দেব।

— তা দিও। তবে তোমার যাদুও একটু শিখিয়ে দিও।

— আমার যাদু?

— হ্যাঁ। যা ছিলে আর যা হয়েছ — সেই রূপান্তরের যাদু।

শব্দ করে হেসে উঠেছিল দুজনে।

কানাইকে দেখেও সার্থকতার তৃপ্তি বোধ করে প্রণতি। সেই 'মা ঠাকরুন, আমিও যামু আপনের লগে', বলে ত্রস্ত যে কিশোর ওদের সঙ্গে গরুর গাড়িতে উঠেছিল, সে এখন মোটরগাড়ি চালায়। বিয়ে করে নিজের সংসার গড়ে তুলছে। নিজের বাসস্থানও। তবে প্রায়ই এসে খবরাখবর করে। খবর দিলে তো আসেই। বাবাইয়ের সঙ্গে ওর আত্মার সম্পর্ক।

ওদের ছেড়ে যাবার ব্যাপারে যমুনার আপত্তি ছিল। বলেছিলেন, এখানেই থাক। দরকার হলে আর একটা ঘর তুলে নে। জায়গা তো আছে।

প্রণতি বলেছিল, না, মা। ওকে যেতে দাও। নিজের ঘর-সংসার নিজেই সামলাক। পুরুষ মানুষ স্বাবলম্বী হোক।

কানাইকে বলেছিল, শোন, আলাদা ঘর করছিস তার মানে আমাদের সঙ্গে বিচ্ছেদ নয়। যখন খুশি আসবি। কোনো অসুবিধা হলে, বা যেকোনো দরকারে আগের মতোই বলবি এসে।

কানাই জবাব দিয়েছিল, এসব কি বলতে হয় দিদি! মা ঠাকরুন আর তুমি ছাড়া আমার আপনজন আর কে আছে!

কানাইও যে দেবদূততুল্য হয়ে উঠবে, কখনো কি ভাবতে পেরেছিল প্রণতি! জীবনের সে রহস্যময়তার কথা পরে।

১৯৫৭র নির্বাচনে উদয়ন কোনো ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়িতেই শয্যাগত। ডান পায়ে প্লাস্টার। শরীরের নানা অংশের ক্ষতগুলো ধীরে ধীরে সেরে উঠছে। ওই অতর্কিত আক্রমণের খবর পেয়ে প্রণতি ছুটে না গিয়ে পারেনি। মানিক সেন সহ কানাই ও বাবাইকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিল। সেখানেই আলাপ হয়েছিল শৈলেশ

ও পূরবীর সঙ্গে।

শৈলেশকে আন্তরিক সজ্জন মানুষ মনে হয় প্রণতির। বন্ধুর জন্য উৎকণ্ঠায় বিচলিত। বারবার বলে, ভাবতেই পারছি না উদয়নের এমন শত্রু থাকতে পারে।

মানিক বলে, আমি উদয়দাকে সাবধান হতে বলেছিলাম। তবে এভাবে মারবে আমিও ভাবতে পারিনি।

পূরবী বাবাইয়ের গাল টিপে বলল, মাকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে এসো।

প্রণতিকে বলল, আপনার ছেলেটা দারুণ মিষ্টি হয়েছে। আসবেন কিন্তু আমাদের বাড়িতে।

শৈলেশ বলে, আপনার কথা উদয়নের কাছে এত শুনেছি যে আপনাকে আমার অচেনা মনেই হচ্ছে না। শুনলাম এম.এ করার জন্য তৈরি হচ্ছেন।

নরম স্বরে প্রণতি বলে, সবই মাস্টারমশাইয়ের জন্য। উনি সাহায্য না করলে কিছুই করতে পারতাম না।

শৈলেশ বলে, আমি যদিও ইংরেজির লোক নই, তবু কোনো হেলপ দরকার হলে বলবেন। আমাদের লাইব্রেরি থেকে বইপত্র দিতে পারব। যদি বলেন আমাদের ইংরেজির অধ্যাপকদের কারুকেও আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি।

৫ এপ্রিল, ১৯৫৭। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ভোটে জিতে একটি কমিউনিস্ট সরকার নাম্বুদ্রিপাদের নেতৃত্বে কেরালায় সরকার গঠন করে। যদিও তার বহু আগে ১৯৪৬ সালে অনন্তন নাম্বিয়ার মাদ্রাজ বিধানসভার প্রথম কমিউনিস্ট সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

ডাক্তারের হুকুমনামা অগ্রাহ্য করেই উদয়ন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে সেদিন। বলে, এই ঐতিহাসিক দিনে আমি বিছানায় শুয়ে থাকতে পারব না। জানি ত্রিপুরা থেকে কেরালা বহু দূর। তবু যে বর্তিকা আজ জ্বলল, আমার বিশ্বাস তার আলো একদিন এখানেও বিচ্ছুরিত হবে।

বাড়িতে বসে শৈলেশ বলল, তুই তো পার্টির কেউ না। তবে তোর এত উল্লাস কীসের?

— জনগণ বাদ দিয়ে তো পার্টি না। আমি সেই জনতার অংশীদার যারা নিপীড়ন, শোষণ, অবিচারের বিরুদ্ধে পৃথিবী জুড়ে অবিরাম লড়ছে। কেরালাকে আমি এক জ্বলন্ত প্রতীক হিসাবে দেখছি। সঙ্গে সঙ্গে এটাও আশা করছি ওখানকার পার্টি দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেবে, সহিষ্ণু হবে, গণউন্নয়নের জন্য সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নেবে।

একটু থেমে আবার যোগ করে — ওই পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে।

শৈলেশ ওর দিকে তাকালে উদয়ন হেসে বলে, একটুখানি জীবনানন্দ ছাড়লাম।

ওকে নিজের বিছানায় পরিপাটি গুছিয়ে দিয়ে খাবার সময় শৈলেশ বলল, এবার ঘরটর নিজেই সাফ সুতরো রাখার ব্যবস্থা করিস। পূরবী আগের মতো হয়তো রেগুলার আসতে পারবে না।

— কেন?

— ওঃ তোকে বলা হয়নি। আমি বাবা হতে চলেছি।

— তাই? কনগ্রাচুলেশনস! একই দিনে এত সুখবর!

বিদায় নিয়ে শৈলেশ চলে গেলে উদয়নের মনে পড়ে, কয়েকদিন আগে পূরবী নিজেই হাসপাতালে ওর কানের কাছে মুখ রেখে বলেছিল, মারামারি ঝগড়াঝাঁটি এবার ছাড়তে হবে। আপনি বাবা হচ্ছেন।

— কী করে জানলে আমি? — উল্লসিত হওয়া উচিত কি না বুঝতে না পেরে সংশয়ের স্বরে বলে উদয়ন—

— মেয়েরা বুঝতে পারে।

— শৈলেশ? ও যদি—

— ও নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। একদমই ভাববেন না। ও এমনিতেই খুশিতে ডগমগ।

উদয়ন শয্যাগত থাকায় প্রণতি উপযুক্ত কোনো স্কুলে সুযোগ পাচ্ছিল না। এম.এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতেও অসুবিধে হচ্ছিল। একদিন আগাম খবর দিয়ে বাবাইকে নিয়ে শৈলেশের বাড়িতে উপস্থিত হয়। সেখানেই পায় পূরবীর শারীরিক সংবাদ। আর আলাপ হয়, ইংরেজির অধ্যাপক অর্ধেন্দু পালের সঙ্গে। সব শুনে অর্ধেন্দু বলে, বইপত্রের অসুবিধে হবে না। আমি কলকাতা থেকে সাজেশনও আনিয়ে দেব। আমি তো আপনাদের বাড়ির কাছেই থাকি। দরকার মতো ছেলেকে পাঠিয়ে দেবেন। যদি বলেন, আমিও যেতে পারি।

মধ্য তিরিশের অর্ধেন্দুর চেহারা উদয়নের বিপ্রতীপ। কৃষ্ণকায় মানুষটি পৃথুল। ধুতির উপর সবুজ পাঞ্জাবি উদরে চেপে বসেছে। মুখে সর্বক্ষণ পান। কথা বলার সময় সুপুরির চর্বিত কুচি ছিটকে আসে। মুখোমুখি বসলে সাদা শাড়ির ছাপা রং ধরার সম্ভাবনা। চোখের দৃষ্টি প্রণতির মধ্যে অস্বস্তি সৃষ্টি করে। অর্ধেন্দুর চোখ কেবল ওর সুডৌল বুকের ঢালে টাল খায়।

ও এখনও প্রাইমারি স্কুলে পড়ায় শুনে অর্ধেন্দু বলল, সে কী! কেন?

— মাধ্যমিক — হাই — অনেক স্কুলেই চেষ্টা করেছি। কিচ্ছু হচ্ছে না। কোনো কানেকশন ছাড়া এখানে কিছু হওয়া খুব কঠিন।

অর্ধেন্দু বলল, কঠিন, অসম্ভব তো নয়। আপনি রাঘবেন্দ্র রায়কে চেনেন? রিজিওনাল কাউন্সিলের মেম্বার।

— ঘোষবাগানে যাঁর বিশাল বাড়ি — শুনেছি অনেক ব্যাবসা —

— ব্যাবসা ওঁর প্রচুর — হোটেল, মোটর গ্যারেজ, ইট-ভাটা, যদিও বেসিক্যালি গভর্নমেন্ট কন্ট্রাক্টর। চেনেন?

— না। নাম শুনেছি। আলাপ-পরিচয় নেই।

— মহারাজগঞ্জের নতুন হাইস্কুলের উনি প্রেসিডেন্ট। আমি বলে রাখব। আপনি একদিন দেখা করবেন। আশা করি কিছু একটা হয়ে যাবে।

বাড়িতে ফিরে রাঘবেন্দ্রর কথা তুলতেই কানাই বলে, আমি তো এখন ওঁরই গাড়ি চালাই, দিদি। খুব ভালো মানুষ। কবে যাবে বলো, আমি নিয়ে যাব।

কয়েকদিন পর অর্ধেন্দু বাড়ি বয়ে এসে বলে গেল, রাঘবেন্দ্রবাবুকে বলেছি আপনার কথা। আপনি রবিবার সকাল এগারোটা নাগাদ ওঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করবেন।

— কোথায় দেখা করব?

— ওঁর বাড়িতে। একতলায় বিরাট অফিস। চিনে যেতে পারবেন, না কি আমি আসব?

প্রভূত ধন্যবাদ জানিয়ে প্রণতি বলল, ও নিজেই যেতে পারবে।

রাঘবেন্দ্রর প্রাসাদতুল্য বাড়ির সামনে দিয়ে বহুবারই যাতায়াত করেছে। ভিতরে ঢুকে প্রণতি বিস্ময়ে স্তব্ধবাক। সামনের লাল পাঁচ ছ-টা গাড়ি। অপেক্ষমাণ বহু মানুষ। ওকে অফিস

ঘরের বারান্দায় দাঁড় করিয়ে কানাই ভিতরে কার সঙ্গে কথা বলে এসে প্রণতিকে ডাকে, দিদি, এদিকে এসো।

বড়োঘরের পাশে একটা ছোটোঘরের মধ্যে প্রবেশ করে প্রণতি। ঘরে কেউ নেই। এক ধারে চেয়ার টেবিল। অন্য ধারে একটা সোফাসেট। ঘরে সুন্দর পর্দা টানা। বিদ্যুতের আলো জ্বলছে, পাখা চলছে।

টেবিলের কাছে একটা চেয়ার টেনে কানাই বলল, দিদি, এখানে বোসো।

চেয়ারে বসে হাতের রুমালে মুখ মুছে, শাড়ি গোছায় প্রণতি। একটু পরেই শার্ট-প্যান্ট পরা একটা যুবকের সঙ্গে ঢোকে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা এক মধ্যবয়সী মানুষ। নিখুঁত দাড়ি-গোঁফ কামানো, কালো চুল। পাকা ধানের মতো গায়ের রং। দীর্ঘ চেহারার নির্মেদ প্রায় ছ-ফুটের মানুষটির নিভাঁজ পোশাকের পারিপাট্য নজরকাড়া।

যুবকটি বলল, স্যার — এই কানাইয়ের দিদি — টেবিলের উলটোদিকে বসে রাঘবেন্দ্র পরিচ্ছন্ন হেসে বলল, নমস্কার। একটু দেরি হল — এত লোকজন — বলুন, কী করতে পারি আপনার জন্য।

সংক্ষেপে নিজের প্রয়োজনের কথা জানালে রাঘবেন্দ্র বলল, বিয়ে করে কাজটা ছেড়ে দেবেন না তো?

প্রণতি কী বলবে ভেবে না পেয়ে মাথা নিচু করে। কানাই বিনত করুণকণ্ঠে বলে, স্যার আমার জামাইবাবু দেশেই খুন হয়ে গেছেন।

— অ্যাঁ! ব্যাপারটা কী খুলে বলুন দেখি।

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও খুব অল্প কথায় দেশ ছাড়া থেকে এখন পর্যন্ত পায়ের তলায় ভূমিসন্ধানের পাঁচালি শোনায় প্রণতি। যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাতে অহেতুক আবেগের ফুলকি না ছলকায়। রাঘবেন্দ্র তবু আপ্লুত। সপ্রশংস চোখে প্রণতির দিকে তাকিয়ে বলল আশ্চর্য, অর্ধেন্দু এসব কিছুই বলেনি।

— উনি জানেন না।

— হ্যাটস অফ টু ইউ, ইয়ং লেডি। উচিত ছিল আরও আগেই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করা। যাই হোক, আমি নিশ্চয় দেখব কী করা যায়। সনৎ —

শার্ট-প্যান্ট পরা যুবক এগিয়ে আসে — স্যার—

— এঁর নাম— কী নাম যেন —

— প্রণতি চৌধুরি।

— হ্যাঁ। কাল সকালে আমাকে মনে করিয়ে দেবে। আর খোঁজ নাও ওই স্কুলের নেক্সট গভর্নিং বডির মিটিং কবে।

বলে উঠে দাঁড়ায় রাঘবেন্দ্র রায়।

দু'হাতে নমস্কারের ভঙ্গিতে জোড় করে প্রণতি বলল, কবে নাগাদ খবর নেব?

রাঘবেন্দ্র বুদ্ধ-হাসি ঠোঁটে মেখে বলে, আপনি কেন খবর নেবেন? খবর যাবে আপনার কাছে।

একমাসের মধ্যেই নতুন স্কুলে যোগ দেয় প্রণতি। মাইনে এবং মর্যাদা দু'টোরই উন্নতি ঘটে। শান্ত মনে ও এম.এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে।

বিনা আমন্ত্রণেই অর্ধেন্দু হঠাৎ হঠাৎ ওর পড়ার খোঁজ নিতে আসে। ব্যাপারটা আদৌ

পছন্দ হয় না প্রণতির। মানুষটি যদিও বই এনে দেয়। জিজ্ঞেস করলে পড়াও বুঝিয়ে দেয়। তবু ওর চোখের ভাষা ও হাতের চঞ্চলতা প্রণতিকে বিপন্ন করে। আঁচল বুকে জড়িয়ে বসলেও অর্ধেন্দুর আতুর চোখ ওই অঞ্চলেই অজ্ঞাত মাধ্যাকর্ষণে এঁটে থাকে। সুযোগ-অসুযোগে হাত ধরা, কাঁধে পিঠে হাত রাখার চেষ্টা তো থাকেই। প্রণতি রূঢ় হতে পারে না কৃতজ্ঞতাবোধে। এবং অখ্যাতির অপপ্রচারের শঙ্কায়।

বাবাই থাকলে আশ্বস্ত থাকে প্রণতি। কিন্তু ওর এখন নতুন আগ্রহ তৈরি হয়েছে ক্রিকেট নিয়ে। ইস্টবেঙ্গলের খেলা নিয়ে মাতামাতি তো আছেই। মাঝেমাঝে অর্ধেন্দুকে এমন বিব্রত করে যে প্রণতির পক্ষে হাসি চেপে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। বোঝা যায় অর্ধেন্দুর ক্রিকেট বা ফুটবলে কোনো ব্যুৎপত্তি নেই।

কিছুদিন আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজ খেলে গেছে কলকাতায়। বাবাই অর্ধেন্দুকে জিজ্ঞাসা করে, পালকাকু, বলো তো কানহাই-এর ২৫৬ নাকি সোবার্সের ৩৬৫ কোনটা মোস্ট গ্লোরিয়াস ব্যাটিং?

সোবার্সও কলকাতায় সেঞ্চুরি করায় নামটা অপরিচিত ছিল না অর্ধেন্দুর। বলল, সোবার্স ৩৬৫ করেছে না কি? কাগজে দেয়নি তো।

— ধ্যুৎ। এখানে করেছে না কি? পাকিস্তানের বিরুদ্ধে করেছে ১৯৫৩ সালে।

— ও তাই বল।

— আচ্ছা তুমি শৈলেন মান্না — আমেদ খানের খেলা দেখেছ?

— এঁরা ক্রিকেট খেলে?

— না। — গম্ভীর গলায় বাবাই বলে, ওঁরা ব্র্যাডম্যানকে প্র্যাকটিস দিত। — বলেই বাবাই দ্রুত বেরিয়ে যায়।

প্রণতি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বলে, কিছু মনে করবেন না। ও আজকাল ভীষণ দুষ্টু হয়েছে।

— না, না। ওতো খুব ভালো ছেলে, ব্রিলিয়ান্ট! এখনই কত জানে।

মানিকের কাছে খবর পেয়েছিল প্রণতি, পুরবীর মেয়ে হয়েছে। উদয়ন সুস্থ হয়ে আবার স্কুলে ও অন্যান্য কাজে বেরুচ্ছে। যদিও চলাফেরা কিছুটা নিয়ন্ত্রিত। স্বাস্থ্যের জন্যও। নিরাপত্তার জন্যও। দু-এক বার এসে প্রণতির পড়ার খবর নিয়ে গেছে। নতুন চাকরির জন্য শুভেচ্ছা ও প্রশস্তি জানাতেও ভুল হয়নি। বাবাই অভিযোগ করায় বলেছে, তুমি তো এখন বড়ো হয়েছ। আর আমি হয়েছি বুড়ো। এখন থেকে তুই তো গিয়ে আবার খবর নেবে।

বাবাই বলে, গেলেই কি তোমাকে পাওয়া যায়? তিন-চার দিন ফিরে এসেছি। তুমি আমাকে ডারউইনের গল্প বলবে বলেছিলে — দি ভয়েজ অফ বিগল।

— ঠিক আছে — শিগ্‌গিরই একদিন এসে শুনিয়ে যাব।

পরীক্ষার কিছুদিন আগে এক বিকেলে অর্ধেন্দু প্রণতির জন্য সাজেশন এনে বলে, আমার এক বন্ধুকে বলে এ-বছরের ব্যাচের ছাত্রদের কাছ থেকে আনিয়েছি। এগুলো ফলো করলেই দেখবেন পাশ করে গেছেন।

ধন্যবাদ জানিয়ে চা-র আয়োজন করে এলে অর্ধেন্দু ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করে। প্রণতি ধাক্কা দিয়ে দু-পা পিছিয়ে বলে, ছিঃ! কী করছেন! আরও কিছু বলার আগেই বাবাইয়ের ডাক আসে বাইরের গেটের কাছ থেকে — মা —

অর্ধেন্দু চেয়ারে বসে চায়ের কাপ তুলে নেয় ক্ষিপ্র হাতে। বাবাইয়ের সঙ্গে ঢোকে উদয়ন।

অর্ধেন্দু বলে, আরে উদয়নবাবু যে! অনেকদিন দেখা হয়নি আপনার সঙ্গে। কেমন আছেন?

— চলে যাচ্ছে। শৈলেশের ওখানে যাননি বোধহয় বহুদিন।

— হ্যাঁ, যাওয়া হয়নি। তো কেরালার ব্যাপারটা দেখছেন কেমন ঘোরালো হয়ে উঠছে।

— আনফরচুনেট। বামপন্থী পার্টিগুলোও বিরোধিতা করছে কংগ্রেসের সঙ্গে সুর মিলিয়ে।

— সবাই তো মিথ্যে বা ভুল বলতে পারে না। কমিউনিস্ট সরকারের জনবিরোধী কাজকর্ম সবাইকে খেপিয়ে দিয়েছে।

— আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারছি না। তবে এটুকু বলব, কমিউনিস্ট পার্টির উচিত ছিল অন্য বামপন্থীদের সঙ্গে একটা ব্রডবেসড আন্ডারস্ট্যান্ডিং তৈরি করা। আরও সহিষ্ণু ও কুশলী হওয়া। দেখা যাক কী হয়।

বাবাই বলল, মামু নো পলিটিক্স। তুমি শুধু আমার সঙ্গে গল্প বলবে।

অর্ধেন্দুকে বলল, পালকাকু, স্কোয়ারকাট আর লেগ প্লান্সের ডিফারেন্সটা একটু বুঝিয়ে দেবেন?

সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ায় অর্ধেন্দু। প্রণতির মুখ-চাপা আঁচলের নীচের বৈভবে চোখ বুলিয়ে বলে, আজ গল্প করো। অন্য একদিন হবে।

সুরেন অনেকদিন, প্রায় দু'বছর আসেনি। যমুনা মাঝেমাঝেই ওর কথা বলে। প্রণতি বারবার চিঠি লিখেও জবাব পায়নি। যমুনার চাপে সীমাকেও লেখে। সীমাও জবাব দেয়, কোনো খবর পায়নি। ডলি তো খুবই ক্ষুব্ধ সুরেনের নিশ্চুপতার জন্য। পবিত্র লিখেছে, এম.এ. পরীক্ষার পর এসে ঘুরে যাও। আর, এখানে একটা মিশনারি স্কুল খুলেছে। যদি চাও সেখানে তোমার জন্য চেষ্টা করতে পারি। হঠাৎই রেভারেন্ড জোনসের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। অতি চমৎকার মানুষ।

পরীক্ষার দিন পনেরো আগে একদিন স্কুল থেকে বেরিয়ে হঠাৎ বৃষ্টিতে রাস্তায় আটকে পড়ে প্রণতি। একটা ফটোর দোকানের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টি কমার জন্য অপেক্ষা করে। বৃষ্টির ছাঁট এত জোরালো যে রিকশাতে যাওয়া যাবে না। একটা ছবি ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুশ্রী এক তরুণী। মুখটা যেন চেনা। অথচ প্রণতি নিশ্চিত, এই মেয়েটিকে কখনো দেখেনি। তবু ভুলে যাওয়া সুরের মতো খালি মনে হয় ও মুখের আদল ওর চেনা।

— দিদি!

ডাক শুনে মুখ ঘুরিয়ে দেখে সামনে দাঁড়ানো গাড়িতে কানাই। পিছনে রাঘবেন্দ্র রায়। জানালার কাচ নামিয়ে রাঘবেন্দ্র বলে, বাড়ি যাবেন তো, উঠে আসুন।

কানাই সামনের দরজা খুলে দেয়। প্রণতি কানাইয়ের পাশে বসে মুখ ঘুরিয়ে রাঘবেন্দ্রকে বলে অনেক ধন্যবাদ। এ-বৃষ্টি যে কখন ধরবে!

— স্কুল কেমন লাগছে?

— ভালো। খুবই ভালো।

— আপনি তো এম. এ. দিচ্ছেন এবারে। আমরা অ্যাসিস্টেন্ট হেডমিস্ট্রেস নেব। রেজাল্ট বেরুলেই অ্যাপ্লাই করে দেবেন।

সকৃতজ্ঞ চোখে মাথা নাড়ে প্রণতি।

নামিয়ে দিয়ে চলে যাবার আগে রাঘবেন্দ্র বলে, অ্যাপ্লাই করে আমাকে একটা কপি পাঠিয়ে

দেবেন।

ঘরে ঢুকে জামাকাপড় ছেড়ে মা-র ঘরে গিয়ে দেখে যমুনা শুয়ে আছেন। জ্বর।

— কখন থেকে হল?

— দুপুরের পর থেকে।

— বাবাই কোথায়?

— খেলতে গেছে। কী ম্যাচ আছে বলল।

— ওকে বললে না কেন, ডাক্তার ডেকে আনত।

— না,না। ডাক্তার-ফাক্তার লাগবে না। তোর সবেতেই বাড়াবাড়ি। শুয়ে উপোস দিলেই ঠিক হয়ে যাব। ব্যস্ত না হয়ে তুই নিজের কাজ কর। পরীক্ষার আর ক-দিন-ইবা বাকি!

আচমকা অর্ধেন্দু এসে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে বলল, পরীক্ষা তো এসে গেল। সাজেশনগুলো কেমন রপ্ত করেছেন জানতে এলাম। অন্য আর কিছু যদি জানতে চান তো বলুন।

ওর গলার স্বর, শরীরের ভাষা, চোখের চাউনি আজ এমন মিহি, গাঢ় ও তাপময় লাগে প্রণতির যে সব অপ্রিয় স্মৃতি মন থেকে মুছে যায়। সত্যি কিছু জিজ্ঞাসা ছিল। রেফারেন্সের প্রয়োজনও।

অর্ধেন্দু মনস্ক শিক্ষকের মতো সব প্রশ্নের জবাব দেয়। পরীক্ষার আগে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলে। সরল শব্দ, সরল বাক্য গঠনের গুরুত্ব বোঝায়। ওকে আশ্বস্ত করে বলে, কোনো ভয় নেই। পাশ করবেনই। তখন মিষ্টি খাওয়াবেন তো?

ওর কণ্ঠের তারল্যে মৃদু হাসে প্রণতি — নিশ্চয়।

যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎই পিছনে ঘোরে অর্ধেন্দু। এক হাতেরও কম দূরত্বে প্রণতি। কিছু বুঝে উঠতে পারার আগেই, বিড়ালের ইঁদুরছানা ধরার ক্ষিপ্রতায় অর্ধেন্দু দু-হাতে প্রণতিকে জড়িয়ে ওর কমলা-কোয়ার মতো ঠোঁটে মুখ ডোবায়। ডান হাত বুকের খাঁজ বেয়ে উঠে নগ্ন ত্বকের ওপর আঁচড় কাটে।

প্রাথমিক বিহ্বলতা কাটার আগেই মাথার ভিতরে তীব্র সাইরেন বাজে। যেন অন্ধকার ঘরের পর্দা জানলা চুরমার করে আলোর প্লাবন গ্রাস করে। প্রণতি এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে অর্ধেন্দুকে প্রাণপণ শক্তিতে ধাক্কা দিয়ে বলে, নীচ, ইতর! আর কখনো ঢুকবেন না এ-বাড়িতে।

অর্ধেন্দু আরও একবার হাত বাড়িয়ে এগোতে গিয়েও প্রণতির চোখের রক্তাক্ত অঙ্গার দেখে পিছিয়ে আসে। হালকা হাসির সঙ্গে বলে ওটুকু আমার গুরুদক্ষিণা হিসাবেই প্রাপ্য ছিল। না দিয়ে কাজটা ভালো করলে না!

সে রাতে শুয়ে শুয়ে, প্রণতি ভাবে শ্বাপদ মানুষের জঙ্গলে নিজেকে কীভাবে বাঁচাবে! বাবাই এখন আলাদা ঘরে শোয়। একলা নিজের ঘরে আতঙ্ক গলা আঁকড়ায়। আপনা শরীরে হরিণী বৈরী! এই শরীরটার জন্যই এত যন্ত্রণা। শরীরই জীবনের আধার। মনে হয় জীবনে কদর্যতাও দাগ কেটে যায়। প্রাচীন শোকের চিহ্নের মতো।

সকালে ওর মুখ দেখে বাবাই জানতে চায়, মা, কী হয়েছে তোমার? শরীর খারাপ?

ছেলেকে সজোরে বুকে চেপে প্রণতি বলে, না বাবা। কিছু হয়নি। তুই কবে বড়ো হবি? তাড়াতাড়ি বড়ো হ, বাবা।

নির্বিঘ্নে পরীক্ষা দিতে পারে প্রণতি। আশা করে রেজাল্ট ভালোই হবে। ফার্স্ট ক্লাস পাবে

কি পাবে না, এই দোদুল্যসম্ভাবনা ওকে চিন্তিত রাখে। উদয়ন পরীক্ষার খবর নিতে না আসায় বাবাইকে পাঠায় খোঁজ নেবার জন্য। বাবাই এসে যা বলে তা হতবাক করার মতো।

— মা, মামা নেই। ও-বাড়ির লোকেরা বলতে পারল না কবে আসবে বা কোথায় গেছে।

— কবে গেছে বলল?

— দিন পনেরো নাকি হবে।

তার মানে ওর পরীক্ষার মধ্যেই। চিন্তিত প্রণতি বাবাইকে নিয়ে শৈলেশের বাড়িতে আসে। শৈলেশ ছিল না। পূরবী বলল, আমরাও জানি না কোথায় গেছে। এমন কখনো হয় না। প্রতিবার বন্ধুকে বলে যায়।

— শৈলেশবাবু কখন আসবেন?

— এখনি এসে পড়বেন। বসুন। একটু চা খান।

— মেয়ের কী নাম রেখেছেন?

— ডাকি টিটি বলে। ভালোনাম শ্যামলী।

— বাঃ! ভারি চমৎকার।

বছর দেড়েকের টিটিকে কোলে নিয়ে প্রণতির মনে পড়ে বাবাই এমন বয়েসেরই ছিল যেদিন উদয়ন কাঞ্চনগড়ে এসে বলেছিল, এবার পরীক্ষা দিতেই হবে। এই তো, যেন সেদিনের কথা। এখন মনে হচ্ছে যেন অন্য যুগান্তের।

শৈলেশও কোনো তথ্য দিতে পারে না। বলে, আমি সত্যিই অবাক। কেউ কিচ্ছু জানে না কোথায় গেছে, কবে আসবে। স্কুলে শুধু জানিয়েছে ক-দিনের জন্য বাইরে যাচ্ছে।

প্রণতি বলল, আমি ভাবলাম আবার যদি অসুখে পড়ে থাকেন বা কোনো দুর্ঘটনা। যা যাচ্ছিল ওঁর! কোনো খবর পেলে জানাবেন।

উদয়নের মতো মানুষ কি এভাবে হারিয়ে যেতে পারে? না কি স্বেচ্ছাকৃত অন্তর্ধান? তাই-বা কেন হবে? এখানে তো কোনো রাজনৈতিক গোলযোগ চলছে না এখন।

কয়েকদিন পর কানাই খবর নিয়ে আসে উদয়ন প্লেনে করে কলকাতা গেছে। সিট ছিল না। এয়ারলাইনসের লোকেদের হাতে পায়ে ধরে নাকি যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

— তোকে কে বলল? — প্রণতি জানতে চায়।

— মানিকবাবু।

৩১ জুলাই, ১৯৫৯ কেন্দ্রীয়সরকার সংবিধানের ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে কেরালার জনগণের দ্বারা নির্বাচিত নাম্বুদ্রিপাদ সরকারকে বরখাস্ত করে। গণতন্ত্রের এই বিবেকশূন্য হত্যার বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টি দেশ জুড়ে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে। আগরতলায়ও তার ঝাঁজ লাগে। সেই সঙ্গে কংগ্রেসিদের বিকৃত উল্লাসের 'মাইমিতা'ও জমে ওঠে।

স্কুলে অ্যাসিসটেন্ট হেডমিসট্রেসের নিয়োগের নোটিশ দেখে প্রণতি আবেদনপত্র জমা দিয়েছে। একটা কপি কানাইয়ের মাধ্যমে রাঘবেন্দ্রকেও পাঠিয়েছে। প্রয়োজনে নিজে গিয়ে দেখা করতে প্রস্তুত তা-ও জানাতে ভুল হয়নি।

ডলির মেয়ে নীতার পাকা দেখা। যমুনা নাতিকে নিয়ে বিকেলেই চলে গেছেন ওদের বাড়িতে। স্কুল থেকে ফিরে স্নান সেরে ডলিদের বাড়ি যাবার জন্য প্রস্তুতির আয়োজন করে প্রণতি।

— দিদি!

কানাইয়ের গলা শুনে বেরিয়ে আসে প্রণতি। ওর পিছনে রাঘবেন্দ্র রায়। প্রথমদিনের মতোই ধবধবে পরিপাটি ধুতি-পাঞ্জাবি পরা। মসৃণ মুখে কোমল হাসি, যাতে বাৎসল্যের ছোঁয়া আছে বলে ভ্রম হতে পারে।

ব্যস্ত হয়ে প্রণতি হাতজোড় করে বলে, আপনি — নিজে — আমি তো ভাবতেই পারি না। আসুন — আসুন — আপনাকে যে কোথায় বসাই — আসুন এঘরে আসুন।

বলে ছেলের ঘরে রাঘবেন্দ্রকে বসায়। ছোটো ছিমছাম ঘরে একদিকে পড়ার টেবিল-চেয়ার। অন্যধারে বাবাইয়ের বিছানা। আলো জ্বেলে পাখা চালিয়ে দেয় প্রণতি।

কানাই বলে, মা কোথায় দিদি — বাবাইসোনা—

— ওরা ডলিদির বাড়ি গেছে। নীতার বিয়ে ঠিক হয়েছে।

— তুমি গেলে না?

— এই তো স্কুল থেকে এলাম। এবার যাব।

রাঘবেন্দ্র ডাকে — কানাই, শোনো।

কানাই দরজায় দাঁড়িয়ে বলে, স্যার।

— আমাকে এখান থেকে পার্টি অফিসে যেতে হবে। মনে ছিল না। তুই অফিস থেকে আমার ফোলিও ব্যাগটা — চিনিস তো, যেটা রোজ নিয়ে যাস, নিয়ে আয়। সনৎকে বললেই দেবে।

— আচ্ছা।

— তাড়াতাড়ি আসবি কিন্তু।

রাঘবেন্দ্র প্রণতিকে বলল, এত আপনি — আজ্ঞে আমার সহ্য হয় না। তুমি তো আমার অনেক ছোটো। তাই তুমিই বলছি। কিছু মনে করবে না তো?

বিগলিত প্রণতি বলে, না না। মনে করব কেন! আমারই বলা উচিত ছিল আপনাকে।

— ঠিক আছে ঠিক আছে। বসো এখানে, কাজের কথাগুলো সেরে ফেলি। আমার সময় খুব কম।

প্রণতি চেয়ারের উলটোদিকে ছেলের বিছানায় বসে বলল, একটু চা করি আপনার জন্য — প্রথম এলেন —

— ওসব পরে হবে। এখন শোনো, তোমার দরখাস্ত আমি পেয়েছি। তবে মুশকিল হচ্ছে, তোমার চেয়ে বেশি এক্সপিরিয়েন্সও, বিটি পাশ ক্যান্ডিডেটও আছে।

— তাহলে হবে না বলছেন!

— তা বলছি না। হতে পারে। যাতে হয় সেই চেষ্টা করার জন্যই তো আসা। হলে তুমি আমায় কী দেবে? স্কুলের চাকরিটা করে দিয়েছি। তুমি আমাকে কিন্তু কিচ্ছু দাওনি।

— আপনার মতো মানুষকে আমি কী দিতে পারি বলুন। তবু যদি বলেন আমার সাধ্যানুযায়ী —

— তোমার সাধ্যের বাইরে কিছু চাইব আমি কি তেমন গণ্ডার নাকি!

রাঘবেন্দ্রর কণ্ঠস্বর এমন নরম, ধীর লয়ে, খাদে ধরা যে এক পলকের জন্যও প্রণতির মনে কোনো সন্দেহ জাগে না। চোখের মুখের ভাষাও প্রীতিময়। তাই রাঘবেন্দ্র উঠে দাঁড়িয়ে যখন ওর কাঁধ ধরে মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে ও কোনোরূপ বাধা দেবার সুযোগ পায় না। কয়েক

মুহূর্তের জন্য মাথাটা হয়ে যায় শব্দহীন দ্যুতিহীন অন্ধকূপ। নাকে মৃদু সুবাস লাগে। সম্ভবত রাঘবেন্দ্র কোনো সুঘ্রাণ মেখে থাকবে। রাঘবেন্দ্রর দু-হাত খামচে ধরে ওর দুই বুক। অনর্গল লালামাখা চুমু দিয়ে যায় ঠোঁটে-গালে, স্তনসন্ধিতে। রাঘবেন্দ্রর বুকের নীচে ফাঁদে-পড়া জানোয়ারের মতো ছটফট করে প্রণতি। রাঘবেন্দ্র কুশলী খেলোয়াড়। জানে কীভাবে নারীকে দুর্বল করতে হয়। দুর্বল হলেই আয়ত্তে আসবে। ব্লাউজের বোতাম ছিঁড়ে একটা স্তন বের করে চুষতে থাকে রাঘবেন্দ্র। আমচোষার মতো। দু-হাতে ঠেলার চেষ্টা করে প্রণতি। মিনতির স্বরে বলে, প্লিজ আমাকে ছেড়ে দিন। ছেড়ে দিন। আমার জন্য কিছু করতে হবে না আপনার। স্কুলের চাকরিটাও ছেড়ে দেব।

স্তনাগ্র থেকে মুখ তুলে রাঘবেন্দ্র বলে, বোকামি কোরো না। কোনো ভয় নেই তোমার। আমি খুশি থাকলে তোমার অনেক লাভ। তোমাকে আমি কলেজের প্রিন্সিপাল করে দেব।

প্রণতি ভাবে কানাই আসছে না কেন? এতক্ষণে তো এসে পড়তে পারত। ওর জানার কথা নয় যে রাঘবেন্দ্র প্ল্যানিংয়ে ভুল রাখে না।

রাঘবেন্দ্রর হাত প্রণতির হাঁটুর নীচে নামে। শাড়িটা উঠে আসে একটু একটু করে। ভীষণ ক্লান্ত লাগে প্রণতির। রাঘবেন্দ্রর চুম্বন তীব্রতর হয়। পালাক্রমে চুষে যায় দুই বুক। ক্লান্তির সঙ্গে শরীরে ভালোলাগা তৈরি হয়। শরীর চাইছে দীর্ঘ উপবাসের অবসান ঘটুক। মরুর বর্ষণ প্রার্থনা যেন। নিজের ভিতরে চমকে ওঠে প্রণতি। একী হচ্ছে! এমন লাগছে কেন! ওর হাত রাঘবেন্দ্রর পিঠ আবেশে বেষ্টনের জন্য উদ্যত। তখন রাঘবেন্দ্র ডান হাতে ওর শাড়ি উরুর উপরে গুটিয়ে তুলে নিজেকে উন্মোচনের উদ্যোগ করে। প্রণতির মাথায় তীব্র বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়। ও সজোরে লাথি মারে। রাঘবেন্দ্র ছিটকে পড়ে যায় বিছানা থেকে। নিজেকে তুলে ত্রস্ত হরিণীর গতিতে ছুটে নিজের ঘরে ঢুকে খিল দেয়।

মিনিট দশেক পরে গাড়ির শব্দ পেয়ে নিজেকে কিছুটা গুছিয়ে বেরিয়ে আসে প্রণতি। উঁকি মেরে দূর থেকে দেখে রাঘবেন্দ্র নিজেকে গুছিয়ে চেয়ারে বসে আছে। মুখে যন্ত্রণার ছাপ। ওকে দেখে বলল, কমিউনিস্ট ছাড়া বুঝি তোমার মন ওঠে না? ঠিক আছে আমিও দেখব।

কানাই এসে প্রণতিকে দেখে জিজ্ঞাসু চোখে জানতে চায়, কী হয়েছে দিদি?

— কিছু হয়নি। তোর স্যার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। বাড়ি নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দে।

রাঘবেন্দ্র বলল, ব্যাগটা এনেছিস?

— হ্যাঁ। গাড়িতে আছে।

— ঠিক আছে। চল।

উঠে দাঁড়িয়ে রাঘবেন্দ্র বুঝতে পারে প্রণতির পদপল্লবে, অন্তত ওই মুহূর্তে, অলিম্পিয়ান পি.কে. ব্যানার্জির শটের জোর ও নিশানা ছিল। মনে হয় যেন দাঁড়াতে পারবে না। কোঁচার আড়ালে হাত দিয়ে বুঝে নেয় অণ্ডকোষ যথাযথ আছে কি না।

ঘর থেকে বেরিয়ে কানাইয়ের কাঁধে হাতের ভার রেখে বশিষ্ঠ-চোখে প্রণতির দিকে তাকায় রাঘবেন্দ্র। নয়ন-অনলে শিখা থাকলে প্রণতি তক্ষুনি হয়তো খাণ্ডব হয়ে যেত।

বিধ্বস্ত মনের বিরুদ্ধতা ছিলই। শরীরও প্রতিবাদ করছিল। তবু ডলিদের বাড়িতে টেনে হেঁচড়ে নিজেকে নিতেই হয়েছিল প্রণতির। যতই স্বাভাবিক আচরণ করার চেষ্টা করুক, নীতার সঙ্গে হাসি-মশকরায় যোগ দিক, মুখের কারুকার্য ও চোখের তমস-বিভাসা অন্তর্গত মানচিত্রের

ছিন্নদীর্ণ মধুবনি পট প্রকট করেই। উদ্বিগ্ন যমুনা বার বার জিজ্ঞাসা করেন, কী হয়েছে রে?

— বলেছি তো কিছু হয়নি।

— শরীর খারাপ লাগছে?

— ওঃমা! কতবার এক কথা বলব?

— টুনু, যতই বড়ো হ, আর পড়া লেখা শেখ, ভুলে যাস না, আমি তোর মা। তোর মুখচোখ বলছে কিছু হয়েছে।

— ঠিক আছে। বাড়ি তো চলো।

রাত সাড়ে দশটা নাগাদ ওবাড়ি থেকে বেরিয়ে রিকশা চাপে প্রণতি। মার কোলের উপর অনিচ্ছুক বাবাই। ডলি ও নীরদ এগিয়ে দিতে এসে বলে, আমরা কেউ সঙ্গে যাব?

প্রণতি বলে, লাগবে না। এইটুকু তো।

বাড়ির দিকে কিছুটা এগুতেই চোখে পড়ে দাউ দাউ আগুনের শিখা।

যমুনা বলে, কার সর্বনাশ হল রে!

আরো একটু এগোতেই মানুষের চিৎকার শোনা যায়। ছোটাছুটি। ব্যস্ততা। কোলাহল। বাঁশ ফাটার শব্দ।

দূর থেকে দেখেই বিদ্যুতের রেখার মতো দৌড়ে আসে কানাই। প্রণতির চোখ তখনো বোঝার চেষ্টা করে কার বাড়িতে লেগেছে আগুন।

যমুনা বলেন — কী রে কানাই —

আর্তনাদ করে কানাই বলে, মা-ঠাকরুন, সব গেছে আমাদের। বাড়ি আর নাই — বেবাক জ্বলে গেছে।

প্রণতির গলা থেকে শব্দ স্খলিত হয়, আমাদের বাড়ি!

— হ্যাঁ, দিদি। সন্ধেবেলায় ঘর দেখে গেলাম, এখন ছাই।

যমুনা রিকশাতেই অজ্ঞান হয়ে পড়েন। বাবাই দৌড়ে গিয়ে দেখে, এসে বলে, মা, আমাদের বাড়িটা জ্বলছে। শ্মশানের মতো।

রিকশা থেকে নেমে প্রণতি দৃঢ়ভাবে ছেলের হাত ধরে।

চোখের সামনে জ্বলছে বারো বছরের সংগ্রামের মিনার ও জীবনচর্যার যাদুঘর।

— (ত্রিপুরাপর্ব সমাপ্ত)

উত্তরা

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

উত্তরা

প্রযোজনা	:	বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত প্রোডাক্‌শন্‌স্‌
কার্যনির্বাহী প্রযোজক	:	দুলাল রায়
মূল কাহিনী	:	সমরেশ বসু
চিত্রগ্রহণ	:	অসীম বোস
শব্দগ্রহণ	:	অনুপ মুখোপাধ্যায়
শিল্প নির্দেশনা	:	অশোক বোস
পোশাক পরিকল্পনা	:	কুন্তলা দাশগুপ্ত
প্রধান সহকারী	:	অরুণ গুহঠাকুরতা
সম্পাদনা	:	রবিরঞ্জন মৈত্র
সঙ্গীত প্রয়োগ	:	বিশ্বদেব দাশগুপ্ত
কণ্ঠসংগীত	:	অভিজিৎ বসু ও প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়
অভিনয়ে	:	জয়া শীল, তাপস পাল, শঙ্কর চক্রবর্তী, আসাদ, সিন্ধুবালা দেবী, সৌরভ দাস, তাপস অধিকারী, গৌতম ওয়ারসি, মাসুদ আখতার, সুব্রত দত্ত ও তৎসহ অনেকে।

What Critics Say

"UTTARA has the power of stunning you with the sheer beauty of its imagery and the stark brutality of its story. Truly, Buddhadeb is the high priest of the Indian avant garde today."

TIMES OF INDIA April 23, 2000

"Easily one of the finest of 20th century Indian Cinema, UTTARA will forever be remembered..."

THE WEEK Jan 30, 2000

"The images in UTTARA could well have been from the palette of French Impressionist masters from the Barizon school. The still and silent beauty lingers on...The juxtaposition of good and evil, beauty and ugliness, sloth and power is beautifully portrayed."

THE HINDUSTAN TIMES May 14, 2000

"This is a film of a great poetic beauty - of strange surrealism which combines with the harsh realities of communal violence and discrimination today. It is a film of immediate relevance to us. And yet it makes its point without being polemical, without dealing with political issues — as though they were a part from the texture and fabric of life."

INDIA INTERNATIONAL CENTRE QUARTERLY, Monsoon 2000

We consider UTTARA really very strong, very poetic and visually stunning, the best Indian film in years.

Alberto Barbera, Director, International Film Festival of Venice, 2000

The *Wrestlers* is a major new film from India by one of its cinematic masters...this tragic beautifully made film is both politically urgent and a lasting cinematic experience.

Noah Cowan, from ***The Masters*** Section, Toronto International Film Festival Book, 2000

It [UTTARA] is a great film, a stroke of a master filmmaker.

Gian Luigi Rondi, IL TEMPO, September 01, 2000

Buddhadeb Dasgupta's UTTARA is a poetry on celluloid. It has a unique cinematic style... Dasgupta is the only hope of Indian Cinema after the death of Satyajit Ray.

Roberto Pugliese, IL GAZETTINO

In the startling film, *The Wrestlers*, Buddhadeb Dasgupta takes on the weighty issue of religious and ethnic intolerance in rural India by way of astonishing pictorial compositions and a flair for the surreal. What makes the film truly remarkable is neither its subject matter nor its formalist qualities, but how Dasgupta creates a distinctive "Indian" cinematic technique. Dasgupta melds the symbolic aspects of folktales and myths - with their heightened emotions and symbolic characters — to a filmic practice owing much to the surreal visions of Mizoguchi and the experiments of Dziga Vertov.

Bill Evans, Cinema Scope, Fall 2000

A superb Indian fable on dream and reality. 'UTTARA', a prized film screened in Venice International Film Festival, is extremely beautiful: the pure beauty of the scenery around, the innocence of the people, the manner by which the enchantment of dreams continually mingles with the reality.

Franscoise Maupin, Le Figaocope, 13.6.01

Buddhadeb Dasgupta employs a unique strategy of 'magic hour' shooting (those brief periods after dawn and before sunset), as well as precisely matched reverse angle shots and unusually deep focus for his farming and blocking. The cumulative result is one of formal unease, a world where great natural beauty and deadly human menace coexist in equal measure.

Eddie Cockrell, Philadelphia Festival of World Cinema-2001

উত্তরা

দৃশ্য-১/ সূর্যাস্তের পরের সময়

সূর্য সবে ডুবেছে। সন্ধ্যা নামেনি। সামান্য আলোর আভা তখনও আছে। কিছু ফাঁকা একটি জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত একটি প্রাচীন গাছের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে ক্যামেরা। কাছে দূরে ঝরে পড়ছে শুকনো পাতা। পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। সঙ্গে টাইটেল মিউজিক।

কাট-টু

আকাশে সূর্যাস্তের রং তখনও যায়নি। ধূ-ধূ এক প্রান্তরের মাঝখানে কালো পিচের দিগন্ত বিস্তৃত রাস্তা। সেখান থেকে বিন্দুর মতো হেডলাইট জ্বালিয়ে এগিয়ে আসছে একটা জিপ।

জিপের ভেতর চালক সমেত তিনজন লোক। চালক একটু শীর্ণকায়। তার পাশের জন মোটা ও থলথলে চেহারার। মাথার অনেকটা জুড়ে টাক। পেছনে যে বসে আছে সে বেশ লম্বা, মাথা বেয়ে চুল ঘাড়ে এসে পড়েছে। অনবরত শিস দিয়ে চলেছে সে। এ ছাড়া শুধুই গাড়ি চলার একঘেয়ে আওয়াজ।

চালকের পাশে বসে থাকা লোকটি একটা কাচের জলের বোতল মুখের কাছে এনে ঢক ঢক করে জল খেতে থাকে। বোতলের জল ফুরিয়ে যায়। লোকটি কাচের বোতল জানলা দিয়ে বাইরে ছুড়ে দেয়। বোতলটি সশব্দে ভেঙে টুকরো হয়ে ছড়িয়ে যায়। গরুর হাম্বা রব। দূরে প্রান্তরে একটা গাছ দেখা যায়। আবার হাম্বা রব। নারীকণ্ঠে শোনা যায় গরু তাড়িয়ে নিয়ে যাবার শব্দ। সঙ্গে জিপের আওয়াজ।

কাট-টু

জিপটি সাঁ করে সামনে থেকে দূরে চলে যেতে থাকে।

কাট-টু

আবছাভাবে একটি মেয়ের মুখ দেখা যায়।

দৃশ্য-২ / *উষার সময়*

সবে আলো দেখা দিচ্ছে। উঁচু ও বিস্তীর্ণ এক ঢালের প্রান্তর, ঢালের ওপর একা একটি গাছ, গাছের ওপারে সূর্য ওঠার আগের আকাশ। শুধু আস্তে আস্তে সোঁ-সোঁ করে হাওয়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। অচেনা, অন্য এক পৃথিবীর সুর। যেন ভেসে আসছে অনেক আলোকবর্ষ পেরিয়ে।

দেখা যায় ঢালের ওপার থেকে উঠে আসছে একদল বামনাকৃতি মানুষ। যেন স্বাভাবিকের চেয়ে সামান্য আস্তে তাদের হেঁটে আসা। ক্যামেরা পেরিয়ে বামনের দল এগিয়ে যেতে থাকে। দিন শুরুর নানান কাজে বেরোচ্ছে তারা। কারও মাথায় টোকা, সঙ্গে জোড়া বলদ ও কাঁধে মই-লাঙল, কারও কাঁধে কোদাল, কারও হাতে কুড়াল, কারও হাতে রং-এর বালতি ও ব্রাশ, কারও সঙ্গে খেলা দেখানোর বাঁদর। সবার শেষে আসছে যে, তার শরীরে রেলগার্ডের পোশাক, মাথায় টুপি, গলায় ঝোলানো হুইস্‌ল।

কাট-টু

একটা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে নিঃশব্দে চলেছে বামনের দলটি। মাঝে মাঝে শুধু তাদের পায়ে শুকনো পাতা মাড়িয়ে যাওয়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। দলটির শেষে সেই বামন রেলগার্ড। তার মুখ। এগিয়ে আসছে সে। হঠাৎ তার এগিয়ে আসার পথের ধারে বড় একটা গাছের গায়ে জঙ্গলের মধ্য থেকে একটা ছোরা পলকে ছুটে এসে সামান্য সাঁ শব্দ করে বিঁধে যায়। সেই শব্দে দাঁড়িয়ে পড়ে বামন গার্ড। তাকায় ছোরাবিদ্ধ গাছটার দিকে। ছোরাটা কাঁপছে।

একটু দূর থেকে মুখে আঙুল দিয়ে শিস দেওয়ার শব্দ শোনা যায়। বামন ফিরে তাকায়।

কাট-টু

জঙ্গলের মধ্যে আগে গাড়ির ভেতর দেখা সেই তিনজন লোককে দেখা যায়। একটু মোটা ও থলথলে চেহারার লোকটি একটা গাছে পিঠ দিয়ে টান টান দাঁড়িয়ে আছে। গাছের গায়ে তার শরীর ঘেঁষে বিঁধে আছে কয়েকটি ছোরা। উলটোদিকে, একটু দূরে শীর্ণকায় লোকটির হাতে কয়েকটি ছোরা। সে তাক করে একটা ছোরা মোটা ও থলথলে চেহারা, লোকটার মাথার পাশ দিয়ে গাছে ছোড়ে। সশব্দে ছোরাটা গাছে বেঁধে। লোকটি নির্বিকার। তৃতীয়জন, যে বেশ লম্বা ও যার মাথা বেয়ে চুল ঘাড়ে এসে পড়েছে, একবার শিস দেয়। মাঝেমাঝে পাখির ডাক শোনা যায়।

তারা সবাই এই বামনের দলটিকে বিস্ময় নিয়ে দেখছে। এদের পেছনে একটু দূরের জঙ্গলের মেঠো রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটা জিপ।

রেলগার্ড বামনটি অবাক হয়ে এদের দিকে তাকায়।

যে লোকটির হাতে কয়েকটি ছোরা ধরা, সে বামনকে লক্ষ করে ঝুঁকে 'উস' শব্দ করে দু'হাত দিয়ে তালি মারে পাখি উড়িয়ে দেবার ভঙ্গিতে।

বামন মুখ ফিরিয়ে নেয়। যেন কিছুই হয়নি এমন তার মুখের ভাব। তারপর আগের মতোই এগিয়ে যেতে যেতে ফ্রেম-আউট হয়ে গেলে ক্যামেরা সরে যায় আরও দূরে।

দৃশ্য-৩ / *সকাল*

বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে আঁকাবাঁকা ধুলোমাটির সরু মেঠো রাস্তা। দূরে আবছা পাহাড়ের রেখা দেখা যাচ্ছে। ধুলো উড়িয়ে একটা পুরনো ঝরঝরে যাত্রী-বাসকে আসতে দেখা যায়। বাসের ভেতর বসে আছে সেই বামন গার্ড। যাত্রীরা সবাই সাধারণ স্থানীয় মানুষ।

পেছন থেকে দেখা যায় বাসটিকে, এগিয়ে চলেছে দূরে।

একই রাস্তা দিয়ে ক্যামেরার দিকে এগিয়ে আসছে একটি সাইকেল। সাইকেল চালাচ্ছে মাঝ বয়সী একজন মানুষ। ধূসর রং-এর হাফ-হাতা শার্ট, হালকা কালো রং-এর প্যান্ট। গলায় ক্লারিকাল কলার। গলায় ঝুলছে ছোট একটি কাঠের তৈরি 'ব্ল্যাক বা ব্রাউন' ক্রুশ। গালে অল্প পাকা দাড়ি। সৌম্য, প্রশান্ত ও ক্ষমাশীল মুখে লুকিয়ে আছে হাসি। সাইকেলের সামনে ঝুলছে ছোট একটা সবজির ব্যাগ, একটা এনামেলের দুধের বাসন। সাইকেলের পেছনে বেশ বড়

একটা কুমড়ো, কুমড়োর পিছনে বসে আছে ছ-সাত বছরের একটি বাচ্চা ছেলে, শ্যামলা রং ও রোগা তার শরীর, মায়াময় তার মুখ এবং গভীর ও আয়ত তার চোখ। দু'হাত দিয়ে সে জড়িয়ে ধরে আছে সাইকেল চালকের পেট।

ক্যামেরা পেরিয়ে চলে যায় তারা। দূরে, বাসটিকে দেখা যায় রাস্তা দিয়ে নীচে নেমে মিলিয়ে যেতে।

দৃশ্য-৪ / *সকাল*

প্রান্তরে দেখা যায় হঠাৎ কেউ তাদের পরনের কাপড় শূন্যে ছুড়ে দেয়। সেগুলো ভাসতে ভাসতে এক এক করে মাটিতে নেমে আসে। এবারে দু'জন লোক পেছনের অপেক্ষাকৃত নিচু জমি পেরিয়ে দৌড়তে দৌড়তে ক্যামেরার মুখোমুখি হয়।

তারা কুস্তি লড়তে শুরু করে। একজনের নাম নিমাই, অন্যজন বলরাম। খালি গা দু'জনের। পরনে লাল রং-এর ল্যাঙট। দু'জনের শরীরেই আখড়ার মাটি মাখা। একজন অন্যজনকে মাটিতে ফেলে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার শরীরের ওপর। দু'জনের মুখ দিয়েই নানান ধরনের আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। বয়স তিরিশ বত্রিশের বেশি নয়। কুস্তির মাঝখানে তারা হঠাৎ বুঝতে পারে ট্রেন আসছে। বলরাম নিমাইকে বলে —

বলরাম : মারাইনছে রে নিমাই, টেরেন আইসে।

জামাকাপড় বগলে নিয়ে তারা ছুটতে শুরু করে।

কাট-টু

দূরে সেই ট্রেনটিকে আসতে দেখা যায়। ট্রেনের হুইস্‌ল শোনা যায়।

কাট-টু

লোকদুটি ছুটতে ছুটতে জামাকাপড় বগলে নিয়ে রেললাইন পেরিয়ে স্টেশনের গুমটিঘরের দিকে ছোটে। ঘরের বাইরে থেকে দেখা যায় নিমাই ঘরের ভেতর থেকে সিগনাল দেবার ফ্ল্যাগ তুলে নিচ্ছে। আবার ট্রেনের হুইস্‌ল শোনা যায়।

কাট-টু

ট্রেন কাছে এসে পড়ে।

কাট-টু

একটি নির্জন স্টেশনে সবুজ ফ্ল্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে আছে সেই কুস্তি করতে থাকা দু'জনের একজন নিমাই। বলরাম গেট ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

কাট-টু

ট্রেনের গার্ডের কামরায় সেই বামন গার্ডকে দেখা যায়। বামন হাসে তাদের দিকে তাকিয়ে। লোকদুটির মুখও হাসি হাসি।

কাট-টু

ট্রেন যাওয়ার জন্য বন্ধ থাকা একদিকের রেলগেটের ওপারে ধীরে ধীরে সাইকেল থেকে এসে নামে একটু আগে দেখা সেই সাইকেল আরোহী, স্থানীয় চার্চের ধর্মযাজক পাস্টার। দেখা যায় সাইকেলে কুমড়োর পিছনে বসে আছে আমাদের আগের দেখা সেই ছোট ছেলেটি। ছেলেটি পিতৃ-মাতৃহীন। নাম ম্যাথু।

পাস্টার : কী বলরাম গেট খোলো?
নিমাই : একটু দাঁড়ান পাদরিবাবা, একটা মালগাড়ি যাবে।
পাস্টার : অ।

দূর থেকে মালগাড়ি এগিয়ে আসে। ধোঁয়ায় পর্দা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। মালগাড়ি ধীরে ধীরে দূরে চলে যেতে থাকে। দেখা যায় (ব্যাক টু ক্যামেরা) গেটের সামনে বলরাম, পাস্টার ও সাইকেলে কুমড়োর পেছনে বসে থাকা ম্যাথুকে। বলরাম বামন গার্ডের দিকে হাত নাড়ে। মালগাড়ি চলে গেলে বলরাম গেট খোলে।

গেট পেরোতে পেরোতে পাস্টার বলরামকে বলে —

পাস্টার : ও বলরাম, ওষুধটা খেয়েছিলে?
বলরাম : দু'পুরিয়া খাইছি। পেট ফাঁপাটা এখন কম।
পাস্টার : ওষুধটা যেন বন্ধ করে দিও না। ফুরিয়ে গেলে নিয়ে এসো।
নিমাই : পাদরিবাবা, সক্কালবেলা হাট থেকে এত সব তরিতরকারি কিনে আইনলেন, এত খাবে কে?
পাস্টার : দেশে খাবার লোকের কী অভাব আছে নিমাই!

পাস্টার সাইকেল চালিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। ম্যাথু, নিমাই আর বলরামের দিকে তাকিয়ে তাদের উদ্দেশ্য করে বলে —

ম্যাথু : আমিও কুস্তি শিখব।

বলরাম আর নিমাই হাসে। ম্যাথু হাত নাড়ে বলরামদের দিকে তাকিয়ে। অল্প হাসি সেই মুখে।

কাট-টু

ফাঁকা একটা প্রান্তরের মেঠো রাস্তা দিয়ে পাস্টার আর ম্যাথুকে দেখা যায় সাইকেলে করে যেতে। পথে এক সাইকেল আরোহী পাস্টারকে বলে —

সাইকেল আরোহী : নমস্কার, পাদরিবাবা।

নমস্কার জানিয়ে লোকটি পাস্টারকে পেরিয়ে চলে যায়।

দূরে দেখা যায় পাস্টার ও ম্যাথুকে সাইকেলের ওপরে। সাইকেল থামে। ম্যাথু নামে। কালো গ্রিলের ফাঁক দিয়ে ক্লোজ শটে দেখা যায় পাস্টারকে। ম্যাথুকে বাজারের থলি দেখিয়ে বলে—

পাস্টার : ম্যাথু এগুলো নিয়ে যাস।

দৃশ্য-৫ / *দিন*

দূর থেকে দেখা যায় একটি ছোট গ্রামীণ চার্চের অভ্যন্তর। শোনা যায় ঢং ঢং ঢং ঢং ঘণ্টার শব্দ। পাদরির বেশ পরা পাস্টারকে দেখা যায়। সে প্রথমে যিশুর সামনে ঝুঁকে অভিবাদন করে। তারপর ঘুরে হাতের ইশারায় সবাইকে বসতে বলে। চার্চের ভেতরে রাখা কাঠের বেঞ্চের উপর সবাই ধীরে ধীরে বসে। দেখা যায় গ্রামের কয়েকজন সাধারণ নারী পুরুষ। ক্রমাগত ঢং ঢং ধ্বনি শোনা যায়।

কাট-টু

চার্চের সামনে গাছের ওপর বাঁধা একটি চার্চ-বেল। বেলের মাথায় একটা দড়ি বাঁধা। গাছের নীচে বসে সেই দড়ি ধরে টানছে ম্যাথু। ম্যাথুর মুখ এই কাজ করতে পেরে উদ্ভাসিত। ধীরে ধীরে গান ভেসে আসে — কালোজলে কুচলাতলে ডুবল সনাতন...

কাট-টু

ম্যাথু বেলের দড়ি ধরে টানতে টানতে ওদের দিকে তাকায়। অন্যমনস্ক হয়। তার হাত থেকে বেলের দড়ি খসে যায়। বেলের শব্দ থেমে যায়।

কাট-টু

বড় বড় গাছের পাশে শুকনো পাতার ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে নাচতে নাচতে এগিয়ে যাচ্ছে একটি নাটুয়ার দল। কয়েকজনের মুখে মুখোশ আঁটা, অন্য দু'তিনজন বিভিন্ন ধরনের ঢোল আর বাঁশি বাজাচ্ছে। অদ্ভুত সুন্দর তাদের নাচের ভঙ্গি এবং তার সঙ্গে গাইতে থাকা সেই গান। যেন স্বর্গীয় কোনও কিছু। এবারে গানটা স্পষ্ট হয়।

গান

কালোজলে কুচলাতলে ডুবল সনাতন
আজ সারা না কাল সারা না পাই যে দরশন
লদী ধারের চাষে বধু মিছাই কর আশ
ঝিরিহিরি বাঁকা লদী বইছে বারোমাস।
চিংড়িমাছের ভিতর কড়া তায়ে ঢালেছি ঘি
নিজের হাতে ভাব ছাড়েছি ভাবলে হবে কি
চালরচুলা লম্বা কাঁচা খুলি খুলি যায়
দেখি শ্যামের বিবেচনা কার ঘরে সামায়।
মেদ্‌নীপুরের আয়না চিরন বাঁকুড়ার ওই ফিতা
যতন করে বাঁধলি মাথা তাও যে বাঁকা সিঁতা
পেছপাড়িয়া রাজকুমারী গলায় চন্দ্রহার
দিনে দিনে বাড়ছে তোমার চুলেরই বাহার
কলি কলি ফুল ফুটেছে লীল কালো আর সাদা
কোন ফুলেতে কিষ্ট আছেন কোন ফুলেতে রাধা।

কালোজলে কুচলাতলে ডুবল সনাতন
আজ সারা না কাল সারা না পাই যে দরশন।

কাট-টু

(ব্যাক টু ক্যামেরা) ম্যাথু ছুটছে কয়েকটা গাছের সারির মধ্য দিয়ে। ম্যাথু দাঁড়ায়। এবার সামনে থেকে ম্যাথুকে দেখা যায়। গান চলছে।

কাট-টু

মুখোশ পরা নাটুয়ার দলটি যাচ্ছে। গান চলছে।

কাট-টু

ম্যাথু একটা গাছের আড়াল থেকে দেখতে থাকে। গান চলছে।

কাট-টু

মুখোশ পরা নাটুয়ারা তার দিকে তাকায়। এবার গান ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়।

কাট-টু

চার্চের ভেতর পাস্টার বাইবেল পাঠ করে চলে।

পাস্টার : আমি সমস্তদিন তোমার অপেক্ষায় থাকি। সদাপ্রভু তোমার করুণা ও দয়া স্মরণ করি, কেন না উভয়েই অনাদি। আমার যৌবনের পাপ ও আমার অধর্মসকল স্মরণ করিও না। সদাপ্রভু তোমার মঙ্গলভাবের অনুরোধে, তোমার দয়ানুসারে আমাকে স্মরণ কর।

চারজন লোক নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া চাওয়ি করে ধীরে ধীরে বেঞ্চ থেকে ওঠে। পাস্টারের বাণী চলতে থাকে —

পাস্টার : সদাপ্রভু মঙ্গলময় ও সরল। (পাস্টার লোকদের বেরিয়ে যেতে দেখে অল্প থামে। তারপর আবার বলা শুরু করে।) এইজন্য তিনি পাপীদিগকে (এবার চারজন চার্চ থেকে বেরিয়ে যায়। পাস্টার লক্ষ করে। আবার পড়তে থাকে) পথ দেখান। তিনি নম্রদিগকে ন্যায়বিচারের পথে চালান।

কাট-টু

চারজন লোক চার্চের বাইরে রাখা খাবার জন্য কাঠের টেবিলে ধীরে ধীরে এসে বসে। ম্যাথু এসে তাঁদের খাবার দেয়। পাখির শিস শোনা যায়। সবাই একবার চার্চের দিকে ঘুরে তাকায়। খেতে শুরু করে। দেখা যায় পাস্টার খিচুড়ির বালতি নিয়ে এগিয়ে আসছে। ম্যাথু ও পাস্টার তাদের পরিবেশন করছে। পাস্টার তাদের বলে—

পাস্টার : কি মাইকেল, (খিচুড়ি দেয়) স্যামুয়েল, ঠিকমতো খাচ্ছ তো? (সবাই খেতে খেতে সম্মতিসূচক অনুচ্চ শব্দ করে) পেটভরে খাও।

ক্লোজ শটে সবাইকে খেতে দেখা যায়। বোঝা যায় সবাই খুব ক্ষুধার্ত।

কাট-টু

দেখা যায় চারজন গাছের নীচে বসে আছে। বোঝা যাচ্ছে তাদের খাওয়াদাওয়া হয়ে গেছে।

মাইকেল : পিটারকাকা, চলেন আগাই।
পিটার : দাঁড়া, টুকুস জিরাই লি।

পিটারের পাশে বসে থাকা স্যামুয়েল বলে —

স্যামুয়েল : হ্যাঁরে মাইকেল, টমাসের ব্যাটাটার কনো কাম হল?
মাইকেল : না রে, আজ তিনমাস কারও কনো কাম নাই। পাদরিবাবা খেইতে না দিলে ছেইলেপুলে নিয়া মরতাম। আর ভাইবছি সব ছাড়িছুড়ে দে উই টাউন দিকেই চলি যাব।
পিটার : মামার বেটাটাকে বইলেছি...পাদরিবাবার ঠিনে আইসে খিস্টান হইয়ে যা। দু'বেলা খাতি তো পাবি...আগে প্যাট... তা বাদে ধম্মোকম্মো।
চতুর্থজন : পরশুদিন টমাসকাকার ঘরে আইসে কিছু লক নকি ধমকাঁইয়ে গেইছে।
স্যামুয়েল : হুঁ।
পিটার : রবার্টের ঘরকেও ওরা গেইছিল। হামাদের শালা গু-মুতের পারা হাল। আইতেও গেলি, যাতেও গেলি। ভাবছি ইঠিন ছেড়ে চইলেই যাব।
স্যামুয়েল : কোথা যাবি?
চতুর্থজন : ওই আমরিকা ন কি! উঠিনে সবাই খিস্টান। আমরাও খিস্টান। একই জাত। উঠিনে মানুষ নাকি গোটাদিন ক্যাবল খায়। আমরাও খাবো।
পিটার : নামটা যেন চিনহা চিনহা লাইগছে। জেইগাটা কুথায় রে?
চতুর্থজন : আছেরে বাপ! আমি কি গেইছি নকি! প্রথমে কইলকাতা, উঠিনে লে বিজলি টেরেন, তা বাদে সমুদ্র পাইরাইন চলা পথ।

দলটি দূরে চলে যেতে থাকে। মাইকেলের কথা শোনা যায়।

মাইকেল : দমতক খাইয়েছি।

মুখে আওয়াজ করে। বোঝা যায় প্রত্যেকেরই পেট ভরতি।

দৃশ্য-৬ / *শেষ বিকেল*

কুস্তির আখড়ায় নিমাই ও বলরাম কুস্তি করছে। আগের মতোই খালি গা ও পরনে লাল ল্যাঙট। দু'জনের শরীরেই আখড়ার মাটি মাখা। দু'জনে মুখে আওয়াজ করে কুস্তি লড়তে থাকে।

নিমাই একসময় 'আঃ' বলে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে মাটিতে। হাতদুটো বুকের কাছে মাটিতে রাখা। হাতের আঙুল মাটি মুঠো করে ধরতে চায়। বলরামও নিমাইকে দেখে আর একদিকে শুয়ে পড়ে একই রকম 'আঃ' শব্দ করে। সে চিত হয়ে শোয়।

নিমাই বলরামের গালের মাটি হাত দিয়ে ঝেড়ে দিতে দিতে বলে—

নিমাই : এবারে মাটিটা খুব লরম হয়েছে রে। কোপাই কোপাই লরম করে দিইচি। মনে হচ্ছে যেন মেইয়েমানুষের শরীলের ওপর শুইয়ে আছি। আঃ।

বলরাম : আমারও তেমন তেমন লাগছে।

নিমাই বলরামের শোয়ানো হাতের ওপর হাত রাখে। বলে —

নিমাই : শুয়েছিস কখনও মেইয়েমানুষের সঙ্গে?

বলরাম : না। তবে আন্‌জাদ কইরতে পারি। তুই?

নিমাই একটু চুপ করে থাকে। অরপর বলে —

নিমাই : শোবার কথা ছিল, শোওয়া হয়নি!

গান ভেসে আসে — জাকর ঘুঘি তাকর মাছ...

গান ও সংলাপ একসঙ্গে চলতে থাকে।

বলরাম আগ্রহ নিয়ে উঠে বসে। বলে —

বলরাম : সত্যি?

নিমাই হ্যাঁ-এর ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে।

বলরাম : বলিস নাই তো কোনোদিন?

নিমাই : সে অনেক কথা। আর একদিন বইলবো।

কাট-টু

মুখোশ পরা, ঢোল ও বাঁশি বাজানো নাটুয়ার দলটিকে গান গাইতে গাইতে, নাচতে নাচতে যেতে দেখা যায়। গান ক্রমশ স্পষ্ট হয়।

গান

যাকর ঘুঘি তাকর মাছ, মিছাই কর সাত পাঁচ
রিঝ ফুর্তি কর মনের সুখে
মন রে বেঁহুশ হলে ঘেরে লিবেক দুখে।
ভালো ঘাটের জল লিবি ভালো করে ছাঁক্যে খাবি
বেঘাট গেলে কাট্যে দিবেক জঁকে।
গদাধর তাই বলে ভেবে, ঘুমায়ো না জাগ্যে রবে
(এ ভাই) ঘুমায় গেলে লুট্যে লিবেক চোরে।

কাট-টু

বলরাম আর নিমাই তাকিয়ে দেখে।

কাট-টু

দূরে প্রাচীন কয়েকটি গাছ। গাছ থেকে ঝরে পড়ছে শুকনো পাতা। পাতার ওপর দিয়ে নাচতে নাচতে, ঢোল আর বাঁশি বাজাতে বাজাতে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে মুখোশ আঁটা নাটুয়ার দলটি।

কাট-টু

একটা ফাঁকা জায়গা দিয়ে হেঁটে আসছে বলরাম ও নিমাই। বলরাম বলে—

বলরাম : তুই আগে কোন টিশনে ছিলিস?

নিমাই : বইলেছিলাম তো, চাকুমদা।

বলরাম : চাকুমদা। চাকুমদা, চাকুমদা। বড় অদ্ভুত নাম।

দেখা যায় দু'জনে রেললাইনের দু'ধারে বসে।

নিমাই : জায়গাটা ছিল আরও অদ্ভুত। একাই গেটম্যান, একাই সিগনালম্যান। ধারেকাছে কয়েক মাইলের মধ্যে শুনশান, কেউ কোথাও নাই। মাঝে মাঝে যখন কথা বইলতে ইচ্ছে হইতো রেল লাইনের সঙ্গে কথা বইলতাম!

বলরাম : কী বইলতিস?

নিমাই : বইলতাম, কেমন আছো গো তোমরা রেল লাইন? উয়ারা বইলতো, ভালো নাই নিমাইদা। আমি বইলতাম, ভালো নাই কিসের জইন্য? উয়ারা বইলতো, আমরা দুইজনে পাশাপাশি আছি আজ কত বচ্ছর, কিন্তু কেউ কাউকে ধইরতে পারি না, ছুঁইতে পারি না।

একটু থেমে নিমাই বলে —

নিমাই : লাইন দুইটার একটা ছিল মাদি, অন্যটা মদ্দা।

বলরাম হাসে। বলে —

বলরাম : তুই শালা পাগলের পাগল।

নিমাই : জাইগাটা বড় একা ছিল রে। এখানে তো তবু তুই আছিস।

বলরাম : এ জায়গাটাও তাই। এখানে আসার পর চার বছর আমিও একা ছিলাম। হুট করে আবার একদিন কোথায় টান্‌স্‌ফার কইরে দিবে কে জানে!

নিমাই : তোর সঙ্গে আর হয়তো দেখাই হবেক নাই। একটু থেমে বলে — আজ সক্কালবেলা সেই স্বপ্নটা আবার দেইখলাম, বুঝলি। আমার গার্ডের প্রমোশন হয়েছে। গায়ে গার্ডের জামা, হাতে

ফ্যাল্যাগ। একটা পেসেন্‌জার টেরেন নিয়ে যাচ্ছি আর যাচ্ছি, ধানবাদ আসানসোল দুগ্গাপুর বদ্ধমান...

বলরাম : আগে আমিও এই স্বপ্নটা দেইখতাম।

নিমাই : একটা জিনিস খেয়াল কইরেছিস বলরাম?

বলরাম : কী?

নিমাই : আমরা দু'জনে একসঙ্গে আছি এতদিন ধইরে, কেউ কাউকে জানি না, চিনি না, এতদিন একসঙ্গে কাজ কইরছি, কুস্তি লইড়ছি...

বলরাম : এই এক জায়গায় তোর সঙ্গে আমার ভালো মিইলেছে, তোরও কুস্তির নেশা, আমারও তাই। মাঝে মাঝে মনে হয় এই পৃথিবীটা শালা একটা বিরাট কুস্তির আখড়া। কুস্তি ছাড়া আর কিছু নাই। আমি তোর সঙ্গে লইড়ছি, তুই লইড়ছিস পাদরিবাবার সঙ্গে, পাদরিবাবার বাচ্চা ছেইলেটা লইড়ছে বামন গার্ডটার সঙ্গে, আর হাতিমপুরে আমার পিসি লইড়ছে পাশের ঘরের কানাইকাকার সঙ্গে... ওঃ হোঃ হোঃ...।

বলরাম হাসতে শুরু করে দেয়। হাসতে থাকে নিমাইও।

দৃশ্য-৭ / *দিনশেষের সময়*

হাতিমপুরে পিসির বাড়ি। লম্বা বারান্দায় একটা গরু জাবনা খাচ্ছে। বাছুরটা এগিয়ে আসে। বাঁটে মুখ দেয়। ঘরের ভেতর থেকে কানাই-এর (বলরাম বর্ণিত কানাইকাকা) কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

কানাই : চিঠি যে লিখবে পিসি ঠিকানা জানো?

পিসি : জানি, জানি।

কানাই : তালে আগে ঠিকানা বলো।

পিসি : বলরাম সর্দার। দেউলপুর টেশন। বীরভূম।

কাট-টু

একটা দেওয়ালে বেশ কিছু ছবি টাঙানো। ঠাকুর দেবতার পাশে একজন বিদেশিনীর ছবি, তার পাশে গদা কাঁধে হনুমান, পাশে মরা বাঘের পিঠে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বন্দুক হাতে রাজা, রাজার পাশে রানি, রানির পাশে লন্ডনের বিগ বেনের ছবি। এদেরই মধ্যে বলরামেরও একটা ছবি ঝুলছে। ক্যামেরা এসবের ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে নীচে নেমে আসে। দেখা যায় একজন বুড়ির চিঠি লিখে দিচ্ছে মাঝবয়সী একজন লোক। শটের শুরু থেকে তাদের গলা শোনা যায়। হঠাৎ ঘরের মধ্যে গরু ঢুকে পড়তে দেখা যায়। বাইরে থেকে বাছুরের ডাক শোনা যায়।

পিসি : এই দ্যাখো, আরে যাঃ।

গরুটি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

কানাই : বীরভূম। হ্যাঁ কী বলছিলে, বলো।

পিসি : আচ্ছা কানাই, ক'দিন লাগবে রে চিঠি যেতে?

কানাই : হপ্তাখানেক। মাসভরও লাগতে পারে। চিঠির কি ঠিক আছে কিছু?

পিসি অবাক হয়ে বলে—

পিসি : কী বলছিস, বলরাম তো দু'দিনেই চলে আসে।

কানাই : সে কি আর তুমি যাচ্ছো, না আর কেউ যাচ্ছে তোমার চিঠি দে আসতে? তার চেয়ে আমি বলি কি, শহরে যেয়ে টেলিফোন করে দাও তোমার ভাইপোকে। একেবারে কথা বলতে পারবে শহরের লোকের মতো! কানাই হাসে।

পিসি অবাক হয়ে বলে —

পিসি : সেটা আবার কী রে?

কানাই : সে আছে, শহরে এক রকমের কথা বলার কল। সে তুমি বুঝবে নাই। এখন কী লিখবো সেটা বলো।

পিসি : লেখো, ছ'মাস চিঠি আসে নাই। টাকা পাঠাচ্ছে ঠিক, কিন্তু পিসির কোনও খোঁজ লিচ্ছে নাই? কেন রে অ্যাঁ? পরশু থেকে তোর সব নিয়ে কুড়ি পচিসবার পাইখানা যাচ্ছি আর আসছি। কাল থেকে একটু ধরেছে।

কানাই থেমে আছে দেখে পিসি বিরক্ত হয়।

পিসি : কী হল রে, লেখ।

কানাই ততোধিক বিরক্ত হয়ে বলে —

কানাই : পাইখানা টাইখানা লিখব?

পিসি : লিখবে না তো সে জাইনবে কি করে পিসির অবস্থা। লিখে দাও পিসি বেশি দিন বাইচবে না। সে যেন নিশ্চয় করে একবার আসে। এই বোশেখ মাসের মধ্যেই যেন আসে। না আইসলে পিসির মরা মুখ দেখবে। লিখে দাও।

কাট-টু

পুরনো দিনের একটা বিশাল লম্বা টানা বারান্দায় সারি সারি ঘর। বারান্দাটা প্রায় খাটালের মতো। গরু মোষ বাঁধা। একজন দুধ দুইছে। একজন বাইরে থেকে গরু নিয়ে ঢুকছে। এরই মধ্য দিয়ে পিসিকে দেখা যায় একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এগিয়ে আসতে। এক হাতে লাঠি অন্য হাতে পোস্টকার্ড। ক্যামেরার কিছুটা ক্লোজে ডান দিকে দাঁড়িয়ে বাইশ তেইশ বছরের দোহারা, কাটা কাটা চোখ মুখ, আঁটোসাটো গড়নের একটি মেয়ে। বারান্দার দেওয়ালে ঝোলানো ছোট্ট একটা আয়নায় চুল বাঁধছে সে। বুড়ি হাসে তাকে দেখে। একটু দাঁড়ায়। মেয়েটিও সামান্য হাসে।

পিসি কাছে এসে বলে —

পিসি : ও উত্তরা, তোর বাপ কুথা গেল রে?

উত্তরা : এই তো বাইর হইল।

পিসি : অ।

তারপর থেমে বলে —

পিসি : বলরামকে চিঠি লিখে দিইচি। একবার আসুক, তারপর দেখা যাবে। হ্যাঁ।

উত্তরার মুখে সামান্য লজ্জার ভাব দেখা যায়।

পিসি : কী? (হঠাৎ গান গেয়ে ওঠে পিসি।)

গান

ভালোবাসো যারে খুশি
মোরে দিও মুখের হাসি
মনে রাখিও
সময়ে সময়ে দেখা দিও হে
মনে রাখিও।

পিসি : (যেতে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে) চিঠিটা বাক্সের মধ্যে ফেলে দিয়ে আসো, যাও।

উত্তরা মাথা নাড়ে।

দৃশ্য-৮/ *সূর্য ডোবার সময়*

জোরে হাওয়া দিচ্ছে। ফাঁকা, উঁচুনিচু একটা মাঠে বুড়ো বটগাছ দাঁড়িয়ে। পাশ দিয়ে মেঠো এক রাস্তা চলে গেছে। গাছে ঝুলছে একটা লাল রং-এর টিনের ডাকবাক্স।

উত্তরা ছুটে আসছে। ডাকবাক্সের কাছে পৌঁছে পোস্টকার্ডটা ফেলে দেয় তাতে। তারপর ডাকবাক্সটাকে দু'হাতে প্রায় জড়িয়ে ধরে সামান্য সময় কান পেতে কি যেন শোনে। একটা দুটো করে শুকনো পাতা ঝরে পড়ছে গাছ থেকে। উত্তরা শুকনো একটা পাতা কুড়িয়ে নেয় হাতে।

উত্তরা ফিরে যাচ্ছে। গাছটা পার হয়ে যেতে যেতে মনকাড়া এক উদাস সুর ভেসে আসে তার গলা থেকে। গাছকে ছাড়িয়ে ক্যামেরার কাছাকাছি আসে উত্তরা। (আমাদের আগে শোনা গানটা গুনগুন করে — গাছে আইল বড় আম...ইত্যাদি)। থেমে একবার পিছন ফিরে ডাকবাক্সকে দেখে। শূন্য ফ্রেমে সেই সুর মিলিয়ে যেতে যেতে ভেসে থাকে।

দৃশ্য-৯ / *রাত্রি*

অন্ধকারের মধ্যে প্যাসেঞ্জার ট্রেনের এক-একটি আলোকিত জানলা পার হয়ে যাচ্ছে।

বলরাম হাতে সবুজ আলো নিয়ে সিগনাল দেখাচ্ছে চলে যাওয়া ট্রেনকে। ট্রেন দূরে চলে গেলে অন্ধকারে ভেসে ওঠে নিমাই-এর মুখ। গেটের ওপারে একটি জিপ। জিপ থেকে নেমে দাঁড়িয়ে আছে সেই তিনজন লোক। লম্বা ও ঘাড় পর্যন্ত চুলওলা একজন, একজন মোটা ও থলথলে, অন্য আর একজন শীর্ণকায় ও লম্বা।

নিমাই এগিয়ে গিয়ে গেট খুলে দেয়।

লম্বা চুলওলা লোকটি নিমাইকে ডাকে —

লম্বা চুল : অ্যাই এদিকে, (তারপর প্রশ্ন করে) এখানে কোনও থাকার জায়গা পাওয়া যাবে? ছোটখাটো কোনও হোটেল টোটেল?

শীর্ণকায় লোকটি বলে—

শীর্ণকায় : খাবারের হোটেল? এই ভাত রুটি মাংস সবজি? পাওয়া যাবে?

নিমাই : না। এসব ছোটখাটো জায়গা...

লম্বা চুলওলা লোকটি গলায় ঢোক গেলার শব্দ করে বলে —

লম্বা চুল : পাওয়া যায়? খোকা, খোকা। পাওয়া যাবে।

অন্যজন : শালা গাণ্ডু আছে। ধারেকাছে কেউ মদটদ বিক্রি করে। (নিমাইকে তাকিয়ে থাকতে দেখে আবার বলে) মদ — বিলাইতি, বিলাইতি।

নিমাই : না। আপনারা যাবেন কোথায়?

লম্বা চুল : কোথাও না। আমাদের এখানেই কাজ।

নিমাই : কী কাজ?

লম্বা চুল : আছে কিছু একটা। (অল্প থেমে লোকটি গলা নামিয়ে বলে) — অ্যাই মেয়েছেলে? পাওয়া যাবে?

নিমাই অদ্ভুত মুখ করে তাকায়। মোটা ও থলথলে লোকটি বলে —

মোটা লোক : আরে খিদে আছে কিন্তু খেতে পায় না, এরকম মেয়েছেলে। পাওয়া যাবে? কি? পাওয়া যাবে?

নিমাই : (কোনোরকমে বলে) না।

সমবেত হাসির শব্দ শোনা যায়।

বলরাম এবার এগিয়ে আসে। বলে —

বলরাম : কী চাই আপনাদের?

লোকটি জিপে উঠতে উঠতে বলে —

শীর্ণকায় : চাইলাম তো অনেক কিছুই...। একের পর এক...। শালা ঢ্যামনা।

লোকটি জিপের দরজা বন্ধ করে। জিপ স্টার্ট দেয়। অন্যরা গাড়িতে উঠে পড়ে। জিপ চলে যায় এবং মিলিয়ে যায় অন্ধকারে।

কাট-টু

রেললাইনের মাঝখান দিয়ে হেঁটে আসছে ওরা। পেছনে আবছা আলো ও অন্ধকারের মধ্যে পড়ে থাকা লাইন দেখা যায়। বলরাম ও নিমাই-এর হাতে একটা করে রেল সিগনালের আলো।

বলরাম বলে—

বলরাম : এরা কারা? কখনও তো দেখি নাই এইখানে।

নিমাই বলে —

নিমাই : আমি দেখেছি কাল। ওই জঙ্গলে। ঘুমোচ্ছিল তিনজন। জিপের মধ্যে।

বলরাম : কী কাজ কে জানে। (একটু থেমে বলে) — অদ্ভুত সব কথা শুধোচ্ছিল!

নিমাই : ছাড়ান দে। জগৎ সংসারে কত রকমের লোক আছে...সে সবে আমাদের কী দরকার। এখানে তুই আছিস, আমি আছি আর আছে আমাদের কুস্তি। (হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে নিমাই।)

বলরাম : কী হল?

নিমাই : লইড়তে ইচ্ছা করছে। লড়বি?

বলরাম : এই রাইতে।

কাট-টু

খালি গা। দু'জনের শরীরে শুধু ল্যাঙট। ল্যাঙটের রং লাল। অন্ধকারের মধ্যে দুটো শরীরকে মনে হচ্ছে দুই প্রাগৈতিহাসিক জন্তু। লড়ছে দু'জন দু'জনের সঙ্গে। দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরছে প্রাণপণে, তারপর ছেড়ে দিয়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ছে তাদের শরীর, পরস্পরের ওপর। তাদের মুখ দিয়ে মাঝে মাঝে অদ্ভুত শব্দ বার হয়ে আসছে। লড়ে যাচ্ছে তারা। অন্ধকারে তাদের ছায়ামূর্তির মতো দেখায়।

দৃশ্য-১০/ *সকাল*

সকালবেলা। মুখে বিচিত্র আওয়াজ করে বলরাম আর নিমাই নদীর ধারে এক্সারসাইজ করছে। নদীর জলের ওপর এক্সারসাইজরত নিমাই ও বলরামের ছায়া। পাড়ে দু'টো বাঁশের ডগায় দড়িতে বাঁধা ল্যাঙট, গামছা, ধুতি ঝুলছে। হাওয়া দিচ্ছে। নিমাই আর বলরাম দু'জন দু'জনের গায়ে ঘষে ঘষে তেল মাখিয়ে দিচ্ছে।

কাট-টু

নদীর ধারে পারের কাছে দেখা যায় ম্যাথুকে। সে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তাদের, পরস্পরকে তেল মাখানো দেখছে। তার হাতে দুধ নেওয়ার পাত্র। মুখে হাসি। হাততালি দিয়ে ওঠে ম্যাথু।

কাট-টু

হাততালির শব্দ শুনে কুস্তি থামিয়ে সামনে তাকায় নিমাই ও বলরাম।

কাট-টু

ম্যাথু হাসে। অদ্ভুত সহজ সেই হাসি। হাত নাড়ে নিমাই ও বলরামের দিকে।

কাট-টু

বলরাম ও নিমাই হাসে।

কাট-টু

ম্যাথু, ম্যাথু বলে পাস্টারের ডাক শোনা যায়।

ম্যাথুর মুখের ওপর সামান্য দূর থেকে ভেসে আসা গরুর হাম্বা ডাক শোনা যায়। একবার পিছন ফিরে তাকায় ম্যাথু। তারপর ছুটতে শুরু করে।

দৃশ্য ১১/ *সকাল*

গ্রামের একটি গোয়ালঘর। ম্যাথু এসে দাঁড়ায়। পাত্রটা একজনকে দেয়। লোকটি দুধ ঢেলে দিতে থাকে। ম্যাথু দেখতে থাকে। গরুর ডাক ভেসে আসে।

কাট-টু

গোয়ালের পিছনে মাটির ঘর। ঘরের ভেতর দেখা যায় পাস্টারকে। কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত একটি মেয়ের হাতে ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছে পাস্টার। মেয়েটির নাম রানি।

ঘরের একদিকে যুবাবয়সী একজন মাটিতে বসে অনেক যন্ত্রপাতি নিয়ে ট্রানজিস্টর তৈরি করছে। মাঝে মাঝে তার সেই ট্রানজিস্টর থেকে বিভিন্ন রেডিও স্টেশনের আওয়াজ ভেসে আসছে। যুবাটি কাজ করতে করতে আড়চোখে পাস্টার, ম্যাথু ও রানিকে তাকিয়ে দ্যাখে। যুবকটির রানির স্বামী।

রানিকে দেখে বোঝা যায় সে বিবাহিত।

রানি পাস্টারকে বলে —

রানি : অনেকটা সাইরে গেইছে, না?

পাস্টার : হ্যাঁ হ্যাঁ। আরো সারবেক।

রানি : আঙুলগুলান যে সব মাইখে যাচ্ছে পাদরিবাবু।

পাস্টার : টাউনে হাসপাতালে যাইয়ে অপারেশন করাইলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

রানির স্বামী তার কাজ করতে করতে বলে —

রানির স্বামী : কুঠ কখনও সারে নাই। তোরও সারবেক নাই রানি, আস্তে আস্তে চখে, মুখে, নাখে সোব জায়গায় হইয়ে যাবে।

ম্লান হয়ে ওঠে রানির মুখ। পাস্টার তাকায় রানির দিকে। তারপর শুশ্রূষা করতে থাকে। ম্যাথু উঠে রানির স্বামীর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। তার কাজ দেখতে থাকে। তারপর বলে —

ম্যাথু : কনখান থেকে আইসছে এই সব কথা?

রানির স্বামী : অনেকদূরের একটা গরহ থিকে।

ম্যাথু : কোন গরহ? আমি পড়হেছি। নাম বলো?

রানির স্বামী : দিল্লি! (ব'লে হো হো করে হাসতে থাকে।)

ম্যাথুর বয়সী বা সামান্য বড় একটি ছেলে ম্যাথুর পেছনে এসে দাঁড়ায়। একটু থেমে সামান্য খোঁচা মারে ম্যাথুর পিঠে। ম্যাথুকে ডাকে। দেখা যায় পাস্টার তার চিকিৎসার সরঞ্জাম গোছাচ্ছে।

ছেলেটি ও ম্যাথু বাড়ির বাইরে বেরিয়ে চলে যায়।

রানির স্বামী ম্যাথুর চলে যাবার দিকে তাকিয়ে বলে —

রানির স্বামী : ছেইল্যাটা অনেক বড় হইয়ে গেইছে। পাঁচ বছর হয়ে গেল না উয়ার মা-বাপের কাটা মুণ্ডু ওই ধানক্ষেতে পাওয়া গেইছিল?

পাস্টার মাথা নাড়ে।

রানির স্বামী : তখন থিকেই উ গির্জায় থাকে, লয়?

পাস্টার তার জিনিস গোছাতে গোছাতে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে।

কাট-টু

চিকিৎসার সরঞ্জাম গোছানো হলে পাস্টার বাড়ির বাইরে এসে সাইকেলে ওঠার উপক্রম করে। রানির স্বামী এইসময়ে পাস্টারের সঙ্গে বাড়ির বাইরে আসে।

কাট-টু

দূরে ম্যাথু ও সেই ছেলেটি দৌড়চ্ছে।

কাট-টু

রানির স্বামী : উয়ার আসল নাম তো রাখাল, লয়?

পাস্টার : হঁ।

রানির স্বামী : উ তো আমাদের জাত, উয়াকে ম্যাথু বলে ডাকো কেন?

পাস্টার : কেন? কী বইলে ডাইকবো?

রানির স্বামীর গলায় অসন্তোষ ফুটে ওঠে। বলে —

রানির স্বামী : উটো তো খিস্টান নাম?

তার বলার ধরন দেখে পাস্টার অবাক হয়ে তাকায়। তারপর বলে —

পাস্টার : উয়ার ধরম বইদলেছে। খিস্টান নামই তো হবে।

রানির স্বামী জোর দিয়ে অনেকটা চিৎকারের ভঙ্গিতে বলে —

রানির স্বামী : না, হবেক নাই। এখানে আর কাউকে খিস্টান করা চলবেক নাই।

পাস্টার হঠাৎ এসব কথা শুনে অবাক হয়ে যায়। আস্তে আস্তে সে যাবার উদ্যোগ করতে থাকে।

দৃশ্য-১২/ *সকাল*

একটা জিপ দাঁড়িয়ে আছে। দূরে একটা গাছের কাছ থেকে সাইকেলে চড়া রানির স্বামী আসছে। সাইকেলের হ্যান্ডেলে ঝোলানো ট্রানজিস্টার বাজছে। সে জিপ ছাড়িয়ে চলে যায়। জিপের সামনের দরজার (ড্রাইভারের দিকের) মধ্য দিয়ে একটি যুবতীর মুখ দেখা যায়। সে চুল বাঁধতে বাঁধতে এগিয়ে আসছে। সে জিপের পিছনদিকে এসে অল্প দাঁড়ায়, তারপর চলে যায়।

আবার জিপের সামনের দরজার মধ্যে দিয়ে দেখা যায় রানির স্বামী জিপের তিনটি লোকের সঙ্গে আসছে। রানির স্বামী চলে যায়। লোকগুলো জিপে উঠে বসে। স্টার্ট দেয়।

কাট-টু

কতগুলো পাথর, উঁচু ঢিপির মতো পড়ে আছে। দূর থেকে ডাকপিয়ন আজিজকে সাইকেল চালিয়ে আসতে দেখা যায়। দেখা যায় সাইকেলে পাস্টারকে। মুখোমুখি এসে তারা থামে। পাস্টার আজিজকে বলে —

পাস্টার : কী আজিজ খবর কি?

আজিজ : হাওয়া খুব খারাপ। আপনার খবর?

পাস্টার : এখনও আছি।

আজিজ : পাদরিবাবু, দেউলপুরের বলরাম সর্দারটে কে? চেনেন নাকি?

পাস্টার : চিনি। কেন?

আজিজ : একটা চিঠি আছে।

পাস্টার : ওই তো, রেলের সিগনালম্যান।

আজিজ : ওই কুস্তি।

পাস্টার : হ্যাঁ।

আজিজ : বুঝেছি।

তারপর দু'জন দু'দিকে চলে যায়।

দৃশ্য-১৩/ *দিন*

দেখা যায় বলরাম ও নিমাই পোস্ট অফিস থেকে বেরিয়ে আসছে। বলরামের হাতে ধরা তার পিসির লেখা চিঠি।

পোস্ট অফিসের ভেতর থেকে ভেসে আসে এক মহিলাকণ্ঠ। কাউকে দিয়ে পয়সার বিনিময়ে চিঠি লেখানো হচ্ছে।

বলরাম চিঠি উলটেপালটে দেখে। তারপর নিমাইকে বলে —

বলরাম : তুই পড়, আমার সব অক্ষর মনে নাই।

নিমাই চিঠি নেয়। দ্যাখে। তারপর বলে —

নিমাই : আমি তো জোড়লাগা অক্ষর পইড়তে পারি না।

বলরাম : তাইলে?

নিমাই বলরামের পিঠে হাত দিয়ে, যেখানে পয়সার বিনিময়ে চিঠি লেখা ও পড়া হচ্ছে, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বলরাম ও নিমাই লোকটির কাছে আসে। দেখা যায় একজন মহিলা তখনও চিঠি লিখিয়ে চলেছে।

বলরাম লোকটিকে চিঠিটা দিয়ে বলে —

বলরাম : কী লেখা আছে?

লোকটি : পড়ে দিব? পড়তে ৫০ পয়সা।
নিমাই : ঠিক আছে পড়ুন।

ক্যামেরা ঘুরলে এবার পোস্ট অফিসের ভেতরটা দেখা যায়। একজন লোক বেরিয়ে আসে। আরেকজন প্রাণপণ ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে। অনবরত হ্যালো হ্যালো শোনা যায়।

পোস্ট অফিসের কর্মী সেই ফোনরত লোকটিকে বলে —

কর্মী : কী ব্যাপার কি? টেলিফোনটা কি ভেঙে ফেলবেন নাকি? আরে বাবা ঝালদা তো আধঘণ্টার পথ। যান না, গিয়ে খবরটা দিয়ে আসুন না।

লোকটি : (ক্রুদ্ধ স্বরে) দূর মশায়। তারের ভেতর দিয়ে কথাগুলান যদি পাস করাইতে নাই পাইরলেন, থাম্বাগুলান ঠুক্যা রেখ্যে দেন।

দৃশ্য-১৪/ *সন্ধ্যা শুরুর সময়*

বলরাম আর নিমাই আস্তে আস্তে কুস্তি করতে করতে কথা বলছে। তাদের দু'জনের শরীরে আখড়ার মাটি মাখা।

নিমাই বলে—

নিমাই : কী ভাইবছিস?
বলরাম : ভাইবছি, ভাইবছি চিঠির কথা।
নিমাই : কী কইরবি?
বলরাম : সেই ভাইবছি। পিসি যদি সত্যি মরে যায়?
নিমাই : ঘুইরে আয়। আমি ডিউটি কইরে দেবো। চিঠি পেতে কেমন লাগে রে?
বলরাম : ভালো লাগে। আবার ভয়ও লাগে। দেখিস একদিন তোরও চিঠি আইসবে।
নিমাই : আমাকে চিঠি লিখবে কে?
বলরাম : তোর সত্যি কেউ নাই?
নিমাই : ছিল। এখন নাই।
বলরাম : কী হেঁয়ালি করছিস?
নিমাই : সে অন্য একদিন বইলবো।

কুস্তি করতে করতে নিমাই দু'হাতে বলরামের কাঁধ পেঁচিয়ে ধরে ঝটকা মেরে মাটিতে ফেলে দেয় বলরামকে।

দৃশ্য-১৫/ *সকাল*

বলরাম আর উত্তরা গাছের সারির মধ্য দিয়ে হেঁটে আসছে। টোপর ও মুকুট ওদের হাতে ধরা।

আগে দেখা বড় সেই গাছের ডালে লাল ডাকবাক্স ঝুলছে। গাছটাকে পেরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। কয়েক পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পরে উত্তরা। গাছটার দিকে তাকায়। তারপর ছুটে এসে ডাকবাক্সটার গায়ে কান পেতে আগের মতো কী যেন শুনতে থাকে।

দূরে হেঁটে যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়ায় বলরাম। তারপর বলে —

বলরাম : কী হল?

উত্তরা কিছু বলে না। মন দিয়ে ডাকবাক্সে কান পেতে কিছু শুনতে থাকে। বলরাম আবার বলে —

বলরাম : কী শুনছিস?

উত্তরা লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলে —

উত্তরা : শব্দ।
বলরাম : কীসের?
উত্তরা : চিঠিগুলার। কান পাইতলে শোনা যায় একটা আর একটার সাথে কথা বইলছে। তুমি শুইনবে?

বলরাম কোনও উত্তর না দিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে উত্তরার দিকে।

দৃশ্য-১৬/ *রাত*

চার্চের ভেতরটা দেখা যায়। ঢং ঢং ধ্বনি ভেসে আসে। পাস্টার (ব্যাক টু ক্যামেরা) দাঁড়ানো। আস্তে আস্তে ঘোরে। এখন পাস্টার ক্যামেরার মুখোমুখি। এগিয়ে আসে। দাঁড়ায়। একদম ক্যামেরার মুখোমুখি। এগিয়ে আসে। ডাকে —

পাস্টার : ম্যাথু।

অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ম্যাথু দৌড়ে আসে। একটা পাগল হাসতে হাসতে হাততালি দিয়ে হুররর হুস আওয়াজ করে।

দৃশ্য-১৭/ *বিকেল*

গ্রামের রাস্তা দিয়ে লোকজনে ঠাসা একটা বাস চলেছে। বাসের মাথায় ছাগল ভেড়া মুরগি নিয়ে বসে আছে আরো অনেক লোক। বাসের ভেতর কোনও রকমে ঠাসাঠাসি হয়ে বসে আছে বলরাম আর উত্তরা। কন্ডাক্টার একজনকে বলে — দে। তর দু'টাকা। আর তর গরুর দু'টাকা। চারটাকা দে। দে।

উত্তরা ঝিমোচ্ছে। মাঝে মাঝে তার মাথা ঢুলে পড়ছে বলরামের কাঁধে। কন্ডাক্টার বলরাম ও উত্তরার কাছে এসে দাঁড়ায়।

কাট্-টু

বাসটাকে দূর থেকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। একটা সাইকেল বাসের উলটোদিক থেকে এসে বাসটাকে পেরিয়ে চলে যায়। হঠাৎ বেশ জোরে বাসের টায়ার ফুটো হয়ে যাবার শব্দ হয়। বাসটা দাঁড়িয়ে পড়ে।

কাট-টু

কন্ডাক্টার নেমে পড়ে, ঝুঁকে দেখে, বাসের চাকা থেকে হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে। উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলে —

কন্ডাক্টার : দেখি দেখি? মারাইনছে রে, বোকাচোদার টায়ারটো শালা পাংচার হইয়ে গেল!

উত্তরা : কী হল?

বলরাম : শুনলি না? টায়ার পাংচার।

কন্ডাক্টার এবার যাত্রীদের উদ্দেশ্য করে বলে —

কন্ডাক্টার : বাস আর যাবেক নাই। আর স্টেপনি নাই। চাকা সারায়ে আনতে দু'ঘন্টা লাইগবে। নামি আসো। নামো, নামো, নামো সব। আরে মুরগি ছাগলগুলান নামা। নামো। গাড়ি আর যাবে না, যাও। আর শুন। টিকিট কাছে রাইখবে। অন্যদিন দেখাইলে ভাড়া হাফ।

কাট-টু

কিছু লোকজন বাসের ভেতর থেকে নেমে পড়তে থাকে।

কাট-টু

বলরাম আর উত্তরা বাসের ভেতর বসে আছে।

উত্তরা : আর কত রাস্তা?

বলরাম : ইয়ার পর ভুলাইবাড়ি, তারপর মুর্গিহাটা, ডুমডুমি, ফুলডুংরি, ফুলডুংরিতে রাত কাটায়ে পরদিন নদী পাইর হয়ে নিমতাপুরের জঙ্গল। তারপর দেউলপুর। দুই দিনের রাস্তা।

কাট-টু

জানলা দিয়ে দেখা যায় দূরে হাট বসেছে। একটা বাঁশের খুঁটির মধ্যে পাংচার হওয়া চাকাটা গড়িয়ে নিয়ে দু'জন লোক ছুটছে। পেছনে পেছনে ছুটছে বাসের কন্ডাক্টার।

কাট-টু

উত্তরা ও বলরাম হাটের মধ্য দিয়ে হাঁটতে থাকে।

বলরাম : চল্ ওদিকে চল্।

লোকজনের কথা, গানের আওয়াজ শোনা যায়। দু'জনে কলসির দোকানে এসে দাঁড়ায়। উত্তরা জিগ্যেস করে —

উত্তরা : কত কইরে বইলছে গো?

ব্যাপারি : পাঁচসিকা দিবে?

কলসি না কিনে ওরা হাটের অন্যদিকে যায়।

কাট-টু

দু'টো গাছের মধ্যে স্ক্রিন টাঙিয়ে হাটে ফটো তোলার দোকান খুলেছে একজন। স্ক্রিনে লন্ডন ব্রিজের ছবি আঁকা। একজন খুব বুড়ো লোক খুব জমকালো একটা মুকুট পরে ছবি তুলছে।

ফটোগ্রাফার লোকটিকে বলে —

ফটোগ্রাফার : হিলবেন নাই, হিলবেন নাই। সোজা তাকান।

ফটো তোলা হয়ে গেলে বলে —

ফটোগ্রাফার : হয়ে গেছে, উঠে পড়েন।

এবার ফটোগ্রাফার বলরাম আর উত্তরাকে দেখে বলে —

ফটোগ্রাফার : তুইলবেন নাকি?

কাট-টু

বলরাম আর উত্তরা ছবি তোলার জন্য বসে আছে। পুরনো ক্যামেরার পিছনে কালো কাপড়ে মাথা ঢেকে ছবি তুলছে ফটোগ্রাফার। মুখে বলে — ওয়ান, টু, থ্রি।

কাট-টু

একটা জলের টাবে ওদের ছবি ফুটে উঠছে আস্তে আস্তে।

কাট-টু

বাঁশের ভেতর চাকা গলিয়ে কাঁধে নিয়ে ফিরে আসছে সেই দু'জন লোক। পেছন পেছন ছুটে আসছে কন্ডাক্টার।

কন্ডাক্টার বলে —

কন্ডাক্টার : পা চালিয়ে চল। আঁধার হয়ে যাবেক।

দিগন্তে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আকাশ লাল হয়ে আছে।

দৃশ্য-১৮/ *ভোর*

ভোর। দেখা যায় আগের সেই পরিচিত ঢালটা পেরিয়ে বলরাম আসছে। উত্তরার মাথায় ঘোমটা। সিঁথিতে সিঁদুরের টিপ। প্রথম স্বামী সাক্ষাতের একটা দুর্বোধ্য হাসি তার মুখে। হেঁটে আসছে সে। তার পায়ে বাঁকামল। তার হাঁটার সঙ্গে সঙ্গে মলের ঝমঝম শব্দ হচ্ছে।

বলরাম : তোকে এই মলটা কে দিইছে?

উত্তরা : মা। মাকে দিইছিল তার মা। আমি আমার মেয়েকে দিয়ে যাবো। সেও আবার তার মেয়েকে... (হাসে উত্তরা। তারপর বলে) — কেন শুধোচ্ছো?

বলরাম : শব্দটা খুব কড়া। মনে হচ্ছে শিকল।
উত্তরা : (অদ্ভুতভাবে হেসে বলে) শিকলই তো! তোমার ভালো লাগছে নাই?
বলরাম : (উত্তর না দিয়ে বলে) ওখানে আর একজন থাকে। নিমাই।
উত্তরা : জানি।
বলরাম : আমরা কুস্তি লড়ি। এক সাথে থাকি।
উত্তরা : জানি।
বলরাম : এক সাথে রান্না করি। কাজ করি।
উত্তরা : সেও জানি। তোমার পিসি বইলেছে।

হাঁটতে থাকে ওরা। বলরাম আগে। উত্তরা আগের চেয়ে একটু বেশি পিছন পিছন হাঁটতে থাকে। তার পায়ের মল থেকে শব্দ হচ্ছে।

দৃশ্য-১৯/ *সকাল*

জঙ্গলের ভেতর একটা জিপ। কয়েকটা গাছের তলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে আছে থলথলে মোটা ও শীর্ণকায় লোকদু'টি। আশেপাশে দু'তিনটি মদের বোতল ও গ্লাস ছড়ানো। তারা উত্তরা ও বলরামের দিকে দেখে।

একটু দূরে লম্বা ও ঘাড় পর্যন্ত চুলওলা লোকটা এবং তার সঙ্গে একটি যুবতী মেয়ে। উত্তরাকে দেখে তারা শিস দেয়। মেয়েটি তার ব্লাউজের বোতাম লাগাতে থাকে। স্থানীয় মেয়েটি এতক্ষণ কী করছিল তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

কাট-টু

জঙ্গলের অন্য অংশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে উত্তরা। তার পায়ে পরা মল। শব্দ হচ্ছে মলের। সামনে বলরাম।

কাট-টু

লম্বা ও চুলওলা লোকটি মুখে আঙুল দিয়ে শিস দেয়।

কাট-টু

উত্তরা দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর একটু এগিয়ে আসে। ওদের দেখতে পায়।

কাট-টু

লোকটি তাকিয়ে আছে। তার পাশের মেয়েটি অদ্ভুতভাবে দেখছে উত্তরাকে।

কাট-টু

ক্যামেরা উত্তরার মুখের দিকে এগিয়ে যায়। তার মুখে ভয়ের ছায়া পড়ে। একটু দূর থেকে বলরামের গলা শোনা যায়—

বলরাম : উত্তরা, এই উত্তরা।

উত্তরা ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় বলরামের দিকে। ওরা আবার এগিয়ে যেতে থাকে।

কাট-টু

যুবতীটি পাশের লম্বা চুলওলা লোকটাকে বলে—

যুবতী : এই বাবু। ঘর যাব। টাকা দে।

লোকটা একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ায়। (ব্যাক টু ক্যামেরা)

যুবতী : কী হল? টাকা দিবি নাই।

লোকটা কিছু টাকা বের করে ঘাসে ফেলে দেয়।

যুবতীটি দৌড়ে গিয়ে টাকা কুড়িয়ে আনে।

এই দৃশ্যের উপর *অফ-ভয়েসে* কথাবার্তা শোনা যেতে থাকে।

মোটা থলথলে লোকটা — আর দেরি করা ঠিক হবে না। কাজটা সেরে ফেলা উচিত।

লম্বা চুলওলা লোকটা — সিগনাল আসেনি।

মোটা লোকটা — কবে আসবে?

লম্বা চুলওলা লোকটা — যে কোনওদিন।

মোটা লোকটা — লোকে সন্দেহ করছে।

লম্বা চুলওলা লোকটা — কিছু করার নেই, অপেক্ষা করতে হবে।

দৃশ্য-২০ / *দিন*

দেখা যায় নিমাই একা একা ল্যাঙট পরে মুখে আওয়াজ করে এক্সারসাইজ করছে।

বলরামদের বাড়ির কাছাকাছি একটা ঢাল পেরিয়ে বলরাম ও উত্তরা আসতে থাকে বাড়ির দিকে। বলরাম দূর থেকে চিৎকার করে ডাকে —

বলরাম : নিমাই, হেই নিমাই।

উত্তরা ঢালের উঁচুতে দাঁড়িয়ে পড়ে।

কাট-টু

বলরাম ছুটে গিয়ে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে নিমাইকে। বুকে বুক ঠেকায়। দু'জন দু'জনকে দ্যাখে। উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ওদের চোখ।

নিমাই দূরে দাঁড়িয়ে থাকা উত্তরার দিকে তাকায়। বলে —

নিমাই : ওই মেইয়েছেলেটা কে?
বলরাম : সামনে চল, একবার দেখবি।
নিমাই : দেখার কী আছে? মেইয়েছেলে মেইয়েছেলে।

বলরাম : মেইয়েছেলে না, বউ।
নিমাই : বউ মেইয়েছেলে না? কার বউ? বলে পোশাক পরতে থাকে।
বলরাম : আমার।
নিমাই : (অবাক স্বরে বলে) মানে? তোর সঙ্গে থাকবে? এখানে?
বলরাম : পিসি বলল বিহা না করলে আইত্মঘাতী হবে। তাই...।

নিমাই কোনও উত্তর দেয় না।

কাট-টু

উত্তরা দূরে দাঁড়িয়ে ওদের দু'জনকে দেখছে। তার মাথায় ঘোমটা। মুখে হাসি।

কাট-টু

বলরাম উত্তরার কাছে আসে। হাসে। তারপর ফ্রেম আউট হয়। নিমাই দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। এবার দূর থেকে নিমাই উত্তরার কাছাকাছি (ক্লোজ টু ক্যামেরা) আসে। দেখতে থাকে উত্তরাকে। উত্তরা মুখ নিচু করে মাথা অন্যদিকে একটু ঘোরায়। উত্তরার মুখে হাসি।

দৃশ্য-২১/ *বিকেল*

বলরামের ঘর। বলরাম দরজা খুলে দেয়। উত্তরা ঢোকে। নিমাই ও বলরাম বাইরে দাঁড়িয়ে উত্তরাকে ঘরে ঢুকতে দেখে। উত্তরা অসংকোচে সারা ঘর দেখতে দেখতে আপনমনে হেসে ওঠে। ঘরের জানলাগুলো খুলে দেয়। বলরাম ও নিমাই উত্তরাকে দেখতে থাকে।

ঘরের ভিতর দাঁড়িয়ে উত্তরা প্রশ্ন করে —

উত্তরা : নিমাইদার ঘর?

বলতে বলতে খসে পড়া ঘোমটা ঠিক করে নেয়।

নিমাই কোনও কথা না বলে হাত তুলে বলরামের উলটোদিকের ছোট্ট রেলকোয়ার্টারটা দেখিয়ে দেয়। উত্তরা বলরামের ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

কাট-টু

উত্তরা নিমাইয়ের ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। পেছনে বলরাম ও নিমাই। উত্তরা নিমাইয়ের ঘরের ভেজানো দরজার সামনে দাঁড়ায়। নিমাই এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দেয়। উত্তরা নিমাই-এর ঘরে ঢোকে। পরমুহূর্তে বেরিয়ে আসে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে প্রশ্ন করে —

উত্তরা : আন্না (রান্না) কোথায় হয়?
নিমাই : বলরামের ঘরে হোত। আমরা শুতাম ইখানে। (নিজের ঘর দেখায়।)
উত্তরা : একসঙ্গেই?

নিমাই আর বলরাম পরস্পরের দিকে তাকায়। তারপর হাসির উচ্চরোলে ফেটে পড়ে। হেসে ওঠে উত্তরাও।

কাট-টু

মুখোশ পরে ঢোল কাঁধে নিয়ে নাটুয়ার দলটি নাচতে নাচতে, গাইতে গাইতে, ঢোল বাজাতে বাজাতে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। গান ভেসে আসে — একদিনকার হলুদবাটা, তিনদিনকার বাসি...

গান

একদিনকার হলুদবাটা, তিনদিনকার বাসি
চৈতপরব ফুরাইন গেল হে...গঙ্গাজল
কি হলুদ মাখামাখি, কি এই দেখাদেখি।
লদীধারের কাশ-ই, তাই ঘুরে দেইখতে আসি
ও আমার জামফুলিকে বইলে দিবি হে গঙ্গাজল
বড় সুখে আছি, আমি বড় সুখে আছি।
জামদালিলো, ওলো তুই যাস না খালে খালে
খোজাবোড়লে বিঁইধে দিবেক মরবি জ্বালায় জ্বলে
চৈতমাসের ছাতুকুড়া, বলি চাইলেই শুকাইল হে
কাল যে বঁধূ মাইরেছিলে আজও দুখাইছেরে।

কাট-টু

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। বলরামের ঘরের ভেতর দেখা যাচ্ছে। উত্তরা জানলা দিয়ে নাটুয়ার দলটিকে চলে যেতে দেখে। উত্তরার হাতে উনুন ধরাবার কাঠ। উত্তরা এবার উঠে দাঁড়িয়ে জানলার কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়। নাটুয়ার দলটি ক্রমশ দূরে চলে যায়। গানের রেশ ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে যায়। গুনগুন করে গাইতে গাইতে উত্তরা উনুন ধরাচ্ছে। কাঠ জ্বলে ওঠা আগুনে লাল হয়ে উঠছে মুখ। উনুনে কড়া চাপায় উত্তরা। তেল ঢালে। রান্না শুরু করে।

দৃশ্য-২২/ *রাত্রি*

রাত্রি। উত্তরা আর বলরাম ওদের ঘরে ঢোকে। তারপর দরজা ও জানলা বন্ধ করে দেয়।

কাট-টু

নিমাই ওর ঘর থেকে দেখতে পায় এই দৃশ্য। খালি গায়ে নিমাই উঠে আস্তে আস্তে জানলার কাছে এসে দাঁড়ায়। তাকিয়ে থাকে বলরামের ঘরের দিকে।

কাট-টু

বলরামের ঘর। বলরাম ও উত্তরার মুখে অস্ফুট আওয়াজ। মৃদু চিৎকার কামোত্তেজনায় শীৎকারের মতো শোনায়। বলরাম উত্তরাকে ধরবার চেষ্টা করে। বারবার উত্তরা সরে সরে যায়। তাহলেও বোঝা যায় উত্তরার ধরা দেবার ইচ্ছা পুরোপুরি আছে।

কাট-টু

নিমাইয়ের মুখে বিষাদ এসে জড়ো হয়। নিমাই আকাশের দিয়ে তাকায়। বন্ধ ঘরের ভিতর থেকে বলরাম ও উত্তরার মৃদু শীৎকার শোনা যায়।

কাট-টু

মেঘ ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে পূর্ণিমার চাঁদের উপর দিয়ে।

দৃশ্য-২৩/ *ভোরের আগের আকাশ*

দ্বিতীয় দৃশ্যের মতো আবার একদল বামন বেরিয়ে পড়েছে দিনের কাজে। পেছনে গার্ডের পোশাক পরা সেই বামন। অন্য কোনও পৃথিবী থেকে ভেসে আসা সুরের মতো মিউজিক শোনা যাচ্ছে।

সবাই ক্যামেরা পেরিয়ে চলে যায়। তাদের হাঁটার শব্দ শোনা যায় মৃদুভাবে ভেসে আসে।

দৃশ্য - ২৪/ *ভোর*

মাঠের মাঝখান দিয়ে বাস এগিয়ে আসে। একটু দূরে বাসটা এসে দাঁড়ায়। বামন গার্ড নামে। বাসটা চলে যায়। বামন গার্ড মাঠের ওপর দিয়ে হাঁটতে থাকে।

কাট-টু

বাস চলে গেলে দেখা যায় রাস্তা দিয়ে বামন গার্ড যাচ্ছে। রাস্তার ঢালের ওপর থেকে সাইকেলে উঠে আসে পাস্টার, সঙ্গে ডাক্তারদের ব্যাগ। পিছনে বসে ম্যাথু।

দূরে প্রথম দৃশ্যের সেই জিপটি দেখা যায়।

বামন গার্ডকে পেরিয়ে এগিয়ে যায় সাইকেল। ম্যাথু বামন গার্ডের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ে। বামন হাসে।

কাট-টু

জিপটিকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। ভিতরে সেই তিনজন লোক।

কাট-টু

জিপের সামনে কাচের মধ্য দিয়ে দেখা যায়, রাস্তার উলটোদিক থেকে শুকনো কাঠের বান্ডিল মাথায় উত্তরাকে আসতে। লোকগুলো ক্ষুধার্ত দৃষ্টি নিয়ে উত্তরার দিকে তাকায়। অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। দেখা যায় উত্তরার পিছনদিক থেকে সেই জিপটা খুব জোরে এগিয়ে আসছে। এবারে জিপটা পাস্টারের খুব কাছাকাছি চলে আসে। পাস্টার সাইকেল সহ রাস্তার নীচে নামতে চেষ্টা করে। না পেরে, হুড়মুড় করে পাস্টার, ম্যাথু দু'জনেই মাটিতে পড়ে যায়। সাইকেল ছিটকে যায় অন্যদিকে। উত্তরা দেখে।

কাট-টু

উত্তরা মাথার বান্ডিল মাটিতে ফেলে ছুটে আসে সেই দিকে। পাস্টার ও ম্যাথুকে হাত বাড়িয়ে মাটি থেকে উঠতে সাহায্য করে উত্তরা।

কাট-টু

ছুটতে ছুটতে আসতে থাকে বামন গার্ড। একটু দূরে পড়ে থাকা সাইকেলটা মাটি থেকে তোলে।

ওরা উঠে দাঁড়ায়। উত্তরা ম্যাথুকে বলে —

উত্তরা : উঠো, উঠো, লেগেছে?

পাস্টার সামান্য হেসে মাথা নেড়ে না জানায়।

কাট-টু

ঢালু রাস্তার নীচে উলটে পড়ে থাকা সাইকেলটা নিয়ে এগিয়ে আসতে থাকে বামন গার্ড।

কাট-টু

উত্তরা তার হাত দিয়ে ম্যাথুর পা-এর ছড়ে যাওয়া জায়গাটা ঝেড়ে দেয়।

ম্যাথু উত্তরার দিকে তাকিয়ে হাসে। যেন চেনে ও উত্তরাকে। পাস্টার সেই দিকে তাকিয়ে নিজের হাতের সামান্য ছড়ে যাওয়া জায়গাটা দেখতে দেখতে বলে —

পাস্টার : তুমি কোথায় থাকো?

উত্তরা : রেল কম্পানির বাড়িতে।

পাস্টার : নিমাই-এর বউ?

উত্তরা মাথা নেড়ে না জানায়।

পাস্টার : বলরামের?

উত্তরা চাপা হেসে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে। পাস্টার অ, বলে মাথা নাড়ে। ম্যাথুকে বলে —

পাস্টার : আয়।

কাট-টু

বামন গার্ড সাইকেলের ক্যারিয়ারে ম্যাথুকে তুলে দেয়। পাস্টার একবার উত্তরার দিকে তাকায়। তারপর সাইকেল চালিয়ে চলে যায়।

কাট-টু

উত্তরার মুখ। তার মুখে হাসি লেগে আছে।

কাট-টু

পাস্টার সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে। পিছনে বসে আছে ম্যাথু। ম্যাথু উত্তরার দিকে চিৎকার করে বলে —

ম্যাথু : তোমার নাম কি?
উত্তরা : (চেঁচিয়ে) উত্তরা। তোমার?
ম্যাথু : ম্যাথু, আমাদের বাড়িতে আসবে?
উত্তরা : যাব।

পাস্টার আর ম্যাথু সাইকেল চালিয়ে আরো দূরে চলে যাচ্ছে। ম্যাথু উত্তরার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ে।

কাট-টু

বামন গার্ড এগিয়ে এসে উত্তরার দিকে তাকায়। তারপর ফিরে গিয়ে উত্তরার শুকনো ডালের বান্ডিলটা নিয়ে আসে। উত্তরা বসে। বামন গার্ড বান্ডিলটা উত্তরার মাথায় তুলে দেয়। উত্তরা একটু অবাক হয়ে ডালের বান্ডিলটা মাথায় রাখে।

বামন গার্ড হেসে টুপি খুলে ঝুঁকে তাকে অভিবাদনের ভঙ্গি করে। উত্তরা হাসে। তারপর চলে যেতে থাকে।

কাট-টু

বামনের মুখ। দেখছে উত্তরার চলে যাওয়া।

কাট-টু

বলরাম আর নিমাই কুস্তি লড়ছে। বেশ জমে উঠেছে কুস্তি। তাদের দু'জনের গায়েই পর্যাপ্ত মাটি দেখে বোঝা যায় তারা অনেকক্ষণ ধরে লড়ছে।

দূরে উত্তরাকে আসতে দেখা যায়। তার মাথায় শুকনো ডালের বান্ডিল। একটা উঁচু জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ে উত্তরা। তারপর দেখতে থাকে ওদের লড়াই।

কাট-টু

দূরে দেখা যায় সাইকেল রিকশায় ক্যানভাসার যাচ্ছে। তাকে দেখা যাচ্ছে না। রিকশার পেছন পেছন একপাল ছেলেমেয়ে দৌড়চ্ছে।

ক্যানভাসার : কুলি, কুলি, কুলি। আজ সন্ধ্যায় দেখানো হবে অমিতাভ বচনের কুলি। নাচে গানে মারপিটে ভরপুর রঙিন ছবি কুলি।

ক্যানভাসারকে নিয়ে রিকশা আস্তে আস্তে ফ্রেম আউট হয়।

কাট-টু

উত্তরার মুখ। সে মাথায় ডালের বান্ডিল নিয়ে অল্পক্ষণ কুস্তি দেখে। তারপর মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে চলে যায়।

দৃশ্য-২৫/ *শেষ বিকেল*

দেখা যায় কুয়ো থেকে জল তুলে স্নান করছে বলরাম। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে উত্তরা বলরামের স্নান দেখছে।

উত্তরা : বাইস্কোপ নিয়ে যাবে?
বলরাম : বাইস্কোপ?
উত্তরা : হ, বাইস্কোপ।
বলরাম : কখন?
উত্তরা : সন্ধ্যাবেলায়।
বলরাম : নিমাই। সে তো এখনও ফিরে নাই।
উত্তরা : তোমার সবকিছুতেই উয়ার ভাগ আছে।
বলরাম : মানে?
উত্তরা : নাই? কে জানে।

দৃশ্য-২৬/ *সন্ধ্যা*

দূর থেকে দেখা যায় একটা উঁচু ঢালের মতো জায়গায় খোলা মাঠে পর্দা টাঙিয়ে সিক্সটিন মিলিমিটারে সিনেমা দেখানো হচ্ছে। কুলি। পর্দায় চলছে কুলি সিনেমার গানের দৃশ্য। অনেক লোক মাটিতে বসে সিনেমা দেখছে। তাদের সঙ্গে লণ্ঠন, অল্প জ্বালানো আছে। এদের মধ্যে বলরাম আর উত্তরাও আছে। আস্তে আস্তে গানের সুরকে ছাপিয়ে ঝড়ের শব্দ শোনা যায়। তারপর হঠাৎ ঝড়ে পর্দা উড়তে থাকে। ঝড় ক্রমাগত বাড়তে থাকে। তারপর হঠাৎ ঝড়ে পর্দা উড়ে যায় নাচ গানের দৃশ্যটিকে নিয়ে। সবাই উঠে দাঁড়ায়। তারপর জ্বালানো লণ্ঠন নিয়ে ছুটতে শুরু করে দেয়।

কাট-টু

বৃষ্টি শুরু হয়। বৃষ্টি বাড়তে থাকে।

কাট-টু

বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ছুটছে ওরা দু'জন। বলরামের হাতে লণ্ঠন। ওদের পিছনে লণ্ঠন হাতে ছুটছে আরও অনেকেই।

দৃশ্য-২৭/ *রাত্রি*

নিমাই আর বলরাম খেতে বসেছে। উত্তরা একটা একটা করে রুটি করে ওদের থালায় দিচ্ছে। দু'জন কেউ কোনও কথা বলছে না। উত্তরা ওদের লক্ষ করে। তারপর উত্তরা নিমাইকে উদ্দেশ্য করে বলে —

উত্তরা : নিমাইদার মুখটা রাগ রাগ কেন?
নিমাই : কে বলেছে তোমাকে?
উত্তরা : আমরা বাইস্কোপ গেছি তাই রাগ করেছ, না?

নিমাই কোনও উত্তর দেয় না।

উত্তরা : এবার তুমি একটা বিহা কইরে ফেলো নিমাইদা?

বলরাম একবার আড়চোখে তাকায় নিমাইয়ের দিকে। নিমাই কোনও কথা বলে না। উত্তরা রুটি সেঁকছে আগুনে। রুটিগুলো ফুলে উঠছে গোল হয়ে।

কাট-টু

বলরামের ঘর। অল্প আলো। উত্তরাকে ধরতে ছুটে আসে বলরাম। উত্তরা চকিতে সরে গিয়ে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ায়। মলের শব্দ বেজে ওঠে পায়ে। তার মুখে অদ্ভুত হাসি। নাকের পাটা ফুলে উঠেছে। আবার ছুটে আসে বলরাম। বলরামের মুখ কামনাময়। উত্তরা সরে যায় আবার। দু'জনের শরীরের এই খেলা চলতে থাকে আরও কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ উত্তরা দাঁড়িয়ে গিয়ে বলরামকে বলে —

উত্তরা : না।

বলরাম অবাক হয়ে বলে —

বলরাম : কেন?

উত্তরা একটু থেমে বলে —

উত্তরা : সারাদিন খালি শরীর আর শরীর। অন্য কিছু নাই?

বলরাম : নাই?

উত্তরা : আছে। তেলমাখা, কুস্তি লড়া, মাঝে মাঝে ট্রেনের ঝান্ডা ধরা আর ভোস ভোস করে ঘুম!

বলরাম আবার ছুটে আসে। উত্তরা আলতো হেসে আবার দৌড়ে সরে যায়।

কাট-টু

বাইরে থেকে জানলার ভেতর দিয়ে দেখা যায় বলরাম ও উত্তরাকে। তাদের মুখের অনুচ্চ ধ্বনি কামোত্তেজনাময়।

কাট-টু

নিমাইয়ের মুখ। তাকিয়ে আছে নিমাই বলরাম আর উত্তরার ঘরের দিকে। ভেসে আসছে উত্তরার পায়ের মলের শব্দ। সঙ্গে টুকরো হাসির স্বর। ঘর থেকে বেরিয়ে আসে নিমাই। হাওয়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

কাট-টু

সামনে একটা গাছ। হাওয়ায় দুলছে। গাছটার গায়ের রং শাদা, জ্যোৎস্নার আলোয় একটু সামান্য নীল লাগছে গাছটাকে। নিমাইকে দেখা যায় গাছটার ডাল ধরে ওপরে উঠে যাচ্ছে একটা ডাল ধরে ঝুলে পড়ে নিমাই। দোল খেতে থাকে জোরে জোরে। যেন সার্কাস দেখাচ্ছে নিমাই। তার মুখ দিয়ে অদ্ভুত আওয়াজ বেরিয়ে আসতে থাকে, যা শীৎকারের মতো শোনায়।

হাওয়ার শব্দ বাড়ছে।

দৃশ্য-২৮/ রাত্রি

পূর্ণিমার রাত। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে চারদিক। একদল লোক আলো হাতে প্রার্থনাসংগীত গাইতে গাইতে চার্চের দিকে হাঁটছে।

চার্চ। চার্চের সামনে একটি শালকাঠের ক্রুশ। হাওয়ার শব্দ জোরে শোনা যাচ্ছে।

কাট-টু

একটা চালাঘরের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে শালকাঠের ক্রুশটি। ভিতরে একটা চৌকিতে চাদর গায়ে গুটিয়ে শুয়ে আছে ম্যাথু। হাওয়া ও ঝড়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ দরজা খুলে যায়। ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসে ম্যাথু।

কাট-টু

পাস্টারের ঘরের দরজা খুলে পাস্টার বেরিয়ে আসে। হাতে লণ্ঠন। পাস্টার ম্যাথুর ঘরে এসে ঢোকে। দরজায় দাঁড়িয়ে বলে —

পাস্টার : ম্যাথু, ঘুম পাচ্ছে না?

ম্যাথু মাথা নাড়ে। পাস্টার কাছে এসে বলে —

পাস্টার : আমার ঘরে শুবি?

ম্যাথু সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে। দেখা যায় পাস্টার ম্যাথুকে কাঁধে চড়িয়ে নিচ্ছে। পাস্টারের হাতে লণ্ঠন। হাওয়ার শব্দ আগের মতো শোনা যাচ্ছে।

কাট-টু

পাস্টারের হাতে লণ্ঠন, কাঁধে ম্যাথু। শালকাঠের ক্রুশের পাশ দিয়ে তারা যাচ্ছে।

ম্যাথু বলে —

ম্যাথু : আমার মা বাবা ভগবানের কাছে আছে, তাই না কাকা?

পাস্টার : হ্যাঁ।

ম্যাথু : ওখান থেকে আমাকে দেখতে পাচ্ছে?

পাস্টার : হ্যাঁ। (তারপর একটু থেমে বলে) সামনের মাসে তোকে আমি চাঁইবাসা পাঠিয়ে দেব। ওখানে স্কুলে পড়বি। পড়বি না?

ম্যাথু মাথা নাড়ে। হুঁ বলে। হাওয়ার শব্দ বাড়তে থাকে।

ওরা চলে যায় ফ্রেমের বাইরে। ফ্রেমে দেখা যায় শালকাঠের ক্রুশ।

কাট-টু

ট্রেন আসছে। নিমাই ট্রেনের জন্য সিগনাল হাতে (সবুজ রঙের ফ্ল্যাগ) অপেক্ষা করছে। লণ্ঠন হাতে বলরাম তাকে পেরিয়ে চলে যায়। নিমাই ট্রেনকে সিগনাল দেখায়। ট্রেন চলে যায়।

দৃশ্য-২৯/ *ভোর*

কুস্তি লড়ছে বলরাম আর নিমাই। এক সময় মাটি থেকে আর উঠতে চায় না বলরাম। মুখে ক্লান্তিসূচক আওয়াজ করে। নিমাইয়ের গলায় রাগ। বলে —

নিমাই : কী হয়েছে তোর?

বলরাম উলটে মাটির ওপর শুয়ে পড়ে কনুই দিয়ে দু'চোখ ঢেকে বলে —

বলরাম : ঘুম পাচ্ছে।

নিমাই গলায় রাগ নিয়েই বলে —

নিমাই : মেয়েমানুষের সঙ্গে শুলে এমনিই হয়। সারাদিন ঘুম পায়। ওঠ। ওঠ, ওঠ।

বলরাম অতিকষ্টে উঠে দাঁড়ায়। আবার কুস্তি শুরু করে।

দৃশ্য-৩০/ *দিন*

জঙ্গলে উত্তরা মাটির নীচে ঝরে পড়ে থাকা শুকনো পাতা কুড়াচ্ছে, রাখছে একটা বস্তার মধ্যে। তার পাশে একজন বুড়ি। সেও পাতা কুড়াচ্ছে। ট্রেনের শব্দে উত্তরা মুখ তুলে তাকায়। দূরে ট্রেন লাইনের ওপর ট্রেনটা আসতে দেখা যায়।

কাট-টু

ট্রেনটা যাচ্ছে ফাঁকা একটা জঙ্গলের পাশ দিয়ে। গার্ডের কামরা থেকে বামন গার্ডকে দেখা যায় উত্তরাকে দেখে হাসতে। তারপর আগের মতো টুপি খুলে অভিবাদনের মতো ভঙ্গি করে।

কাট-টু

উত্তরা হাসে। হাত নাড়ে।

কাট-টু

ট্রেনটা চলে যেতে থাকে।

কাট-টু

উত্তরা আবার পাতা কুড়াতে থাকে।

কাট-টু

দূর থেকে একজন যুবতী বউকে আসতে দেখা যায়। কাছে এলে চেনা যায়। একে সেই তিনজন লোকের মধ্যে লম্বা ও চুলওলা লোকটির সঙ্গে জঙ্গলের ভেতর শুয়ে থাকতে দেখা গেছে। কাছাকাছি এসে উত্তরাকে দেখে মেয়েটি দাঁড়িয়ে পড়ে। তার মুখে উত্তরাকে চিনতে পারার সংকেত ভেসে ওঠে। উত্তরাও চিনতে পেরেছে তাকে।

বুড়ি উত্তরাকে বলে —

বুড়ি : উটা আমার বেটার বহু। তুমি উয়াকে চিনহো?

উত্তরা মাথা নেড়ে না জানায়।

বুড়ি ছেলের বউকে শুকনো কাঠের কয়েকটা বস্তা দেখিয়ে বলে —

বুড়ি : এই দুই বড়া নিয়ে যা।

বউটি বস্তা দু'টি মাথায় ও হাতে নেয়। উত্তরা এগিয়ে এসে সাহায্য করে। বউটি ধীরে ধীরে চলে যায়।

উত্তরা বুড়িকে জিজ্ঞাসা করে —

উত্তরা : উয়ার স্বামী কোথায়?

পাতা কুড়োতে কুড়োতে বুড়ি বলে —

বুড়ি : টাউনে গেইছিল কাম খুঁজতে। আজ একবছর হয়ে গেল। আজো ঘর ঘুরলো নাই। দু'টো লাতি আছে। বউটা লোকের গরুবাগালি করে। এতগুলান পেট। চইলবে কী করে?

কাট-টু

বউটি দূরে চলে যাচ্ছে। উত্তরা তাকিয়ে থাকে তার দিকে।

দৃশ্য-৩১/ *দিন*

নদীর পারে বলরাম ও নিমাই এক্সারসাইজ করতে ব্যস্ত। মুখে নানারকম আওয়াজ করে তারা এক্সারসাইজ করতে থাকে।

কাট-টু

লং শটে দেখা যায় পুকুরপাড়ে এদের জামাকাপড় টাঙানো। এক্সারসাইজ চলতে থাকে।

কাট-টু

বলরাম, নিমাইয়ের শরীরের উপর বসে তেল মাখাতে মাখাতে বলে —

বলরাম : নিমাই, এবার তুইও একটা বিহা করে ফেল।

নিমাই : মেয়েছেলে থাকলে শরীর খারাপ হয়ে যায়। (তারপর একটু থেমে বলে) আমার বিয়া হয়ে গেছে।

বলরাম : (অবাক হয়ে বলে) সত্যি?

নিমাই মাথা নাড়ে।

বলরাম : তোর বউ কোথায়?

নিমাই : জানি না।

বলরাম : মানে?

নিমাই : জনম দিয়াই মাটা মরে গিয়েছিল। বাবা তারপর ভেন্ন সংসার করে। বাবা মারা যাবার পর সৎমা তার গ্রামের এক পাগল

মেয়েছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে দিইছিল। তখন অল্প বয়স। কয়েকদিন পরে বউটা পালায়ে গেল। অনেক খোঁজ করেছিলাম। আর ফিরে আসেনি। বউটার মুখটাও আমার মনে নাই। তার জন্য কোনও দুঃখ ছিল না। তারপর রেলের এই চাকরিটা পেলাম। বদলি হয়ে এখানে এলাম। এখানে তুই ছিলি।

বলরাম : (মজা করার স্বরে বলে) ছিলি মানে? আমি এখনও তো জিয়ন্ত আছি রে?

নিমাই : আগে তোর আমার মাঝে কেউ ছিল না। (একটু থেমে নিমাই বলে) এখন আছে।

নিমাই তাকায় বলরামের দিকে।

বলরাম কোনও কথা বলে না। তার মুখ দেখে বোঝা যায় নিমাই কী বলতে চায় ধরতে পারছে না সে।

নিমাই : তুই বউটাকে এখানে না নিয়ে এলেই ভালো করতিস।

বলরাম অবাক হয়ে তাকায় নিমাই-এর দিকে।

কাট-টু

নিমাই উঠে দাঁড়ায়। তারপর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে ঝাঁপ দেয় পাশের নদীতে। বলরাম বসে থাকে।

কাট-টু

জঙ্গলের ভিতর মাটির রাস্তা দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে পাস্টার, সাইকেলের পিছনে বসে আছে ম্যাথু। কী দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে পাস্টার। ডাকে —

পাস্টার : বলরাম।

কাট-টু

বলরাম মুখ ফিরিয়ে তাকায়।

কাট-টু

পাস্টার চেঁচিয়ে বলে —

পাস্টার : আর এলে না তো ওষুধ নিতে?

বলরাম : এখন ভালো আছি।

পাস্টার : ও। তোমার বউয়ের সঙ্গে আলাপ হল সেদিন। খুব ভালো মেয়ে।

কাট-টু

বলরামের মুখ। সে হাসে।

দৃশ্য-৩২/ *বিকেল*

সাইকেল চালাতে চালাতে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে পাস্টার। নানান পাখি ডাকছে জঙ্গলের মধ্যে। ম্যাথু চারদিক তাকিয়ে দেখছে।

ম্যাথু : কাকা, পাখিদের ভাষা পাখি ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারে না?

পাস্টার : গাছেরা পারে।

ম্যাথু : তুমি একটুও বুঝতে পারো না?

পাস্টার : একটু একটু পারি।

ম্যাথু : তাহলে বল পাখিরা কী বলছে?

পাস্টার : বলছে ভালোবাসো, ভালো থাকো আর সবাইকে ভালো রাখো।

কাট-টু

জঙ্গলের মেঠো রাস্তার ওপার থেকে একটা জিপগাড়ি পাস্টারের সাইকেলের সামনে এসে জোরে ব্রেক করে দাঁড়ায়। জিপের ভেতর সেই তিনজনকে বসে থাকতে দেখা যায়। গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে দেয় চালক।

পাস্টার সাইকেল থামিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পেছন থেকে ম্যাথু দেখছে জিপের ভিতরে বসা লোকগুলোকে।

কোনও কথা না বলে মোটা এবং থপথপে ও শীর্ণকায় লোকদুটি জিপের দু'দিক দিয়ে নেমে দু'দিকে যায়। তারপর একটু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে থাকে।

ম্যাথুও নেমে পড়ে সাইকেল থেকে। পাস্টার তাকায়।

ম্যাথু এগিয়ে যায় জিপটার দিকে। জিপটাকে ঘুরে দ্যাখে। তারপর লোকটার কাছে এসে হর্নটা দেখিয়ে বলে —

ম্যাথু : ওটা হর্ন? বাজাও?

লোকটা তাকায় ম্যাথুর দিকে। কোনও কথা বলে না।

জঙ্গলের শুকনো পাতায় অন্য লোক দু'টির প্রস্রাব করার শব্দ শোনা যায়।

পাস্টার : (ডাকে) ম্যাথু।

ম্যাথু : হিসি।

একটু এগিয়ে গিয়ে ম্যাথু প্রস্রাব করতে থাকে। প্রস্রাব করতে করতে একটু ঝুঁকে তাকায় ডান পাশের শীর্ণকায় লোকটির প্রস্রাব করার দিকে। লোকটি ভ্রূ কুঁচকে তাকায় ম্যাথুর দিকে।

ম্যাথু এবার মুখ সরিয়ে মোটা ও থলথলে লোকটির প্রস্রাব করার দিকে তাকায়।

লোকটি ম্যাথুর দিকে তাকিয়ে অল্প ঘুরে যায়।

ম্যাথু সহজ ও সরল হাসি হাসে।

শুকনো পাতায় তিনজনের প্রস্রাব করার আওয়াজ হতে থাকে।

কাট-টু

জিপে বসে থাকা লোকটি পাস্টারকে দেখতে থাকে। দেখতে দেখতে কঠিন হয়ে ওঠে তার মুখ।

পাস্টার তাকিয়ে থাকে তার দিকে। ম্যাথু পাস্টারের কাছে এসে দাঁড়ায়।

লোকটি গাড়ি স্টার্ট দেয়। অন্য দু'জন ছুটে এসে গাড়িতে উঠে পড়ে।

কাট-টু

জিপ চলে যায়। ধুলো ওড়ে।

কাট-টু

পাস্টার তাকিয়ে থাকে চলে যাওয়া জিপটার দিকে।

কাট-টু

পাস্টার সাইকেলে উঠে ম্যাথুকে নিয়ে চলে যেতে থাকে। ম্যাথু ও পাস্টারের কথোপকথন চলতে থাকে।

ম্যাথু : লোকগুলো কে কাকা?
পাস্টার : জানি না। এখানে কখনও দেখিনি এদের।
ম্যাথু : তোমার ভয় করছে কাকা?

পাস্টার মাথা নেড়ে না জানায়। তবু পাস্টারের মুখ সামান্য চিন্তিত।

ম্যাথু : কাকা?
পাস্টার : হুঁ।
ম্যাথু : তোমার কী হতে ইচ্ছে করে?
পাস্টার : মানুষ।
ম্যাথু : (হেসে) বাঃ, তুমি তো মানুষই তো?
পাস্টার : (হেসে) তোর কি হতে ইচ্ছে করে?
ম্যাথু : পাখি।

কাট -টু

শেষ বিকেল। সাইকেল চেপে পাস্টার আর ম্যাথু আসছে।

কাট-টু

রাস্তা দিয়ে উত্তরাকে আসতে দেখা যায়। উত্তরার হাতে কাগজে মোড়া একটা আয়না।

কাট-টু

রাস্তার উলটোদিকে দেখা যায় পাস্টার ও ম্যাথুকে। সাইকেলে করে আসছে।

কাট-টু

উত্তরা দাঁড়িয়ে পড়ে।

কাট-টু

সাইকেল নিয়ে পাস্টার উত্তরার কাছে এসে দাঁড়ায়। শঙ্কায় পাস্টারের মুখ তখনো কিছুটা ম্লান। একটু থেমে উত্তরাকে বলে —

পাস্টার : কোথায় গিয়েছিলে?
উত্তরা : হাটে।
ম্যাথু : কী কিনলে?
উত্তরা : (কাগজে মোড়া আয়নাটা দেখিয়ে) আয়না।
ম্যাথু : আমাকে দেখাও।

উত্তরা আয়নাটা কাগজের মোড়ক খুলে ম্যাথুকে দেখায়। ম্যাথু দেখতে থাকে। তারপর উত্তরাকে বলে, —

ম্যাথু : আমাদের বাড়িতে এলে না তো?
উত্তরা : একদিন আইসবো।
পাস্টার : বলরাম কোথায়?

উত্তরা দূরে হাত তুলে দেখায়।

কাট-টু

বেশ দূরে দেখা যায় বলরাম আর নিমাই কুস্তি লড়ছে।

কাট-টু

পাস্টার তাকিয়ে দ্যাখে ওদের।

ম্যাথু : (উত্তরাকে প্রশ্ন করে) ওদের গায়ে খুব শক্তি, না?

উত্তরা হাসে।

ম্যাথু : কেউ ওদের কিচ্ছু করতে পারবে না। আমিও ওদের মতো কুস্তি লইড়বো।

পাস্টার হেসে ওঠে। তারপর চলে যায়। মলের আওয়াজ করে উত্তরাও তার গন্তব্যে রওনা হয়। একবার মুখ ঘুরিয়ে পাস্টার ও ম্যাথুর গমনপথের দিকে তাকায়।

কাট-টু

বলরাম আর নিমাই কুস্তি করছে। নিমাইয়ের মুখ কিছুটা হিংস্র ও রাগী। নিমাই বারবার মাটিতে ফেলে দিচ্ছে বলরামকে। যেন সত্যিই লড়ছে সে। বলরাম সত্যিই যেন একজন প্রতিপক্ষ।

পড়ে যাবার পর মাটি থেকে উঠতে উঠতে অবাক হয়ে বলরাম বলে —

বলরাম : তুই এমন কইরছিস কেনে? যেন সত্যি সত্যি লইড়ছিস?

নিমাই ঘুরে বলরামের উলটোদিক হয়ে বসে। আর তখনই দূরে উত্তরাকে দেখতে পায়। উত্তরার মুখ। তার চোখে বিষাদ।

নিমাই দূরে উত্তরর দিকে মুখ রেখে বলে —

নিমাই : এখানে হয় তুই থাইকবি নইলে আমি। আমাদের এখানে আর একসঙ্গে থাকা চইলবে না।

বলরাম : কেন? কী হইয়েছে?

দেখা যায় উত্তরা চলে যাচ্ছে।

নিমাই কোনও উত্তরা দেয় না। তাকিয়ে থাকে উত্তরার চলে যাওয়ার দিকে।

দৃশ্য-৩৩/ *রাত্রি*

বলরামের ঘর। দরজা খুলে ছিটকে বেরিয়ে এসে সামনের দিকে ছুটে যেতে থাকে উত্তরা। তার শাড়ি একটু আলুথালু। সামান্য পরে বলরাম বেরিয়ে এসে উত্তরার পিছন পিছন ছুটতে থাকে। হাতে লণ্ঠন।

নিমাই তার ঘরে জানলা দিয়ে দেখে এই দৃশ্য।

বাইরে জ্যোৎস্নায় ছুটে যাচ্ছে উত্তরা। পিছন পিছন ছুটছে বলরাম।

বলরাম : উত্তরা, থাম বলছি।

উত্তরা : না। আমার ভাল লাইগছে নাই।

একসময় বলরাম ধরে ফ্যালে উত্তরাকে। ছিটকে শুইয়ে দেয় মাটিতে। তারপর উত্তরার শরীরের ওপর চড়িয়ে দেয় নিজের শরীরটাকে। উত্তরা বাধা দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। উত্তরা এক সময় ছেড়ে দেয় তার শরীর। বলরাম উত্তরার শরীরটাকে জোর করে নিতে থাকে।

কাট-টু

উত্তরা ও বলরামের রমণক্লান্ত শরীর দু'টো পাশাপাশি পড়ে আছে। উত্তরা উঠে পড়ে।

বলরাম : মনে হচ্ছিল যেন উইড়ে যাচ্ছিলাম। তর কেমন লাগছিল?

উত্তরা : শুধু শরীল তো একটা ডানা। একটা দিয়া উড়া যায়।

বলরাম : মানে?

উত্তরা : উইড়তে দু'টা ডানা লাগে। তোমার মনের ডানা কই? আছে?

দৃশ্য-৩৪/ *সকাল*

উত্তরা আর বুড়িকে দেখা যায় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে, মাথায় গাছের ডালের বান্ডিল নিয়ে আসছে।

কাট-টু

উত্তরা মাথায় গাছের ডালের বান্ডিল নিয়ে নিজেদের ঘরের দিকে আসছে।

কাট-টু

ঘরের ভিতর থেকে দেখা যায় উত্তরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। ছুড়ে ডালের বান্ডিল ঘরের বাইরে রাখে।

দৃশ্য-৩৫/ *সকাল*

বলরামের বাড়ির একটু দূরে রেলের একটা ভাঙা ও পুরনো শেড।

উত্তরা নিমাইকে খুঁজতে এসে উঁকি দিয়ে দ্যাখে নিমাই ওখানে বসে আছে। উত্তরা এগিয়ে যায়।

নিমাই-এর মুখ। মুখ দেখে বোঝা যায় ঘুমোয়নি। পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডে উত্তরাকে দেখা যায়।

উত্তরা সামনে এসে বলে —

উত্তরা : সকালবেলায় এখানে আইসে বস্যে আছ? চা খাবে নাই?

নিমাই : না?

উত্তরা চলে যেতে গেলে নিমাই ডাকে —

নিমাই : উত্তরা শোন।

উত্তরা : (ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে) কী?

নিমাই : (একটু থেমে বলে) তুই এখান থিকে চলে যা।

উত্তরা অবাক হয়। কাছে এগিয়ে আসে। বলে —

উত্তরা : মানে?

নিমাই কোনও কথা বলে না।

উত্তরা : (নিমাইকে প্রশ্ন করে) তোমার কি হইয়েছে?

নিমাই উঠে দাঁড়ায়। তাকায় উত্তরার দিকে। তারপর বলে —

নিমাই : উত্তরা শোন, আমারও তোকে পেতে ইচ্ছা করে বলরামের মতো।

উত্তরার চোখে বিস্ময়। একটু থেমে বলে —

উত্তরা : আমাকে পেতে ইচ্ছা করে নাকি আমার শরীলটাকে? কোনটা?

নিমাই : জানি না।

নিমাই হঠাৎ এগিয়ে আসে উত্তরার দিকে। উত্তরা সরে যায় অন্য দিকে। নিমাই আবার এগিয়ে আসে। উত্তরা আবার সরে যায়। এক সময় নিমাই ধরে ফ্যালে উত্তরাকে, উত্তরা

ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। পারে না বা পারার চেষ্টা ঠিক মতো করে না। (এইসময় পর্দায় শুধু নিমাই ও উত্তরার পা দেখা যায়)। একটা ধস্তাধস্তি চলতে থাকে।

হঠাৎ পিছন থেকে বলরামের ক্রুদ্ধ, কর্কশ চিৎকার শোনা যায় —

বলরাম : (রুদ্ধ আক্রোশে চিৎকার করে) নিমাই।

ফিরে তাকায় উত্তরা। দেখে বলরাম তার ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। উত্তরা বুঝতে পারে বলরাম সব দেখেছে। নিমাই তাকায় বলরামের দিকে। তারপর আস্তে আস্তে ছেড়ে দেয় উত্তরাকে।

দৃশ্য-৩৬/ *শেষ বিকেল*

শেষ বেলা। বলরাম আর নিমাই কুস্তি করছে। দু'জনের মুখেই ক্রোধ। দু'জনের মুখেই ঘৃণা। ওরা লড়ছে। ক্রমশ হিংস্র হয়ে উঠছে ওদের মুখ।

দৃশ্য-৩৭/ *বিকেলের আকাশ*

প্রথম দৃশ্যের মতো পাতা ঝরে পড়ছে। ক্যামেরা গাছের কাছে গেলে দেখা যায় গাছের কোটর থেকে অসংখ্য পোকা বেরিয়ে আসছে। দূরে ঘাসের ওপর দিয়ে একটা সাপ চলে যাচ্ছে। প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। উত্তরা মাথায় ডালপালার বান্ডিল নিয়ে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে। বৃষ্টির ছাটে উত্তরার সারা গা ভিজে যাচ্ছে। মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে উত্তরা এই বৃষ্টিস্নাত বিকেল খুবই উপভোগ করছে। মুখে মৃদু হাসি।

ধীরে ধীরে সাপটার চলে যাওয়া দেখে উত্তরা।

আস্তে আস্তে বৃষ্টি ধরে আসে। উত্তরা হাঁটতে শুরু করে, ঘাসের ওপর উত্তরার মলপরা পা দু'টো খালি দেখা যায়।

পাশের মেঠো রাস্তায় ধুলোর ঝড়ের মধ্য দিয়ে আমাদের আগে দেখা সেই জিপটা যাচ্ছে। ভিতরে সেই তিনজন লোক।

দৃশ্য-৩৮/ *শেষ বিকেল*

ঝড় থেমে গেছে। দূর থেকে দেখা যায় চার্চ। লং শটে দেখা যায় পাস্টার সাইকেল চালিয়ে আসছে। তার পিছনে বসে আছে ম্যাথু। চার্চের কাছে দু'জন সাইকেল থেকে নামে। ম্যাথু চার্চের বাইরে হাঁটতে থাকে। পাস্টার চার্চে ঢোকে।

কাট-টু

পাস্টার চার্চের ভিতরে ঢুকে চারদিকে তাকায়। তার কীরকম যেন লাগে। অতর্কিতে আগে থেকে চার্চের ভিতর লুকিয়ে থাকা দু'জন (আগে দেখা জিপের আরোহীদের তিনজনের মধ্যে দু'জন) তাকে ধরে। ধস্তাধস্তির সময় পাস্টারের অস্ফুট গলা শোনা যায় —

পাস্টার : কী চাও? ছাড়ো, ছাড়ো ছাড়ো!

লোক দু'টি পাস্টারকে হিঁচড়াতে হিঁচড়াতে চার্চের ভিতরে থামের কাছে নিয়ে যায়। ইতিমধ্যে জারিকেন ভরতি কেরোসিন নিয়ে তৃতীয়জন দৌড়তে দৌড়তে চার্চে ঢোকে।

পাস্টার : (কোনোক্রমে বলে) ম্যাথু পালা।

জারিকেন ভিতরে রেখে লোকটি বাইরে আসে।

অন্য দু'জন পাস্টারকে থামের সঙ্গে বেঁধে ফেলে। মুখে বলে — বাঁধ, শালাকে বাঁধ।

কাট-টু

তৃতীয়জন চার্চের বাইরে আসে। ম্যাথুকে তাড়া করে। বলে —

তৃতীয়জন : এই শালা, দাঁড়া ওখানে।

ম্যাথু হাতের ব্যাগভরতি বাজার ফেলে দৌড়তে থাকে। তরিতরকারি ব্যাগ থেকে বেরিয়ে জমির ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকে।

দৃশ্য-৩৯ / *শেষ বিকেল*

ভয়ে ও আতঙ্কে ম্যাথু জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ছুটছে। পিছন পিছন ছুটছে তিনজনের একজন, সেই শীর্ণকায় লোকটি।

কাট-টু

ম্যাথু ছুটছে।

তার পাশে একটা গাছে শীর্ণ লোকটির ছুড়ে মারা ছোরা সাঁ করে সশব্দে বেঁধে।

কাট-টু

মুখোশ পরা ও ঢোল হাতে নাটুয়ার দলটি জঙ্গলের ভেতর থেকে ছুটে এসে শীর্ণকায় লোকটির পথরোধ করে দাঁড়ায়। তারপর ঢোল ও নাচের তালে এগিয়ে আসতে থাকে লোকটির দিকে।

ম্যাথু গাছের কোটরে দাঁড়ায়। নাটুয়ার দলটি ম্যাথুকে ঘিরে ঘিরে নাচতে থাকে। সঙ্গে মিউজিক। ম্যাথু ও গাছটিকে কয়েকবার প্রদক্ষিণ করার পর তারা ম্যাথুর হাতে একটা মুখোশ ধরিয়ে দিয়ে চলে যায়।

দৃশ্য-৪০/ *শেষ বিকেল*

চার্চের সামনে জলে ভেজা জঙ্গলে দাঁড়িয়ে আছে জিপটা। জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে দূরের চার্চ দেখা যায়। উত্তরা মাথায় ডালপালার বান্ডিল নিয়ে জিপের ভেতর দেখে। জিপে কেউ নেই দেখে অজানা আশংকায় কেঁপে ওঠে। ডালপালা মাটিতে ছুড়ে দিয়ে চার্চের দিকে দৌড়য়।

কাট-টু

উত্তরা জানলা দিয়ে দেখে চার্চের ভিতর খুঁটিতে পাস্টারকে বেঁধে রাখা হয়েছে। মুখ কাপড় দিয়ে বাঁধা। জেরিকেন থেকে কেরোসিন ছিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে তার শরীরে এবং আসবাবপত্রে। জানলা দিয়ে লম্বা চুলওলা লোকটিকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়।

উত্তরার মুখ। সে দেখছে। তার মুখে আতঙ্ক। লম্বা চুলওলা লোকটি দেখে ফেলে উত্তরাকে। লম্বা লোকটিকে ইশারায় দেখায়।

চোখে চোখ পড়া মাত্র উত্তরা ছুটতে শুরু করে। তিনজনের একজন, দু'টো জারিকেন নিয়ে চার্চের দিকে আসতে থাকে। কয়েকজন গ্রামবাসী পিছন পিছন আসে। লোকটি তেড়ে যায়। বলে — যাও এখান থেকে। কী হল যাও? আরে ভাগ শালা।

গ্রামবাসীরা ভয় পেয়ে পালায়। লম্বা চুলওলা লোকটি চার্চের জানলা বন্ধ করে দেয়।

দৃশ্য-৪১/ *শেষ বিকেল*

বলরাম আর নিমাই কুস্তি লড়ছে। ভয়ংকর তাদের সে লড়াই। যেন একজন অন্যজনকে শেষ করে দেবে। উত্তরা ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়ায়। তারপর কুস্তিরত বলরাম ও নিমাইকে বলে —

উত্তরা : কী কইরছো তোমরা, থামো। ওয়ারা পাদরিবাবাকে মাইরে ফেলবে। থামো তোমরা। এখনি চলো। চলো তোমরা। সময় আছে, চলো না।

ওরা তাকায় একবার। অদ্ভুত ক্রোধের ঘোর ওদের চোখে। আবার লড়তে থাকে ওরা।

উত্তরা : বাঁচাবে নাই মানুষটারে, একবার যাবে নাই।

ওরা যেন কিছুই শোনে না। জন্তুর মতো দেখায় ওদের। প্রাণপণে লড়ে যায় দু'জন।

উত্তরার গলায় কান্না দলা পাকিয়ে আসে। চোখে ঘেন্না। বলে —

উত্তরা : ছিঃ, একটা মেইয়েমানুষের শরীলের জন্য...ছিঃ।

উত্তরা ছুটে বেরিয়ে যায়।

দৃশ্য-৪২/ *শেষ বিকেল*

লং শটে দেখা যায় উত্তরা সেই মাঠের ভিতরের রাস্তা দিয়ে ছুটছে। বাসে করে সেই বামন গার্ড আসছে।

কাট-টু

বামন গার্ড জানলা দিয়ে উত্তরাকে দৌড়তে দেখে। বাস ড্রাইভারকে বলে —

বামন গার্ড : বাস থামাও। (বাস থেমে যায়। গার্ড নেমে আসে। বামন গার্ড টুপি খুলে উত্তরাকে অভিবাদন করে।)

উত্তরা : উয়ারা পাদরিবাবাকে পুড়ায়ে মারছে। আপনি চলুন আমার সঙ্গে। আসুন।

বামন গার্ড : চলো।

দৃশ্য-৪৩/ *শেষ বিকেল*

লম্বা চুলওলা লোকটা চিৎকার করছে। চিৎকার করে বলছে —

লম্বাচুল : চলে যাও। যে শালা এদিকে আসবে তাকেও জ্বালিয়ে দেয়া হবে। কোনও শালা এখানে আসবে না। যাও যাও এখান থেকে। শালা। যে আসবে তাকেও জ্বালিয়ে দেব।

দুর্বৃত্তদের প্রত্যেকের হাতে জ্বলন্ত মশাল। গ্রামবাসীদের দিকে তেড়ে গেলে গ্রামবাসীরা ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। মশাল হাতে এবার তারা চার্চে আগুন লাগিয়ে দেয়। আগুন লেগে চার্চ পুড়তে থাকে। দেখা যায় তিনজন লোক জিপে চড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। দেখা যায় চার্চের ধোঁয়া শালকাঠের ক্রুশটিকে ক্রমশ ঢেকে দিচ্ছে।

দৃশ্য-৪৪/ *শেষ বিকেল*

উত্তরা বামন গার্ডকে নিয়ে চার্চের কাছে এসে চার্চটিকে দাউদাউ করে জ্বলতে দেখে। উত্তরা 'পাদরিবাবা' বলে হাহাকার করে জ্বলন্ত চার্চের দিকে ছুটে যায়।

বামন গার্ড : (উত্তরার হাত ধরে) যেও না। কী করছ কী?

উত্তরাকে টেনে সরিয়ে নিয়ে যায় গার্ড। একটা জানলার কাছে গিয়ে দেখতে পায় ভিতরে পাস্টারের শরীর আগুনে জ্বলছে। বোঝা যায় অনেক আগেই মরে গেছে পাস্টার।

উত্তরার সামনে চার্চের ছাদের জ্বলন্ত কাঠ খসে পড়ে। সরে গিয়ে দু'জনে একটু দূরে দাঁড়ায়।

বামন গার্ড : সব শেষ। কিছু করার নেই। সব শেষ।

উত্তরা অধীর হয়ে কাঁদতে থাকে। বামন গার্ডের দিকে তাকায়। তার মুখ দেখে বোঝা যায় সেও বুঝতে পেরেছে আর কিছু করার নেই। চার্চের ঘণ্টার পাশ দিয়ে দু'জন হাঁটতে শুরু করে।

দৃশ্য-৪৫/ *শেষ বিকেল*

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে রাস্তা দু'ভাগ হয়ে গেছে। এক বাঁকের সামনে এসে বামন গার্ড বলে —

বামন গার্ড : আমি যাই। গাড়ি নিয়ে যেতে হবে ঝাড়সুগদা।

সে এগিয়ে যায়। উত্তরা দাঁড়িয়ে থাকে। কয়েক পা হেঁটে ঘুরে দাঁড়ায় বামন গার্ড। টুপি খুলে

অভিবাদনের ভঙ্গি করে উত্তরার দিকে তাকায়।

দুঃখের মধ্যেও উত্তরার মুখে হাসির আভা ফুটে ওঠে।

বামন গার্ড হাসে। চলে যেতে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। বলে —

বামন গার্ড : বাড়ি যাবে না?

উত্তরা মাথা নেড়ে না জানায়।

বামন গার্ড : কী হয়েছে?
উত্তরা : ঘেন্না পাচ্ছে।
বামন গার্ড : কেন?
উত্তরা : উয়ারা মানুষ লয়। কত বইললাম। আইলো না কিছুতেই। আইলে হয়তো মানুষটারে বাঁচানো যেত।

বামন গার্ড একটু চুপ করে থাকে। তারপর বলে —

বামন গার্ড : কোথায় যাবে তাহলে? কেউ নেই তোমার?
উত্তরা : আছে। সেখানে যাবো নাই। গেলে আবার ওই লোকগুলোর কাছে পাঠায়ে দেবে।

তারপর মুখ সামান্য ঘুরিয়ে নিচু স্বরে বলে —

উত্তরা : উয়ারা আমার দেহটা কিনে নিয়েছে কিনা!

বামন গার্ড অল্প সময় তাকিয়ে থাকে উত্তরার দিকে। তারপর সামনের দিকে হেঁটে যেতে থাকে।

উত্তরা দেখছে বামন গার্ডকে।

বামন গার্ড কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে থামে। বলে —

বামন গার্ড : আমার সঙ্গে যাবে?
উত্তরা : (অবাক হয়ে বলে) কোথায়?
বামন গার্ড : আমাদের গ্রামে।
উত্তরা : (ম্লান হেসে বলে) সে কতদূর?
বামন গার্ড : ওই পাহাড়টা পেরিয়ে একটা নদী, নদীটা পেরোলেই আমাদের গ্রাম। যাবে? থাকবে আমার সঙ্গে?

উত্তরার মুখে সেই ম্লান হাসি একটু বাড়ে। বলে —

উত্তরা : তোমার সঙ্গে কী ভাবে থাইকবো?
বামন গার্ড : কেন, আমার বউ হয়ে?

উত্তরা এবার হেসে ফ্যালে।

বামন গার্ড : আমার বউ নেই। বিয়ে হয়নি। (তারপর একটু থেমে বলে)

তুমি খুব ভালো। তোমার সঙ্গে বিয়ে হলে বাচ্চাগুলো তোমার মতো ভালো হবে।

উত্তরা : তারাও তো তোমার মতো ছোট ছোটো বামন হবে।
বামন গার্ড : তাইতো হবে। আমাদের গ্রামে আমরা সবাই তাই।
উত্তরা : (একটু অবাক হয়ে বলে) সবাই?
বামন গার্ড : সবাই। দাদু, ছেলে, নাতি, ঠাকুমা, মা, মাসি সবাই আমার মতো।

উত্তরা হাসে। তার হাসি দেখে বোঝা যায় উত্তরার ভাল লাগছে বামন গার্ডকে।

বামন গার্ড : লম্বা মানুষ তো দেখলে এতকাল। কিছু করতে পারল তারা? পৃথিবীটা বদলাল? খালি যুদ্ধ, যুদ্ধ আর যুদ্ধ। (একটু থেমে) জানো, আমাদের গ্রামে আমরা সবাই একটা স্বপ্ন দেখি।
উত্তরা : কী স্বপ্ন?
বামন গার্ড : দেখি আশেপাশে সব আমাদের মতো বামনে ভরে গেছে। তারাই চালাচ্ছে সব। মানুষ ভাল আছে। সত্যি? (আবার থেমে বলে) তুমি স্বপ্ন দ্যাখো?
উত্তরা : দেইখতাম ছোটবেলায়। কানাইকাকা বলত স্বপ্ন দেখা নাকি ভাল লয়, আয়ু কমে যায়।
বামন গার্ড : জানি না। তবে যারা স্বপ্ন দেখে না, তারা স্বপ্ন দেখার লোকগুলোকে সরিয়ে দিতে চায়। একদিন আর পারবে না।

উত্তরা তাকিয়ে আছে তার দিকে।

বামন : যাবে আমার সঙ্গে?

উত্তরা হাসে। সামনের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। তার পায়ের মলের শব্দ আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। কয়েক পা এগিয়ে এসে উত্তরা তার পা থেকে মলজোড়া খুলে জঙ্গলের মধ্যে ফেলে দেয়।

কাট-টু

বামন : (উত্তরাকে প্রশ্ন করে) ফেলে দিলে?

কাট-টু

উত্তরা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলে —

উত্তরা : হ্যাঁঃ। শব্দটা শিকলের মতো লাগে।

কাট-টু

বামনের মুখ। অবাক তার চাহনি।

কাট-টু

উত্তরার মুখ। সেই মুখে অদ্ভুত এক হাসি। এগিয়ে আসতে থাকে সে। রহস্যময়ী লাগে তাকে

সেই আলোয়।

হঠাৎ কী দেখে থেমে যায় উত্তরা। থেমে যায় তার হাসি। ভয়ে পাণ্ডুর হয়ে যায় তার মুখ। দূর থেকে জিপের শব্দ শোনা যায়।

কাট-টু

জিপটা এসে থামে তাদের কাছে। জিপ থেকে দ্রুত নামে সেই আগের দেখা তিনজন লোক। ওদের দিকে দ্রুত এগিয়ে আসতে থাকে।

কাট-টু

উত্তরা দাঁড়ায়। তাকায় বামন গার্ডের দিকে। তার চোখ ইঙ্গিতে কিছু বলতে চায় বামন গার্ডকে।

কাট-টু

বামন গার্ড তাকায় উত্তরার দিকে। দ্রুত পায়ে হেঁটে পালাবার চেষ্টা করে তারা।

কাট-টু

সেই তিনজন লোকের মধ্যে একজন ইশারা করে অন্যজনকে। সে হঠাৎ বামন গার্ডের দিকে একটা ছোরা ছুড়ে মারে।

বামন গার্ড আর্ত চিৎকার করে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। দেখা যায় ছোরাটা বামন গার্ডের পিঠে সমূলে বিঁধে আছে। উত্তরা আতঙ্কিত হয়ে তাকায় সেদিকে।

কাট-টু

লোক তিনটি উত্তরার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। এগিয়ে আসতেই থাকে। উত্তরার চিৎকার শোনা যায়।

কাট-টু

উত্তরার মুখ। ছুটে যায় সে।

কাট-টু

লোক তিনটি ক্রমশ আরও এগিয়ে আসতে থাকে। চারদিকে সন্ধ্যাশেষের রং, সারা আকাশ জুড়ে।

উত্তরা আর্ত চিৎকার করে পালাবার চেষ্টা করছে। পেছনে তাড়া করছে সেই তিনজন।

উত্তরা ছুটে দূরে প্রান্তরে একটা বাড়ির কাছাকাছি যেতে চায়।

লংশটে দেখা যায় দুর্বৃত্তরা তাকে তাড়া করছে। উত্তরা ছুটতে ছুটতে আলুথালু বেশে ক্যামেরার কাছাকাছি এসে পড়ে।

দৃশ্য-৪৬/ *শেষ বিকেল*

ফাঁকা প্রান্তরের মধ্যে রাস্তা দিয়ে জোরে, দূরে চলে যাচ্ছে আগের দেখা দুর্বৃত্তদের সেই জিপ।

জিপ চলে যাওয়ার পর দেখা যায় সেই পথ দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে যাচ্ছে পূর্বপরিচিত সেই চারজন গ্রামবাসী; মাইকেল, পিটার, স্যামুয়েল ও চতুর্থজন।

স্যামুয়েল : ই শালা সমুদ্দুর আর কতদুর রে? কতনা দিন চলতে হবেক?

চতুর্থজন : অনেকদুর রে স্যামুয়েল। এখনও তো কইলকাতাই আইল নাই। প্রথমে কইলকাতা। উঠিনেলে বিজলি টেরেন। ইয়ার পর সমুদ্দুর পাইরাইন চলা পথ, তা বাদে আমেরিকা।

পিটার : আমরা আর ইঠিনে ঘুরে আসব নাই।

স্যামুয়েল : উঠিনের মেইয়েছেলেগুলান নাকি পরীর মতোন। উয়ারাও খিস্টান। একজাইতেই তো বিয়াশাদি। নকি? ছেলেপুল্যা গুলা হলে সব ধবোধবো হবেক। চাইরবেলা পেটভরে খেতে পাবেক। উয়ারা যেমন খায়।

দৃশ্য-৪৭/ *ভোর*

বামনের দল জল পেরিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে আসছে। ধীরে ধীরে তারা পাড়ে উঠে পড়ে। তারা গাছের তলায় মাটিতে পড়ে থাকা মৃত বামন গার্ড ও উত্তরার শরীরের কাছে এসে দাঁড়ায়। দ্যাখে পড়ে থাকা দু'টি শরীর। তারপর গানের মতো মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে গোল হয়ে ঘুরতে থাকে মৃত বামন গার্ডের শরীর ঘিরে। দেখা যায় বামন গার্ডের পিঠে একটা ছোরা সমূলে বিদ্ধ হয়ে আছে। একজন বামনের চোখে জল দেখা যায়। এক সময় মৃত বামন গার্ডের শরীরটাকে তারা তুলে নেয়, দু'টো ছোট ছোট বাঁশের মধ্যে বাঁধা মাদুরের ওপর।

তারা বামন গার্ডের শব নিয়ে ধীরে ধীরে এগোতে থাকে। বামন শবযাত্রীদের মধ্য থেকে একজন মহিলা বামন দাঁড়ায়। তারপর সামান্য জোরে হেঁটে এসে উত্তরার শরীরের দিকে ঝুঁকে তাকায়। উত্তরার শরীরের অসম্বৃত বেশবাস দেখে বোঝা যায় ধর্ষণ ও চূড়ান্ত শারীরিক নিগ্রহের ফলে তার মৃত্যু হয়েছে।

সেই বামন মহিলা উত্তরার খোলা চোখ আলতো করে বন্ধ করে দেয়। তার সঙ্গীরা এই দৃশ্য দেখে।

কাট-টু

বামন শবযাত্রীরা চলেছে। হঠাৎ ঢোলের শব্দ শুনে দাঁড়িয়ে পড়ে তারা।

কাট-টু

মুখোশ পরে নাচতে নাচতে, ঢোল বাজাতে বাজাতে সেই নাটুয়ার দলটিকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়।

তাদের পিছনে মুখোশপরা ম্যাথু। তারা গান গাইছে — ফুলগাছটি লাগাইছিলাম...

গান

ফুলগাছটি লাগাইছিলাম ধূলামাটি দিয়া রে
সে ফুলও ফুটিয়া রইল অগম দইরার মাঝারে ।
গাছে আইল বড় আম, ছয় আনা সাত আনা দাম
বড় আম বড় মিঠা লাগে রে
বাঁকুড়া বাজারে লাজ লাগে রে।
আমগাছে আম নাই, কুটা কেনে লারো রে
তুমার দেশে হামি নাই, আঁখি কেনে ঠারো রে।
কদমতলে মাথায় চূড়া, দাঁড়ায় আছে নবীন ছুড়া
ওরে ছুড়া মোদের পাড়ায় যাবি লো
গেঁথে দিবো বিনি সুতার মালা।
সড়পে সড়পে যাব, বেছে বেছে টুপা লিব
সেই টুপায় চালভাজা খাব রে
সফল জনম আর কি পাব।

কাট-টু

ম্যাথু নাটুয়ার দল ছেড়ে শবযাত্রীদের দিকে এগিয়ে আসে। মুখোশ খোলে। কাঁদতে কাঁদতে হাত নাড়ে শবযাত্রীদের দিকে।

কাট-টু

বামন শবযাত্রীরা আস্তে আস্তে চলে যায়।

গানের মধ্যে বলরাম ও নিমাইয়ের কুস্তি করার শব্দ ওভারল্যাপ করে।

তাদের বেশ খানিকটা পেছনে দেখা যায় নিমাই ও বলরাম তখনও কুস্তি করে যাচ্ছে।

মুখ ফিরিয়ে তারা একবার তাকায় ম্যাথুর দিকে। তারপর আবার শুরু করে দেয় তাদের কুস্তি।

কাট-টু

কুস্তি করে যাচ্ছে নিমাই আর বলরাম। তাদের কুস্তি করার সময় মুখনিঃসৃত আওয়াজ অনেকটা শীৎকারের মতো শোনায়।

হঠাৎ কালো হয়ে আসে চারদিক। তাদের কুস্তির আখড়ার সামনে এতকাল অনড় থাকা পাথরটা হঠাৎ নড়ে ওঠে। তারপর গড়িয়ে গড়িয়ে জমির ঢাল বেয়ে নীচে নেমে আসতে থাকে। আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায় নিমাই ও বলরাম।

ভেসে ওঠে প্রথম দৃশ্যের মতো প্রাচীন গাছের একটি জঙ্গল। কাছে দূরে ঝরে পড়তে থাকে শুকনো পাতা। ক্যামেরা এগিয়ে যায় এই প্রাচীন গাছের সারির মধ্য দিয়ে।

ধীরে ধীরে পর্দা শাদা হয়ে যায়। শেষের টাইটেল একে একে উঠে আসতে থাকে।

সমাপ্ত

"TRUST INDIANOIL TO SERVE YOU THE BEST
CUSTOMER SATISFACTION IS OUR MOTTO".

Indian Oil Corporation Limited
(Marketing Division)

INDIANOIL BHAVAN
2, Gariahat Road (South)
Dhakuria
CALCUTTA - 700068.

इंडियनऑयल
Indian Oil

Price : Rs. 60 | **BIVAV** | Reg No : 30017/76
Vol. 23 No.1 | Special Autumn Issue | 83rd issue
July-Sept. '2001
Published in October
INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NO ISSN 0970-1885

VICTORIA MEMORIAL HALL

AN INSTITUTION OF NATIONAL IMPORTANCE

1 QUEEN'S WAY, KOLKATA -700 071
PH: 223-1889-91/5142, FAX: 223-5142

A. SOUND AND LIGHT SHOWS AT VICTORIA MEMORIAL GROUND ON PRIDE AND GLORY-THE STORY OF CALCUTTA:
SHOW TIMES : **OCTOBER TO FEBRUARY**
FROM 6.15-7 P.M (BENGALI SHOW) / FROM 7.15-8 P.M. (ENGLISH SHOW)
MARCH TO JUNE
FROM 6.45 -7.30 P.M. (BENGALI SHOW)/ FROM 7.45-8.30 P.M. (ENGLISH SHOW)
RATE OF TICKETS: R.10/- AND Rs.20/-, STUDENTS:Rs.10/-
CHILDREN ABOVE THREE YEARS- FULL TICKETS
FOR BLOCK BOOKINGS PLEASE CONTACT- EDUCATION UNIT-IN-CHARGE

B. TRAVELLING EXHIBITION:
ORIENTAL SCENERY -YESTERDAY & TODAY TO BE HELD IN FOUR METRO CITIES BELOW

BANGALORE :- 08.12.2001 TO 31.01.2002 (KARNATAKA CHITRA KALA PARISHAT)
CHENNAI :- 15.01.2002TO 05.02.2002 (STATE MUSEUM)
HYDERABAD :- 15.02.2002 TO 05.03.2002 (SALAR JUNG MUSEUM)
NEW DELHI :- 15.03.2002 TO 1ST WEEK OF APRIL 2002 (IGNCA)

C. RECENT PUBLICATIONS:

I. CHARLES D'OLY'S CALCUTTA -ALBUM I AND II	RS.	40.00 EACH
2. J.B.FRASER'S CALCUTTA	RS.	35.00
3. CALCUTTA IN THE EYES OF THOMAS DANIELL	RS.	35.00
4. INDIAN IN THE EYES OF DANIELLS'	RS.	40.00
5. INDIA AS SEEN BY SIMPSON	RS.	40.00
6. SELECT VIEWS OF INDIA	RS.	40.00
7. PICTURE POST CARD SET-D	RS.	10.00
8. PICTURE FOLIO NO.2	RS.	1.00
9. PICTURE FOLIO NO.3	RS.	2.00
10. CERAMIC TILES (VIEWS OF ST. ANDRES'S CHURCH)	RS.	32.00
11. CHAKRABORTI, HIREN: AN URBAN HISTORICAL PERSPECTIVE FOR THE CALCUTTA TERCENTENARY	RS.	35.00
12. GREIG, CHARLES: LANDSCAPE PAINTINGS IN THE VICTORIA MEMORIAL	RS.	150.00
13. GOPA CHOUDHURI AND BHASKAR CHANDRA : A COMPREHENSIVE CATALOGUE OF WATER COLOURS, PENCIL SKETCHES AND PEN AND INK DRAWINGS IN THE COLLECTIONS OF VICTORIAL MEMORIAL	RS.	15.00
14. URDU GUIDE BOOK	RS.	5.00
15. GANGULY, K.K. : MODERN MASTERS	RS.	35.00
16. CATALOGUE OF BUSTS AND STATUARY	RS.	2.50
17. CALCUTTA GALLERY - INDIA'S FIRST CITY GALLERY	RS	50.00
18. CONTEMPORARY ART OF BENGAL	RS	375.00
19. VICTORIA MEMORIAL 2000 NATURAL HISTORY PAINTINGS @ ALBUM SERIES	RS	90.00
20. HILSCAPE OF INDIA	RS	70.00
21. VICTORIA AT NIGHT	RS	5.00
22. NATIONAL LEADERS PORTRAIT GALLERY	RS	1.25